আবার যদি ইচ্ছা কর

নারায়ণ সান্যাল

আবার যদি ইচ্ছা কর

নারায়ণ সান্যাল

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা ৭০০০০৯

"Abar Yadi Ichcha Kara"
A Bengali novel by
Narayan Sanyal
Rs. 120 only

রচনাকাল ১৯৭০-৭১
প্রথম (নাথ) সংস্করণ
আগস্ট ১৯৮১
শ্রাবণ ১৩৮৮

পঞ্চম মুদ্রণ
জুন ২০০৯
আষাঢ় ১৪১৬

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

অলংকরণ
লেখক

মুদ্রক
অন্নপূর্ণা এজেন্সি
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

ISBN 81-8093-093-9

১২০ টাকা

প্রেমেনদাকে

কৈফিয়ৎ

'Prisoner of Zenda'কে য়ুরোপ থেকে ভারতবর্ষের 'ঝিন্দ্'-রাজ্যে স্থানান্তরিত করার কৈফিয়ৎ হিসাবে শরদিন্দু লিখেছিলেন একটিমাত্র পংক্তি ঃ 'নাম দিয়াই বংশ পরিচয় স্বীকার করিলাম।'

অত সহজে আমার নিষ্কৃতি মিলবে না। জেন্দার বন্দী ছিলেন কাল্পনিক ; আমি যাঁদের দেশকাল ভেদে নবজন্ম দিয়েছি তাঁরা রক্তমাংসের মানুষ।

আমার নায়ক চন্দ্রভান গর্গের জন্ম-তারিখ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই। বস্তুত ঐ তারিখে দেহত্যাগ করেন বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী ভ্যাসঁ ভান গখ্। পল গোগ্যাঁ ভান গখ্-এর চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। গগনবিহারী পালও আমার কল্পনায় চন্দ্রভানের চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। সমারসেট মম্ তাঁর 'The Moon and Sixpence' কাহিনী লিখেছেন গোগ্যাঁর মৃত্যুর বছর পনের পরে। মম্ স্বীকার করেছেন, গোগ্যাঁর বিচিত্র জীবনকথা তাঁকে ঐ উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল ; যদিও গোগ্যাঁর জীবনকে তিনি হুবহু অনুসরণ করেননি। অপরপক্ষে আর্ভিন স্টোন তাঁর 'Lust for Life' উপন্যাসে ভান গখ্-এর জীবনী সর্বতোভাবে অনুসরণ করেছেন ঐতিহাসিক নিষ্ঠায়।

প্রথমেই স্বীকার্য ভ্যাসঁ ভান গখ্ ও পল গোগ্যাঁর জীবন আমার এ কাহিনীর মূল প্রেরণা। আমার পক্ষে ঐ দুই দিকপাল শিল্পীর জীবন সর্বতোভাবে অনুসরণ করার উপায় ছিল না। স্থান ও কাল পরিবর্তন করায় স্থানে স্থানে পাত্রদ্বয়ের জীবনকাহিনী পরিবর্তনে আমি বাধ্য হয়েছি। যেমন—ভান গখ্ প্রথম জীবনে লণ্ডনে এক প্রখ্যাত আর্ট ডীলারের দোকানে সেল্‌সম্যানের কাজ করেছেন। 'গোপিল অ্যাণ্ড কোম্পানী'র মত সারা য়ুরোপ-ব্যাপী কোন চিত্র-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আমি ঐতিহাসিক কারণে বিংশ শতাব্দীর ঊষাযুগে ভারতবর্ষে কল্পনা করতে পারিনি। সে-যুগে কলকাতার হগ্ মার্কেটে বটুকেশ্বর দেবনাথের ছোট্ট ছবির দোকানটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেই আমার লেখনীর ভাঁড়ারে কল্পনাশক্তি 'বাড়ন্ত' হয়ে পড়ে। ভান গখ্ তাঁর 'ফার্স্ট' কাজিন'কে সামাজিক প্রথায় বিবাহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন—যা এদেশে অকল্পনীয় ছিল।

তুলনায় গোগ্যাঁর বাস্তব-জীবন থেকে গগন পাল-এর জীবনকাহিনীর ফারাকটা বেশি। বরং বলা যায় গগনের সঙ্গে মম্-কল্পিত স্টিকল্যাণ্ড চরিত্রের সাদৃশ্য অধিক। স্টিকল্যাণ্ড অথবা গগন যেভাবে রাতারাতি স্ত্রী ত্যাগ করলেন বাস্তবে গোগ্যাঁ তা করেননি। আন্না অথবা য়ামায়ার কথা স্ত্রীর কাছে গোপন রেখে স্ত্রীর সঙ্গে তিনি শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। গোগ্যাঁ গৃহত্যাগের সময়ে পুত্রকে নিয়ে যান এবং পুত্র প্রতি পিতার কর্তব্যে ত্রুটি করেননি। তিনি দুবার তাহিতি যান এবং কুষ্ঠরোগেও মারা যাননি। আবার স্টিকল্যাণ্ডের জীবনে ভ্যাসঁর মত কোন বন্ধুর দেখা পাই না—কোন উন্মাদ প্রতিভাধর শিল্পীবন্ধু তাঁর ক্ষুর নিয়ে তাড়া করেননি। সেদিক থেকে স্টিকল্যাণ্ডের চেয়ে গোগ্যাঁর বেশি কাছাকাছি গেছে গগন। বাস্তবে গোগ্যাঁর একটি চিত্র সালোঁতে নির্বাচিত হওয়াতেই তাঁর শিল্প-জীবনের দিকে ঝোঁক হয়—অথচ কাল্পনিক গগনবিহারীর কোন চিত্র কলকাতার আর্ট স্কুলের বার্ষিক প্রদর্শনীতে নির্বাচিত হয়নি।

ফলে সমারসেট মম্ ও আর্ভিং স্টোনের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আমি একটা মনগড়া কাহিনী উপস্থাপিত করছি এমন কথা মনে নেওয়াই বোধহয় শোভন।

একটা কথা। চিত্রশিল্পী হিসাবে নিজের সীমিত ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও এ গঙ্গা-পূজার উপচারে গঙ্গাজলটিকে একেবারে বাদ দিতে মন সরল না। সচিত্র উপন্যাস লেখার রেওয়াজ নেই—তাই প্রতি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে কিছু ছবি এঁকেছি। এ কাহিনীর মূল প্রতিবেদন যে এক শতাব্দীতেই সীমিত নয়, এমন একটা ইঙ্গিত যদি ঐ ছবিগুলির মাধ্যমে ফুটে উঠে থাকে তাহলেই আমার শ্রম সার্থক। বলা বাহুল্য যে-সব শিল্পীর ছবি এঁকেছি তাঁরাই যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী এমন কোন বিচার করে আমি তাঁদের নির্বাচন করিনি।

আরও একটা কথা। যদিও মনগড়া কাহিনী লিখছি বলে 'কৈফিয়তে' একটা সাফাই গাওয়া গেল, তবু হয়তো অজ্ঞাতসারে একটা অন্যায় করেছি। এ কাহিনী পড়ে পাঠকের মনে ঐ দুই বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীর সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতে পারে। সেই অপরাধ স্খালনের জন্য গ্রন্থশেষে ঐ দুই মহান শিল্পীর সংক্ষিপ্ত জীবনী পরিশিষ্টে যোগ করে দিলাম।

কৈফিয়ৎ বা explanation হিসাবে আমার শেষ কথা পল গোগ্যাঁর সেই অনবদ্য উক্তিটি ঃ

"A man's work is the explanation of that man."

নারায়ণ সান্যাল

২১. ৬. ৭২

চিত্রসূচী

পৃষ্ঠা	বিষয়	সময়কাল (আঃ)
৯ ...	স্পেনের আলতামেরিয়ায় প্যালিওলিথিক যুগের গুহাচিত্র। চার রকম রঙ ব্যবহৃত	দশ হাজার বছর পূর্বেকার
১৫ ...	মিশর সম্রাট টুটেনখামেন ও তাঁর মহিষী	১৪০০ খ্রীঃপূঃ
২৪ ...	মহাচীনের হোনান প্রদেশে শান বংশের সম্রাট সিয়াঙ চুঙ-এর সমাধিতে প্রাপ্ত শ্বেত-পাথরের ভাস্কর্য, একটি রাক্ষসমূর্তি	১২০০ খ্রীঃপূঃ
৩১ ...	পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় আসুরনাসিরপাল-এর প্রাসাদে খোদিত ভাস্কর্য—অশ্বারোহী কর্তৃক সিংহ-শিকার	খ্রীঃপূঃ ৭ম শতাব্দী
৫৫ ...	অজন্তা সপ্তদশ বিহার—বিশ্বান্তর জননী	৬৫০ খ্রীঃ
৮৩ ...	অবলুপ্ত মায়া সভ্যতায় প্যালেঙ্কে-প্রাপ্ত একটি স্টাক্কো	১১-১৩শ শতাব্দী
৯৯ ...	তিশান—ভেনিসীয়, বেলিনীর ছাত্র ও জর্জনের বন্ধু	১৪৭৭-১৫৭৬
১১৫ ...	মিকেলাঞ্জেলো-নির্মিত মর্মর মূর্তি—গোলিয়াথের প্রতীক্ষায় ডেভিড (ফ্লোরেন্স)	১৪৭৫-১৫৬৪
১২৩ ...	অজন্তা গুহায় সিংহল—অবদান জাতক কাহিনী	৭ম শতাব্দী
১৩৪ ...	রাফায়েল—কিশোর বয়সে, নিজ প্রতিকৃতি প্যাস্টেল	১৪৮৩-১৫২০
১৪০ ...	রেমব্রান্ট—নিজ প্রতিকৃতি (তেলরঙে আঁকা) হল্যাণ্ড	১৬০৬-১৬৬৯
১৬১ ...	দেলাক্রোয়ে—ঐ ফরাসী	১৭৯৯-১৮৬৩
১৬৯ ...	পল সেজান— ঐ ঐ	১৮৩৯-১৯০৬
১৮৩ ...	পল গোগ্যাঁ (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)	১৮৪৮-১৯০৩
২০১ ...	ভ্যাসঁ ভান গখ্ ঐ	১৮৫৩-১৮৯০
২১২	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৬৭-১৯৩৮
২৩৪ ...	নন্দলাল বসু	১৮৮২-১৯৬৬

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের-ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে।।
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধূলার 'পরে করি খেলা গো ;
হাসির মায়ামৃগীর পিছে ভাসি নয়ননীরে।।
কাঁটার পথে আঁধার রাতে আবার যাত্রা করি,
আঘাত খেয়ে বাঁচি না হয় আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে গো,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি আবার ধরণীরে।।

রবীন্দ্রনাথ

অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত স্বহস্তে লিখেও বেচারি গণেশ মহাভারতকার হতে পারেননি। সে হিসাবে এ গ্রন্থের কাহিনীকার হিসাবে আমারও দাবী থাকা উচিত নয়। তবু একটু 'কিন্তু' আছে। দেবাদিদেব গণপতি দ্রুতগতিতে শ্রুতি-লিখন লিখে গিয়েছিলেন মাত্র।

আমি তা লিখিনি। নোট নিয়েছি—তারপর নিজের ভাষায় লিখেছি, কাট-ছাঁট করেছি, সাজিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি একমাত্র দ্বৈপায়ন-দাদুর মুখেই গোটা গল্পটা শুনিনি—কিছুটা পেয়েছি কীটদষ্ট পুরাতন দৈনিক ও মাসিক পত্রের পাতায়, কিছুটা বা পূর্বসুরীদের প্রকাশিত গ্রন্থে। তবু নিঃসংশয়ে স্বীকার করতে হবে, এ কাহিনী লেখার মূল প্রেরণাটা পেয়েছি দ্বৈপায়ন-দাদুর কাছে।

দ্বৈপায়ন-দাদু আমার মায়ের অতি দূর সম্পর্কের মামা। তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। আমার জন্মের আগে থেকেই। সম্পর্কটা মায়ের দিক থেকে হলেও বন্ধনটা দৃঢ়তর হয়েছিল বাবার সঙ্গেই। আমার বাবা ছিলেন শিবপুর কলেজের এঞ্জিনিয়ার, আর দ্বৈপায়ন-দাদু মেডিকেল কলেজের ডাক্তার। বয়সে বাবা কিছু বড় হতেন। অথচ দুই ভিন্নপথের বৈজ্ঞানিক কোথায় যেন একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে ওঁদের বাড়িতে কতবার গিয়েছি। ওঁদের সেই বাগবাজারের সাবেকী বাড়িতে। বাবার সঙ্গে তাঁর কি সব আলোচনা হত। আমাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য দাদু আলমারি খুলে ছবির বই বার করে দিতেন। অপূর্ব সব রঙিন ছবির বই। আমি বিভোর হয়ে ছবি দেখতাম। ছবিগুলো আমার শিশুমনে গভীর রেখাপাত করেছিল সেই বয়সেই। তাই বাবা বাগবাজারে যাচ্ছেন শুনলেই আমি বায়না ধরতাম—তাঁর সঙ্গে যাব। মনে হয়, চিত্রশিল্পের দিকে ছেলেবেলা থেকে আমার যে ঝোঁকটা হয় তার জন্য দ্বৈপায়ন-দাদু অনেকাংশে দায়ী। তারপর আর তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। আমার বাবা গত হয়েছেন আজ প্রায় ত্রিশ বছর। এর মধ্যে দাদুকে আর দেখিনি। আসলে আমার বাবাই ছিলেন যোগসূত্র। তিনি গত হওয়ার পর দ্বৈপায়ন-দাদুর সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা শিথিল হয়ে আসে। সামাজিক অনুষ্ঠানে দু' তরফেই নিমন্ত্রণ হয়—মা থাকতে বিজয়ার একখানা করে পোস্টকার্ড ছাড়তেন মনে আছে। তারপর যেমন হয়ে থাকে—ফারাকটা বেড়েই গেছে। তাঁর চেহারাটা আবছা মনে পড়ে। ত্রিশ বছর আগে তাঁকে শেষবার যখন দেখি তখনই তিনি পঞ্চাশোর্দ্ধ। টকটকে ফর্সা রঙ, কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত একমাথা চুল। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা আর বাঙলার বাঘের মত একজোড়া পুরুষ্ট গোঁফ। পেশায় ডাক্তার হলে কি হয়, তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল—ভারতীয় দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও ললিতকলায়।

লেখাপড়া শেষ করে চাকরি-বাকরি করি—বড় হয়ে অনেকবার মনে হয়েছে একবার

তাঁর কাছে যাই। গিয়ে দেখি, সেই আশ্চর্য বইগুলো এখনও টিকে আছে কিনা তাঁর আলমারিতে। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। দ্বৈপায়ন-দাদু যে এখনও বেঁচে আছেন এ খবরটা জানতাম। শুনেছি এখনও তিনি চলে-ফিরে বেড়াতে পারেন। ছানি কাটাবার পর চোখেও আবার দেখতে পাচ্ছেন।

বছরখানেক আগেকার কথা। কী খেয়াল হল—আমার সদ্য-প্রকাশিত একটি গ্রন্থের এক কপি তাঁকে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলাম। লিখলাম—'আপনি হয়তো আমাকে ঠিক মনে করতে পারবেন না। খুব ছোটবেলায় আপনি আমাকে দেখেছেন। বাবার সঙ্গে আপনার ওখানে যখন যেতাম তখন আপনি আমাকে অনেক ছবির বই দেখতে দিতেন। তখন আমি নিতান্ত শিশু, কিন্তু তখনই আমার দৃষ্টি প্রথম ছবির জগতের দিকে যায়। এ বইটি সেই ছবির দেখার বিষয়েই। বইটি আপনার কেমন লেগেছে জানতে পারলে ভাল লাগবে। বাবাকে তো আর দেখাতে পারলাম না।'

দাদুর কাছ থেকে কোন প্রাপ্তিসংবাদ আসেনি। তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম সে-কথা।

প্রায় মাস-ছয়েক পরে ছোট্ট একটা পোস্টকার্ডে এল ততোধিক ছোট্ট একটি চিঠি। হস্তাক্ষরে বার্ধক্যের ছাপ। হরফগুলো কেঁপে কেঁপে গেছে। লিখেছেন, "ছিয়াশী চলছে, তাই তোমার বইটি শেষ করতে দীর্ঘ সময় লাগলো। একবার এলে ও-বিষয়ে সাক্ষাতে আলোচনা হতে পারে। আসার সময় আর এক কপি 'অপরূপা অজন্তা' নিয়ে এস।"

ভাল লেগেছে কি লাগেনি সে-কথার ধার দিয়েও যাননি। উনি না যান, আমাকে যেতে হবে। ওঁর কাছে। একটু খটকা লাগল। দ্বিতীয় আর এক কপি বই নিয়ে উনি কী করবেন? যা হোক এক রবিবারের সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেই সাবেক বাড়িতে আছেন এখনও। দোতলা বাড়ি। সংস্কারের অভাবে জীর্ণ। পলেস্তারা খসে গেছে এখানে-ওখানে। রেনওয়াটারপাইপ ফেটে গেছে। একটা অশ্বত্থের চারা মাথা চাড়া দিয়েছে কার্নিশে। একতলায় একটা ওষুধের দোকান। সে-আমলে এখানে বসেই উনি রুগী দেখতেন। এখন ডিসপেন্সারী। দোতলায় একটা অংশ ভাড়া-দেওয়া, অপর অংশে থাকেন দ্বৈপায়ন-দাদু আর তাঁর মেয়ে—সীমামাসি। সীমামাসিই দরজা খুলে দিতে এসেছিল। পরিচয় দিতেই আমার হাতটা খপ করে ধরে বলে—ওমা, তুমিই সেই নরেন? এখন কত বড় হয়ে গেছ! পথেঘাটে দেখলে চিনতেই পারতুম না। বাবা! দেখ কে এসেছে!

সীমামাসিকে আমি আদৌ চিনতে পারিনি। কখনও ওঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বাবার সঙ্গে যখন আসতাম তখন আমি এইটথ্ কি নাইনথ্ ক্লাসে পড়ি। পকেট বোঝাই হয়ে থাকত লাট্টু অথবা মার্বেলে। কোন মাসিকে এ বাড়িতে দেখেছি—কই মনে তো পড়ে না! দিদিমাকে মনে আছে। লালপাড় শাড়ি পরতেন—কাছে বসিয়ে খাওয়াতেন। বোধহয় তখন সীমামাসি শ্বশুরবাড়িতে থাকত। তখনও নিশ্চয় সে বিধবা হয়নি।

দাদুকে দেখেই কিন্তু চিনতে পারলাম। কারণ মায়ের অ্যালবামে তাঁর ফটো দেখেছি। পরিবর্তনের মধ্যে মাথার চুলগুলো বিলকুল সাদা হয়ে গেছে। বসেছিলেন একটা ক্যাম্বিসের ইজি-চেয়ারে। কী একখানা বই পড়ছিলেন। হাতে লাল-নীল পেন্সিল। আমি প্রণাম করতেই বললেন—বসো। আর একখানা বই এনেছ?

আমি তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বইখানি বাড়িয়ে ধরি।

প্রথম পাতাটা উল্টে দেখে বললেন—কই, আমাকে দিচ্ছ তা তো লিখে দাওনি?

কোন পত্রিকায় সমালোচনার জন্য দু'কপি বই দাখিল করতে হয় শুনেছি ; কিন্তু—

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে কলম বার করে ওঁর নাম লিখে বইটি ওঁর হাতে দিলাম। বৃদ্ধও বিনা বাক্যব্যয়ে ইজি-চেয়ার থেকে উঠলেন। টেবিলের টানা ড্রয়ার থেকে মোটা একখানা বাঁধানো খাতা দেখে বইটাতে একটি নম্বর বসালেন। আলমারি খুলে একটা নির্দিষ্ট তাকে বইয়ের নম্বর মিলিয়ে সেটিকে রাখলেন এবং ব্রাউন কাগজে মোড়া একখানি বই নিয়ে এসে আমাকে দিয়ে বলেন, এই নাও তোমার বই।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে বললেন, আমি বনফুলের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারিনি। একথা ঠিক যে, সাধারণ বাঙালী পাঠকের ক্ষীর হজম করার ক্ষমতা ক্রমশ লুপ্ত হতে বসেছে ; আর দল বেঁধে ফুচ্‌কা খেতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তবু আমার বিশ্বাস—তোমার এ বই একদিন দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হবে। তখন এ কপিটা তোমার কাজে লাগবে।

বইটা খুলে দেখি—মার্জিনে অসংখ্য মন্তব্য! বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করেছেন, পাঞ্চুয়েসন মার্ক বদলেছেন,—গোটা বইটা প্রুফ রীডিং করেছেন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ। বেশ বোঝা যায় কী অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন উনি বইটি পড়তে বসে। দু-এক স্থলে ওঁর সংশোধনের অর্থ বোধগম্য হল না। প্রশ্ন করলাম—লেঅনার্দোর 'লাস্ট-সাপার' কথাটা কেটেছেন কেন?

দ্বৈপায়ন-দাদুর চোখদুটি হাসিতে চিকচিক করে উঠল, বললেন, যেহেতু লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি 'লাস্ট-সাপার' নামে কোন ছবি আঁকেননি।

অবাক হয়ে বলি, তার মানে? 'মোনালিসা' ছাড়া ওঁর 'লাস্ট-সাপার'ই তো—

বাধা দিয়ে দাদু আবার বলেন, দেশ তো পঁচিশ বছর স্বাধীন হয়েছে, নরেন। লেঅনার্দো যে ছবিটি এঁকেছিলেন তার নাম 'লাস্ট-সাপার' তিনি দেননি। তাঁর ভাষায় যদি বল, তবে বলা উচিত 'চেনা উল্‌তিমা' (Cena Ultima)। আর সে-ভাষায় যদি তোমার পাঠক অর্থ গ্রহণ করতে না পারে তবে যে ভাষায় বইটি লিখেছে সেই ভাষাতেই বল, 'শেষ সায়মাশ'। ইংরাজের দেওয়া নাম এখনও চালাব কেন?

আমি সবিনয়ে ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে বলি, আর এখানে? সিংহল-অবদান জাতকের এখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন কেন?

দাদু বললেন, ঠিক মনে পড়ছে না। পড়ে শোনাও তো।

আমি পড়ে যাই—দ্বীপটির নাম তাম্রদ্বীপ—ইতিপূর্বে জম্বুদ্বীপের বণিক কখনও আসেনি এ দ্বীপে। নারিকেল-ছাওয়া সমুদ্র-মেখলা এই দ্বীপে—

দাদু বাধা দিয়ে বলেন, ও বুঝেছি। তোমার ও-বর্ণনায় আমার আপত্তি 'নারিকেল-ছাওয়া' শব্দটায়। তুমি জাতকের গল্প শোনাচ্ছ—সিংহল দ্বীপে পলিনেশিয়া থেকে নারকেল আমদানি করা হয় খ্রীষ্টজন্মের পর। খ্রীষ্টপূর্ব সিংহলের বনরাজির বর্ণনায় 'তমাল-তাল' চলতে পারে। নারিকেল ওখানে আউট অফ বাউণ্ডস্!

কথা বলতে বলতে দুজনেই মেতে উঠি। আমি সদ্য অজন্তা চষে এসেছি। জাতীয় গ্রন্থাগারে না-হ'ক মাস ছয়েক ঘোরাঘুরি করেছি—অথচ দ্বৈপায়ন-দাদু দেখছি আমার চেয়ে সব বিষয়েই খবর রাখেন বেশি। মতের অমিল হলেই বার করে আনছেন বই—গ্রিফিথ, ইয়াজদানি, লেডি হেরিংহ্যাম, মুকুল দে। টেবিলের ওপর স্তূপাকার হয়ে উঠল ঈশানচন্দ্রের জাতক, ফৌস্‌বোলের জাচকার্থ বর্ণনা, বুদ্ধের নানান জীবনী। কোন্ গ্রন্থটি

কোন্ আলমারির কোন্ তাকে থাকে তা খুঁজে বার করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হচ্ছে না। দুজনেই ডুবে গেছি অজন্তাসমুদ্রে।

সকাল আটটায় শুরু হয়েছে। তারপর কখন যে ঘন্টা-চারেক কেটে গেছে একেবারেই টের পাইনি। হুঁশ হল সীমামাসি ডাকতে আসায়।

—বাবা, তোমার স্নান করার সময় হল যে।

—এই যে সীমা এসেছিস! নরেনের জন্য একটু চা-টা—

—তুমি ছাড়লেই দিতে পারি।

—না না, চা খেতে খেতেই আমাদের চলতে পারে।

মনে পড়েছিল কাঁচি সিগারেটের সেই বিজ্ঞাপনটির কথা। আমি কী হারিয়েছি তা আমি নিজেই জানি না। বইটি লেখার পর ওঁর কাছে না এসে যদি লেখার আগে আসতাম!

সেদিন ওঁর স্নানের জল যে কতবার ঠাণ্ডা হয়েছিল তা মনে নেই। তবে ছাড়া যখন পেলাম তখন বেলা দুটো।

কিন্তু ছাড়া কি সত্যিই পেলাম? এমন মানুষকে কি ছাড়া যায়? ত্রিশ বছরের লোকসানটা পুষিয়ে নিতে ঘন ঘনই আমাকে বাগবাজারমুখো ছুটতে হল। এখন বুঝতে পারি, কোন্ আকর্ষণে বাবা ওঁর কাছে আসতেন। দু'চার দিনেই বৃদ্ধ আপন করে নিলেন আমাকে। গিয়েছিলাম আলমারির লোভে—কিন্তু এখন দেখছি আলমারির মালিকও কম লোভনীয় নন।

একদিন বললাম, আপনি লেখেননি কিছু? বই-টই?

বৃদ্ধ হাসলেন, পড়েই শেষ করতে পারলুম না—লিখি কখন?

—কখনই লেখেননি? প্রবন্ধ-টবন্ধ?

—ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে কিছু লিখেছি। সে-যুগের মাসিক-সাপ্তাহিকে। বই করে ছাপাইনি কিছু।

—আপনার ছবির দিকে ঝোঁক হয় কতটুকু বয়সে?

বৃদ্ধ আবার হেসে বলেন, একেবারে ছেলে বয়স থেকেই। আমার ঠাকুরদা নিজে হাতে কালীপ্রতিমা বানিয়ে পুজো করতেন। তাঁর কাছ থেকে মাটি চুরি করে যখন পুতুল গড়তাম তখন মাজায় কড়ি-বাঁধা ঘুন্‌সি-ছাড়া বোধহয় আর কিছু ছিল না।

তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে বলেন,—আমার ইচ্ছে ছিল আর্টিস্ট হব। গভর্ণমেন্ট আর্টস স্কুলে ভর্তি হব। হলাম গিয়ে ডাক্তার!

—আর্টিস্ট হলেন না কেন?

—বাবা হতে দিলেন না। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কবিরাজ। ডাক্তারী পড়তে পাঠালেন আমাকে। বাবা যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন সেটাই ইংরাজি করে বলেছেন হারীন্দ্রনাথ ঃ

'Doctor's fees are heavy, lawyer's fees are high,
Artists are just supposd to entertain and die!'

আবার একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বলেন, আচ্ছা তুমি চন্দ্রভান গর্গের নাম শুনেছ? কিম্বা গগনবিহারী পালের?

বললাম, আজ্ঞে না। কে তাঁরা?

সে-কথার জবাব না দিয়ে পুনরায় বলেন, অথবা বটুকেশ্বর দেবনাথের?

এবার বলি, হ্যাঁ। বটুকেশ্বর দেবনাথ সে-আমলের একজন নামকরা চিত্রকর। রবি বর্মার স্টাইলে ছবি আঁকতেন তিনি। বেশ জোরালো ড্রইং ছিল তাঁর।

বৃদ্ধ ম্লান হেসে আমার কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন শুধু—নামকরা চিত্রকর! না? বেশ জোরালো ড্রইং! অথচ চন্দ্রভান আর গগনবিহারীর নামই শোননি তুমি।

আবার পেশ করতে হল একই প্রশ্ন, ওঁরা দুজন কে? ছবি আঁকতেন?

বৃদ্ধ যেন নিজের চিন্তাতেই ডুবে রইলেন অনেকক্ষণ। চোখদুটি আধবোজা। হাতদুটি কোলের ওপর জড়ো করে রাখা আছে। ক্যাম্বিসের ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে উনি যেন অনেক অনেকদিন আগে ফেলে-আসা পথের বাঁকে বাঁকে পাক খাচ্ছেন। তারপর হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলেন, ওরা তিনজনই আমার সহপাঠী। ঐ চন্দ্রভান, গগন আর বটুক। একই স্কুলে পড়তাম আমরা। চারজনের বন্ধুত্ব ছিল গভীর। ওর ভেতর আমি আর বটুক ছবি আঁকতাম। চন্দ্রভান আর গগন ছবি আঁকার ধারে-কাছেও ছিল না। অথচ—

আবার হারিয়ে ফেলেছেন নিজেকে। আমি নিশ্চুপ অপেক্ষা করি। খানিক পরে হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, তুমি তো লিখতে পার। চন্দ্রাভান আর গগনের কথাটা লিখবে নরেন? দল বেঁধে যারা 'ফুচকো' খেতে চায় তাদের জন্যে তো অনেক কিছুই লিখছে—যারা ক্ষীর হজম করার ক্ষমতা নিয়ে নিরম্বু উপবাস করত তাদের কথাও কিছু বল না?

বুঝতে পারি একটা গল্পের প্লট এসে গেছে হাতের কাছে। কথা-সাহিত্যের যাঁরা বেসাতি করেন তাঁদের কাছে এ জাতীয় প্রস্তাবে উৎসাহিত হওয়ার কিছু থাকে না। অধিকাংশ মানুষই ভাবে তার জীবনে আছে উপন্যাসের উপাদান, ভাল একটা রোমান্টিক কাহিনীর হিরো হবার জন্যেই সে এসেছে পৃথিবীতে। তাই এ-জাতীয় কথায় কথাসাহিত্যিক কান দেন না। জানেন, কিছুটা সময় নষ্ট করা ছাড়া এতে লাভ নেই কিছু। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বক্তা তাঁর নিজের কথা বলতে চাইছেন না ; তাছাড়া বক্তা এখানে রাম-শ্যাম-যদু নয় স্বয়ং ডাক্তার দ্বৈপায়ন লাহিড়ী।

আমি এককথায় রাজী হয়ে যাই।

দাদু বলেন, ভাল হত জীবনী লিখতে পারলে—কিন্তু ওদের গোটা জীবনটা তো আমি জানি না। যেটুকু জেনেছি তাও অসম্পূর্ণ। অনেক কার্যকরণ সম্পর্ক জানা নেই আমার। তবু ওদের সম্বন্ধে বোধকরি একমাত্র আমার স্মৃতিতেই বেঁচে আছে কিছু তথ্য। আমার সঙ্গে সঙ্গে তাও শেষ হয়ে যাবে। না—আমি কোন কিছুই সাজেস্ট করব না। তুমি ওদের জীবনী লিখতে পার, ওদের কাহিনী দিয়ে নাটক লিখতে পার, বা উপন্যাস লিখতে পার। সে দায়িত্ব তোমার। তবে যা হোক কিছু লিখ ওদের নিয়ে। চন্দ্রভান গর্গ আর গগনবিহারী পালের নাম বাঙালীর জানা উচিত।

আমি বলি, জীবনী কেউ পড়ে না, নাটক লিখলে সেটা মঞ্চস্থ করার হাঙ্গামা আছে। নাটকও কেউ পড়ে না। যদি বলেন, তাহলে একটা উপন্যাসই লিখব দাদু, তবে একটা শর্ত আছে!

কৌতুক উপচে পড়ে দ্বৈপায়ন-দাদুর মোটা ফ্রেমের চশমা ভেদ করে—শর্ত? কী শর্ত?

—আপনাকে একটা ভূমিকা লিখে দিতে হবে।

হো হো করে হেসে ওঠেন দাদু। বলেন, এই কথা? কিন্তু তাহলে আমিও একটি

শর্ত আরোপ করব। কঠিন শর্ত!

এবার আমাকে গম্ভীর হতে হয়। বলি, বলুন!

—রোজ সকালে উঠে তোমাকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে—হেই ভগবান, বইটা ছাপা হওয়া পর্যন্ত যেন বুড়ো দ্বৈপায়ন-দাদু টিকে থাকে!

আমি তৎক্ষণাৎ বলি, এ প্রার্থনা মঞ্জুর হলে ভগবানকে আচ্ছা জব্দ করা যাবে! কারণ সে-ক্ষেত্রে বইয়ের শেষ পৃষ্ঠাটা আর কিছুতেই লিখব না আমি। দ্বৈপায়ন-দাদু অমর হয়ে থাকবেন।

অট্টহাস্যে ঘর ফাটিয়ে ফেলেন দাদু, এটা বড় জবর বলেছ হে।

সে হাসিটা আজও কানে বাজছে। কারণ এ-বই ছাপাখানা থেকে বার হয়ে আসার আগেই দ্বৈপায়ন-দাদু আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন।

তাই তাঁর ভূমিকাটা আর যোগ করা গেল না।

অবশেষে চার বন্ধু রাজী হল। দেখাই যাক না পরখ করে, ক্ষতি তো নেই। আপত্তি ছিল গগনের। ও এসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করে না। একেবারে মূর্তিমান কালাপাহাড়। দেব-দ্বিজ-হাঁচি টিকটিকি-মাদুলি-কবচ সব কিছুকেই সে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চায়। তা হোক, সেও রাজী হয়েছে সঙ্গে যেতে। আর কিছু নয়, সারাদিন একসঙ্গে হৈ-হৈ তো করা যাবে। পারানি-নৌকায় গঙ্গা পার হওয়া, কোম্পানির বাগানে বেড়ানো, তাই বা মন্দ কি? তাছাড়া দেখাই যাক না ভণ্ড সাধুর বুজরুকির পরিমাণ।

রবিবার ছুটির দিন। সকালবেলা বাবুঘাটের খেয়াঘাটে গুটিগুটি এসে জমায়েত হয়েছে ওরা চার বন্ধু। খবরটা প্রথমে এনেছিল বটুক—বটুকেশ্বর দেবনাথ। বরিশালের বাঙাল। সে খবর এনেছে যে, গঙ্গার ওপারে কোম্পানির বাগানে কে এক ত্রিকালজ্ঞ সাধু এসেছেন। প্রকাণ্ড বটগাছটার তলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন প্রায় এক মাস। মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারেন। কখনও হস্তরেখা বিচার করে, কখনও স্রেফ তার কপালের দিকে তাকিয়ে। এমন ত্রিকালজ্ঞ অবধূত হাতের কাছে থাকতে তিন-তিনটে মাস অপেক্ষা করার কি দরকার? চল সবাই মিলে ওপারে যাই। বাবার পা জড়িয়ে ধরি ; তাহলেই তিনি বলে দেবেন, চারজনের মধ্যে কে জলপানি পাবে, কে স্রেফ পাস করবে আর কে গাড্ডু খাবে। আর্য মিশন স্কুলের চার বন্ধু প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে ওরা। পাস না ফেল—এ জল্পনার শেষ নেই। দীপু তো রোজ প্রশ্নপত্রগুলি নিয়ে বসে আর প্রশ্নে কত নম্বর পাবে তা আন্দাজে লিখে যোগ করে দেখে। পাস করলে সে সোজা গিয়ে ভর্তি হবে সাহেব-পাড়ার সরকারী আর্টস্কুলে। আর্টিস্ট হতে হবে তাকে। বশ্যা-বাঙাল বটুকেশ্বর কথা দিয়ে রেখেছে—সেও লেজুড় ধরবে দীপুর। চন্দ্রভান জমিদারের ছেলে—বাপের মস্ত জমিদারী। নদে-মুর্শিদাবাদে হাজার হাজার বিঘে জমির মালিক ওরা। তিনপুরুষ বসে খেলেও সে সম্পত্তি শেষ হবে না। রোজগার তাকে কোনদিনই করতে হবে না। তবে সখের পড়াশুনা কতদিন চালাবে বলা যায় না। আর গগন পাল? ও ডাকাতটা দেহেই বেড়েছে শুধু—বুদ্ধিটা বাড়েনি। বয়সে সে ওদের তিনজনের চেয়ে প্রায় পাঁচ বছরের বড়। দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেছে, তবু এখনও ম্যাট্রিকটা পাস করতে পারল না।

বাবুঘাটের এ পাশে পাটের গুদাম। খোয়া বাঁধানো চওড়া হ্যারিসন রোড দিয়ে সারি সারি ঘোড়ার গাড়ি, পাল্কি আর গো-যান চলেছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ায়টানা ট্রামগাড়ির ঘরঘরানি। ভিস্তিতে সাত সকালে জল ছিটিয়ে গেছে, না হলে ধুলোর ঝড় উঠত এতক্ষণে। এক প্রহর বেলাতেই রোদ বেশ চড়া হয়েছে। হবে না? বোশেখ মাস চলছে যে।

ওরা এসে বসে শান-বাঁধানো পাষাণ রাণার ওপর। খেয়া নৌকাটা সবেমাত্র ওপার

থেকে ছেড়েছে। বোশেখ মাস হলে কি হয়, ডিহি কলকাতার গঙ্গা গ্রীষ্ম-বর্ষার ফর্মুলা মেনে চলে না, চলে জোয়ার-ভাঁটার আইনে। এখন গঙ্গায় ভরা জোয়ার। পাষাণ রাণার অনেকগুলি ধাপ ডুবে গেছে ঘোলা জলের গর্ভে। কচুরিপানার চাঁই দল বেঁধে ভেসে চলেছে কাকদ্বীপ-সাগরদ্বীপ থেকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখতে।

বটুকেশ্বর বলে—দীপু তোর বাবা আর বাগড়া দিচ্ছেন না তো?

দীপু একটা আড়ামোড়া ভেঙে জবাব দেয়—বাবা আর কিছু বলেননি। মাকে কাল বলেছি—বটুকও আমার সঙ্গে ভর্তি হবে। আমি ঐ আর্টস্কুলেই পড়তে যাব কিন্তু! তা মা বললেন, আগে পাস তো কর, তারপর ওঁকে বলব।

চন্দ্রভান গগন পালকে বলে—গগ্যা, তুই এবার কি পড়বি রে?

—আমি? আমি আসছে বছর আবার ম্যাট্রিক দেব!

—দূর! এবার তুই ঠিক পাস করে যাবি!

গগন জবাব দেয় না। মাঠ থেকে একটা চোরকাঁটা উবড়ে নিয়ে তার ডাঁটা চিবোতে থাকে। উদাস নেত্রে গঙ্গার ওপারে কি যেন দেখতে থাকে।

কথাটা প্রথম খেয়াল হল বটুকেশ্বরের। বলে—হ্যাঁরে, আমরা সন্ন্যাসী দর্শন করতে যাচ্ছি, একেবারে খালি হাতে যাব?

—খালি হাত ছাড়া কি? কেন, মারামারি বাধবে নাকি?

—দূর! তা নয়, আমি বলছিলাম কি, একটু মিষ্টি-টিষ্টি, কি ফল—

দীপু বলে—ঠিক কথা। আমার মাকে দেখেছি তাঁর গুরুদেবের কাছে যাবার সময় ফল-মিষ্টি নিয়ে যেতে। তোর কাছে পয়সা আছে বটুক?

চন্দ্রভান ওদের মধ্যে রেস্তওয়ালা বন্ধু। জমিদারের ছেলে। কামিজের পকেট থেকে একটা চক্‌চকে দোয়ানি বার করে বলে—আমার কাছে আছে। যা হোক নিয়ে আয়।

দীপু করিৎকর্মা ছেলে। বড় রাস্তার ধারে দোকান বসেছে। চট করে সেখান থেকে কিনে নিয়ে আসে গোটা চারেক পাকা আম, কদমা আর চিনির মঠ। বলে—কী দাম হয়েছে সব জিনিসের! ভূতো-বোম্বাই আম, তাও পয়সায় দুটোর বেশি দিল না।

বটুক বলে—সামনেই অক্ষয় তৃতীয়া যে। আমের দাম তো এখন বাড়বেই।

চন্দ্রভান বলে—তাও তো এখন পাচ্ছিস। পরের বছর তাও পাবি না।

—কেন? পাব না কেন?

—পূব-বাঙলা আলাদা হয়ে গেলে চালান আসবে ভেবেছিস? আম তো আসে মালদা থেকে।

—তোর মাথা থেকে! সে হল গিয়ে ফজলি আম, ভূতো-বোম্বাই নয়। তাছাড়া পূব-বাঙলা আলাদা হয়ে গেলেও সে তো মহারানীর রাজ্য ছেড়ে যাবে না। বিহার থেকে কি চালান আসে না?

বটুক বলে, আর তাছাড়া বাঙলাদেশ কেটে দু'খণ্ড করব বললেই হল? সুরেন বাঁড়ুজ্জে বেঁচে থাকতে ওটি হবার জো নেই।

কিছুই বলা যায় না রে বটুক। সাহেবরা ইচ্ছে করলে না পারে কি?

দ্বৈপায়ন কাগজ পড়ে। অনেক খবর রাখে। সে বললে—অত সহজ নয় হে! লর্ড কার্জনের হুকুমে ছোটলাট ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েসানে সব বড় বড় জমিদারদের ডেকে অনেক বুঝাবার চেষ্টা করেছে। এখনও কেউ হুঁ-হাঁ করেনি। ছোটলাট পূব-বাঙলায় লম্বা চরকিও মেরে এসেছে। শুনেছি মৈমনসিঙের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য

চৌধুরী তার মুখের ওপরেই বলে দিয়েছেন বাঙলা ভাগের প্রস্তাবে বাঙালিরা প্রাণপণে বাধা দেবে।

চন্দ্রভান বলে—আরে মৈমনসিঙের মহারাজা তো হিন্দু। পূব-বাঙলার অনেক বড় বড় মুসলমান জমিদারও তো আছে! তারা এতে সারা দেবে। সব মুসলমানই চাইবে—

বাধা দিয়ে বটুক বলে ওঠে—না! আবদুল রসুলও পূব-বাঙলার মানুষ।

গগন বলে—ঝাঁট দে! একা আবদুল রসুল কি করবে?

—একা কেন? ঢাকার নবাব শল্লিমুল্লার ভাই আকাতুল্লা, মৌলবী আবদুল কাসেম, আবুল হোসেন, দেদার বক্স, দীন মহম্মদ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, লিয়াকৎ হুসেন, ইসমাইল সিরাজী, আবদুল হালিম গজনবী—সবাই বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে। এঁরা কেউই হিন্দু নন। পূব আর পশ্চিম বাঙলা কি দুটো আলাদা দেশ, যে কেটে দু'খণ্ড করলেই হল?

এইবার ঝগড়া বেধে যায় বুঝি। চন্দ্রভান তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে বলে—কই, কি কি আনলি দেখা তো দীপু?

দেপায়ন কাগজের ঠোঙা খুলে দেখাতে থাকে।

এ কী রে গর্দভ! পৈতে এনেছিস কেন?

মাকে দেখেছি ফল-মিষ্টির সঙ্গে একটা পৈতাও দিতেন গুরুদেবকে।

আরে দূর! সে তো গুরুদেব, ব্রাহ্মণ মানুষ। এ যে সন্ন্যাসী। এ তো পৈতে পুড়িয়ে ভগবান হয়েছে!

স্থির হয় পৈতেটা আপাতত সরিয়ে রাখা হবে। যদি—দেখা যায় সন্ন্যাসীর গলায় পৈতে আছে তখন কায়দা করে ওটা ঠোঙায় ফেলে দেওয়া হবে।

এবার ওঠ সবাই। ঐ দেখ, খেয়া নৌকা এসে গেছে এপারে।

কিন্তু শুভকাজে নানান বাধা। ঠিক এই শুভ মুহূর্তেই দুটি ছেলে লাফাতে লাফাতে এসে হাজির হল। সূরযভান আর সুশীল। সূরয বলে—দাদা, আমরাও কোম্পানির বাগানে যাব!

—তোরা কোত্থেকে খবর পেলি? কে বলেছে আমরা কোম্পানির বাগানে যাচ্ছি?

—আমরা সব জানি। সব টের পেয়ে গেছি। তোমরা সন্ন্যাসী দেখতে যাচ্ছ!

কী আপদ! সূরয হচ্ছে চন্দ্রভানের ছোট ভাই। পিঠোপিঠি। আর সুশীল সেন সূরযের সহপাঠী। ও দুটি আবার মানিক-জোড়। দু-ক্লাস নিচে পড়ে। এইট্‌থ ক্লাসে।

হ্যাঁরে, সরকার মশাই জানেন?—চন্দ্রভান সভয়ে প্রশ্ন করে ছোট ভাইকে।

পাগল! সরকার মশাই শুধু জানেন আমি তোমার সঙ্গে আছি।

তা হতভাগা ছেলে, মরতে খালি পায়ে এসেছিস কেন?

ত্রয়োদশবর্ষীয় সূরযভান তার ধূলি-ধূসরিত নগ্ন পদযুগলের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসে। বলে—এক্কেরে খেয়াল ছিল না।

নে, আমারটাই পায়ে দে।

দু ভাইয়ের জুতোর মাপ এক। সূরয মৃদু আপত্তি জানায়।

চন্দ্রভান একটি থাপ্পড় উঁচিয়ে ভাইকে শাসনে আনে। চিনেবাজারে ফিতে বাঁধা জুতো জোড়া খুলে দেয়। সূরয মুখ নিচু করে পরে নেয় দাদার জুতো।

দীপু বলে—এ এক নতুন বখেড়া হল। এসব আণ্ডাবাচ্ছা নিয়ে—

বটুক ভিতরের কথা জানে। তাই বলে, আর উপায় নেই দীপু। লক্ষ্মণভাই যা

বায়না ধরেছেন তখন শ্রীরামচন্দ্রকে আর টলানো চলবে না।

চন্দ্রভান একগাল হাসে। স্বীকার করে নেয় অভিযোগটা। না করেই বা কি লাভ? জানতে তোর আর বাকি নেই কারও।

পিঠোপিঠি ভাইয়ের এ রকম ভালবাসা সচরাচর নজরে পড়ে না। ঝগড়া নেই, বিবাদ নেই, ভাইয়ের দাদা-অন্ত প্রাণ—দাদাও ভ্রাতৃপ্রেমে অচৈতন্য। ন'দে-শান্তিপুরের জমিদার ওরা। বাপ-মা মরা দু-ভাই। কাকা রাশভারী মানুষ ; তিনিই সংসারের কর্তা। শোনা যায়, দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার অগ্নিভান গর্গের শাসনে বাঘ আর গোরু একঘাটে জল খেতে না এলেও নিজ নিজ আবাসে শান্ত হয়ে থাকে। অগ্নিভান খানদানী জমিদার নন—তিন-পুরুষে জমিদারী। অগ্নিভানের পিতামহ ভানুভান গর্গ একদিন পশ্চিমদেশ থেকে এসেছিলেন লোটা এবং কম্বল সম্বল করে। ব্যবসাসূত্রে। গেঁওখালি থেকে কলকাতা—বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। তিনি ছিলেন উদ্যোগী পুরুষসিংহ। আকাশে তারার ঔজ্জ্বল্য কমতে শুরু করার আগেই তাঁর দিন শুরু হত কানে পৈতা জড়িয়ে। সূর্যোদয়ের আগেই একশ ডন-বৈঠক সেরে ছোলাভিজে ও মিছরি সহযোগে এক লোটা দুধ খেয়ে ফেলতেন। তারপর সারাদিন কাজের চাকায় বাঁধা থাকত তাঁর কর্মসূচী। ধুলিমুঠি নিয়ে সোনামুঠি করেছেন কাঁচামালের ব্যবসায়ে। হাটে হাটে মাল কিনেছেন, মাল বেচেছেন শহরগঞ্জে। প্রথম যুগে ঝাঁকা মাথায় করে, শেষদিকে শুধু হিসাব রেখে। শেষ বয়সে সূর্যাস্ত আইনের কল্যাণে হঠাৎ কিনে ফেললেন জমিদারী। জলাঙ্গীর উত্তর ধারে এক লপ্তে সোনা ফলানো প্রকাণ্ড এক ভূখণ্ড। পাগলাচণ্ডীর একজন জমিদার হয়ে বসলেন। আনন্দময়ী মায়ের মন্দিরের সোপানে তাঁর নাম লেখা সাদা মার্বেলের ফলকটা আজও পায়ে পায়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। ভানুভান নূতন দেশে এসে সবকিছুই করায়ত্ত করেছিলেন, পারেন নি শুধু এ-দেশের ভাষাটা আয়ত্ত করতে। বাঙলা হরফ আদৌ চিনতেন না। সেটা আয়ত্ত করেছিলেন তাঁর পুত্র ইন্দ্রভান গর্গ। তিনি এমন সুন্দর বাঙলা বলতে পারতেন যে, বোঝাই যেত না বাঙলা ভাষাটা তাঁর মাতৃভাষা নয়। পরিবর্তনের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন পরবর্তী পুরুষ ভীমভান আর অগ্নিভান। বাঙলাই ছিল তাঁদের মাতৃভাষা। ভীমভান অবশ্য অকালে মারা গেছেন। জমিদারীর মালিক এখন অগ্নিভান। কনৌজী ব্রাহ্মণ ওঁরা। অগ্নিভান ভ্রাতৃষ্পুত্রদ্বয়ের উপনয়ন দিয়েছেন এগারো বছর বয়সে। পাগলাচণ্ডীকে নিজের কাছে রাখেন নি রেখেছেন কলকাতায় গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। সরকার মশাই ওদের স্থানীয় গার্জেন।

চন্দ্রভানের বাবা ভীমভান কবে মারা যান তা ওর স্মরণ হয় না, কিন্তু মা যখন মারা যান তখন ওর বয়স আট, ওর ছোট ভাই সূরযের পাঁচ। মায়ের মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল চন্দ্রভান। মৃত্যুকে সে প্রথম চিনল ; কিন্তু মৃত্যুর মহিমা উপলব্ধি করবার মত বয়স ছিল না তখন সূরযভানের। চন্দ্রভান দুটি বাহু দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল ছোট ভাইকে। মায়ের অভাবটা বুঝতে দেয় নি। ব্যথা তো শুধু সেখানেই নয়, ব্যথা ছিল আরও গভীর। খুড়িমা ঐ দুটি শিশুকে দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। অগ্নিভান বদমেজাজী রাশভারী মানুষ, তাঁর স্ত্রী ওদের দেখতে পারেন না। ফলে চন্দ্রভানই হয়ে পড়ল ছোট ভাইয়ের একমাত্র অবলম্বন। দুই ভাই যেন কানাই-বলাই—

কাহিনীর সূত্র হারিয়ে ফেলেছেন দেখে বললাম—সন্ন্যাসীর দেখা শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন?

দ্বৈপায়ন-দাদু গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে রেখে বলেন—তা পেয়েছিলাম।

যদিও তাঁর ভবিষ্যৎবাণী শুনতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল।

—কেন?

—আমরা খেয়ানৌকায় যখন ওপারে পৌঁছলাম তখন সূর্য মাথার উপর। বোটানিক্সে আগেও এসেছি। ঝুরিনামা প্রকাণ্ড বটগাছটার অবস্থান জানা ছিল। গুটি গুটি সেখানে হাজির হয়ে দেখি জনমানবহীন বৃক্ষচ্ছায়ায় সন্ন্যাসী একা বসে আছেন পদ্মাসনে। সামনে একটা ধুনি জ্বলছিল, নিবে গেছে। পাশে পড়ে আছে একটা চিমটে আর ত্রিশূল। একটা কমণ্ডলু। কম্বলের একটা আসন বিছানো। সন্ন্যাসীর বয়স কত তা আন্দাজের বাইরে। মাথায় বিরাট জটা, আবক্ষ দাড়ি। শীর্ণ শিরাওঠা দেহ। পরিধানে কৌপীন, উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ। চোখ দুটি আধবোজা, আমাদের দেখতে পাচ্ছেন কিনা বোঝা গেল না। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড এই যে উনি যেখানে বসেছেন সেখানে গাছের ছায়া পড়ে নি। বোধ করি প্রথম যখন ধ্যানে বসেন, তখন ওখানে ছায়াই ছিল—এতক্ষণে ছায়াটা সরে গেছে। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বসে আছেন উনি—কিন্তু সে অনুভূতি ওঁর নেই। বটুকেশ্বর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল তাঁকে। দেখাদেখি আমরাও। ধ্যানভঙ্গ হল না সাধুবাবার। বটুক ফল আর কদমার ঠোঙাটা ওঁর নাগালের মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়ায়। সন্ন্যাসীর গলায় যে পৈতে নেই সেটা আগেই লক্ষ্য হয়েছিল আমাদের। বটুক তাই হাতসাফাই করে পৈতেটা সরিয়ে রেখেছিল। সে আমাদের চোখের ইঙ্গিতে সরে পড়তে বলে। কি আর করা যায়? ধ্যান ভাঙা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষাই করতে হবে। একটু দূরে আমরা গাছের ছায়ায় এসে বসি। গগন কাজের ছেলে। এক প্যাকেট তাস সঙ্গে করে এনেছিল। চন্দ্রভান তাস খেলতে জানে না। তা হোক, আমাদের অসুবিধা হল না। সুরযের বন্ধু সুশীল জানে। আমরা চারজনে টোয়েন্টিনাইন খেলতে বসি। চন্দ্রভান আর সুরয আদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় আর বকবক করতে থাকে। বেলা তিনটে নাগাদ আমাদের সকলের খিদে পেয়ে গেল। চন্দ্রভান ব্যবস্থা করল। কোম্পানির বাগানের বাইরে নি ঈ কলেজের তিন নম্বর গেটের কাছে একটা মুদিদোকানের সন্ধান পেল সে। নিয়ে এল চিড়ে, গুড় আর সবরিকলা। দোকানিকে বলে-কয়ে বুদ্ধি করে একটা পেতলের লোটাও নিয়ে এসেছিল। ঐ লোটাতে ভেজানো হল চিড়েটা। সামনের পুকুর থেকে পদ্মপাতা তুলে এনে সবাই মিলে ফলার করা গেল।

হঠাৎ বটুক বলে ওঠে—এই, এই দ্যাখ! সাধুবাবার ধ্যান ভেঙেছে।

তাই তো! সাধুবাবা উঠে পড়েছে। আমাদের দেওয়া একটা আম খাচ্ছে বসে। দাড়ি বেয়ে নেমেছে আমের রস! আমরা তৎক্ষণাৎ পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে গুটিগুটি এগিয়ে যাই সেদিক পানে। বটুকেশ্বর আমাদের দলপতি। সকালে আমাদের সাড়ম্বর প্রণামটা সাধুবাবার আধবোজা চোখজোড়া দেখতে পেয়েছিল কিনা মালুম নেই—তাই বটুক আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। আমরাও দেখাদেখি ঘাসের উপর লম্বা হয়ে পড়লাম। শুধু গগন হাত তুলে জাত বাঁচানো আলতো একটা নমস্কার ঠুকে দেয়। সাধুবাবা খুশি হয়েছেন মনে হল। মিষ্টি মিষ্টি হাসছিলেন তিনি। দক্ষিণ হস্তটি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল, তাই বাম হস্তটি প্রসারিত করে বললেন—জিতা রহো বেটা! ক্যা মাংতা রে?

দেখতে হাঁদা মত হলে কি হয়, বটুক তুখড় ছেলে। হাত দুটি কচলে বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে—আপনার দর্শন পেয়েছি। আর কি চাইব বাবা?

সাধুবাবা একটি চিনির মঠ ভেঙে নিদন্ত মাড়িতে সেটি চর্বনের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন ;

বলেন—সচ্? বাঃ বাঃ! অব তো দর্শন হো গয়া। অব ভাগ্!

বটুক হাত দুটি জোড় করে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, যাব তো বটেই ; তবে এসে যখন পড়েছি বাবা, তখন আপনার শ্রীমুখ থেকে দু-একটি বাণী শুনে যেতে চাই।

সন্ন্যাসী চিমটিখানা তুলে নিয়ে পুনরুক্তি করেন—যা ভাগ্!

চন্দ্রভান ছিল একটু পিছনে। সেখান থেকে বলে ওঠে—চলে আয় বটুক!

সন্ন্যাসী এতক্ষণে নজর করেন ওকে। হঠাৎ ভ্রূ-যুগল কুঁচকে ওঠে ওঁর। চিমটেটা নামিয়ে রাখেন। ইঙ্গিতে চন্দ্রভানকে কাছে আসতে বলেন। চন্দ্রভান এগিয়ে যায়। বসে ওঁর সামনে হাঁটু মুড়ে। কোন কথা নেই। সন্ন্যাসী স্থির দৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন চন্দ্রভানের ভ্রূ-মধ্যে। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ খপ করে ওর চুলের মুঠিটা খামচে ধরে বলেন—ক্যা নাম?

—শ্রীচন্দ্রভান গর্গ!

—জনম তারিখ মালুম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঊনত্রিশে জুলাই, আঠারশ নব্বই!

—সাহব বন্ গয়্যা ক্যা?—চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকি দেন সাধুবাবা।

চন্দ্রভান তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলে—সাতই শ্রাবণ, বারোশ সাতানব্বই।

—তো শিবলোক ইয়ে বৈকুণ্ঠ্ পসন্দ্ নেহি হুয়ে? ক্যা রে বেটা?

মাথা মুণ্ড কিছু বোঝা যায় না। চন্দ্রভান ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

চুলের মুঠিটা এতক্ষণে ছেড়ে দিয়ে ওকে এক ধাক্কা মেরে সাধুবাবা বলেন—ভাগ্। যবন কাঁহাকা।

চন্দ্রভান পালিয়ে বাঁচে।

কিন্তু বটুকেশ্বর অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। ইতিমধ্যে আর একটি আমের খোসা ছাড়িয়ে বাবাজীর ভোগের জন্য বাড়িয়ে ধরেছে। কাকের মত ছোঁ মেরে সেটি তুলে নেন বাবাজী। দু-চোখ বুজে ভূতো-বোম্বাই আম চুষতে থাকেন। আম এবং দাড়ির কিছু অংশ।

বটুক বলে—ও যবন নয় বাবা। বামুন! কনৌজী ব্রাহ্মণ!

—বিলকুল যবন! তব শুন্!

সন্ন্যাসী অতঃপর ওঁদের এক বিচিত্র কাহিনী শোনান।

দ্বৈপায়ন-দাদু বলতে থাকেন—ষাট-সত্তর বছর আগেকার কথা নরেন, তবু গল্পটা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। তার কারণ সে সময়ে অপরিণত কৈশোরের অবিশ্বাসে গল্পটা যতই আষাঢ়ে মনে হোক না কেন, পরবর্তী জীবনে বারে বারে মনে হয়েছে অদ্ভুত দিব্যদৃষ্টি ছিল সেই সন্ন্যাসীর। জীবনে তাঁকে ঐ একবারই দেখেছি—সেই উনিশ-শ পাঁচ সালের এপ্রিল মাসে ; কিন্তু তাঁকে ভুলতে পারি নি সারা জীবনে।

আমি জিজ্ঞাসা করি—কী গল্প বলেছিলেন সাধুবাবা?

—গল্প নয়। চন্দ্রভানের জন্মান্তরের কাহিনী বলেছিলেন। শুনেছি, সাধনার এক পর্যায়ে সাধক পূর্বনিবাসজ্ঞান লাভ করেন। তখন তিনি জাতিস্মর হয়ে ওঠেন। পূর্বজন্মে কবে কি করেছেন তা বলে দিতে পারেন। বুদ্ধদেব ঐ দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন—যার ফলশ্রুতি জাতকের অনবদ্য কাহিনীগুলি। কিন্তু এক্ষেত্রে সন্ন্যাসী তাঁর নিজের পূর্বজীবনের কথা তো বলেন নি। বলেছেন চন্দ্রভানের পূর্বজন্মের কাহিনী। কেমন করে বললেন? উনি ওঁর ভাঙা ভাঙা ব্রজবুলিতে যা বললেন তার নির্গলিতার্থ

হল চন্দ্রভান পূর্বজন্মে ছিল যবন। খ্রীষ্টান। কিন্তু খ্রীষ্টান হলে কি হয়, সে ছিল পুণ্যাত্মা লোক। জ্ঞানতঃ পাপ কাজ কিছু সে করে নি। তাই তার মৃত্যুর পর শিবলোক আর বৈকুণ্ঠলোক থেকে দেবদূতেরা তাকে নিতে এল। সীনটা কল্পনা কর নরেন—সাহেব চন্দ্রভানের কোটপ্যান্ট পরা পূর্বজন্মের মৃতদেহ অসাড় হয়ে পড়ে আছে—আর দুইদল দেবদূত ঝগড়া করছে! একদল ওকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে, একদল নিয়ে যাবে শিবলোকে। সে ঝগড়া আর থামেই না। শেষে স্বয়ং যমরাজ মীমাংসা করতে সেখানে হাজির হলেন। যমরাজ বলেন, তোমাদের ঝগড়া থামাও! এই যবনের আত্মা কোথায় যেতে চায় তা জেনে নাও। সে যদি বৈকুণ্ঠে যেতে চায়, তবে ওর অক্ষয় বৈকুণ্ঠ লাভ হবে। আর যদি ও শিবলোকে যেতে চায়, তবে তাই হবে। তখন সদ্যমৃত সেই যবনের আত্মাকে জিজ্ঞাসা করল ওরা—সে কোথায় যেতে চায়। ইতিমধ্যে সাধুবাবা গঞ্জিকার কল্কেটি হাতে নিয়েছিলেন। তাতে প্রচণ্ড এক টান মেরে তিনি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেন আর ও বেটা এমন বে-অকুফ, ব্যাটা বললে, সে আবার এই পৃথিবীতে জন্মাতে চায়! এই দুনিয়ায় ওর সারা বদনে গর্দা ফেঁকেছে, ওকে পাঁকের মধ্যে পেড়ে ফেলেছে, লাথ মেরেছে—তবু ওটা এমন পাগল, এমন বে-সরম, বে-অকুফ—ও বললে এই দুনিয়াদারীর পাঁকের মধ্যেই ও ফিরে আসতে চায়। কীরে বেটা বুদ্ধু! তাই বলিস নি?

চন্দ্রভান মুখ নিচু করে অপরাধীর মত বসে থাকে।

হঠাৎ খিল্‌খিল করে হেসে ওঠে ওর ছোট ভাই সূরযভান।

সন্ন্যাসী রাগ করে না। সেও অট্টহাস্য করে ওঠে। বলে—সাধ মেটে নি এখনও? পাগল, বুদ্ধু কাঁহাকা!

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। এমন পাগলের সঙ্গে দেখা করতে এত পরিশ্রম করে এসেছি? একা চন্দ্রভান কেন, আমরা সবাই তো পাগল!

বটুকেশ্বর কিন্তু আশা ছাড়ে নি। বলে—ওটা একেবারে বদ্ধ পাগল, বাবা। ওর কথা বাদ দিন। এবার আমার কথা বলুন। আমি পাস করতে পারব এ বছর?

সন্ন্যাসী মাছি তাড়াবার মুদ্রা করেন। বলেন—তোর কিছু হবে না, সরস্বতী মাইয়ের কৃপা তোর উপর হবে না। যা ভাগ্‌!

বটুকের মুখটা ম্লান হয়ে যায়। বলে,—পাস করতে পারব না বাবা?

সন্ন্যাসী ততক্ষণে তাঁর বড় ছিলিমে আর একটা অন্তিম টান দিয়ে ধোঁয়া গিলে বসে আছেন। মুখের উপর বিরক্তিকর মাছি বসলে লোকে যেভাবে হাত নেড়ে তাড়ায় সেইভাবে বিরক্তি প্রকাশ করলেন শুধু। আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় নি। শুধু মজা দেখতে ইচ্ছে হল। নিজের কথাটা সঙ্কোচে বলতে পারলুম না। গগনকে বলি—এই গগা, বাবাকে হাতটা দেখা না ; তোকে নিয়েই ভয়। আয়, কাছে আয়—

গগনটা চিরকালই ডাকাবুকো। সে যে এসব বুজরুকির ভিতর নেই এটা প্রমাণ করতে রীতিমত তফাতে দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণ। সেখান থেকে ইংরাজীতে একটা জানাশুনা বাণী ঝাড়ল। ম্যাট্রিকে চার্লস ল্যাম্বের সেক্সপীয়র আমাদের পাঠ্য ছিল। ম্যাকবেথ এর একটা প্যাসেজ ছিল 'মোস্ট ইম্পর্টেন্ট' কোশ্চেন।' আমরা মাত্র একবার ম্যাট্রিক দিয়েছি ; কিন্তু বার কয়েক ম্যাট্রিক দিয়ে অমন ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো গগনের একেবারে ঠোঁটস্থ হয়ে গিয়েছিল। ও শুনিয়ে দিল, ডাইনীদের ভবিষ্যৎবাণী শুনে ব্যাঙ্কোর সেই অনবদ্য উক্তিটি, ম্যাকেবেথের প্রতি। ব্যাঙ্কো বলেছিল—এরা ছোটখাট ব্যাপারে আমাদের কিছু সত্যিকথা বলে বিশ্বাস উৎপাদন করে। তারপর ভরাডুবি

করায়। গগন সেই লাইনটা আউড়ে গেল গম্ভীর কণ্ঠে—"These ministers of darkness tell us truth in little things, to betray us into deeds of greatest consequence."

সাধুবাবার ততক্ষণে তন্দ্রা এসে গেছে। কম্বলের বিছানায় তিনি লম্বা হয়ে পড়েছেন। শয়নে পদ্মনাভ—চোখ দুটি আরামে বোজা। ইংরাজী শুনে তাঁর চমক ভাঙল। গঞ্জিকাপ্রসাদে সে চোখ দুটি টকটকে লাল। যেন ভস্ম করে ফেলবে গগ্যাকে। গগ্যা ভস্ম হল না। সেও কটমট করে তাকিয়ে আছে। পরমুহূর্তেই সাধুবাবা এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন যা স্বপ্নেও আশঙ্কা করি নি তাঁর কাছ থেকে। সাধুবাবা বললেন—বাৎ তো ঠিক হ্যায় বেটা! লেকিন ম্যাকবেথ সিওয়া উহ্নোনে হ্যামলেটভি লিখিন থা! না ক্যা রে? নেহি শুনা হ্যায় তু ঃ "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy?"

আমরা বজ্রাহত। লেংটিসার ভস্মমাখা জটাধারী বাবার ইংরাজী উচ্চারণ আমাদের থার্ড মাস্টার মহেন্দ্রবাবুর চেয়ে ভাল!

গগন স্তম্ভিত হয়ে এগিয়ে আসে। ঠোঁট দুটি কেঁপে যায় তার। অস্ফুটে বলে—বাবা?

সাধুবাবা ততক্ষণে পুরোপুরি পদ্মনাভ বনেছেন। যোগনিদ্রা আসন্ন। বিড়বিড় করে কোনক্রমে বলেন—হো গা রে বেটা! 'তেরা বনৎ বনৎ বনি যাই! তেরা বিগড়ি বনৎ বনি যাই!'

তার মানে কি?

আমি দাদুকে প্রশ্ন করেছিলাম—সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল? গগনবিহারী পাস করেছিলেন সে বছর?

দাদু বলেন—না, গগন পাস করতে পারে নি। আমাদের চার বন্ধুর মধ্যে একমাত্র সে-ই ফেল করেছিল। আমি এবং বটুক জলপানি পেয়েছিলাম, চন্দ্রভান মোটামুটি পাস করে। আর গগন আবার ফেল! আমার অবশ্য পাস করে গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়া হয় নি। বাবা আমাকে জোর করে ভর্তি করে দিলেন প্রেসিডেন্সিতে—ফার্স্ট আর্টস পড়তে। বটুক চলে গেল বরিশালে, তার বাপের কাছে। ভর্তি হল ব্রজমোহন কলেজে। যদিও সে সেখানে টিকতে পারে নি। বছরখানেকের মধ্যেই আবার সেখান থেকে পালিয়ে আসে কলকাতায়। এবার ভর্তি হয় সরকারী আর্ট কলেজে। অবনীন্দ্রনাথ তখন আর্ট কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল। আমাদের চার বন্ধুর মধ্যে একমাত্র বটুকেশ্বরই আর্টস্কুলের শিক্ষা শেষ করেছিল। সে-ই হয়েছিল পাস করা আর্টিস্ট। আমি ডাক্তার। চন্দ্রভান আর গগন তাদের জীবনে কোন প্রতিষ্ঠা পায় নি।

আমি বলি—তাহলে সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী আর ফলল কোথায়?

দাদু বলেন—সেই গল্পই তো শোনাতে বসেছি। ধ্রুবানন্দ অগ্নিহোত্রীর ভবিষ্যদ্বানী বর্ণে বর্ণে ফলে গিয়েছিল।

আমি চমকে উঠে বলি কী নাম বললেন সন্ন্যাসীর? ধ্রুবানন্দ অগ্নিহোত্রী? কী আশ্চর্য! এঁর কথা যে আমি বাবার কাছে শুনেছি।

দাদু বলেন—তা তো হতেই পারে। তোমার বাবা তো শিবপুর কলেজ থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন আঠারশ আটানব্বইয়ে। কলেজের পাশেই তো ঐ কোম্পানির বাগান। তা কি বলেছিলেন তোমার বাবা?

আমি বলি—তিনি বাবাকে বলেছিলেন দিনান্তে অন্তত একবার নির্জনে গিয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবে, তাহলে নিজেকে চিনতে পারবে। প্রকৃতির কোন বিরাট মহৎ প্রকাশের সামনে যখন দাঁড়াই তখন আত্মার বিরাটত্ব উপলব্ধি করতে পারি। ধ্যানস্তিমিত পর্বতশ্রেণী, গহন অরণ্য, বিশাল সমুদ্র, এরা মানুষের মনের আগল সরিয়ে দেয়। সেই অর্গল-মুক্ত মনের ভূমা স্পর্শ পাওয়া যায়। বাবা তখন সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করেছিলেন—সংসারী মানুষ আমরা, দিনান্তে অমন অরণ্য-পর্বত-সমুদ্রের সাক্ষাৎ পাব কেমন করে? উত্তরে ধ্রুবানন্দ নাকি বলেছিলেন—উপর দেখতে রহো বেটা, ইস্‌লিয়ে বহ্‌ তুমকো দে চুকা এক বিশাল নীলাকাশ! ইন্‌সে বড়া, ইন্‌সে বিশাল ঔর ক্যায় হ্যায়?

দাদু উদ্দেশে কাকে যেন প্রণাম করলেন যুক্ত করে। অস্ফুটে বললেন—বড় খাঁটি কথা। উন্‌সে বড়া, উন্‌সে বিশাল ঔর ক্যা হ্যায়?

বটুকেশ্বর দেবনাথের কথাটাই আগে বলি। চার বন্ধুর মধ্যে একমাত্র সে-ই পেয়েছিল আর্টস্কুলের ছাড়পত্র। কেতাদুরস্ত আর্টিস্ট হয়েছিল বরিশালের ছেলে বটুকেশ্বর। পূর্বভারতের সবচেয়ে বড় তিনটি নদী— পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, আর মেঘনা যেখানে মিলিত হয়ে সমুদ্রে মিশেছে সেই বদ্বীপে বরিশাল নদীর পশ্চিমতীরে এই বরিশাল। নদীমাতৃক ভূখণ্ড যেমন উর্বর, ওখানকার মানুষগুলোও তেমনি দুর্বার। জোয়ারের সময় মেঘনার মুখে প্রবল বান আসে— তখন প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে আসে এক কামান গর্জনের মত গুরুগম্ভীর শব্দ! ইংরেজরা তার নাম দেয় 'বরিশাল গান্‌স'। তিন-চার শ' বছর আগে থেকেই মগ জলদস্যুরা এদেশে মাঝে মাঝে লুণ্ঠন করে যেত। ব্রহ্মরাজ যখন আরাকান দেশ আক্রমণ করেন তখন অনেক মগ এই জেলায় পালিয়ে আসে। এখানেই তারা স্থায়ী বাস্তু বাঁধে। পুরুষানুক্রমে এই জেলাতেই থেকে যায়। ধর্মে এরা ছিল বৌদ্ধ। অনেকেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে অবশ্য। বটুকেশ্বরের পদবী ছিল 'দেবনাথ' ; বোধকরি তার পূর্বপুরুষ এক কালে ছিল নাথ-পন্থী বৌদ্ধ। সে ইতিহাস বটুকেশ্বর জানত না ; কিন্তু এটুকু জানত যে তার রক্তের মধ্যে আছে মেঘনার পথে ছুটে আসা বঙ্গোপসাগরের রোষ ; ঐ বরিশাল গান্‌স।

বটুকের বাবা দীননাথ দেবনাথ ছিলেন ছাঁ-পোষা ভালমানুষ। বরিশাল স্টিমার ঘাটে গঞ্জের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে তাঁর ছিল পাটোয়ারি গুদাম আর ব্যবসা। ছেঁচা-বাঁশের বেড়া দেওয়া দেওয়াল আর টালির ছাদ। দীননাথ লেখাপড়া শেখেন নি বেশি, শিখেছেন শুভঙ্করীর হিসাব, যা তাঁর কাজে লাগে পাটোয়ারী ব্যবসায়ে। কিন্তু ছেলেকে তিনি লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন। ওঁদের পাড়ার ছোট ছোট ছেলেগুলো সব বখাটে আর বদমায়েস। তাই শহর কলকাতাতে রেখেছিলেন বটুককে, তার মামা বাড়িতে। ওর মামা ইংরাজ কুঠিয়ালের মুচ্ছুদ্দি। করিৎকর্মা লোক। ভাগ্নেকে মানুষ করে তোলার ভরসা দিয়েছিলেন বলেই দীননাথ বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছেন।

কিন্তু লেখাপড়া শিখতে বসেও বটুক মনে শান্তি পায় না। ইংরাজি, অঙ্ক অথবা ইতিহাস-ভূগোলে সে মনোনিবেশ করতে পারে না। তার সখ সে ছবি আঁকবে। বরিশালের গ্রামে আসন্ন বর্ষার যে পট সে দেখেছে শিশুকালে, মেঘনার বুকে প্রকৃতির যে ভীম-সুন্দর রূপ দেখেছে ভাদ্রের সাঁড়াসাড়ি বানে, সেটাকে সে রঙে আর রেখায় ধরতে চায়। ম্যাট্রিক পাস করে তাই সে বায়না ধরল আর্টস্কুলে ভর্তি হবে। এবার কিন্তু দীননাথ রাজী হতে পারেন না। ছবি আঁকা কেউ আবার পয়সা দিয়ে শেখে নাকি? ছবি এঁকে কোন্ চতুর্বর্গ লাভ হবে? ছেলেকে আর কলকাতায় ফিরতে দিলেন না। নিয়ে এলেন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি করে দিতে।

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ তখন স্বনামধন্য রজনীকান্ত গুহ। সব কথা

শুনে তিনি বলেন, দীননাথবাবু, আপনার পুত্রকে যদি আমার কলেজে ভর্তি করে দেন তাহলে তার দায়িত্ব আমি নিতে পারি, কিন্তু সে ক্ষেত্রে জলপানির টাকা কিন্তু বটুকেশ্বর পাবে না।

—কেন? পাবে না কেন?—প্রশ্ন করেছিলেন দীননাথ দেবনাথ।

—স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার ফরমান জারি করেছেন যে, বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হলে কোন ছাত্র সরকারী বৃত্তি পাবে না।

—ব্যামফিল্ড ফুলার কে? জিজ্ঞাসা করেছিলেন বরিশালের পাটোয়ারী দেবনাথ।

—ফুলারের নাম শোনেন নি? তিনি নবগঠিত পূর্ববঙ্গ আর আসামের ছোটলাট। ডন ম্যাগাজিনে দেখেন নি, তিনি প্রকাশ্যে বহু স্থানে বলে বেড়িয়েছেন, তাঁর দুই স্ত্রী—হিন্দু স্ত্রী দুয়োরাণী আর মুসলমান বিবি হচ্ছেন সুয়োরানী। এখানকার বানরিপাড়ায় গুর্খা সৈন্যদের কাণ্ড শোনেন নি?

দীননাথ তাঁর মাথাটা নেড়ে জানিয়েছিলেন তিনি কিছুই জানেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল রজনীকান্তের। এতবড় কাণ্ডটা ঘটে গেল সদর বরিশালের বুকের উপর, অথচ এখানকার একজন বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী তার কোন খোঁজ রাখেন না। এ দেশকে জাগাবেন সুরেন্দ্রনাথ আর অশ্বিনীকুমার।

বটুকেশ্বর উপস্থিত ছিল সেখানে। ভর্তি হয়ে এসেছিল। বললে—আমি জানি স্যার! বরিশালের বিদ্রোহ দমন করতে ফুলার এখানে গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করেছিল। আমাদের মা-বোনেদের উপর তারা অকথ্য অত্যাচার করে—

রজনীকান্ত বলেন—তুমি জান? তুমি কেমন করে জানলে?

—জানি স্যার! এও শুনেছ আমার বয়সী একদল ছেলে তাই ফুলারকে হত্যা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। সুরেন্দ্রনাথই নাকি—

—থাক বটুকেশ্বর! ওসব কথা প্রকাশ্যে আলোচনা করতে নেই।

বটুকেশ্বর চুপ করে যায়। রজনীকান্ত তখন দীননাথকে বলেন—আপনি যদি জলপানির মায়াটা ত্যাগ করেন তাহলে আমি একে ভর্তি করে নিতে পারি।

চকিতে ওঁর মনে হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ আর অশ্বিনীকুমার তো দিবাস্বপ্ন দেখছেন না। প্রৌঢ় ব্যবসায়ী দীননাথ খবর রাখে না এটাই তো একমাত্র সংবাদ নয় ; তার নাবালক পুত্র সবই খবর রাখে এটাও তো সত্য!

আগুন জ্বলছে। এ আগুন নিভবে না।

বটুকেশ্বর ভর্তি হল ব্রজমোহন কলেজে।

কিন্তু টিকতে পারে নি সেখানে ; ফিরে এসেছিল কলকাতায়। কেন তা বলি ঃ

সরকার ঘোষণা করলেন যোলোই অক্টোবর উনিশ-শ পাঁচে বাঙলা দেশকে কেটে দু-খানা করা হবে। বাঙলা হিসাবে সেটা ত্রিশে আশ্বিন। অমনি দিকে দিকে এই দিনটিকে ক্ষোভ আর দুঃখের প্রতীক করে তোলার আয়োজন পূর্ণ করে তুললেন দেশের নেতৃবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন দুই বঙ্গের মিলনের প্রতীক হিসাবে এদিন অনুষ্ঠিত হবে রাখীবন্ধন উৎসব। রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, ঐ সঙ্গে সারা দেশে হবে 'অরন্ধন'। সুরেন্দ্রনাথ 'অখণ্ড বঙ্গভবন' গড়ে তোলার প্রস্তাব করলেন। সমস্ত দেশে সে কী ভাবের জোয়ার! কোন বাঙালীর ঘরে সেদিন উনানে আগুন জ্বলে নি। ব্যবসাবাণিজ্য সব বন্ধ, রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি, পাল্কি অথবা গোরু-গাড়িও চলে নি। সেই প্রথম সারা দেশব্যাপী হরতাল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল বরিশালের। বড়লাট কার্জন গোটা বরিশাল জেলাকেই 'প্রোক্লেমড্ ডিস্ট্রিক্ট' বা আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী জেলা বলে চিহ্নিত করলেন। অশ্বিনীকুমারের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' বিলাতি জিনিসের বহ্ন্যুৎসবে মাতলো-- দেশী জিনিস বিদেশী জিনিস যার দোকানে রাখা হত তাদের বয়কট করতে শেখালো। চারণকবি মুকুন্দদাস বরিশালের পথে পথে প্রাণ মাতানো গান গেয়ে বেড়ান। অশ্বিনীকুমারের সহযোগী মনোমোহন চক্রবর্তীর লেখা গানও মুকুন্দদাস গেয়েছেন 'ছেড়ে দাও কাচের চুড়ি, বঙ্গনারী, কভু হাতে আর প'র না! জাগ গো ভগিনী, ও জননী, মোহের ঘোরে আর থেক না।'

সেবার কংগ্রেসের একবিংশতিতম অধিবেশন বসল কাশীতে। সভাপতিত্ব করলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন—"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ফলে বঙ্গদেশের এই বিপুল জনজাগরণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। ব্রিটিশ রাজত্বে এই প্রথম জাতি ও ধর্মের বৈষম্য ভুলে বাঙালী জাতি বাইরের কোন সাহায্যের অপেক্ষা না রেখে স্বাভাবিক প্রেরণার বশে অন্যায়ের প্রতিরোধে অগ্রসর হয়েছে। প্রধান লক্ষণীয় বিষয় এই যে, জনসেবার উচ্চ আদর্শ থেকে বাঙলা এ কাজ করেছে, আর সমগ্র ভারতবর্ষ এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে বাঙলা দেশের কাছে ঋণী। আজ বাঙলা যে কথা চিন্তা করছে, আগামীকাল সারা ভারতবর্ষ সে কথা চিন্তা করবে।"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন সেবার হবে বরিশালে। প্রথম সম্মেলন হয়েছিল বহরমপুরের, বৈকুণ্ঠনাথ সেনের আগ্রহাতিশয্যে। তারপর, কৃষ্ণনগর, চুঁচুড়া, চট্টগ্রাম, নাটোর, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানেও প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছে। এ-বছর স্থির হয় এপ্রিলের চোদ্দই ও পনেরই অধিবেশন বসবে বরিশালে। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যারিস্টার আবদুল রসুল হবেন সভাপতি। রসুলসাহেব মেম বিয়ে করেছিলেন ; কিন্তু সেই বিদেশী মহিলাও মনে-প্রাণে সমর্থন করলেন স্বাধীনতা আন্দোলনকে। সে-বৎসর বাখরগঞ্জ জেলায় ফসল ভাল হয় নি। দুর্ভিক্ষই হয়েছিল বলা চলে। তবু জেলার বিভিন্ন অংশে যখন প্রচারে বের হলেন বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ সেন, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অথবা শরৎকুমার রায় তখন অভূতপূর্ব সাড়া জাগল সারা জেলায়। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক সমবেত হল জেলা সদর বরিশালে। ব্রজমোহন কলেজের ছেলেদেরই উৎসাহ বেশী। কলকাতা থেকে সম্মেলনে যোগ দিতে আসছেন দেশবরেণ্য নেতারা। ওরা দিবারাত্র পরিশ্রম করে প্রচার চালায়। এই স্বদেশী আন্দোলনে ওতপ্রোত ভাবে যোগ দিয়েছিল প্রথম বার্ষিক ফার্স্ট-আর্টসের ছাত্র বটুকেশ্বর দেবনাথ।

সরকার থেকে ইতিপূর্বেই একটা সার্কুলার জারি করা হয়েছে—প্রকাশ্যে রাস্তার কেউ 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনি দিতে পারবে না। অনেকে এ আদেশ মানতে স্বতঃই রাজী হল না। 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনি দিতে গিয়ে অসংখ্য যুবক বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হল। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তারা জেলা-শাসকের কাছে এই সর্তে আবদ্ধ হলেন যে, প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করার সময় প্রকাশ্য স্থলে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করা হবে না। ফলে সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই একটা দলাদলির সৃষ্টি হল। চরমপন্থীরা কর্মকর্তাদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হল। যাইহোক সম্মেলনের আগের দিন সন্ধ্যায় কলকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু প্রতিনিধি বরিশালের স্টিমার ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। সুরেন বাঁড়ুজ্জে, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব

উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বটুকেশ্বর স্টিমার ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখল। চোখ ফেটে জল এল তার। এমন মহা মহা অতিথিরা এলেন তার মাতৃভূমিতে অথচ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে তাঁদের বরণ করে নেওয়া গেল না। উপায় নেই। স্বয়ং অশ্বিনীকুমার বারণ করে রেখেছিলেন। অশ্বিনীকুমার ছিলেন ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। এ-ক্ষেত্রে কিন্তু অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে বর্তমান অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ একমত হতে পারেন নি। তবু নেতৃত্বের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেন নি তিনি। তাঁর ছাত্ররা তাই মুখ বুঁজে মেনে নিলেন ওঁদের আদেশ।

স্টিমার থেকে নেমে এসে এ-বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন তুললেন কৃষ্ণকুমার মিত্র ঃ ছেলেরা বন্দেমাতরম্ বলছে না কেন?

রজনীকান্ত হেসে বললেন—ছেলেরা গোরা চাবুককে অগ্রাহ্য করতে শিখেছে, কিন্তু দলপতির আদেশকে অমান্য করতে শেখে নি বলে!

কৃষ্ণকুমার, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তকে তাঁরা অগ্রাহ্যও করতে পারলেন না। ব্রহ্মবান্ধব বললেন, এ সিদ্ধান্ত আমরা যে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারিনি তার একটা নীরব প্রতিবাদ রাখতে চাই রজনীবাবু। আমরা ক'জন অভ্যর্থনা সমিতির নির্ধারিত আবাসে উঠব না। আপনার কলেজে একটু স্থান হবে?

রজনীকান্ত হাত দুটি জোড় করে বলেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মশায়ের স্থান হবে না এমন বাড়ি শুধু বরিশাল কেন গোটা বাঙলা দেশে নেই। আমার কলেজ ধন্য হয়ে যাবে আপনাদের পদধূলি পড়লে।

তৎক্ষণাৎ তিনি ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবকদের ডেকে ব্যবস্থা করতে বললেন। বটুকেশ্বরের দল তো হাতে স্বর্গ পেল। অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যদের সসম্মানে নিয়ে গিয়ে তুলল ওদের কলেজে।

অল্প পরেই ওঁরা এলেন, বলেন—এ কী! সম্মেলন শুরু হবার আগেই শিবির দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যে?

কৃষ্ণকুমার বলেন—'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি যদি আপনারা ত্যাগ করতে মনস্থ করে থাকেন, তবে ঐ সঙ্গে আমাদেরও ত্যাগ করতে হবে।

তা তো হতে পারে না। ফলে রফা হল—পরদিন সকাল সাতটায় দুই শিবির থেকে সকলে এসে সমবেত হবেন রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে। সেখানে সর্বপ্রথমে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে তারপর শোভাযাত্রা করে সভামণ্ডপে যাওয়া হবে।

সে রাত্রে সে কী উন্মাদনা! সারা শহরটা সে রাত্রে ঘুমায় নি। প্রভাত হলেই রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে বরিশালবাসী বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেবে। দেবে কার সঙ্গে? সুরেন বাঁড়ুজ্জে, রবীন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে। কিন্তু নাটকের সে তো শেষ নয়, সেই যে শুরু। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন আর পুলিস-সুপার কেম্পকে না চেনে কে? বরিশালের কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলতে এই দুই ইংরাজ শাসকও সে রাত্রে রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছিল—তা কি জানতে বাকি আছে কারও?

চোদ্দই এপ্রিল, ১৯০৬। কোম্পানির বাগানে ধ্রুবানন্দের কাছে ধর্ণা দেওয়ার ঠিক এক বছর পরের দিনটি। সূর্যোদয়ের আগেই হাবেলী ময়দানে এসে হাজির হয়েছে বটুকেশ্বর। তার হাতে 'বন্দেমাতরম্' লেখা একগোছা ব্যাজ। এগুলি হাতে বাঁধবে অ্যান্টি সার্কুলার সমিতির সভ্যবৃন্দ। মাঠে এসে দেখে তার আগেও এসেছে অনেকে।

পতাকা দণ্ডটা খাটানো হয়ে গেছে। মাননীয় অতিথিরা তখনও কেউ আসেন নি।

—এই তো বটুকদা! কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

—একি সুশীল! তুই কোত্থেকে?

—কাল রাতের স্টিমারে এসেছি। কত খুঁজেছি আপনাকে। একবার ব্রজমোহন কলেজে, একবার স্টিমার ঘাটে।

—রাত্রে কোথায় ছিলি?

—কলেজেই।

সুশীল সেন কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছে। এতবড় সম্মেলনটা দেখবার লোভ সামলাতে পারে নি। বটুক ওকে ডেকে নেয়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, বলে—এ হলো শ্রীসুশীলকুমার সেন। কলকাতার আর্যমিশনে পড়ে।

সুশীল খুব মিশুকে ছেলে। বরিশালের ছেলেদের ভাষাটা একটু অন্যরকম। ও কিন্তু হাসি চেপে থাকে। কলকাতায় ওদের বাঙাল বলে খেপানো চলে। এখানে ও-কথা বললে ঠেঙিয়ে মুখের জিওগ্রাফি পালটে দেবে।

বটুক বলে—হ্যাঁরে, ওদের সব খবর কি? দ্বৈপায়ন, সূরয, গগনরা কেমন আছে?

—সূরয তো আমার সেক্‌শানেই পড়ছে, গগ্যাদা পড়াশুনা ছেড়ে দেশে চলে গেছে। দীপুদা প্রেসিডেন্সিতে পড়ছে।

—আর চন্দ্রভান?

—সে বিবাগী হয়ে গেছে।

—বিবাগী হয়ে গেছে! মানে? বাজে কথা?

—না বটুকদা, সত্যিই। সে অনেক কাণ্ড—

কিন্তু অনেক কাণ্ড শুনবার সময় নেই তখন বটুকেশ্বরের। ভলান্টিয়ারদের ফল-ইন করা নির্দেশ এসে গেছে। পিঁক-পিঁক করে বাঁশি বাজছে। বটুক ছুটে গিয়ে সামিল হয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে।

একটু পরেই এসে পড়লেন দেশবরেণ্য নেতারা। দু-দলেরই। এখন আর অবশ্য দু-দল নন। সবাই এক দলের। এখানে কোন বক্তৃতা হবে না, কোন ভাষণ হবে না। আগে থেকেই তাই স্থির হয়ে আছে। শুধু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে ওঁরা শোভাযাত্রা করে এগিয়ে যাবেন সভামণ্ডপে। এতক্ষণে সূর্য উঠেছে। কাতারে কাতারে মানুষ জমায়েত হয়েছে রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে। শুধু মানুষই নয়, অমানুষও। লাল-পাগড়ি মাথায় অসংখ্য দেশীয় পুলিস, গুর্খা আর বালুচি রেজিমেন্টের বন্দুকধারী, আর লালমুখো অশ্বারোহী সার্জেন্ট।

কিন্তু পুলিস আর গোরার আবির্ভাবের কথা কি আর ওরা জানতো না? সব জেনে বুঝেই তো এসেছে ওরা। তাই আকাশ বিদীর্ণ করে সহস্র কণ্ঠে ওরা মাতৃবন্দনা ধ্বনি করল—বন্দেমাতরম্!

বার বার তিনবার। না, পুলিস লাঠি নিয়ে তেড়ে এল না। আইন-অমান্য করা হল আনুষ্ঠানিকভাবে। তবু তেড়ে এল না। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন শহরে প্রাদেশিক সম্মেলন করার অনুমতি দিয়েছিলেন একটি মাত্র শর্তে—প্রকাশ্য স্থানে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া হবে না। প্রকাশ্য স্থানেই সে শর্ত ভেঙে ফেলা হল।

রওনা হল শোভাযাত্রা। প্রথম গাড়িতেই চলেছেন মূল সভাপতি ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল সাহেব। তাঁর পাশে বসেছেন তাঁর ইউরোপীয় স্ত্রী। বাদবাকি সবাই পদব্রজে।

সভাপতিকেই শুধু গাড়ি করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতির তরফ থেকে অন্যান্য দেশবরেণ্য নেতাদের জন্যও গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল ; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ রাজী হন নি। বলেছিলেন, আমরা সেবক, আমরা নেতা নই। পায়ে হেঁটেই যাব আমরা।

এঁরা বলেছিলেন, কিন্তু জোড়াসাঁকোর রবিবাবু অথবা টাকীর জমিদার যতীন্দ্রনাথ কি এতটা হেঁটে যেতে পারবেন? হাজার হোক ওঁরা হলেন—

সুরেন্দ্রনাথ বলেন, যা বলেছেন তা আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করবেন না! রবিবাবু কি যতীনবাবু যদি এ-কথা শুনতে পান তবে রাগ করে এখনই ফিরে যাবেন। রসুল সাহেবকে আমরা গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছি এজন্য যে, তিনি আজ সভাপতি। ওঁর বদলে বরিশাল শহরের কোন গাড়োয়ান সভাপতি হলে তাকেই আমরা গাড়ি করে নিয়ে যেতাম ; রসুল সাহেব হেঁটে যেতেন।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে। সভাপতির গাড়ির পিছনেই আছেন সুরেন্দ্রনাথ। অমৃতবাজারের সম্পাদক মতিলাল আর ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তার পরের সারিতে বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আর ব্রহ্মবান্ধব। এমনি করে এক এক সারিতে তিনজন। পিছনে 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ পরিহিত স্বেচ্ছাসেবক দল। আর শোভাযাত্রার সবশেষে চলেছেন তিনজন—অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভাপতি কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ, আর 'হাওড়া হিতৈষী'র সম্পাদক গীষ্পতি কাব্যতীর্থ। দীর্ঘ শোভাযাত্রা, এ-মাথা থেকে ও-মাথা দেখা যায় না। শোভাযাত্রা হাবেলী থেকে রাস্তায় পড়ে শোভাযাত্রার মাথা পথের বাঁকে হারিয়ে যায় ; কিন্তু বন্দেমাতরম্ ব্যাজ পরা স্বেচ্ছাসেবকের দল যেই রাস্তায় পড়েছে অমনি একজন লালমুখো বললে—চার্জ!

শুরু হল লাঠি চার্জ! এলোপাথাড়ি মার। বড় লাঠির প্রহার, ব্যাটন নয়। লাঠি চার্জের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত শোভাযাত্রায় কেউ! 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেন নি। সেই হাবেলী মাঠে যা দেওয়া হয়েছিল তাই প্রথম, তাই শেষ। কিন্তু যষ্টি প্রহার শুরু হতেই সহস্র-কণ্ঠে ওরা ধ্বনি দিয়ে ওঠে—বন্দেমাতরম্!

বটুকেশ্বরের পাশেই ছিল সুশীল। লাঠি চার্জ শুরু হতেই শোভাযাত্রার লাইন ভেঙে গিয়েছিল। বটুক হাত বাড়িয়ে চেপে ধরে সুশীলের কামিজ। বলে—এই হাঁদা! রাস্তা ছেড়ে রকে উঠে দাঁড়া। ওখানে থাকলে মাথা ফেটে যাবে। টানতে টানতে ওকে নিয়ে আসে রাস্তার ধারে। দু-পাশের বাড়ির দরজা জানালা দুড়দাড় করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটা পাকা বাড়ির রকে উঠে দাঁড়াল বটুক—ঠেলে তুলল সুশীলকে। কিন্তু ও কী?

পুলিসের লাঠি চার্জ শুরু হতেই মিছিলের সারি বাঁধা শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল। উঁচু রকের উপর দাঁড়িয়ে ও দেখতে পেল লাঠি পেটার বীভৎসতা। ঐ পড়ে গেলেন ফণীবাবু,—ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেচারাম লাহিড়ীর কাঁধে নামল একটা লাঠি! আর সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা 'নবশক্তি'র মনোরঞ্জনবাবুর ছেলে চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার। লাঠির ঘায়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন রাস্তার ধারের একটা পুকুরে। উদ্যত লাঠি মাথার উপরে দেখেও তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন নি। শুধু চিৎকার করে বলেছিলেন—বন্দেমাতরম্!

বটুক বললে—চিত্তদা কি ডুবে মারা যাবে নাকি?

জবাব না পেয়ে পাশে ফিরে দেখে সুশীল তার পাশে নেই। সে ঐ রাস্তায় নেমে পড়েছে আবার। পুলিসের পায়ের ফাঁক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে রাস্তার

পাশে—যেখানে পুকুরের জলটা লাল হয়ে উঠেছে চিত্তরঞ্জনের রক্তে। আর যেখানে তার দেহটা এইমাত্র ডুবে গেল।

বটুক কি করবে স্থির করে উঠতে পারে না। কর্তব্যবুদ্ধি বলছে এখন তাকেও যেতে হবে রাস্তার ওপারে—ঐ যেখানে আহত মানুষটার দেহ ডুবে গেল পুকুরের জলে, কিন্তু শুভবুদ্ধি ওর পা-দুটি বেঁধে ফেলেছে এই নিরাপদ মালভূমিতে! ওর চোখের সামনেই আবার লাঠির ঘায়ে লুটিয়ে পড়লেন ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মশাই। দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল বটুকেশ্বর।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললে সে।

হাঙ্গামা মিটে গেলে বাড়ি ফিরে এল বটুকেশ্বর। একটা প্রচণ্ড আত্মগ্লানিতে ভরে গেছে তার অন্তঃকরণ। নাঃ! স্বদেশবান্ধব সমিতির সভ্য হওয়ার মত মনের জোর তার নেই। দীননাথ ওকে বন্ধ করে রাখলেন ঘরের ভিতর। শিকল তুলে দিয়ে। কোন প্রতিবাদ করে নি বটুক। ও বুঝেছে, এ পথ ওর নয়। চমরমুহূর্তে আতঙ্কে ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতাকে ও দাদা ডাকে। তাঁর বাবা ব্রতীসমিতির মনোরঞ্জনকে জেঠামশাই বলে। ওঁরা তার আপনজন। তবু ঐ চিত্তরঞ্জনকে বাঁচাবার জন্য মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে সে এগিয়ে যেতে পারে নি। অথচ সুশীল? ওর চেয়ে বয়সে অন্তত তিন-চার বছর ছোট হবে। চোদ্দ-পনের বছরের কিশোরমাত্র। সে চিত্তরঞ্জনদাকে চেনে না। তার চোখে সে দেখেছিল একজন বিপন্ন দেশবাসীকে! লজ্জায় অনুশোচনায় বটুক সমস্ত দিন পড়ে থাকল তার ঘরের মধ্যে। খবর পেল ক্রমে ক্রমে। চিত্তরঞ্জন ডুবে মারা যান নি। পুলিস-সুপার একমাত্র সুরেন্দ্রনাথকেই গ্রেপ্তার করেছিলেন। আরও শুনল, পুলিস যখন সুরেন্দ্রনাথকে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সনের বাড়িতে নিয়ে গেল তখন তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, বিহারীলাল রায় আর ভারতীয় সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ। ম্যাজিস্ট্রেট সরাসরি বিচারে বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনার দোষে সুরেন্দ্রনাথকে দুশ' টাকা জরিমানা করলেন। সুরেন্দ্রনাথ একখানা চেয়ারে বসতে উদ্যত হয়েছিলেন বলে আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর আরও দুশ' টাকা জরিমানা হল। গ্রেপ্তারের সময় সুরেন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে সম্মেলনের কাজ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন। সভা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অশ্বিনীকুমার ও অমৃতবাজারের সম্পাদক ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভাপতি রসুল সাহেব বলেন, 'ধর্ম যাই হোক, আজ হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান সহযাত্রী।'

সুশীলের সঙ্গে বটুকেশ্বরের আর দেখা হয় নি। যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল তেমন নিঃশব্দেই সে চলে গেছে কলকাতায়। বটুককে আর কিছু করতে হল না। ওর বাবাই গিয়ে একদিন ওর নাম কাটিয়ে আনলেন ব্রজমোহন কলেজ থেকে। ছেলে ছবি আঁকা শিখতে চায়, তাই শিখুক। বরিশালে থাকলে শেষে কি বোমা-পিস্তলের দলে ভিড়বে! স্বদেশী করার চেয়ে ছবি আঁকা ভাল—অন্তত দীননাথ দেবনাথের পাটোয়ারী বুদ্ধি তাই বলে।

এক বছর বরিশালে কাটিয়ে বটুকেশ্বর দেবনাথ ফিরে এল কলকাতায়। ভর্তি হল সরকারী আর্টস স্কুলে। উনিশ-শ' ছয় সালে। রজনীকান্ত গুহর অগ্নিস্রাবী রাজনীতির প্রখর রৌদ্র থেকে অবনীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধ শিল্পচ্ছায়ায়। মাত্র এক বছর হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছেলে অবনীন্দ্রনাথ সরকারী আর্টস স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষরূপে কর্মভার বুঝে নিয়েছেন।

কিন্তু চন্দ্রভান? সে কি সত্যিই সন্ন্যাসী হয়ে গেল নাকি?

চন্দ্রভানের কাহিনী বলতে গেলে একটু আগে থেকে শুরু করতে হবে।

জমিদার বাড়ির ছেলে চন্দ্রভান একটু অদ্ভুত ধরনের ছেলে বরাবরই। ওর চরিত্রের মূলে ছিল একটা দুরন্ত অভিমান। এ অভিমানটা ঠিক কার প্রতি তা বলে বোঝানো যাবে না। তবে আঘাতটা কেমন করে এসেছিল তার একটা হদিস পাওয়া যায়।

আট বছর বয়সে মাতৃবিয়োগে ওর বালক মনে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল। কিন্তু তার চেয়েও আঘাত পেয়েছিল কাকা-কাকীমার ব্যবহারে। সম্পত্তির এই দুই ভাগীদারকে তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন নি। তাঁদের সোনার চাঁদ ছেলেদের প্রাপ্যে ভাগ বসাতেই আছে ওরা দুজন। কাকা-কাকীমার উদাসীনতার আইসবার্গ আর পাঁচজনের নজরে পড়ে নি, কিন্তু চন্দ্রভান তার শিশুমন নিয়েই বুঝতে পেরেছিল ঐ নিরুত্তাপ ভাসমান আইসবার্গের নিচে নিমজ্জিত হয়ে আছে বহুগুণ ঘৃণা আর বিদ্বেষ! শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে নিল চন্দ্রভান, আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল মা-হারা ভাই সূরযকে। প্রাণধারণের জৈবিক বৃত্তিতেই বোধকরি শিশু বুঝতে পারে কোথায় পাওয়া যাবে স্নেহ-ভালবাসা। সূরযভান নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল তার দাদাকে। দাদাই তাকে জামা পরিয়ে দেয়, জুতো পরিয়ে দেয়—দাদাই তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় বনে বাদাড়ে। অগ্নিভান কি বুঝলেন তা তিনিই জানেন। দু-ভাইকে সরিয়ে ফেললেন জমিদার বাড়ি থেকে। কলকাতার বাড়িতে এনে রাখলেন ওদের, গৃহ-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। ফলে, যে বয়সে মায়ের স্নেহ আর বাপের ভালবাসা শিশুরা জীবনরস সংগ্রহ করে সেই বয়সে ওরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখল। মজা হচ্ছে এই যে, চার-পাঁচ বছরের ভিতরেই ওদের ভূমিকাটা গেল বদলে। সূরযভান বয়সে ছোট হলেও সাধারণ বুদ্ধি তার বেশী। সে-ই হয়ে উঠল চন্দ্রভানের অভিভাবক। দাদার জামাকাপড়ের হিসাব পর্যন্ত রাখত সে।

অগ্নিভান সূরযকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল—কিন্তু কিছুতেই রাজী করাতে পারে নি সূরযভানকে। দাদাকে ছেড়ে সে থাকবে না। শেষ পর্যন্ত অগ্নিভান মাসান্তে ওদের নামে টাকা পাঠানো ছাড়া ওদের সম্পর্কই ভুলে যেতে বসেছিল।

হঠাৎ নাটকীয়ভাবে একটা কাণ্ড ঘটে গেল একদিন। একদিন নয়, সে একটা চিহ্নিত তারিখ ইতিহাসের পাতায়। উনিশ-শ পাঁচের সেই ষোলোই অক্টোবর—ত্রিশে আশ্বিন। বড়লাট লর্ড কার্জনের হুকুমজারী করেছেন, ঐদিন বাঙলা মায়ের অঙ্গ কেটে

দুখানা করা হবে। পূব বাঙলা আর আসামের লাট হবেন ব্যামফিল্ড ফুলার। কলকাতা টাউন হলে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে বাঙলার সুধীজন জানালেন প্রতিবাদ। তারপর ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, মৈমনসিঙ, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি বাঙলার এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে ক্রমাগত প্রতিবাদ সভা হল। 'ডন' পত্রিকায় সতীশচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু ক্ষমতামদমত্ত শাসকশ্রেণী কর্ণপাত করল না। তারা অচল রইল তাদের সিদ্ধান্তে—ঐ ত্রিশে আশ্বিনই বাঙলাকে কেটে দু-টুকরো করা হবে।

তখন প্রতিবাদে ফেটে পড়ল সমস্ত দেশ। এ-পার বাঙলা ও-পার বাঙলা। বাঙলার কবি বললেন—এ দিন রাখীবন্ধন উৎসব হবে। রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—ঐ সঙ্গে অরন্ধন। সমস্ত দিনের মত কর্মসূচী তৈরী হয়ে গেল। আর্যমিশনেও এসে লাগল ঢেউ। চন্দ্রভান অবশ্য তখন ঐ স্কুলের ছাত্র নয়। পাস করে ইতিমধ্যে মিশন কলেজে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু সূরয তখনও ঐ স্কুলের ছাত্র। চন্দ্রভান, সূরয, গগন, দ্বৈপায়ন আর সুশীল ভোর বেলায় এসে জড়ো হল স্কুলের মাঠে। সমস্ত দিনের মত ওদের কর্মসূচী তৈরী হয়ে আছে। সূর্যোদয়ের আগে থেকেই দলে দলে সারা কলকাতার মানুষ চলেছে গঙ্গার ধারে। ওরাও ক'জন গিয়ে স্নান করল গঙ্গায়। তারপর দল বেঁধে সবাই চলল বিডন উদ্যানে আর সেন্ট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে। সেখানে হল রাখীবন্ধন উৎসব।

সারা শহরে সেদিন অরন্ধন। কোন বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে নি। দোকান-পাট হাট-বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ। পথে পাল্কি, ঘোড়ার গাড়ি বা গোরুর গাড়ি চলছে না। শুধু পদাতিক। মানুষ, মানুষ আর মানুষ। শুধু বন্দেমাতরম্। গান গাইছে কোন কোন শোভাযাত্রী ছেলের দল—

"বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল,
—পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।।"

সে কী গান! কে বাঁধল গো এমন গান? কে আবার? জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কবি—রবীন্দ্রনাথ। আবার কেউ গাইছে—"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, ততই বাঁধন টুটবে।"

গানের গলা চার বন্ধুর কারও নেই—একমাত্র ব্যতিক্রম গগন পাল। সুরেলা কণ্ঠ তার। ওদের সকলের হয়ে একাই সে সারাদিন গান গাইল।

এ ওর হাতে রাখী বেঁধে দেয়—ও এর হাতে।

বিকেল বেলা হাঁটতে হাঁটতে ওরা ক'বন্ধু চলে এল আপার-সার্কুলার রোডে। এখানে বঙ্গ-ভবন স্থাপনের উদ্দেশ্যে সভা হওয়ার কথা। সভাপতিত্ব করতে এলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা আনন্দমোহন বসু। তিনি তখন রোগশয্যায়। রোশয্যায় নয়, আসলে মৃত্যুশয্যায় ; কারণ এই রোগভোগের অল্পকাল পরেই তিনি অমর ধামে চলে যান। আরামকেদারায় করে সভাপতিকে সভামঞ্চে নিয়ে আসা হল। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার গুরুদাস সভাপতি বরণ করলেন। সভায় তিল ধারণের ঠাঁই নেই। লোকে লোকারণ্য। অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোক সভাপতি বরণের সঙ্গে সঙ্গে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিল। আনন্দমোহন রোগশয্যায়, তাই তাঁর ভাষণটি বজ্রকণ্ঠে পড়ে শোনালেন সুরেন্দ্রনাথ। অভিভাষণ পাঠের পর আনন্দমোহনের স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র পড়ে শোনানো হল। ইংরাজিতে সেটি পাঠ করলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী এবং বাঙলায়

সেটি পাঠ করে শোনালেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। হঠাৎ গল্প থামিয়ে দ্বৈপায়ন-দাদু বলেন, সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। আমার বয়স তখন যোলো, রবীন্দ্রনাথের চুয়াল্লিশ।

আমি বলি—তারপর?

—তারপর সন্ধ্যায় আমরা সবাই দল বেঁধে চললাম বাগবাজার স্ট্রীটে। পশুপতি বসু মশায়ের বাড়িতে। কর্মসূচী অনুসারে এখানেই স্বদেশী কাপড় তৈরী করার জন্য ভাণ্ডার খোলা হবে। আমাদের হেঁটে যেতে হয় নি। ভীড়ের চাপে আপনা থেকেই পৌঁছে গিয়েছিলাম বাগবাজারে। জনসমাবেশ লক্ষাধিক হয়েছিল। সে আমলে এ একটি রেকর্ড। সভায় স্থির হল, স্বদেশী বস্ত্র তৈরীর জন্য একটি ভাণ্ডার স্থাপন করা হবে। যার পকেটে যা ছিল সবাই দান করল। আমাদের কাছে বিশেষ কিছুই ছিল না ; কিন্তু চন্দ্রভানের হাতে ছিল একটি আংটি। ক'বছর আগে উপনয়নের সময় পেয়েছিল। হাত থেকে খুলে সেটিই সে ফেলে দিল ভিক্ষাপাত্রে।

সব মিটতে সেই যার নাম রাত দশটা।

সমস্ত দিন অভুক্ত আছি। নিরম্বু উপবাস। ক্লান্ত দেহে টলতে-টলতে সবাই বাড়ি ফিরে এলাম। অন্যের কথা জানি না, আমি তো বিছানায় পড়েই মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়ি। ক'দিন পরে খবর পাওয়া গেল চন্দ্রভান বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

খবরটা শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। এমন সাহস নেই যে, ওদের বাড়িতে গিয়ে যাচাই করে আসি। খবরটা জানিয়ে গেল সুশীল। ঐ সুশীল সেন।

পরদিন সকালেই নাকি চন্দ্রভান চলে এসেছিল সুশীলদের বাড়িতে। চোখ দুটো লাল, মুখখানা থমথম করছে। সুশীল অবাক হয়ে বলে—কী হয়েছে চন্দরদা? অসুখ করেছে আপনার?

চন্দ্রভান বলেছিল—সুশীল, সেদিন তুই যুবক সঙ্ঘের কথা বলছিলি। ওদের আস্তানাটি কোথায় জানিস?

—কেন জানব না? গোলদিঘির ধারে। কতবার গিয়েছি সেখানে। কেন চন্দরদা?

—তুই আমাকে সেখানে নিয়ে চল। পথে কথা হবে।

সুশীল যেমন ছিল বেরিয়ে আসে। পথে নেমে প্রশ্ন করে—কি হয়েছে চন্দরদা?

—আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি সুশীল। আর ও-বাড়িতে ফিরব না। তুই সেদিন বলেছিলি যুবক সঙ্ঘে অনেক ছেলে কাজ করে। ওরা থাকতে দেয়, খেতে দেয়। আমি ওদের দলে নাম লেখাব।

—সে কী? আর কোনদিন বাড়ি ফিরবেন না?

—না!

—সূরয কোথায়? সে জানে?

—সূরয বেঁচে আছে কিনা তা-ই জানি না!

পথের মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল সুশীল। চন্দরদার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

সমস্তটা শুনে অবশ্য বুঝতে পারে চন্দ্রভানের মস্তিষ্কবিকৃতি হয় নি আদৌ। দুরন্ত অভিমানে সে তার পরিচিত দুনিয়ার গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। গতকাল সূর্যোদয়ের আগেই দু ভাই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে—সে-সব কথা তো সুশীল জানেই। সেও ছিল দলে। সারাদিন ওরা পথে পথে ঘুরেছে। বন্দেমাতরম্ করেছে, গান গেয়েছে আর সভায় জয়ধ্বনি করেছে। চন্দ্রভান জানতে পারে নি, সকালের দিকেই পাগলাচণ্ডী থেকে অগ্নিভান এসেছিলেন তাঁর কলকাতার বাড়িতে। উনি বড় একটা কলকাতায় আসেন না।

তবে নাকি এ বছর সরকারী খেতাব পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে—তাই কলকাতায় এসে কিছু তদবির-তদারক করে যেতে এসেছেন। ওঁদের কলকাতার বাড়িতেও অরন্ধনের ব্যবস্থা হয়েছিল। জমিদার-মশাই এসেই ব্যবস্থাটা পালটে দিলেন। সব বাজার বন্ধ। শুনে অগ্নিভান ক্ষেপেই আগুন। শেষ পর্যন্ত সরকার মশাই ফিরিঙ্গি পাড়ার হগ-সাহেবের বাজার থেকে নিয়ে এসেছেন কাঁচা আনাজ। উনান জ্বলেছে, খানা পাকানো হয়েছে। কিন্তু রাজপুত্রেরা কোথায়? গৃহ-শিক্ষক মথুরাবাবু আমতা-আমতা করে বলেছিলেন—তিনি ঠিক জানেন না। সরকার মশাইও যখন বললেন চন্দ্রভান আর সূরযভানের অবস্থান সম্বন্ধে তিনিও কোন খবর রাখেন না তখন বোমার মত ফেটে পড়েছিলেন অগ্নিভান। হুকুমজারি করেন—যেখান থেকে পার, ধরে নিয়ে এস ওদের!

সমস্ত দিন চাকর, দারোয়ানের দল সারা কলকাতা চষে বেড়িয়েছে। বিডন স্কোয়ার থেকে বাগবাজার। কিন্তু সে জনারণ্য থেকে কেমন করে খুঁজে বার করবে ওদের? একপ্রহর রাত করে দুই রাজপুত্র যখন বাড়ি ফিরে এলেন তখন অগ্নিভানের সমস্ত দিনের নিরুদ্ধ আক্রোশ ফেটে পড়েছিল!

সুশীল ভয়ে ভয়ে বলে—খুব মারধর করেছেন বুঝি?

—না, এমন আর বেশী কি? ওঁর আক্রোশ মিটাবার আগেই নুরুল মিঞার চাবুকটা ভেঙে গেল যে!

নুরুল মিঞা ওদের ল্যাণ্ডো গাড়ির কোচমান। সুশীল তাকে চেনে। বললে—চাবুক মেরেছেন? আপনাকে?

কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছে নিয়ে চন্দ্রভান বললে—না, আমাকে নয়, সূরযকে।

আশ্চর্য শাসন-পদ্ধতি! অগ্নিভান তাঁর সমস্ত আক্রোশ মিটিয়েছেন কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র সূরযভানের উপর। চাবুকের পর চাবুকের আঘাতে সূরযভান যখন মাটিতে লুটোপুটি খেতে খেতে আর্তনাদ করেছে—ও কাকা আর কখনও করব না, ছেড়ে দাও। তখন চন্দ্রভান দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল দর-দালানের থামের সঙ্গে। কারও সাধ্য হয় নি অগ্নিভানকে বাধা দিতে। চাবুকটা ভেঙে যাওয়ার পর অগ্নিভান একটি পদাঘাত করেছিলেন, তাতে রকের উপর থেকে সূরযভানের মূর্ছিত দেহটা গড়িয়ে পড়েছিল উঠানে। অগ্নিভান উঠে চলে গিয়েছিলেন দ্বিতলে। সরকার মশাই পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন সূরযের অচৈতন্য দেহটা। চন্দ্রভানের বাঁধনটা খুলে দেওয়ার কথা আর কারও খেয়াল হয় নি!

যুবক সঙ্ঘের অফিস ঘরখানি অতি ছোট। দিনের বেলাতেও যেন আলো জ্বাললে সুবিধা হয়। দরজা খোলাই ছিল। সুশীল আর চন্দ্রভান ঢুকতেই এক ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন। এতক্ষণ একটা হাতলহীন চেয়ারে বসে টেবিলের উপর একখানি খবরের কাগজ বিছিয়ে পড়ছিলেন তিনি। গতকালকার শহর তোলপাড় করা খবরই বোধহয়। সুশীলকে দেখে বললেন—কি খবর সুশীল? এ কাকে নিয়ে এসেছ?

সুশীল বলল—ইনি আপনাদের যুবক সঙ্ঘের সভ্য হতে চান কদমদা। এঁর নাম চন্দ্রভান গর্গ। এ বছরই আর্যমিশন থেকে পাস দিয়েছেন। এখন কলেজে পড়ছেন।

ভদ্রলোক চন্দ্রভানের চেয়ে বছর কয়েকের বড়ই হবেন। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, পায়ে কটকি চটি। কাঁধে একটা ময়লা আলোয়ান। তবু 'আপনি' বলেই কথা বললেন চন্দ্রভানের সঙ্গে, বললেন—বসুন। আমাদের যুবক সঙ্ঘের নিয়মাবলী দেখেছেন? প্রতিজ্ঞাপত্র দেখেছেন?

চন্দ্রভান তক্তপোশের একপ্রান্তে বসে পড়ে। টেবিল-চেয়ার ছাড়া ঘরে ঐ একখানি তক্তপোশ পাতা। তার উপর মাদুর বিছানো। মাথার কাছে গুটানো একটা ছোট বিছানা। তালপাতার হাতপাখাও আছে একখানা। পিছনের দেওয়ালে ছত্রপতি শিবাজীর ছবি। আরও একখানা ফটো আছে—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের। চন্দ্রভান বললে—না, নিয়মাবলী দেখি নি। তবে আপনাদের উদ্দেশ্যের কথা সুশীলের কাছে শুনেছি। আমি সর্বান্তঃকরণে দেশের কাজে নামতে চাই। তবে একটা কথা—আমাকে আশ্রয় দিতে হবে। আমি গৃহত্যাগ করে এসেছি।

কদম দাস একটু গম্ভীর হল। বললে, আপনার নামটাই শুনেছি। আপনার পরিচয়?

চন্দ্রভান আত্মপরিচয় দিল।

কদম দাস আরও গম্ভীর হয়ে বলল—কিছু মনে করবেন না। আপনার কাকা একজন প্রভাবশালী বিশিষ্ট জমিদার। আপনাকে আশ্রয় দিতে হলে আমাকে একবার বড়দার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। বড়দা, মানে যিনি আমাদের প্রেসিডেন্ট আর কি। ব্রজরাখালবাবু। তিনি হয়তো এখনই এসে পড়বেন।

চন্দ্রভান খবরের কাগজখানা টেনে নেয়। কদম দাস সুশীলের সঙ্গে গল্প করতে থাকে। গতকালকার সভার আলোচনা। কাল নাকি বাগবাজারের মিটিঙে পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে।

একটু পরেই এসে গেলেন ওদের সভাপতি ব্রজরাখাল রায়। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। গলাবন্ধ আলপাকার কোট আর ধুতি। পায়ে ফিতা বাঁধা জুতো। গালে কুচকুচে কালো চাপ দাড়ি। কদম দাস তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ব্রজরাখাল বসতে বসতেই প্রশ্ন করেন—আত্মোন্নতি সমিতি থেকে নিবারণ এসেছিল?

—না বড়দা। তাঁর আসার কথা আছে নাকি?

—হ্যাঁ। একজনকে গ্রামে পাঠাতে হবে। রেভারেণ্ড শারদাঁ একজন কর্মী চেয়েছেন—

হঠাৎ চন্দ্রভানের দিকে নজর পড়ায় বলেন—এঁকে? এঁকে তো চিনি না।

কদম দাস চন্দ্রভানের সব কথা বুঝিয়ে বলে।

উপসংহারে বলে, আমি বলেছি, বড়দা রাজী না হলে আমরা কিছুই—

কথার মাঝখানেই ব্রজরাখাল বলে ওঠে—এ শুধু ঠাকুরের কৃপা। বাওয়ালীতে কাকে পাঠাব তাই ভেবে মরছি। আর এদিকে ঠাকুর তাঁর কাজ করা লোককে এখানে বসিয়ে রেখেছেন। না হে চন্দ্রভানবাবু, আর দ্বিতীয় কথা নয়। তুমি তৈরী হয়ে নাও। গ্রামে গিয়ে থাকতে পারবে তো?

চন্দ্রভান সবিনয়ে বললে—আমি গ্রামেরই ছেলে। ন'দে জেলার পাগলাচণ্ডীতে ছেলেবেলা কেটেছে আমার। কোথায় যেতে হবে?

—গ্রামটার নাম বাওয়ালী। হাঁটা পথে মাইল পনের। বজবজের দক্ষিণে। তা নৌকাতেও যেতে পার। অনেকটা পথ চলে যাবে। রাজারামপুরের ঘাটে নামলেই হবে। ওখান থেকে মাইল তিনেক যেতে হবে দক্ষিণ-পূর্বমুখো। সেখানে রেভারেণ্ড আঁরি শারদাঁকে এক ডাকে সবাই চিনবে। উনি একজন পাদরী। তিনিই লোক চেয়েছেন—

চন্দ্রভান একটু ইতস্তত করে বলে—কালকেই শপথ নিলাম বিলাতী জিনিস বর্জন করব—আর আজই আপনি আমাকে একজন ইংরাজ ভদ্রলোকের কাছে চাকরি করতে যেতে বলছেন?

ব্রজরাখাল কোটের বোতামগুলি খুলতে খুলতে বলে—এটা তো বুদ্ধিমানের মত কথা হল না চন্দ্রভানবাবু। প্রথমতঃ, ইংরাজ আমাদের শত্রু নয়, ইংরাজশাসকই আমাদের শত্রু। মার্গারেট নোব্‌লও ইংরাজ, ভুলে যেও না—স্বামীজীর দেহান্তের পর তিনিই আমাদের পথ দেখাচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ, রেভারেণ্ড শারদাঁ ইংরাজ নন, তিনি ফরাসী। আত্মভোলা মানুষ। সত্তরের কাছাকাছি বয়স। বাওয়ালীতে উনি খুব ভাল কাজ করছেন। একটি অনাথ আশ্রম খুলেছেন, তাঁত বসিয়েছেন বাড়িতে। সম্প্রতি একটি ছোটদের বিদ্যালয় খুলেছেন—তার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক চেয়ে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। তুমি চাকরি করতেও যাচ্ছ না, যাচ্ছ বাওয়ালী গ্রামে দেশসেবা করতে।

একটু থেমে আবার বলেন—দেখ, যদি কোন কুণ্ঠা থাকে তবে খোলাখুলি বল।

চন্দ্রভান দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলে—আমারই ভুল বড়দা। আমি যাব।

—ব্যস্ ব্যস্। তবে আর দেরি নয়। এখনই রওনা হলে সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছবে।

সুশীল সেন চট্ করে বলে—বড়দা, আমার মনে হচ্ছে উনি একেবারে একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছেন—

—তাই নাকি? তা হোক। আমি আজই মাইনে পেয়েছি—

হাত পেতে ভিক্ষা কখনও নিতে হয় নি। চন্দ্রভান কিছুতেই হাতটা পাততে পারে না।

সুশীল যেন বুঝতে পারে ওর অবস্থা। বলে, কাল আংটিটা ও-ভাবে খোয়া না গেলে আজ তোমার এ অবস্থা হত না চন্দরদা—

—আংটি খোয়া গেছে? কেমন করে?

সুশীল হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে দেয়। ব্রজরাখাল বুঝতে পারে, সম্ভ্রান্ত জমিদার ঘরের এ ছেলেটি লজ্জায় হাত পাততে পারছে না। তাই কদমের হাতেই টাকা ক'টা ফেলে দিয়ে বলে—কদম, তুমিই বরং ওকে দিও, ধুতি-টুতি যা লাগবে। আচ্ছা দেখ তো, আমাদের দরিদ্র ভাণ্ডারের তহবিলে কিছু আছে? ফাদার শারদাঁর কাছে খানকতক বর্ণ-পরিচয় আর শ্লেট-পেনসিল ইত্যাদি পাঠিয়ে দিতে পারলে ভাল হত।

কদমকেশর লক্ষ্মীর ঘটটি উপুড় করে দেখিয়ে দেয়। ভাঁড়ে ভবানী!

—তবে থাক। এর পরে না হয় দেখা যাবে। তাহলে চন্দ্রভানবাবু—

চন্দ্রভান বললে—আপনি কদমদাকে নাম ধরে ডাকেন। আমাকেও নাম ধরেই ডাকবেন, আমি ওঁর চেয়ে বয়সে ছোট—

—তা বেশ তো! তাই না হয় ডাকব এবার থেকে।

চন্দ্রভান উঠে দাঁড়ায়। কদমকেশর একখানা রুলটানা খাতা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—এখানে একটা সই করতে হবে।

চন্দ্রভান সই করবার জন্য কলমদানি থেকে কলমটা তুলে নিতেই হাঁ হাঁ করে বাধা দেয় ব্রজরাখাল। বলে—অমন কাজও কর না চন্দ্রভানবাবু। না পড়ে কোন কাগজে কখনও সই কর না। আগে পড়ে দেখ—

চন্দ্রভান বলে—পড়ে আর কি দেখব বড়দা? আপনারা দেশের ভাল করতে চান, নিয়মাবলী সেই ভাবেই করেছেন। ও আর দেখার কি আছে?

—এ কথাটা ঠিক হল না চন্দ্রভানবাবু। কী প্রতিজ্ঞা করছ, কী কথা দিচ্ছ—

চন্দ্রভান হেসে বলে, কথা দেওয়ার আর মূল্য কি বড়দা? এই তো একটু আগে আপনি আমাকে কথা দিলেন, আমাকে নাম ধরে ডাকবেন—অথচ এখনও বলছেন

চন্দ্রভানবাবু!

দিলখোলা হাসি হাসল ব্রজরাখাল। বললে—আচ্ছা ভাই চন্দ্রভান, এবার থেকে তোমাকে নাম ধরেই ডাকব। কথার খেলাপ করব না।

নৌকায় গিয়েছিল চন্দ্রভান। আর বাড়িমুখো হয় নি। এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছিল সংসার থেকে। এ দুনিয়ায় এখন থেকে সে একা। সূরয বড় হোক, মানুষ হোক। তারপর তার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবে। যখন সূরয নিজের ইচ্ছায় পা ফেলতে পারবে। চন্দ্রভান বুঝতে পেরেছে কাকার আসল রাগ চন্দ্রভানের উপর। তার জন্যেই সূরযকে মার খেতে হয়েছে। ইচ্ছে করেই কাকা ওকে বেত মারে নি, কারণ অত্যাচারী বুঝেছিল নিজের পিঠের চেয়ে সূরযের পিঠেই চাবুকের আঘাত বেশি করে বাজবে চন্দ্রভানের। তাই ওর এ সিদ্ধান্ত। ও বুঝেছে, সংসার থেকে সরে না এলে অত্যাচারের মাত্রা বাড়বে সূরযের উপর।

মেটিয়াবুরুজের ঘাটে দক্ষিণগামী একটি নৌকায় ঠাঁই পেয়েছিল। বজবজ পার হয়ে রাজারামপুরের ঘাটে যখন নামল তখন পড়ন্ত বেলা। ওখান থেকে বাওয়ালী নাকি মাইল তিনেক। মাঝি দেখিয়ে দিল রাস্তাটা—সিধে দক্ষিণমুখো।

আম-কাঁঠালের বাগান। তার মাঝখান দিয়ে পথ। দু-পাশে আশ্‌শ্যাওড়া আর বন-ধোঁধলের আগাছা। মাঝে মাঝে মজা পুকুর, পড়ো ভিটে। বাঁশের ঝাড় নুয়ে পড়েছে পথের উপর। সরু পথটা একটু পরে গিয়ে মিশেছে দিগন্ত অনুসারী সবুজ ধানের ক্ষেতে। কার্তিকের প্রথম। ধানগাছের এবার রঙ ফেরানোর পালা। সবুজ থেকে সোনালী। ধানগাছের তলায় এখন জমে আছে থকথকে কাদা আর গেরুয়া ঘোলাজল। আর সেই ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে কুমারী মেয়ের সিঁথির মত একফালি আলপথ চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। ঐ পথে যেতে হবে তাকে। একেবারে দিগন্তের কাছে দেখা যাচ্ছে গ্রাম্য জনপদ—আম-কাঁঠাল-নারকেল ছাওয়া।

প্রায় ঘন্টাখানেক টানা হেঁটে ও এসে পৌঁছলো গ্রাম প্রান্তে। গ্রাম-সীমানায় মস্ত একটা তেঁতুলগাছ। তার তলায় খানকতক চালাঘর। সামনে একটা গো-গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ওপাশের একটা ভাঙা জমিতে কতকগুলো উলঙ্গ ছেলে কপাডি খেলছে। ভিনদেশী মানুষকে আসতে দেখে সামনের চালাঘর থেকে একজন বুড়োমতন মানুষ হেঁকে ওঠে—কে যায়?

আদুল গা, পরনে ময়লা একটা খাটো ধুতি। হাতে হুঁকা। ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ পড়ন্ত রৌদ্র থেকে দৃষ্টিটা আড়াল করতে চোখের উপর তুলেছে একখানা হাত।

চন্দ্রভান এগিয়ে এসে বলে—আমি শহর কলকাতা থেকে আসছি। বাওয়ালী যাব। ফাদার অঁরি শারদাঁর বাড়ি। পথটা বলতে পারেন?

—এটাই বাউলী। কি নাম তোমার? কি জাতি?

—আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীচন্দ্রভান গর্গ। আমরা ব্রাহ্মণ।

—পেন্নাম হই। তা সাহেবের বাড়ি যাবেন? এই সড়ক ধরে সিধে চলে যান। এট্টু এগুয়েই দেখবেন রথতলা। সেখানে ডানবাগে মোড় ফিরবেন। গাঁয়ের একেবারে শেষ সীমানায় সাহেবের কুঠি।

চন্দ্রভান লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেওয়ামাত্র বৃদ্ধ তাকে 'তুমি' ছেড়ে 'আপনি'তে উন্নীত করেছেন। কথা না বাড়িয়ে সে এগিয়ে যায়।

এককালে বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। রথতলায় হোগলা দিয়ে ছাওয়া একটা রথ রয়েছে।

পথে পড়ল পাকা দোলমঞ্চ। অসংখ্য ছোট-বড় মন্দির। এই মন্দিরগুলি যেন বৃত্তাকারে ঘিরে ধরেছে গ্রামের একমাত্র পাকা বাড়িটিকে। জমিদার বাড়ি। মণ্ডল মশায়দের। সেটাকে ডান হাতে রেখে এগিয়ে যেতে গ্রাম পাতলা হয়ে আসে। এদিকে আর বাড়িঘর নেই। ফাঁকা ফাঁকা। বেশ বড় একটা মাঠ পার হয়ে ওদিকে খানকতক চালাঘর দেখা যায়। তার একটা আবার রাণীগঞ্জ টালি দিয়ে ছাওয়া। জিজ্ঞাসা করে জানল ওটাই সাহেবের কুঠি।

এ তল্লাটে একজনই সাহেব। খুঁজে নিতে বেগ পেতে হল না। ব্রজরাখালও তাই বলেছিল—দশ বিশ মাইলের মধ্যে ঐ একজনই সাদাচামড়ার লোক আছেন। বাড়ি খুঁজে নিতে কোন অসুবিধা হবে না।

সাহেববাড়ির দোরগোড়ায় যখন এসে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মাটির দেওয়াল, টালির ছাদ, বারান্দার খুঁটিগুলো তালের। সামনে বিস্তীর্ণ বাগান। মৌসুমী ফুলের চারা। ফুল ফুটেছে হরেক রকম। অচেনা সব বিলিতি ফুল। সব ক'খানা বাড়ি একটি প্রকাণ্ড বেড়া দিয়ে ঘেরা। পিছন দিকে ছেঁচা-বেড়া এবং ফণীমনসার ঝোপ, শুধু সামনেটা মেদি পাতার সুন্দর করে ছাঁটা বেড়া। প্রবেশ পথে একটি কাঠের গেট। গেটের গায়ে একটা কাঠের ফলক। তার লেখাটা পড়ে ঘাবড়ে যায় চন্দ্রভান। কাঠের ফলকটাতে ইংরাজি হরফে লেখা আছে Rev. Henry Chardin। সর্বনাশ! ফাদার অঁরি শারদাঁর বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে এ কোন রেভ. হেনরি চার্ডিন-এর বাড়ি এসে উপস্থিত হল সে? কিন্তু গাঁয়ের মানুষদের আর দোষ দিয়ে কি হবে? সাহেব বলতে তারা এই একজনকেই চেনে। সাহেবের নাম আর কে মুখস্থ রাখে? সাহেব সাহেব। কিন্তু ঐ চার্ডিন-সাহেব কোন্ বুদ্ধিতে এই অজ পাড়াগাঁয়ে নিজের বাড়ির ফটকে ইংরাজি হরফে নামটা লিখেছেন? তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ বা ওটা পড়েছে কখনও?

—কাকে খুঁজছেন?

বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায় চন্দ্রভান।

তার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে, বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। বয়স কত হবে ওর? বড় জোর পনের! টকটকে ফর্সা রঙ। কলকাতার ফিরিঙ্গি পাড়ায় এমন দুধে-আলতা রঙ, এমন নীল চোখ অথবা এমন সোনালী চুল কিছু অবাক করা দৃশ্য নয়—কিন্তু আম-কাঁঠালের ছায়া-ঘেরা এই বিজন প্রান্তরে অমন মেয়ের আবির্ভাবে চম্‌কে ওঠাই স্বাভাবিক। মেয়েটিকে মেমসাহেবের মত দেখতে হলে কি হয়, ও কথা বলছে পরিষ্কার বাঙলায়—কাকে খুঁজছেন আপনি?

—এটা রিক রেভ. হেনরি চার্ডিনের বাড়ি?

মেয়েটি মুখ টিপে হাসল। দু-হাত মাজায় রেখে মাথাটি কাত করে বললে—আপনি বুঝি ইংরাজি পড়তে পারেন?

চন্দ্রভান থতমত খেয়ে যায়।

—এতক্ষণ বানান করে কি পড়লেন তাহলে?

চন্দ্রভান বেশ অপ্রস্তুত বোধ করে। এটা নেহাৎ বোকার মত প্রশ্ন করছে সে। বাড়ির দোরেই তো গৃহস্বামী নিজ পরিচয় ঘোষণা করে রেখেছেন। তারপর আর এ বাহুল্য প্রশ্ন কেন? সামলে নিয়ে বলে—ভারি মুশকিলে পড়লাম তো! এতক্ষণ খুঁজে খুঁজে এই ভর সন্ধ্যে বেলায় শেষমেশ ভুল ঠিকানায় এসে পৌঁচেছি। আচ্ছা এখানে আর কোন সাহেব বাড়ি আছে?

—আপনি কাকে খুঁজছেন তাই তো বলছেন না!

—আমি খুঁজছি ফাদার আঁরি শারদাঁকে। শুনেছি তিনি বাওয়ালী গ্রামেই থাকেন। আচ্ছা, এটাই বাওয়ালী তো?

—কলকাতা থেকে আসছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। এখন এই ভর সন্ধ্যে বেলায়—

—তাই তো! এখনই এসব জঙ্গলে শেয়াল বের হবে। ওরা আবার কলকাতার মানুষ দেখলেই খ্যাঁক করে তেড়ে আসে। আসুন, ভিতরে আসুন।

চন্দ্রভান কলকাতার ছেলে নয়। গ্রামের অভিজ্ঞতা তার আছে। মেয়েটিকে বেশ ফাজিল বলেই মনে হল। কিন্তু ওর মনের অবস্থা তখন উপযুক্ত জবাব দেবার মত নয়। খোলা গেট পেয়েও ঢুকবে কিনা বুঝে উঠতে পারে না।

—এটা রেভ. হেনরি চার্ডিনের বাড়ি বটে, তবে এখানে আজ সন্ধ্যেবেলায় ফাদার আঁরি শারদাঁ আসবেন। আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন সঙের মত?

—ও! শারদাঁ-সাহেব আজ এখানে আসবেন? তবে তো ভালই হল।

মেয়েটি ওকে নিয়ে আসে ভিতরে। লাল সুরকি বিছানো পথটা দিয়ে টালি-ছাওয়া বাড়ির দাওয়ায়। ভিতর থেকে দুটি বেতের মোড়া বার করে আনে। একটি বাড়িয়ে দেয় ওর দিকে। একটিতে নিজে বসে পড়ে।

একটি জনমজুর শ্রেণীর লোক এসে হাত জোড় করে দাঁড়ায়। বলে—আজ চলি দিদিমণি। কাল আসব তো?

—হ্যাঁ, আসবে বইকি। আর পরাণকেও নিয়ে এস। আলুগুলো কালকেই বসিয়ে দেব।

লোকটা কুণ্ঠিতভাবে বলে—ঘরে মালক্ষ্মী একেবারে বাড়ন্ত দিদিমণি—

—ও, আচ্ছা নিয়ে যাও।

মেয়েটি উঠে যায় ভিতরে। একটু পরেই নিয়ে আসে ছোট একটি বেতের টুকরিতে করে কিছু ধান। ঢেলে দেয় লোকটার প্রসারিত গামছায়। পেন্নাম সেরে লোকটা চলে যেতেই পরিবেশটা একেবারে নির্জন হয়ে পড়ে।

এমন জনমানবহীন বিজন প্রান্তরে একটি উদ্ভিন্ন-যৌবনা মেমসাহেবের সঙ্গে একান্তে চুপচাপ বসে থাকতে রীতিমত অস্বোয়াস্তি বোধ করে চন্দ্রভান। মেয়েটি শাড়ি-জ্যাকেট পরে নি, পরেছে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা ফ্রক-জাতীয় একটি পোশাক। তাই ওর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে আরও সঙ্কোচ হয়। বুকের উপর আঁচল না থাকলে কি এই বয়সী মেয়েদের দিকে তাকাতে পারা যায়? এতক্ষণে গোধূলির আলোও ক্রমে ম্লান হয়ে যেতে বসেছে। চারদিক থেকে কেমন যেন একটা রহস্য-ঘন অন্ধকার ওদের ঘিরে ধরছে। গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে এই অন্তেবাসী কুটিরগুলি। গ্রামের মানুষজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না এখান থেকে। বিশ্বচরাচরে যেন আর কেউ নেই, আর কিছু নেই। আছে মুখোমুখি বসা ওরা দুজন।

অস্বোয়াস্থিকর নীরবতা ভেঙে চন্দ্রভান বলে—চার্ডিন-সাহেব কোথায় গেছেন?

—গোবিন্দপুরের হাটে। এখনই এসে পড়বেন। আপনি ব্রজরাখালবাবুর কাছ থেকে আসছেন তো?

—আপনি কেমন করে জানলেন? কে বলেছেন? শারদাঁ-সাহেব?

মেয়েটি তার ফ্রকের প্রান্ত থেকে চোর-কাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে মুখ নিচু করে বললে

না, চার্ডিন-সাহেবও তাহলে নিশ্চয় সেটা ওই শারদাঁ-সাহেবের কাছে শুনেছেন।

—তাই হবে।

হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মেয়েটি। এর মধ্যে হাসির কি আছে? আবার হঠাৎই হাসি থামিয়ে বলে—একটু বসুন, একটা আলো নিয়ে আসি।

উঠে যায় ভিতরে। একটু পরেই আসে ডোন-দেওয়া একটা কেরোসিনের বাতি নিয়ে। রাখে সেটা মাটিতে। বাইরে এতক্ষণে ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। গোধূলির আলো সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে। ঝোপে-ঝাড়ে জ্বলছে মুঠো মুঠো জোনাকি।

মেয়েটি নিজে থেকেই বলে—আমার নাম ঊর্মিলা—

—ঊর্মিলা কী? চার্ডিন না শারদাঁ?

—চার্ডিন!

—ও! আমার নাম শ্রীচন্দ্রভান গর্গ।

—গর্গ? আপনারা কি কায়স্থ?

—না, ব্রাহ্মণ।

—ও! তাহলে আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

চন্দ্রভান ওর কথামত বিছানা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে পিছন পিছন এগিয়ে যায়। মেয়েটি ওকে নিয়ে যায় বাড়ির পিছন দিকে কুয়োতলায়। বলে—ঐ দড়ি-বালতি রয়েছে, এক বালতি জল তুলুন।

—জল কি হবে?

—আপনি মুখ-হাত ধোবেন। খাবেন। বামুন মানুষ আমার তোলা জল তো আর আপনি খাবেন না। ঐ ঘটি রেখেছি, এক ঘটি জল নিয়ে আসুন।

চন্দ্রভান আর দ্বিরুক্তি করে না। কুয়োর জলে ভাল করে মুখ-হাত ধুয়ে নেয়। ঘটিটা মেজে এক ঘটি জল নিয়ে ফিরে এসে দেখে—মেটে দাওয়ায় একটি পশমের আসন বিছানো রয়েছে। সামনে একটি পদ্মপাতায় কয়েক টুকরো কাটা পেঁপে, শসা, কলা আর বাতাসা।

—আপনি খাবেন তো?—সৌজন্য বোধে প্রশ্ন করে চন্দ্রভান।

—আমি কি ফলারে বামুন?

ক্ষিধে পেয়েছিল প্রচণ্ড। সকাল থেকে পেটে কিছুই পড়ে নি। চন্দ্রভান বসে পড়ে বিনা বাক্যব্যয়ে। মনে হয় মেয়েটি মুখরা। অমন সুন্দর দেখতে, অথচ কথাগুলো কেমন যেন খোঁচা খোঁচা!

মেয়েটি আকাশের দিকে মুখ করে একটি স্বগতোক্তি করে—ব্রজরাখালবাবুর যেমন কাণ্ড! ফলারে বামুন পাঠাতে কে বলেছিল!

চন্দ্রভানের রীতিমত রাগ হয়ে যায়। এ মেয়েটির মোড়লি করার কি আছে? কলাটা কোনক্রমে গলাধঃকরণ করে বলে—তাতে আপনার কি?

—না, আমার আর কি? আমার তো হাঙ্গামা কমলই। আপনাকে রেঁধে খাওয়াতে হবে না।

ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝে উঠবার আগেই শোনা গেল অশ্বখুরধ্বনি। সাহেবরা নিশ্চয় ফিরে এলেন হাট থেকে। খাওয়া হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রভানের। উঠে পড়ে মুখটা ধুয়ে নেয়।

দুজন নয়, একজনই এলেন ঘোড়ায় চেপে! ঘোড়াটা এসে থামল একেবারে বাড়ির

দোরগোড়ায়। সাহেব নামলেন ঘোড়া থেকে। সঙ্গে ছিল ওষুধের একটা ব্যাগ। সেটা ঊর্মিলার হাতে দিলেন। সাদা আলখাল্লার মত একটা জোব্বা পরা, সাদা দাড়ি, চুলগুলি সাদা—বাবরি চুলের গোছা কাঁধের উপর পড়েছে। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসু নেত্রে চন্দ্রভানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। চন্দ্রভানকে পরিচয় দিতে হল না। ঊর্মিলা বললে—ইনি মিস্টার চন্দ্রভান গর্গ। ব্রজরাখালবাবু পাঠিয়েছেন।

বৃদ্ধ তাঁর হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—আমি দুঃখিত। অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে বসিয়ে রাখিয়াছি।

চন্দ্রভান বৃদ্ধের প্রসারিত করটি গ্রহণ করে, সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে বলে—আমাকে আপনি 'তুমি' বলেই কথা বলবেন।

বৃদ্ধ হঠাৎ হা হা করে হেসে ওঠেন—বলেন—আমাকে মার্জনা করতে হবে চন্দ্রভানবাবু। বাঙলা ভাষায় ঐ 'আপনি-তুমি-তুই'—এ আমার কিছুতেই অভ্যাস হইল না। ক্রিয়াপদগুলিও ঐ সঙ্গে বদল হয়ে যায় কিনা। আমি ঐ একটিই অভ্যাস করেছি। তাই সকলকেই 'আপনি' বলি।

—আপনার মেয়েকেও?

—কার কথা বলিতেছেন আপনি?

ঊর্মিলা আগ বাড়িয়ে বলে—উনি বোধহয় আমাকে—'মীন' করছেন।

—ওঃ না! ও আমার মেয়ে নয়, আমার...আমার...

—ভাইঝি, ভ্রাতুষ্পুত্রী। পাদ পূরণ করে ঊর্মিলা।

—এক্সাক্টলি! ভ্রাতুষ্পত্রী। যাই হোক আসুন, ভিতরে বসা যাক।

ওরা ঘরের ভিতরে এসে বসে। মাটির দেওয়াল, মাটির মেজে। কিন্তু সমস্তটা ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। ঘরের দেওয়ালে এ গ্রামের সঙ্গে নিতান্ত বেমানান খানকতক ছবি। বেশ বড় মাপের। রঙিন ছবি। চন্দ্রভান চেনে না, তাই বুঝতে পারে না এগুলি পশ্চিমের বিখ্যাত চিত্রকরদের প্রিন্ট। করেজ্‌জো-র 'কিউপিডের শিক্ষা', লিওনার্দোর 'শিলাসীনা কুমারী', রাফাইলের 'আকাদেমী', এল গ্রেকো-র 'সেন্ট মার্টিন ও ভিখারী', রেমব্রান্টের 'রাতের পাহারা', গেন্‌সবরার 'ব্লু-বয়'।

ঘরের একপ্রান্তে মাটি দিয়ে তৈরী একটি তুলসীমঞ্চের বেদীর মত। তার উপর একটি মূর্তি। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর। তার উপরে লক্ষ্মীর সরার মত গোলাকৃতি আর একটি রঙিন ছবি। একটি সুখী পরিবারের। বাপ, মা ও শিশুপুত্রের। বাপ সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, মা তার ডান হাতটা তুলে কাঁধের উপর বসা শিশুটিকে আকর্ষণ করছে। পশ্চাৎপটে কয়েকজন উলঙ্গ লোক। ওরা কেন এমন প্রকাশ্য স্থানে উলঙ্গ হয়ে সারি সারি বসে আছে বোঝা গেল না।

তিনজনে আসন গ্রহণ করলে বৃদ্ধ ঊর্মিলাকে ইংরাজিতে বললেন—মিষ্টার গর্গের জন্য কিছু খাবার-টাবার—

বাধা দিয়ে চন্দ্রভান বলে—উনি আগেই সেটা সেরেছেন। আমার আহার হয়েছে ; কিন্তু একটা কথা। ফাদার অঁরি শারদাঁ আজ সন্ধ্যেবেলায় এখানে আসবেন শুনেছিলাম—

বৃদ্ধ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকান। হঠাৎ একটা খুক্ খুক্ শব্দ শুনে পাশে ফিরে দেখেন ঊর্মিলা প্রাণপণে হাসি চেপে বসে আছে। বৃদ্ধ একটু সামলে নিয়ে বলেন—আমিই অঁরি শারদাঁ!

চন্দ্রভান নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি শুধরে নেয়—ওঃ মাপ করবেন!

আমি ভেবেছিলাম আপনি হেন্‌রি চার্ডিন!

আর নিজেকে সামলাতে পারল না মেয়েটি। উচ্ছ্বসিত হাসির বন্যায় ফেটে পড়ল আর তৎক্ষণাৎ ছুটে পালিয়ে গেল ভিতরে। বৃদ্ধ যেন অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করছেন। কুণ্ঠিত হয়ে আমতা আমতা করে বলেন—আপনি ভুল করিতেছেন চন্দ্রভানবাবু। আমার নাম ফরাসী উচ্চারণে অঁরি শারদাঁ। রোমান হরফে ওটা Henry Chardin।

চন্দ্রভান মরমে মরে যায় ; কিন্তু মরার তখনও বাকি ছিল তার। বৃদ্ধ ওর হাত দুটি ধরে বললেন—আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রগলভতার জন্য আমি মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

বাওয়ালী গাঁয়ে চন্দ্রভান ছিল প্রায় এক বছর। এসেছিল কার্তিকের প্রথমে, ফিরে আসে পরের বছর অঘ্রাণের শেষাশেষি। এর মধ্যেই বাওয়ালী গ্রামটিকে ও ভালবেসে ফেলেছিল। ফাদার অঁরি শারদাঁ তার অন্তরে একটি স্থায়ী শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এমন গভীরভাবে সে আর কোনও মানুষকে শ্রদ্ধা করবার সুযোগ পায় নি। গুরু বলতে যা বোঝায়—যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা পরিয়ে দেন, মুক্তি পথের ইঙ্গিত যিনি দিতে পারেন—রেভারেণ্ড অঁরি শারদাঁ ছিলেন তাই। অদ্ভুত মানুষ। শ্রদ্ধায় আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। একদিনে চন্দ্রভান সব কথা জানতে পারেনি। জেনেছিল ক্রমে ক্রমে।

রেভারেণ্ড অঁরি শারদাঁ ছিলেন মেথডিস্ট চার্চের পাদরি। অল্প বয়সেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। বিবাহ করেন নি। প্রথমে ছিলেন ইটালিতে—রোমে। তারপর এসেছিলেন ভারতবর্ষে। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারের ব্রত নিয়ে। চার্চ সম্প্রদায় থেকেই ওঁর পাথেয় দেওয়া হয়। প্রথমে এসে ওঠেন পণ্ডিচেরীতে, পরে ফরাসী চন্দননগরে। বাঙলাদেশে এসে এক নতুন ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় হল তাঁর। আলাপ হল কেশবচন্দ্রের সঙ্গে, ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে। তর্ক করলেন এঁদের সঙ্গে ; ভাব বিনিময় হল। তারপর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে এক অদ্ভুত ভাবুকের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। কেমন যেন বদলে যেতে থাকে আজন্মের ধ্যান ধারণা। অনশনক্লিষ্ট নিরন্ন হিদেনগুলোকে নানাভাবে প্রলোভিত করে চার্চের ছত্রচ্ছায়ায় টেনে আনার মধ্যেই যে পরমার্থ আছে এ বিশ্বাসটাতেই ফাটল ধরল। ওঁর চালচলন ভাল লাগল না কর্তৃপক্ষের। ওঁকে হুঁসিয়ার করে দেওয়া হল। তবু অঁরি শারদাঁ সাবধান হতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত চার্চ থেকে বহিষ্কৃত হলেন তিনি। উনি নাকি হিঁদু হয়ে গেছেন। ফাদার শারদাঁ প্রতিবাদ করেননি। ওদের দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে সব ছেড়ে চলে এসেছিলেন একদিন। বেছে নিয়েছিলেন এই অন্তেবাসীর জীবন। না, ধর্ম তিনি ত্যাগ করেন নি। মনে প্রাণে আজও তিনি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান। এ গ্রামে যখন প্রথম এসে উঠেছিলেন তখন নানা দিক থেকে বাধা উপস্থিত হয়েছিল। হিন্দুসমাজ এবং জমিদার লাগল তাঁর পিছনে। কিন্তু ক্রমে সকলের হৃদয়ই জয় করে নিলেন তিনি। ওরা দেখল, এ পাদরি সাহেব গাঁয়ে কোন চার্চ বানাতে চাইল না, একটি মানুষকেও খ্রীষ্টান করল না। বরং এসে যোগ দিল ওদের চণ্ডীমণ্ডপের সংকীর্তনে, ওদের দোল-দুর্গোৎসবে। একে একে ভয় ভাঙলো গ্রামের লোকের। পাগলাসাহেবের মতিগতি বোঝা ভার। গাজনের আসরেও তাকে দেখা যায়, দোলের দিনে আবীরও মাখায়, আবার শোনা যায় নাকি আপন মনে পিয়ানো বাজিয়ে ধর্মসঙ্গীতও গায়। সবচেয়ে বড় কথা পাগলা-সাহেব ছিল ধন্বন্তরী ডাক্তার। কোথায় কার অসুখ করেছে কাকের মুখে বার্তা পেয়ে সে ছোটে। ভিজিট নেয় না, ওষুধের দাম

নেয় না—সারিয়ে তোলে! এমন মানুষকে কি আপন না করে পারা যায়।

পাগলা-সাহেব ধুয়ো ধরল সে একটি অনাথ আশ্রম খুলবে। যেসব অনাথ ছেলেমেয়ে বেওয়ারিশভাবে পথে বেপথে ভিক্ষা করে ফেরে, বাপ-মায়ের অবাঞ্ছিত সন্তান যারা সমাজে পরিত্যক্ত, তাদের সে বাঁচবার সুযোগ দিতে চায়। কথাটা বেয়াড়া ; কিন্তু তাতে সায় দিলেন স্থানীয় জমিদার মশাই। নিজ ব্যয়ে তৈরী করে দিলেন খান দুই চালাঘর। পাগলা-সাহেব নিয়ে এসে তুলল গ্রাম-গ্রামান্তরের ঐ সব বেওয়ারিশ বাচ্চাদের। অথচ আশ্চর্য, জাত মারল না কারও। খ্রীষ্টানের ছোঁওয়া পর্যন্ত খেতে হল না তাদের। কোন্ বিধবা বামুনবুড়িকে এনে তুলল তার অনাথ আশ্রমে। তিনি সকলের ন'পিসি। কোথাকার কার ন'পিসি তা কে-ই বা জানে? বড়পিসি-মেজপিসি কেউ কখনও ছিলেন কিনা তাও জানা যায় না। বৃদ্ধা ন'পিসি ওদের দায়িত্ব নিল। তিন-কুল খাওয়া এই বিধবা বুড়ি এসেছিল ভাত-কাপড়ের লোভে ; কিন্তু ঐ অনাথ শিশুগুলিকে পালন করবার মধ্যেই বালবিধবার বঞ্চিত মাতৃত্ব তৃপ্ত হয়েছে। ঐ অপোগণ্ডগুলিকে সেও ভালবেসে ফেলেছে।

—আপনি আর খ্রীষ্ট ধর্ম দীক্ষা দেন না কাউকে?—প্রশ্ন করেছিল চন্দ্রভান।

—না। আমার সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

—আপনি রোজ বাইবেল পড়েন?

—পড়ি। মহাভারতও পড়ি। রামায়ণও পড়ি। কোরাণের কোন অনুবাদ পাই নাই। পাইলে তাও পড়িতাম।

—আপনি আমাকে বাইবেল পড়ে শোনাবেন? বুঝিয়ে দেবেন?

—সানন্দে ; কিন্তু বিনিময়ে আপনি আমাকে গীতা পড়িয়া শুনাইবেন। বুঝাইয়া দিবেন। আপনি তো ব্রাহ্মণ।

এমনিভাবেই শুরু হয়েছিল ওদের ভাবের আদান-প্রদান। আঠারো বছরের চন্দ্রভান আর আটষট্টি বছরের শারদাঁর বন্ধুত্ব। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ওখানেই ব্রজরাখালের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। উনি জানতেন, ব্রজরাখালের একটি যুবক সমিতি আছে। তাই তাঁর কাছেই খবর পাঠিয়েছিলেন। গুটি আট-দশ বাচ্চাকে আশ্রয় দিয়েছেন ; কিন্তু তাদের লেখাপড়া শেখাবার একটা ব্যবস্থা না হলে যে ওরা মানুষ হয়ে উঠবে না। এতদিনে চন্দ্রভান আসায় বৃদ্ধের মনোবাঞ্ছা চরিতার্থ হয়েছে। চন্দ্রভান তাদের পড়ানোর ভার নিয়েছে। সাতটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সের। রোজ সকালে ওদের নিয়ে বসে। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের বর্ণপরিচয় নিয়ে। আর ধারাপাতের নামতা মুখস্থ করায়। একটারও অক্ষর পরিচয় নেই। সন্ধ্যাবেলা সাহেব নিজেই এসে বসেন। মুখে মুখে নানান দেশ-বিদেশের গল্প বলেন। তত্ত্বকথা শেখান।

একদিন চন্দ্রভান সাহস করে প্রশ্ন করে বসল—আচ্ছা, এই ছবিতে ঐ উলঙ্গ লোকগুলিকে আঁকা হয়েছে কেন?

ফাদার শারদাঁ তাঁর বৈঠকখানায় গোলাকার ছবিটির দিকে তাকিয়ে বলেন—ছবির ঐ বাপ-মা আর শিশু কে জানেন?

—আজ্ঞে না। ওঁরা কে?

—যোশেফ, মেরী এবং যীশু। এঁরা হলেন 'হোলী ফ্যামিলি'। এ ছবিটি একটি বিখ্যাত তন্দো। তন্দো মানে গোলাকৃতি ছবি, আপনাদের যেমন লক্ষ্মীর সরা আর কি! এটা এঁকেছেন সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর নাম মিকেলাঞ্জেলো বুয়োনরতি।

নামটা শুনিয়াছেন?

চন্দ্রভান আবার মাথা নেড়ে বলে—না।

—ছবিটা মিকেলাঞ্জেলো এঁকেছিলেন একজন ইটালিয়ান কাউন্টের জন্য। তিনি পশ্চাৎপটের ঐ নগ্ন মানুষগুলিকে 'হোলি ফ্যামিলি'তে দেখে সেটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। বলেন, ছবিটি অশ্লীল। পরে তিনি মিকেলাঞ্জেলোর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন ও ছবিটা কিনিয়া নেন। ঐ ছবি আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র। কেন তাহা বলি শুনুন।

মিকেলাঞ্জেলোর দোনি তন্দোর প্রসঙ্গে সেই যুগান্তকারী শিল্পগুরুর গোটা জীবনটাই শুনিয়েছিলেন তিনি। আর শুধু কি মিকেলাঞ্জেলো? ঐ প্রসঙ্গে রেনেসাঁ কি তা-ও বুঝিয়েছিলেন। রাফাইল, লিওনার্দো, জর্জনে, এল গ্রেকো, তিশান সবাই এসেছিলেন ভীড় করে সেই বাওয়ালী গ্রামের টালি ছাওয়া ঘরে। চিত্রকর থেকে চিত্রের প্রসঙ্গ। দেওয়াল থেকে ছবিগুলি পেড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নানান তথ্য।

—আপনি চিত্রকরদের বিষয়ে এত কথা জানলেন কেমন করে?

—আমি যে চার্চে ছবি আঁকতাম।

—আপনি ছবি আঁকতে পারেন? কই দেখি আপনার ছবি!

বৃদ্ধ হেসে বলেছিলেন—আমি কাগজে ছবি আঁকি না। দেওয়ালে আঁকি। টেম্পারা ও ফ্রেস্‌কো।

তারপর বলেন—আপনি দেখিতে ইচ্ছা করেন? আচ্ছা আসুন।

রেভারেণ্ড আঁরি শারদাঁর শয়নকক্ষে সেই তার প্রথম পদার্পণ। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালা। ঐ টালি-সেডের পিছনেই। ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেল চন্দ্রভান। ঘরের একপ্রান্তে মাটিতে পাতা একটি বিছানা। মাথার কাছে একটি কলসি। অপর প্রান্তে দেওয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। তার পায়ের কাছে আল্‌পনা আঁকা একটি মাটির ঘটে স্থলপদ্ম। আর ঘরের চতুর্দিকের দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় বড় অপূর্ব সব ছবি। সমস্ত দেওয়াল জুড়ে। চুন, গিরিমাটি, হলুদ ও নীল রঙ গুলে জল-রঙে আঁকা। মোটা মোটা রেখা। রঙ কোথাও গাঢ় থেকে হালকা করা হয় নি। এক এক রঙ এক এক জায়গা জুড়ে। অথচ সবটা মিলিয়ে ভারি হালকা একটি আমেজ।

—আপনি এত সুন্দর ছবি আঁকেন!

—বৃদ্ধা হাসলেন শুধু।

—এটা কার ছবি? এঁর সারা গায়ে এমন তীর বেঁধা কেন? আর থামের সঙ্গে এঁকে অমন করে বেঁধে রেখেছে কেন?

—উনি স্টিসেন্ট সিবেয়ান। আপনাকে ওঁর গল্প শুনাইব।

চন্দ্রভানের মনে পড়ে গেল তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা। ঠিক ঐ রকমভাবেই তাকে থামের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল সেদিন। সূরযভানের পিঠের উপর পড়া প্রতিটি কশাঘাত ঐভাবেই তীরের মত বিঁধেছিল তার বুকে।

—আর ইনি? এই মাথায় মুকুট-পরা মহিলাটি? ক্রুশ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি। ইনি কি মা-মেরী।

—না। মাতা মেরীর মাথায় আমি মুকুট আঁকিব কেন? তিনি তো সামান্য মেহনতী-ঘরের-বধূ—আর ক্রুশকাষ্ঠই বা কেন দিব তাঁর হাতে? উনি সেন্ট হেলেনা। সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন—যাঁর নামে কন্‌স্টান্‌টিনোপল শহর—উনি তাঁর মা। তিনিই প্রভু যীশুর ক্রুশকাষ্ঠটি খুঁজিয়া বাহির করেন।

চন্দ্রভান তন্ময় হয়ে ছবিগুলি দেখছিল। ওদের বাড়িতেও বড় বড় ছবি আছে। সেগুলি অধিকাংশই বিলাতী ঢঙে আঁকা—নিরাবরণা অপ্সরা অথবা নিসর্গ চিত্র। কিছু আছে রবি বর্মার প্রিন্ট। এ ছবির জাত আলাদা। মোটা মোটা তুলির আঁচড়। মূর্তিগুলির যেন ভার নেই—যেন শূন্যে ভাসছেন তাঁরা!

বললে—এমন অপূর্ব ছবি আপনি এমন কাঁচা দেওয়ালে এঁকেছেন? এ আর ক'দিন টিকবে?

ফাদার শারদাঁ ক্রুশলাঞ্ছিত নিজ বক্ষদেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন—এটাও যে কাঁচা দেওয়াল চন্দ্রভানবাবু। এটাই বা আর কতদিন টিকবে?

—কিন্তু মিকেলাঞ্জেলোর দোনি তন্দো তো 'চারশ' বছর টিকে আছে।

—ঠিক কথা। মিকেলাঞ্জেলো পৃথিবীর জন্য এঁকেছিলেন। তিনি ছিলেন শিল্পী। কিন্তু এ ছবির একজনই দর্শক। নেহাৎ আপনি আজ দেখিতে চাইলেন তাই আপনাকে দেখাইলাম।

চন্দ্রভান এ যুক্তি মেনে নিতে পারে না, কিন্তু প্রাজ্ঞ বৃদ্ধের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতেও তার সঙ্কোচ হয়।

বৃদ্ধ বলেন—বাওয়ালী গ্রামের জমিদার মণ্ডলমশায়ের রাধাকান্ত মন্দিরের খিলানে পোড়া মাটির মূর্তিগুলি দেখেছেন চন্দ্রভানবাবু? তাও শিল্প হিসাবে অপূর্ব। মণ্ডলমশাই কাঁচা দেওয়ালে আঁকেন নাই। কিন্তু মহাকালের হিসাবে দু বছর আর দু'শ বছরে কী প্রভেদ?

এবারও জবাব দেয় নি চন্দ্রভান।

ঊর্মিলার উপাখ্যানও শুনেছে শারদাঁর কাছে। মেয়েটি চন্দ্রভানের মত হতভাগ্য। বোধ করি তার চেয়েও বেশি। ঊর্মিলার বাবা জাক-লুই শারদাঁও একদিন ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন সুদূর ফরাসী দেশ থেকে এই ভারত ভূখণ্ডে। একটি কোম্পানীর ম্যানেজার হিসাবে। তখন তাঁর উঠ্‌তি বয়স। এখানে এসে একটি বঙ্গললনাকে তাঁর ভাল লেগে গেল। মেয়েটি সুন্দরী, গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের। কেমন করে পর্দানসীন একটি বঙ্গনারীর সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের সেই শেষ পাদে একটি ফরাসী ভদ্রলোকের দেখাসাক্ষাৎ হত সে কথা আর বিস্তারিত বলেন নি ফাদার শারদাঁ, হয়তো সে নেপথ্যের ইতিহাস তাঁর জানাও ছিল না। জেনেছিলেন তার ফলশ্রুতিটকু। তা ঐ ঊর্মিলা।

কাহিনীর উপসংহারটি করুণ। জাক-লুই শারদাঁ আবার ফিরে গেছেন দেশে। ঊর্মিলার মা অবশ্য সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়েই মুক্তি পেয়েছিল। ঊর্মিলা সেই শিশুকাল থেকে ফাদার শারদাঁর সংসারে আছে। ফাদার শারদাঁ তাকে কলকাতার মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। সেখানেই ছাত্রাবাসে থেকে পড়ে ঊর্মিলা। প্রতি ছুটিতে বাওয়ালীতে আসে।

কাহিনী শেষ করে বৃদ্ধ বলেছিলেন—এ সকল কথা যেন ওর সম্মুখে আলোচনা করিবেন না। অত্যন্ত অভিমানী মেয়ে। আর এখনও তো ও নিতান্ত ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ! হিন্দু সমাজে এমন পনের-যোলো বছরের কচি খুকি থাকলে বাপ-মায়ের গলা দিয়ে ভাত নামতো না। চন্দ্রভান আর কথা বাড়ায়নি।

—শুনছেন গুরুমশাই! ছেলেদের আজ ছুটি দিয়ে দিন।

স্লেট থেকে মুখ তুলে চন্দ্রভান দেখতে পায় পাঠশালার দোরগোড়ায় এসে

দাঁড়িয়েছে ঊর্মিলা। আজ আর ফ্রক নয়। পরেছে বাসন্তী রঙের একখানা ধনেখালি, গায়ে ঐ রঙের জ্যাকেট। স্নানান্তে পিঠের উপর মেলে দিয়েছে কোঁকড়া কোঁকড়া এলো চুল। কপালে পরেছে একটা লাল টিপ। ঠিক লক্ষ্মী ঠাকরুণটির মত লাগছে আজ ওকে।

—কেন? ছেলেদের হঠাৎ ছুটি দিয়ে দেব কেন?

—ন'পিসির জ্বর হয়েছে। মাথা তুলতে পারছে না। আজ আপনাকে রাঁধতে হবে।

চন্দ্রভান বিব্রত বোধ করে। আমতা আমতা করে বলে—রাঁধতে হবে! আমি যে রান্নার কিছুই জানি না!

ফিক্ করে হেসে ফেলে ঊর্মিলা বলে—এটা কি রকম কথা হল রসুয়ে বামুনমশাই! এটা যে আপনার কুলকর্ম!

চন্দ্রভান গম্ভীর হয়ে বলে—আমি রসুয়ে বামুন নই। আমি রান্না করতে পারব না। ফলার খাব।

—ও আপনি বুঝি রসুয়ে বামুন নন, ফলারে বামুন! নিন, উঠুন উঠুন! আপনি না হয় ফলার করবেন—এতগুলো বাচ্চা খাবে কি?

রাখাল রুহিদাস সর্দার পোড়ো। সাহস করে বলে—তাহলে আমাদের ছুটি, মাশাই?

চন্দ্রভান কিছু বলার আগেই ঊর্মিলা ধমকে ওঠে—না, তোমার ছুটি নয়। কাঠগুলো চেলা করতে হবে। বাদবাকির ছুটি—যাও!

মাশায়ের নির্দেশের জন্য আর অপেক্ষা করল না ওরা। 'ছুটি-ছুটি-ছুটি' চিৎকার করতে করতে দুর্দাড় করে বেরিয়ে গেল মাঠে।

চন্দ্রভান বইপত্র গুছিয়ে উঠে পড়ে। বলে—চলুন, রান্নাঘরে যাই!

—বাঃ! কী বামনাই বুদ্ধি আপনার! ছত্রিশ জাতের ছেলেকে ছুঁয়েছেন, সে খেয়াল আছে? যান আগে স্নান করে আসুন!

চন্দ্রভান হেসে বলে—জাত যায় আমার যাবে! আপনার কি?

—জাত খোয়াবার জন্য যেন বড় বেশি উৎসাহ দেখছি। নজরটা কোন্ দিকে?

চন্দ্রভান হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—মানে?

—মানে, একা আপনার জাতের কথা তো হচ্ছে না! ন'পিসির জন্যেও তো পথ্য রেঁধে দিতে হবে আপনাকে। সে বেচারী কেন জাত খোয়ায় আপনার গরজে—

—আমারই বা গরজটা কি?

—তা আপনিই জানেন। কী উঠবেন, না বকবকই করবেন শুধু?

রান্নাঘরে এসে নানান বিড়ম্বনা। ঘরে ঢুকতে পারে না ঊর্মিলা। চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধমক দেয়—ওটা কী হচ্ছে? নাড়ুন, নাড়ুন—তলাটা ধরে যাবে না? আঃ! বাঁ হাত দিয়ে ধরুন হাঁড়িটা! এই দেখ! শুধু হাতে ধরতে বলেছি নাকি? ন্যাকড়া দিয়ে তো ধরবেন? দেখি, দেখি—হাতটা পুড়ে গেল তো? আমারই হয়েছে যন্ত্রণা! এমন বামুনের জাতই যাওয়া উচিত!

চন্দ্রভান প্রতিবাদ করে না। নির্দেশ অনুযায়ী কাজগুলি করে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে যা কিছু করতে যায় তাই কি ভুল? প্রতিপদেই ধমক খাচ্ছে বেচারি। আচ্ছা, নাড়তে বলেছি মানে কি ঘন্ট বানাতে বলেছি? ক্রমাগত অত নেড়ে চলেছেন কেন? আলুগুলো যে ঘেঁটে একশা হয়ে গেল। ওকি? হাতটা ধুয়ে নিন—এঁটো হল না?

চন্দ্রভান হঠাৎ ঘুরে বসে বলে—বামুনের সঙ্গেই আপনার বিয়ে হওয়া উচিত! এত

এঁটোকাঁটার বিচার শিখলেন কোথায়?

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে ঊর্মিলা, বলে—রক্ষে করুন। মুর্গীই খেতে পারব না সারা জীবনে।

—মুর্গী বুঝি আপনি খুব ভালবাসেন?

—আপনি কি ভেবেছিলেন? আর কাউকে ভালবাসি? তাই বামুন বাড়িতে আমাকে চালান করতে চাইছিলেন?

উঠে দাঁড়ায় চন্দ্রভান। এগিয়ে যায় দ্বারের দিকে এক পা।

—আপনার হাত এঁটো।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চন্দ্রভান। হাত দুটির দিকে তাকিয়ে দেখে।

—পুড়ে গেল যে ওদিকে! নামান নামান!

—পুড়ে গেল? কি পুড়ে গেল? নামাতে হবে? কাকে, কিসের থেকে?

গ্রামের অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে চন্দ্রভানের। চরণ, মণ্ডল, নিতাই, রুহিদাস, জীবন কর্মকার আর গোপেন পাড়ুই। মাঝে মাঝে ওদের ওখানে গিয়ে আড্ডা মেরে আসে। ওরা ওকে ডাকে মাস্টারমশাই বলে। জমিদারমশাই একদিন স্কুল কেমন চলছে তা দেখতে এসেছিলেন। ওকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন রাধাকান্তজীর প্রসাদ গ্রহণ করতে।

সেদিন ছিল রবিবার। ওদের স্কুলের ছুটি। ফাদার শারদাঁ সকাল বেলাতেই ঘোড়া নিয়ে চলে গেলেন কোন্‌ দূর গাঁয়ে। রোগী দেখতে। চন্দ্রভান আশ্রয় পেয়েছিল ঐ পাঠাশালা ঘরেই। মাটিতে সতরঞ্চি বিছিয়ে শুতো। মাথার কাছে একটি কলসি। নিজেকেই জল ভরে রাখতে হয় তাতে। সকালে উঠে বিছানা গুটিয়ে রাখে। তখন সেটা পড়াশুনার আসর। আজ ছুটির দিন। আজ একটু বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকা যেতে পারে। চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে থাকে। এই চার মাসের ভিতর সে কলকাতার কোন চিঠি পায়নি। কোন চিঠি নিজেও লেখেনি কাউকে। ওর ঠিকানাই তো জানে না কেউ। আচ্ছা সূরয কেমন আছে? কলকাতাতেই আছে নিশ্চয়। এতদিনে হাফ্‌ইয়ার্লি পরীক্ষা হয়ে গেছে। সামনেই ওর ছুটি। ছুটিতে নিশ্চয় সে পাগলচণ্ডী যাবে। এখানে সূরয এলে কী মজা হত! গগ্যাটা পাস করতে পারে নি। করবে কোথা থেকে? পড়াশুনা যে করত না একদম। বটুক ভর্তি হয়েছে বরিশাল কলেজে। আর দীপু? দ্বৈপায়ন? সে তো প্রেসিডেন্সির ছাত্র এখন! মস্ত পণ্ডিত হবে একদিন ওর বন্ধু দীপু।

আচ্ছা কোম্পানির বাগানে সেই সন্ন্যাসী কেন বলেছিলেন—যবন কাহাকাঁ! যবন? মানে খ্রীষ্টান? ও যদি খ্রীষ্টান হত তাহলে কার কি ক্ষতি হত? ক্ষতি নয় লাভই হত। হাত পুড়িয়ে ওকে রান্না করতে হত না। ঊর্মিলাই রেঁধে খাওয়াতো তাকে। আচ্ছা ঊর্মিলা কি—? ঊর্মিলা মেয়েটা বড় অদ্ভুত। ওর অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না। ওদের স্কুল নিশ্চয় খুলে গেছে। মেয়েটা তো হস্টেলে ফিরে গেল না! কেন?

হঠাৎ কার যেন ছায়া পড়ল ঘরের ভিতর খোলা দরজা দিয়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে চন্দ্রভান দেখে দোরগোড়ায় ঊর্মিলা এসে দাঁড়িয়েছে।

—এমন চুপচাপ শুয়েও থাকতে পারে মানুষ! বাব্বাঃ!

চন্দ্রভান চোখ দুটি বুজে বলে, রবিবারেও জ্বালাতে আসা হয়েছে!

—উঠুন উঠুন। অনেক কাজ আছে—

—কাজ নেই। আজ সাবাথ ডে—

—আপনি কি খ্রীষ্টান?

—হলে যেন খুশি হও তুমি!

—এই খবর্দার! আপনি আমাকে 'তুমি' বলছেন যে!

—কেন, তুমি কি আমার গুরুজন?

—অনুমতি না দিলে অনাত্মীয়া কোন মেয়েকে 'তুমি' বলতে নেই তাও জানেন না?

—অনুমতি তো তুমি দিয়েছ?

—ঈস! কী মিথ্যুক আপনি! কবে অনুমতি দিলাম?

—মুখে দাও নি, দিয়েছ তোমার চোখের তারায়, তোমার ঠোঁটের হাসিতে।

—ওঃ! কাব্য হচ্ছে বামুন-ঠাকুরের। নিন, উঠুন উঠুন। বেগুন গাছগুলোর তলায় আগাছা হয়েছে। নিড়িয়ে দিতে হবে। একা হাতে আমি কত পারি?

—আমি কি তোমার মুনিয, পরাণ রুহিদাস?

—না! পরাণ-বল্লভ! উঠুন! বেগুন খাবার বেলায় তো চারখানা হাত বার হয় দেখি।

—তা তো বের হবেই। আমি হলাম হিন্দু তায় বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, চতুর্ভুজের উপাসক। তার মর্ম যবনী হয়ে তুমি কি বুঝবে?

—নারায়ণ চার হাতে খান না ঠাকুরমশাই। নিন উঠুন!

অগত্যা উঠেই পড়তে হয়।

মুখ-হাত ধুয়ে ছোলা গুড় মুখে দিয়ে চন্দ্রভান নেমে আসে বেগুনের ক্ষেতে। ঊর্মিলা খুরপি নিয়ে তার আগেই এসেছে। রৌদ্রের তেজ এর মধ্যেই বেশ বেড়ে গেছে। টক্‌টকে লাল হয়ে গেল তার মুখটা। ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে! চন্দ্রভান বলে —এ গ্রামে তোমার কোন বান্ধবী নেই?

—কেমন করে থাকবে বলুন? এখানে আমার বয়সী সব মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা সব শ্বশুরবাড়িতে। ছেলেবেলায় যাদের চিনতাম এখন তারা সবাই খোকার মা! সমবয়সী আর যারা আছে এ গাঁয়ে, তারা মেয়ে নয়, এ গ্রামের বউ। তাদের গল্প আমার মত কুমারী মেয়ের সঙ্গে জমে না।

—কেন জমে না?

ঊর্মিলা মুখ তুলে আবার তাকায়। তারপর আবার মুখটা নিচু করে বেগুন গাছের গোড়া খুঁড়তে খুঁড়তে বলে, একটা কথা বলবেন সত্যি করে?

—কী?

—আপনি সত্যি কি? 'ফুল' না 'নেভ'?

—তার মানে?

—তারও মানে? থাক ও কথা!

চন্দ্রভান একটু ঘনিষ্ঠ হবার জন্য বলে—তোমার সঙ্গে আমার জীবনের খুব মিল। তাই নয় ঊর্মি।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় মেয়েটি। খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে। চন্দ্রভান অপ্রস্তুত হয়ে বলে, এর মধ্যে হাসির কি হল?

—না, ভাবছিলাম, 'লা'-টা কোন্ গাঙে ডুবে মল?

—তার মানে?

—সব কথারই মানে? আমার নামের 'লা'-টা কোথায় গেল মশাই!

চন্দ্রভানও উঠে দাঁড়ায়। ছায়ায় সরে এসে বলে, তোমার সঙ্গে কোন সিরিয়াস কথা বলা যাবে না।

—ও! সিরিয়াস কথা বলবেন বুঝি? তা আগে বলতে হয়। কী, বলুন?—ঊর্মিলাও সরে আসে ছায়ায়। গম্ভীর হয়ে তাকায়। যেন ব্রতকথা শুনছে।

—বলছিলাম কি, জানো, আমারও মা নেই!

—সে তো জানিই আমি!

—তুমি কেমন করে জানলে?

—বাঃ, জানব না? আপনি এখানে কত তারিখে এসেছেন খেয়াল আছে? পয়লা কার্তিক। মা থাকলে কখনও ছেলেকে অগস্ত্য-যাত্রার দিন চাকরি করতে পাঠায়!

—উঃ! আশ্চর্য মানুষ তুমি! এত বার-ব্রত-তিথি-নক্ষত্র—

—অর্থাৎ বলতে চাইছেন, কোন বামুন-বাড়ির বউ হলেই আমাকে ঠিক মানায়, তাই না? কিন্তু সে গুড়ে বালি মশাই—মুর্গী ছাড়া—

হঠাৎ ওর হাতখানা ধরে ফেলে চন্দ্রভান। উত্তেজনায় সে থর থর করে কেঁপে ওঠে, বলে—সে কথা তুমি আগেও বলেছ ঊর্মি, কিন্তু আমি যদি খ্রীষ্টান হয়ে যাই—

ঊর্মিলা একটুও উত্তেজিত হয় নি, কিন্তু ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, পাগলামি করবেন না চন্দ্রভানবাবু!

ম্লান হয়ে যান চন্দ্রভান। বলে, পাগলামি? কী বলছ তুমি?

ঊর্মিলা জবাব দেয় না। ধীর পদে ফিরে যায় বাড়ির দিকে। হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ায় চন্দ্রভান। পথ রোধ করে, বলে—কিন্তু জবাবটা তুমি দিয়ে যাও ঊর্মিলা!

—জবাব তো দিয়েছি আমি! আপনি তাই যদি আশা করে থাকেন, তবে ভুল বুঝেছেন। আমি অন্যপূর্বা!

ধীর পদে সে চলে যায় টালি-ছাওয়া বাড়িটার দিকে। বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রভান। না, এ হতে পারে না, এ অসম্ভব! এ ডাহা মিথ্যা কথা।

—সেইদিনই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়ে গেল চন্দ্রভানবাবু। আমি অনুভব করিলাম, যত মত—তত পথ!

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন ফাদার আঁরি শারদাঁ। সেই অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করছিলেন। ঠাকুর স্বয়ং সর্বধর্মের নির্যাস গ্রহণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্মাচরণ করেছেন, সুফী ধর্মের মর্মকথা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তন্ত্রসাধনা করেছেন, বৈষ্ণব ধর্মের রসে অবগাহন স্নান করেছেন। তারপর তিনি বুঝেছেন—যে কৃষ্ণ, সেই খ্রীষ্ট! সব পথ গিয়ে মিশেছে একই সঙ্গমে। তাই গিরীশ, নরেন, মথুরাবাবুকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন পথে যাত্রা করতে বলেছিলেন। জানতেন, সবাই ফিরে আসবে একই সমের মাথায়। ফাদার শারদাঁ তাঁর পথ খুঁজে নিয়েছেন। তিনি খ্রীষ্টান কিন্তু গোঁড়ামি নেই তাঁর এক তিল!

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সেই কথাই ভাবছিল চন্দ্রভান। জাত আর ধর্ম তো এক নয়! কী ক্ষতি হবে দুনিয়ার, সে যদি আজ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে? এই হবে চরম প্রতিশোধ। চাবুক তার নিজের পিঠে পড়ে নি সেদিন, পড়েছিল অন্যত্র। ও নিজেও প্রতিপক্ষের উপর চাবুক চালাবে। বিসর্জন দেবে তার জাত! এতে যদি কারও পিঠে চাবুক পড়ে, তবে সে নাচার! উত্তেজনায় সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘরময় পায়চারি করে।

ঠিক কথা! কালই বলতে হবে ফাদার শারদাঁকে। এভাবেই সে প্রতিশোধ নেবে! পূর্বজন্মে সে যবন ছিল। ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী জানতেন যে, ম্লেচ্ছ ধর্ম গ্রহণ তার অনিবার্য নিয়তি। তাই বলে উঠেছিলেন—যবন কাহাকাঁ!

ম্লেচ্ছ ধর্ম! যে ধর্ম জ্ঞানবুদ্ধি মতে গ্রহণ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন, গ্রহণ করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়,—যে ধর্ম নিজে আচরণ করে দেখেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তা কেন অশ্রদ্ধেয় হবে! সেন্ট জন, সেন্ট সিবেস্টিয়ান, সেন্ট পল, সেন্ট জেভিয়ার—এঁদের পূত জীবন কথা, এঁদের আত্মোৎসর্গের কথা কি শোনেন নি চন্দ্রভান? এঁদের সাধনা কি বুদ্ধ-চৈতন্য-বিবেকানন্দের চেয়ে খাটো? শিশু যীশু ক্রোড়ে মা মেরীর ছবির সঙ্গে মা যশোদা বা গণেশজননীর প্রভেদ কোথায়?

আর তাছাড়া ঊর্মিলা?

ঊর্মিলা রহস্যময়ী। সেদিন নিশ্চয়ই একটা বাজে ওজর তুলেছিল সে। ঊর্মিলা তাকে ভালবাসে। এ সত্য সূর্যোদয়ের মত স্পষ্ট। তার মনের মানুষ যদি কলকাতাতেই থাকবে তবে কেন সে ছুটির পরেও পড়ে আছে এখানে? কেন চলে যায় না কলকাতায়? আসার পর থেকে ঊর্মিলার প্রতিটি দিনের আচরণ আবার যাচাই করে নেয়। না, ভুল তার হয় নি। ঊর্মিলার প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি ইঙ্গিত একটি ধ্রুবসত্যের দিকে নির্দেশ করছে! ঊর্মিলা জানে, তাদের দুজনের মধ্যে আছে জাতের বাধা। দুরতিক্রম্য সে বাধা। তাই একটা মনগড়া বাধার সৃষ্টি করে সে চন্দ্রভানকে একটা মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে চায়। চন্দ্রভানকে রক্ষা করতে চায়। তার ধর্মকে রক্ষা করতে চায়। চন্দ্রভান সব বোঝে! সে 'ফুল'ও নয়, সে 'নেভ'ও নয়—সে প্রেমিক!

পরদিনই ঊর্মিলাকে জনান্তিকে পাকড়াও করে ফেলে। এ ক'দিন ঊর্মিলা রীতিমত এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিল ; কিন্তু আজ চন্দ্রভানও মরিয়া হয়ে উঠেছে। কুয়োতলাতে যেই ঊর্মিলা জল তুলতে এসেছে অমনি কলসিটা হাতে নিয়ে সেও উপস্থিত।

—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

ঊর্মিলা মুখ টিপে হেসে বললে, সেদিনের মত সিরিয়াস কথা নয় নিশ্চয়।

—না, বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণই! সেদিন তুমি যে-কথাটা বলেছিলে সেটা বাজে ওজর, তাই নয়?

—সেদিন তো কত কথাই বলেছিলাম। ঠিক কোন্‌টা বলুন তো?

—তুমি একটি ছেলেকে ভালবাস!

খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে ঊর্মিলা। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে, ঠাকুরমশায়ের কি হিংসে হচ্ছে না কি?

চন্দ্রভান ধমক দেয়—কী ইয়ার্কি হচ্ছে! বল, সত্যি করে বল—আমি যদি তোমাকে বিবাহ করতে চাই—

ঊর্মিলা হাসি থামায়। অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে সেদিনের কথাগুলিই পুনরুক্তি করে—আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন চন্দ্রভানবাবু। এ সব কী বলছেন? আপনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ—

—সেটাই কি একমাত্র বাধা?

আবার হেসে ফেলে। হাসি ওর একটা রোগ। বলে—তা কেন? বাধা আরও কত আছে!

—আমার চেহারা কি তার মধ্যে একটা?

এতে হাসির কি আছে? আবার খিলখিলিয়ে হেসে ফেলে ঊর্মিলা, বলে—ষাট বালাই! কোন্ শত্তুর এমন কথা বলে? তাই তো অগস্ত্য-যাত্রার দিন এসে হাজির!

—তার মানে?

—আপনি এসেই বললেন, এই দেখ আমি পয়লা নম্বর কার্তিক!

—তুমি কি একটুও সিরিয়াস হতে পার না ঊর্মি?

—সিরিয়াস কথাটা যে আপনি বিশ্বাস করছেন না। আমার সঙ্গে একটি ছেলের বিয়ে স্থির হয়ে আছে।

—ফাদার শারদাঁ জানেন?

—কী পাগল আপনি! লুকিয়ে প্রেম করলে কি গুরুজনদের বলতে হয়?

এই প্রগল্‌ভা মেয়েটিকে কেমন করে বাগে আনবে বুঝে উঠতে পারে না চন্দ্রভান। ও অত্যন্ত মুখরা, লজ্জা-সরমের বিন্দুমাত্র নেই! কী নিলর্জ্জের মত বললে কথাটা! চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রভান।

—তবে আপনার একটা জিনিস আছে গর্ব করবার মত!

—কী?

—আপনার কান দুটো! এত বড় বড় খরগোশের মত কান আমি কোনও ছেলের দেখি নি।

চন্দ্রভানের ডান হাতটা নিজের অজ্ঞাতসারেই চলে যায় কানের দিকে। অমনি খিল্‌খিলিয়ে হাসির জলতরঙ্গে ভেঙে পড়ে ঊর্মিলা।

—আপনার প্রেমে না পড়লেও আপনার লম্বকর্ণ দুটির প্রেমে আমি সত্যিই পড়ে গেছি! আপনার কান দুটো আমাকে উপহার দেবেন?

চন্দ্রভান কি একটা জবাব দিতে চায় ; কিন্তু তার আগেই দেখে ন'পিসিও আসছেন কুয়োতলায় জল তুলতে।

কিন্তু রাজী হলেন না ফাদার শারদাঁ। বললেন—কেন আপনি ধর্মত্যাগ করিতে চান তাহা আমাকে বলুন। আমি তো মনে করি হিন্দু ধর্মেও মানুষ ঈশ্বরের কাছে যাইতে পারে।

চন্দ্রভান বললে—আপনিই বলেছেন, যত মত তত পথ!

—না, ঠাকুর বলিয়াছিলেন!

—বেশ, তাই না হয় হল ; কিন্তু কে কোন্ পথে যাবে তা তো সে-ই বেছে নেবে। হিন্দু ধর্মের পথে যদি ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়, তবে খ্রীষ্টান ধর্মের পথেও তা যাওয়া যাবে। আমি যদি তাই পছন্দ করি?

—কিন্তু আমি তো হিন্দু ধর্মের মর্মকথা বুঝিয়াও আপন ধর্ম বিসর্জন দিই নাই।

—তাতে কি হল? আমি যদি দিই, আপনার আপত্তি কোথায়? নাকি আপনি মনে করেন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ পাপ কাজ?

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ান। বুকের উপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকেন। তারপর অশান্তভাবে কয়েকবার পদচারণ করে ফিরে এসে বলেন—আপনি সত্য কথা বলুন—ধর্ম ত্যাগের সহিত পার্থিব কোন বাসনা কামনা জড়িত আছে কি?

মাথাটা নিচু হয়ে যায় চন্দ্রভানের, বলে—আছে! আপনি যদি অনুমতি করেন তবে

আমি ঊর্মিলা দেবীর পাণিগ্রহণ করতে চাই।

—আমিও এমত অনুমান করিয়াছিলাম। আপনি কি তাঁহার সম্মতি লাভ করিয়াছেন?

—না, তাঁর সম্মতি পাই নি এখনও। তবে আশা রাখি পাব। কিন্তু ঐ সঙ্গে এ কথাও আমি জানিয়ে রাখতে চাই ফাদার, আমার এ সিদ্ধান্ত তাঁর অনুমতিসাপেক্ষ নয়। ধর্মজীবনটা আমার নিজের, কর্মজীবনটাই অপরের অনুমতিসাপেক্ষ। তিনি শেষ পর্যন্ত আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে আমি মর্মাহত হব নিশ্চয়, কিন্তু তাতে আমার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত বদলাবে না।

আপনি প্রকৃত তত্ত্ববিজ্ঞানীর মত কথা বলিয়াছেন। কিন্তু একটা কথা—

সরল সাধক মানুষটি এবার যা বললেন তা রীতিমত সংসারাভিজ্ঞের মত। তাঁর বিচিত্র ভাষায় চন্দ্রভানকে বুঝিয়ে দিলেন—আইনতঃ তিনি মিস্ ঊর্মিলা শারদাঁর অভিভাবক নন। ঊর্মিলার বয়স যোলো বৎসর তিন মাস। সে সাবালিকা হবার পর অবশ্য তাকে পিতার অনুমতির অপেক্ষায় থাকতে হবে না। সুতরাং আগামী দু-বছর চন্দ্রভানকে অপেক্ষা করতেই হবে। দ্বিতীয়তঃ, চন্দ্রভান জমিদারের ছেলে। ধর্মান্তর গ্রহণ করলে সে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এ কথাটাও যেন সে ভেবে দেখে। তৃতীয়তঃ, গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করার আগে তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। উপার্জনক্ষম হতে হবে। জীবনে তার লক্ষ্য কী তা স্থির করতে হবে। চতুর্থতঃ, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হলে তাকে ঐ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পাদরির দ্বারস্থ হতে হবে। ফাদার শারদাঁ সে অধিকার থেকে বঞ্চিত।

চন্দ্রভান এবার দৃঢ়স্বরে বলে—ফাদার! আপনি যদি নিজে আমাকে ব্যাপটাইস্ না করেন তবে বুঝব খ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্মও আমাদের বার-ব্রত-তিথি-নক্ষত্রের বেড়াজালে আটকানো হিন্দুধর্মের মতই একটা পঙ্কিল ধর্ম! তাহলে আমি খ্রীষ্টান হতে চাই না!

বৃদ্ধ দুই হাত প্রসারিত করে বললেন—আপনি ক্ষান্ত হন। আপনি আমাকে গভীর সমস্যায় নিক্ষেপ করিয়াছেন। But you are downright correct! আপনি আমাকে একদিন সময় দিন। আমি বিবেচনা করি।

চন্দ্রভান অভিবাদন করে বেরিয়ে আসছিল। তাকে ফিরে ডাকলেন ফাদার শারদাঁ ; বললেন—আপনিও একটি দিন আপনার নিজের সহিত বোঝাপড়া করুন। দেখুন, এ আপনার অন্তরের নির্দেশ কিনা।

পুনরায় অভিবাদন করে বেরিয়ে এসেছিল চন্দ্রভান।

নিজের ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি।

—দাঁড়ান!

চন্দ্রভান মুখ তুলে দেখেছিল আজ ঊর্মিলাই দাঁড়িয়ে আছে তার পথরোধ করে। আজ আর সে ছলনাময়ী প্রগল্‌ভা মেয়েটি নয়। চন্দ্রভান বললে, কিছু বলবে?

—হ্যাঁ! কেন আপনি খ্রীষ্টান হচ্ছেন?

—আড়াল থেকে সবই শুনেছ আশা করি।

—শুনেছি। আপনি কিন্তু ভুল করছেন। এভাবে নিজেকে ঠকাবেন না। যীসাস্‌কেও ঠকাবেন না।

—কি বলতে চাইছ ঊর্মিলা?

—বলতে চাইছি, আপনি ধর্মের জন্য ধর্মত্যাগ করছেন না, করছেন—

—শেষ কর! তোমার জন্য! তাই নয়?

—কিন্তু আমাকে আপনি পাবেন না, এটা জেনে রাখুন!

—এ কথা তুমি আগেও বলেছ ঊর্মিলা। দুটো কথা আমি বলব। প্রথম কথা, যদি তোমার জন্যই আমি আজ ধর্মকে ত্যাগ করি, তাতে প্রমাণ হয় তোমাকে আমি কতটা ভালবাসি। দ্বিতীয় কথা, আমি বিশ্বাস করি প্রেম বিশ্বজয় করতে পারে—তুমি তো সামান্য একটা মেয়ে।

হাসির উৎস বুঝি ফুরিয়ে গেছে প্রগল্‌ভা মেয়েটির। হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলে—না, না, এ হবার নয়, বিশ্বাস করুন! পাগল! আপনি বদ্ধ পাগল!

ফাদার শারদাঁ শেষ সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিলেন। দীক্ষা দিলেন চন্দ্রভানকে। ওর ক্রিশ্চান নাম হল 'ভিন্সেন্ট'। গোটা নামটা মস্ত বড় হয়ে যাচ্ছে দেখে শারদাঁ বললেন, নাম হোক ভিন্সেন্ট চন্দ্র গর্গ। ব্যবস্থাটা ভাল লাগে নি চন্দ্রভানের। বলেছিল, ওর ভাইয়ের নাম সূরযভান, ভাইয়ের সঙ্গে যোগসূত্রটুকু ছাড়তে রাজী হল না। তাই ওর নতুন নাম হল—ভিন্সেন্ট ভান গর্গ!

ফাদার শারদাঁ শেষ সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিলেন, পারল না ঊর্মিলা।

চন্দ্রভান যেদিন দীক্ষা নিল সেইদিনই সে তড়িঘড়ি ফিরে গেল কলকাতায়।

ফাদার শারদাঁর যুক্তিটা মেনে নেয় ভিন্সেন্ট। ঊর্মিলাকে সময় দিতে হবে। শারদাঁ বলেছিলেন, এক্ষেত্রে যতদিন না ঊর্মিলা সাবালিকা হয় ততদিন ভান গর্গকে অন্তরালে সরে থাকতে হবে। ইতিমধ্যে সে যেন তার জীবনের লক্ষ্যটা ঠিক করে নেয়। ঈশ্বর ওকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। কী সে উদ্দেশ্য তা নিজেকেই বুঝে নিতে হয়, খুঁজে নিতে হয়।

ভিন্সেন্ট বললে, মানুষের বড় দুঃখ। আমি ঐ-সব দুঃখী মানুষদের সেবা করতে চাই। প্রকৃত সেবাব্রতী খ্রীষ্টানের মত। আপনার মত। আপনি আমাকে সুযোগ করে দিন শুধু। আমি খ্রীষ্টধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে চাই।

—এ অতি উত্তম প্রস্তাব ; কিন্তু প্রভু যীশুর ধর্ম প্রচার করিবার পূর্বে আপনাকে সে কার্যের উপযুক্ত হইতে হইবে।

ছবি আঁকার আগে জমি তৈরী করতে হয়। ফাদার শারদাঁ বসলেন ওকে নিয়ে সেই কাজে।

ঊর্মিলা কলকাতায় ফিরে এসেছে। চন্দ্রভান রাত থাকতে ওঠে। প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসে। বাইবেল, খ্রীষ্টধর্মের বিষয়ে নানান গ্রন্থ, সন্ত মার্ক লিখিত সুসমাচারে প্রভু যীশুর জীবনী, এমন কি মেরী বেকার এডি লিখিত 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্সে'র গ্রন্থ। খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস, রোমান ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে মার্টিন লুথারের মতবিরোধ, জার্মান-হল্যাণ্ড-স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান চার্চ-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ, প্রটেস্টান্ট ধর্মের জন্ম, চার্চ-অব-ইংল্যাণ্ডের আবির্ভাব, এবং তারপর আবার নূতন নূতন চিন্তাধারা—জর্জ এক্স-প্রবর্তিত সোসাইটি অফ ফ্রেণ্ডস বা কোয়েকারস। জন ওয়েসলে-প্রবর্তিত মেথডিস্‌ম্‌, নন্‌-কনফার্মিস্ট ফ্রি-চার্চগুলির বক্তব্য—সবই একে একে ধারাবাহিকভাবে মুখে মুখে শিখিয়ে গেলেন শিষ্যকে। বলেন, খ্রীষ্টধর্মের ভিতর যুগে যুগে অন্যায়-পাপ-সংকীর্ণতা-অবিচার প্রবেশ করেছে, আর যুগে যুগে উদারনৈতিক ধর্মপ্রচারকের দল সেই ক্লেদ দূরীভূত করে চার্চকে নিষ্কলুষ করে গেছেন। বলতেন, মনে রাখবেন, ধর্মের সবচেয়ে বড় কথা ক্যাথলিসিটি—উদারতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা। তাই প্রভু যীশুর বাণী প্রচার করতে হলে

আপনাকে জানতে হবে অপর ধর্মের কথাও। তাই শেখাতেন অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের জীবনী ও বাণী। গৌতম বুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্করদের কাহিনী শোনাতেন—ব্রাহ্মণ সন্তান চন্দ্রভান গর্গকে শেখালেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল তত্ত্ব—সাঙ্খ্য, বেদান্ত, উপনিষদের বক্তব্য। শোনালেন কোরাণের হজরত মহম্মদ ও আবু-বকরের সংগ্রামের ইতিকথা, কন্‌ফুশিয়াস আর লাও-সে প্রবর্তিত ধর্মের বাণী। আর সব শেষে বললেন,—আপনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঐ কথাটি কখনও ভুলবেন না—যত মত তত পথ!

চন্দ্রভান জিজ্ঞাসা করেছিল,—আমি যদি বাওয়ালীতে থেকেই কাজ করি, তাতে ক্ষতি কি?

কিন্তু এ ব্যবস্থাপনায় ফাদার শারদাঁ রাজী হতে পারেন নি। বলেন, এ-গ্রামে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কোন পরিকল্পনা তাঁর নেই। তিনি এখানে সম্পূর্ণ নূতনভাবে একটি পরীক্ষাকার্য করতে চান। তা-ছাড়া ঊর্মিলা প্রতি ছুটিতে বাওয়ালীতে আসে। চন্দ্রভান ওর দৃষ্টির অন্তরালে থাকুক, এটাই ফাদার শারদাঁর ইচ্ছা। বলেন,—আমি পনের বৎসর পূর্বে আসানসোলের নিকটে একটি কয়লাখনিতে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার করিতাম। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আসানসোল মেথডিস্ট চার্চের রেভারেণ্ড মার্লোকে একটি পরিচয়পত্র দিতে পারি। কয়লাখনির মানুষগুলি বড় দুঃস্থ, বড় অসহায়। ঈশ্বরের আশীর্বাদ তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজন।

চন্দ্রভান রাজী হয়ে যায়।

তার ক্যাম্বিসের ব্যাগ আর বিছানার বাণ্ডিলটা বগলে নিয়ে একদিন সে রওনা হয়ে পড়ে আসানসোলের উদ্দেশে। পাঠাশালার পড়ুয়ার দল সার দিয়ে দাঁড়াল ওকে বিদায় জানাতে। নপিসি রাধাগোবিন্দজীর প্রসাদী ফুলটা গুঁজে দিলেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকের বুক পকেটে; আর ভিন্সেন্ট ভান গর্গ তার ধর্মগুরুর কাছে বিদায় নিল তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে। রেভারেণ্ড অর শারদাঁ এতে বিসদৃশ কিছু দেখলেন না—চরণ দুটি সরিয়ে নিলেন না, বরং বলিরেখাঙ্কিত দুটি হাত ওর মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন।

আসানসোল মেথডিস্ট চার্চের প্রধান যাজক রেভারেণ্ড জোশেফ মার্লো পরিচয়পত্রখানি পড়ে খুশি হলেন। চন্দ্রভানকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন,—আপনাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করছি।

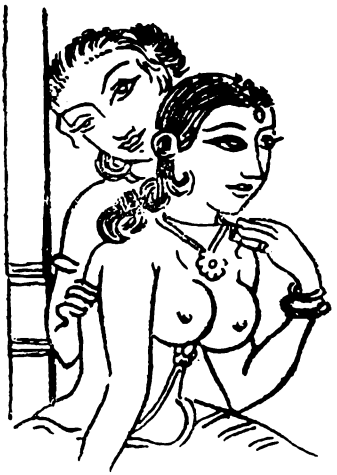

পাশেই বসেছিলেন তাঁর সহকারী ব্রাদার দাভিদ। তাঁকে বলেন, এ ভালই হল—জোড়-জাঙ্গাল কোলিয়ারিতে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার আজ পনের বছর ধরে বন্ধ আছে। ফাদার শারদাঁ ঐ কোলিয়ারি থেকে ফিরে আসার পর ওখানে কোনও কাজ হয় নি।

ব্রাদার দাভিদ ভিন্সেন্টকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন। জোড়-জাঙ্গাল কয়লাখনি একটি পাণ্ডববর্জিত দেশ। কেউ সেখানে ধর্মপ্রচারের ব্রত নিয়ে যেতে চায় না। কয়েক ঘর খ্রীষ্টান সেখানে আছে, একটি পরিত্যক্ত চার্চও আছে। আপাততঃ ঈভানজেলিস্ট হিসাবে সেখানে কাজ করতে যাবে ; ভিন্সেন্ট তার ; কাজে সন্তুষ্ট হলে পরে তাকে প্রীস্ট করে দেওয়া হবে।

চন্দ্রভান প্রশ্ন করেছিল,—ঈভানজেলিস্ট আর প্রীস্টের তফাত কি?

—এই দেখুন। তাও জানেন না আপনি! আপনাকে শিক্ষানবিশী হিসাবে দীর্ঘদিন ট্রেনিং নিতে হবে কাজ শিখতে হলে। হোমে ঈভানজেলিস্ট হিসাবে কাজ করতেও পরীক্ষায় পাস করতে হয়। অতটা কড়াকড়ি অবশ্য এখানে আমরা করি না। আপনি খ্রীষ্টান শ্রমজীবীদের সেবা করবেন, ধর্মপথে যাতে ওদের মতি হয় তা দেখবেন, প্রতি রবিবারে বাইবেল থেকে ওদের পড়ে শোনাবেন ও ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি প্রীস্ট নন, ঈভানজেলিস্ট মাত্র। তাই কারও কন্‌ফেশন আপনি শুনতে পারবেন না। সে প্রয়োজনে আমাদের খবর পাঠাবেন। আমি অথবা ব্রাদার দাভিদ আপনাকে সাহায্য করতে যাব।

—আমি থাকব কোথায়? খাব কী?

—সে আমাদের দায়িত্ব। ওখানে কয়েক ঘর খ্রীষ্টান আছেন। তাঁদের কারও বাড়িতে আপনার বাসাহারের ব্যবস্থা করে দেব। এ-ছাড়া মাসে মাসে আপনাকে নগদ পাঁচ টাকা পকেট অ্যালাউন্সও দেওয়া হবে।

চন্দ্রভান রাজী হল। যাত্রামুহূর্তে ফাদার মার্লো ওকে ডেকে বললেন,—একটা কথা মিস্টার গর্গ। মনে রাখবেন, ওখানকার শ্রমিকেরা মানুষ নয়। ক্রিশ্চিয়ান অর নো ক্রিশ্চিয়ান, দে আর অল হীদেন্‌স্!

চন্দ্রভান অবাক হয়ে যায়। বুঝতে পারে না। খ্রীষ্টান হলে আর কেমন করে মানুষে 'হীদেন' থাকতে পারে? ফাদার মার্লো বুঝিয়ে দিলেন,—ওরা প্রভু যীসাস, বোঙা মাঈ আর কুড়ুংতুল্লার মধ্যে কোন প্রভেদ বুঝতে পারে না। মা মেরীর পূজা দেয় মুরগী বলি দিয়ে। অল্‌-সেন্টস-ডে উদ্‌যাপন করে শুয়োর বলি দিয়ে, মাদল বাজিয়ে নাচ-গান করে,

আর হাঁড়িয়া খেয়ে! মানুষ নয় ওরা—পশু!

চন্দ্রভান বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে।

আজ ক'দিন হল চন্দ্রভান এসে উঠেছে জোড়-জাঙ্গাল কোলিয়ারিতে। জায়গাটা সত্যই পাণ্ডববর্জিত। আসানসোল থেকে প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ। এতটা পথ অবশ্য তাকে হেঁটে আসতে হয়নি। ফাদার মার্লো ওকে টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বরাকর স্টেশন থেকে হাঁটাপথে মাঠামাঠি পাড়ি দিয়েছে পাক্কা সাত মাইল। এক বগলে বিছানার বাণ্ডিল, অপর হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

এখানকার সবকিছুই অজানা, অচেনা। অবাক হতে হয় সব কিছুতেই। লাল কাঁকরে বন্ধ্যা মাটি—মাথা খুঁড়লেও কোদালের মাথায় মুঠভর মাটি ওঠে না, ঘাসের চাপড়া ঠেকে না। মাঝে মাঝে পাথুরে আউটক্রপ ; কিছু দূরে দূরে বিরাট গর্ত। মুরাম-মাটি উঠিয়ে নিয়ে গেছে শাহী-সড়কের পাড় বাঁধতে। বিরাট অজগরের মত শাহী সড়ক চলে গেছে পুব থেকে পশ্চিমে। লালে লাল। এই রাঙামাটির সমুদ্রের মাঝখানে নিকষকালো জোড়-জাঙ্গাল কয়লাকুঠি যেন পলাশফুলের মাঝখানে একটি কালো ভোমরা। এর চৌহদ্দির মধ্যে যদি একবার ঢুকে পড়, দেখবে তোমার রঙিন স্বপ্ন নিঃশেষে মুছে গেছে কয়লার কালিমায়।

একধারে কয়লাতোলার আয়োজন, কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া। বিরাট লোহার ফটক, তার সামনে গাদা বন্দুক হাতে পাহারা দেয় গুর্খা সেপাই। ত্রিসীমানায় গেলেই হাঁকাড় পাড়ে, —হুঁশিয়ার! কাঁটা তারের বাইরে মালকাটাদের বাস। বেশ কিছু দূরে সার দিয়ে বানানো হয়েছে তাদের কুলি-ধাওড়া। ওরা অন্তেবাসী, ওদের এলাকাটা স্বতন্ত্র। এ-পাশে খানকতক খাপরাটালির ঘর। কোম্পানির কর্মচারী বাবুদের আস্তানা। ওভারম্যান, হিসাববাবু, আমিনবাবু, টাইপবাবু, খাজাঞ্চিবাবুদের আস্তানা। ওঁরা ঐসব মালকাটা মজদুরদের জীবনযাত্রা থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে টিকে আছেন খাপরাটালির পাকাবাড়িতে। আবার এদের মহল্লা থেকে বেশ কিছুটা দূরে টিলার মাথায় দুটিমাত্র পাকাবাড়ি। বাগান ঘেরা সুন্দর ছিমছাম সাহেব-কুঠি। ওদিকপানে তোমার-আমার যাওয়া মানা। ত্রিসীমানায় কেউ গেলেই পেডিগ্রিওয়ালা বিলাতী কুকুর তারস্বরে প্রতিবাদ জানাবে। ও দুটি বাড়ির ছোটটিতে থাকেন অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার নাথানিয়াল সাহেব। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ—গোয়ানিজ ক্রিশ্চিয়ান। দশাসই চেহারার মধ্যবয়সী মানুষ। মোম দিয়ে পাকানো একজোড়া কাঁচা-পাকা গোঁফ। পরনে হাফপ্যান্ট, ঊর্ধ্বাঙ্গে খাকি সার্ট, হাতে ব্যাটন। সাহেব একাই থাকেন। মেমসাহেব ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাস করেন কলকাতায়। ও-বাড়িতে আছে কিছু মালি, পাচক, বেয়ারা, খিদমদগার। আর ছিল একটা ঘোড়া। সেটা মরে বেঁচেছে। সাহেব হিন্দি বলতে পারেন ভাঙাভাঙা। ফাদার মার্লোর চিঠিখিনি পড়ে খুশি হয়েছিলেন সাহেব। বলেছিলেন,—হামি অ্যারেঞ্জমেন্ট করিয়া ডিবে। আয়াম হ্যাপী দ্যাট য়ু হ্যাভ কাম টু ওয়ার্ক ফর দীজ হীদেন্‌স্ বাবু!

ভিন্সেন্টকে 'বাবু'ই বলেছিলেন। বঙ্গবাসী ঐ অষ্টাদশবর্ষীয় নেহাৎ চ্যাঙড়া মানুষটা যাতে খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বভ্রাতৃত্বের অজুহাতে বেশি ঘনিষ্ঠ না হতে পারে তাই প্রথম থেকেই তিনি সজাগ হলেন।

খোদ ম্যানেজারসাহেবের বাঙ্‌লোটি তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সে বাড়িটা আরও বড়, আরও ভাল, আরও সাজানো-গোছানো। ম্যানেজারসাহেব খাঁটি ইংরাজ—রাজার

জাত। বর্তমানে ছুটিতে। হোমে। তাই গোয়ানিজ নাথানিয়ালই এখন এ-অঞ্চলের হর্তা-কর্তা এবং বিধাতা। কোম্পানির একমাত্র প্রতিভূ। তাঁর একান্তসচিবকে ডেকে তিনি বলে দিলেন চন্দ্রভানের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে। তা ভালই ব্যবস্থা হয়েছে। কয়লাকুঠিতে ভদ্দরলোকদের ভিতর একমাত্র খোদ নাথানিয়ালই খ্রীষ্টান। বাবুদের মধ্যে আর কেউ খ্রীষ্টান নেই। সব হীদেন! কুলি-ধাওড়ায় যারা বাস করে—বাগদি, সাঁওতাল, মুণ্ডা, গোণ্ড, ভুঁইহার ওদের ভিতর অনেকেই এককালে সদ্ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল, পনের-বিশ বছর আগে। তখন তারা উপাসনাও করত, বড়দিনও করত, প্রতিদিন আহারে বসে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করত, গীর্জায় সমবেত হত প্রতি রবিবার সকালে, হাটে যাবার পথে। তারপর পাদরি সাহেব চলে গেলেন, ওরাও সে-সব কথা ভুলে মেরে দিল। গীর্জাটা উপেক্ষিত হয়ে পড়ে আছে এক যুগ। জানালার পাল্লাগুলো খুলে গেছে, ফাটল দেখা দিয়েছে পাকা-ইটের-দেওয়ালে, বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে সেখানে, কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নি। বছরে বছরে রৌদ্র-বৃষ্টিতে তারা দিব্যি বেড়ে উঠেছে। দু-চারটে শেয়াল ছাড়া ওদিকে বড় কেউ যায় না। গীর্জার দরজার চালাটায় মরচে ধরে গেছে। কুলি-ধাওড়ার কয়েকটি পরিবার যে খ্রীষ্টান তা শুধু বোঝা যায় তাদের নামগুলি শুনে। যোসেফ মুর্মু, ডেভিড মাহাতো, কিংবা ঈশাক রুহিদাস। ওরা বোঙামায়ের পূজা চড়ায়, বাবা কুড়ুংতুল্লার কাছে শুয়োর বলি দেয়, দোলের দিনে আবীর মাখে। তবু বড়দিনের উৎসবে পরধান যখন বোঙামায়ের নামে জোড়া কুঁকড়া বলি দিয়ে বোঙামায়ের জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে তখন প্রৌঢ় যোসেফ মুর্মু নিমীলিত নেত্রে সায় দেয়,—'আমিন'! বুকের উপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে বোঙামায়ের পূজা সমাপ্ত করে।

অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার নাথানিয়াল সাহেব তাঁর বিচিত্রভাষায় বলেছিলেন,—বাবু, এই জানোয়ারগুলোকে তুমি মানুষ কর। দে আর অল হীদেন নিগারস্!

চন্দ্রভান সেই ব্রত গ্রহণ করেই এসেছে। সে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

কুলি-ধাওড়ায় তার পক্ষে থাকা চলে না। আবার বাবুদের কারও ডেরায় খ্রীষ্টানের ঠাঁই হবে না। তাই ম্যানেজার ওর আশ্রয়ের বব্যস্থা করলেন নিজ আস্তাবলে। আস্তাবল পবিত্র স্থান। দু-হাজার বছর আগে অমন এক স্থানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সদ্ধর্মের আদি পুরুষ। সাহেবের ঘোড়াটি মারা গেছে। অভাগা তিনি নন, সাহেব সম্প্রতি একটি হাওয়া গাড়ি কিনেছেন। কলের গাড়ি। ঘোড়া নেই, সহিস নেই, কোচম্যান নেই—সাহেব চাকা ঘোরান আর পাঁই পাঁই করে ছোটে কলের গাড়ি। আধঘন্টায় বরাকর, একঘন্টায় আসানসোল। অবাক গাড়ি। নাম মটোর!

তাই ঐ আস্তাবলেই আশ্রয় পাওয়া গেল। সাহেবের নির্দেশ এল বাবুইঘাসে বোনা দড়ির খাটিয়া। এনে দিল লন্ঠন। বরাদ্দ হল কেরোসিনের। মায় সাহেব নিজের বাতিল করা একখানা টেবিল আর চেয়ারও পাঠিয়ে দিলেন। পাকা ঘর, পাকা মেঝে, মাথার উপর রাণীগঞ্জ টালির পাকা ছাদ। এ তো স্বর্গ! ঘোড়ার জল খাওয়ার বিরাট পাত্রটা ওর স্নানের চৌবাচ্চা। সাহেবের মালি সেটা ধুয়ে-মুছে সাফা করে জলে ভরে দিল।

আহারের আয়োজন অবশ্য বাবুদের কোয়ার্টার্সে। এখানে নয়। সে ব্যবস্থাও হল। তিন নম্বর পিটের মেট-মুন্সি পাঁচু হালদারের বাড়ি দু-বেলা দু-মুঠো খেয়ে আসতে হবে। পাঁচু মেট-মুন্সি বাবু-শ্রেণীর লোক নয়। কুলির সর্দার। কয়লা-কুঠির আইন-মোতাবেক তার থাকার কথা কুলি-ধাওড়ায়। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে বলেই না আইনটাকে আইন বলে মানি? আর দুটি পিটের মেট-মুন্সির যে সৌভাগ্য হয় নি, পাঁচুর তা হয়েছিল। সে

ভদ্রসন্তান। অন্যান্য মেট মুন্সিদের মত সে টিপছাপ দেয় না। রীতিমত সই করে মাইনে নেয়। বাঙলায় নয়, ইংরাজী সই। লেখাপড়া-জানা মানুষ। অনেক দিন থেকে আছে এখানে। কোন্ সুদূর অতীতে ঐ লেখাপড়া-জানা মানুষটা একদিন এসেছিল মালকাটা-কুলি হিসাবে নাম লেখাতে। মালকাটা হতে হয় নি তাকে—সে চাকরি শুরু করে গিন্তিদার হিসাবে। ক'টা টব কোন্ গ্যাং ভর্তি করল তার গুন্তি রাখত। তা গঙ্গার ঢেউ গুণেও বুদ্ধিমান মানুষ টাকা কামায়, আর এ তো কালো হীরে। পঞ্চানন দু-হাত্তা কামিয়েছে সে আমলে। লোকটা সকলের উপকার করে, সকলের ফাই-ফরমাস খাটে। সকলের প্রিয়। মায় সামান্য গিন্তিদারটা খোদ ম্যানেজারের পর্যন্ত নজরে পড়ে যায়। কর্তৃপক্ষ এই কাজের মানুষটাকে না পারে রাখতে, না পারে তাড়াতে। শেষমেষ বাধ্য হয়ে ওকে প্রমোশন দিয়ে দেওয়া হল। গিন্তিদার থেকে মেট-মুন্সি। আর তোমাকে টব গুণতে হবে না বাবা, এবার রেহাই দাও। বরং কুলি খাটাও এবার। পঞ্চানন তাতেও খুশি। টবের বদলে এখন মানুষ গোনে—রোজগার তার ঠিক আছে। সব দেবতার থানেই সেলাম বাজিয়ে চলে। সকলকেই খুশি রাখে। তাই ওর ক্ষেত্রে এ ব্যতিক্রমটা সম্ভবপর হয়েছে। মেট-মুন্সি টালির কোয়ার্টার্স পেয়েছে। আছে বাবুপাড়ায়।

বেঁটে-খাটো মোটা মানুষ। কদমছাঁট কাঁচা-পাকা চুল, চোখ দুটো ছোট ছোট। ধূর্ত সন্ধানী দৃষ্টি। মুখটা সূচালো—দেখলে কি জানি কেন মূষিকের কথা মনে পড়ে যায়। নাকে রসকলি, গলায় কণ্ঠী। পঞ্চানন ধর্মে বৈষ্ণব। ছেলেপুলে নেই। মালাচন্দন হয়েছিল যে ভাগ্যবতীর সঙ্গে, তিনি বাঁজা খাঁজা মানুষ। সেদিক থেকে নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। কিন্তু সব সুখ কি ভগবান কারও কপালে লেখেন দরাজ হাতে? বৈষ্ণবী চিররুগ্না। সারাক্ষণ তার মাথা ঘুরছে, খক্ খক্ করে কাশছে, আর থুথু ফেলছে। শুয়েই থাকে দিনমান। তবে সংসারটা দেখে কে? দেখে ওর দূর সম্পর্কের বোনঝি, ছ্যাতরা। বাপ-মা মরা অভাগীটাকে নিয়ে এসেছে আজ বছর কয়েক। সে রয়ে গেছে এ সংসারে। দিবারাত্র কাজ করে যায় মুখ বুজে। জুতো সেলাই আর চণ্ডীপাঠ ছাড়া বাদবাকি সব কাজ করে যায়। পাচক, ঝি, মালি ও ধোপানি। প্রথম দিন চন্দ্রভান ভেবেছিল ঐ ছ্যাতরা বুঝি হালদারমশায়ের মেয়ে। ও আপন মনে ভেবেছিল দেশে এত পাখি থাকতে পাঁচুবাবু ছাতারে পাখিকে এতটা প্রাধান্য দিলেন কেন? পাপিয়া, মুনিয়া, টুনটুনি, বুলবুল, টিয়া, ময়না কি দোষ করল? মেয়েটি যখন পঞ্চাননকে 'মামা' বলে ডাকল তখন চন্দ্রভান বুঝতে পারে ছ্যাতরা ওর মেয়ে নয়, নামকরণটা পাঁচুবাবু করেন নি। তা এই পাঁচুবাবুর সংসারেই ওর আহারের আয়োজন।

কাজ শুরু করেছে চন্দ্রভান। সাহায্য পাচ্ছে আশাতীতভাবে। প্রথম কাজ হচ্ছে গীর্জাটা সাফা করে ফেলা। সেটা পরিদর্শন করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। দশ-বিশজন মানুষ ইতিমধ্যে লেগে গেছে সেটা সাফা করতে। কোদাল চালিয়ে আশপাশের ফণিমনসা, আশশ্যাওড়া আর বনতুলসীর জঙ্গল সাফা করে ফেলেছে ; ভাঙা ইটের স্তূপ সরিয়ে ফেলেছে ; উইয়ের ঢিবি নির্মূল করে ফেলেছে। এখন উপড়ে ফেলা হচ্ছে দেওয়ালের ফাটল-বেয়ে গজিয়ে ওঠা অশ্বত্থের চারা। চন্দ্রভান খুশিয়াল হয়ে ওঠে ওদের উৎসাহ দেখে। বলে,— কী মুর্মু, তোমরা যে একদিনেই এটার চেহারা পালটে দিলে?

যোসেফ মর্মু কোদালটা নামিয়ে রেখে সেলাম করে। একগাল হেসে বলে,—হাঁ আজ্ঞা। আজ আমরা ক'জন কেউ খাদে নামি নাই। ওভারম্যান সা'ব বললেন—যা

তুরা, হুই গীরজা ঘরটো সাফা করি দে—হাজিরা মিলবে লগদালগদ!

ও, তাহলে ওরা ধর্মের টানে আসে নি। তা হোক, ওদের না থাক, কর্তৃপক্ষের ধর্মজ্ঞান আছে। চন্দ্রভানও লেগে যায় ওদের সঙ্গে কাজ করতে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে জায়গাটা বেশ সাফ্-সুতরো হয়ে ওঠে। একটা সাপ মারা পড়ল। দুটো শেয়াল ছুটে পালাল। প্রভু যীশুর পরিত্যক্ত মন্দির আবার ভদ্র রূপ ফিরে পেল। আগামী রবিবার থেকে সে উপাসনা শুরু করবে এখানে।

গীর্জাটা সুন্দর। লম্বাটে ধরনের। তা শ' দুয়েক লোক একসঙ্গে বসতে পারে। মাঝখানের নেভ-অংশটা অপেক্ষাকৃত উঁচু—রাণীগঞ্জ টালির দোচালা। দু-পাশে দুটি লিন-টু একচালা 'আইল'। কয়েকটা ধাপ বেয়ে উঠে আসতে হয় স্যাঙচুয়ারিতে। কয়ার স্টলটা ভেঙে গেছে। রুডলফ্‌টাও অক্ষত নেই। তার উপর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তিটা কিন্তু অক্ষত! অল্টার পীসের কাছে তিনভাঁজওয়ালা একটা কাঠের Teiptych। কাঠের ব্যাটেন, কাঠের প্যানেল—তাতে তেলরঙের ছবি ; পনের-বিশ বছরেও একেবারে মুছে যায় নি। সম্ভবত ফাদার শারদাঁর হাতের কাজ। এ-পাশে 'অ্যানান্‌সিয়েশান', ওপাশে 'ডিসেন্ট-ফ্রম-দ্য-ক্রশ' আর মাঝখানে 'দ্য হোলি ফ্যামিলি'। চন্দ্রভান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সেই শিল্পকর্ম। রুডের দু-পাশে আরও দুটি ফ্রেস্‌কো—মাতা মেরি এবং সেন্ট জন দি ঈভানজেলিস্ট। ছাদের উপর ফিনিয়াল আর ব্যাট্‌ল্‌মেন্টগুলি ভেঙে গেছে এখানে-ওখানে। ও আর মেরামত করানো যাবে না, তবে মাঝখানের মূল ক্রুশকাঠটা সারাতে হবে। চন্দ্রভান তার চার্চের প্রেমে পড়ে গেল প্রথম দর্শনেই।

কুলি-ধাওড়ার অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে, ভাব জমেছে। ওরা ওর একটা অদ্ভুত নামকরণ করেছে—ফাদারদা! চন্দ্রভান বারে বারে প্রতিবাদ করে বোঝাবার চেষ্টা করেছে—সে পাদ্রী নয়, ফাদার নয়। কিন্তু ওরা শোনে নি। আগে যে দাড়িআলা সাহেব এখানে থাকতেন তাঁকে ওরা বলত ফাদার। তা তাঁর বয়স হয়েছিল। চন্দ্রভান নেহাৎ নাবালক। বেশ তো, ফাদার যদি না হতে চায়, না-ই হল—দাদা হতে তার আপত্তি কিসের? ওদের কুলি-ধাওড়াতেও গিয়েছে চন্দ্রভান। ধাওড়া তো নয়, শুয়োরের খোঁয়াড়। পাশাপাশি গাদাগাদি করে বানানো ছাপড়া—নরক। এক পশলা বৃষ্টি হলে শুধু ছাদ দিয়ে নয়, মেজে ফুঁড়েও জল আসে। একেবারে নন্দোৎসব। তবে ভরসা এটুকু যে, বর্ষার জল এখানে দাঁড়ায় না। বৃষ্টি থামলেই গেরুয়া রঙের জলের স্রোত হুড় হুড় করে ছুটে চলে নামালের দিকে, সিঙারণ নদীর দিকে—সেখান থেকে শেষমেষ তিন মাইল দূরের দামোদরে।

চোরে কামারে দেখা হয় না। ভোর না হতেই মেট-মুন্সি পঞ্চানন তার ধড়াচূড়ো পরে বেরিয়ে যায়। খাকি হাফপ্যান্ট, ফিতে বাঁধা কোম্পানির দেওয়া জুতো, মাথায় টুপী। সূর্যোদয়ের আগেই নামে খাদে। দুপুরে তার খাবার নিয়ে যায় কোন কামিন। পঞ্চানন ফিরে আসে সন্ধ্যার পর। চন্দ্রভান যখন দুপুরবেলায় খেতে আসে তখন বাড়ির মালিক পাতালরাজ্যে। এক প্রহর রাতে আবার যখন আসে নৈশ আহারের সন্ধানে, পাঁচুবাবু তখন বারাঙ্গনা পাড়ার স্বর্গে। মর্ত্যের সঙ্গে পঞ্চাননের সম্পর্কটা সামান্যই—রাত দশটা থেকে ভোর রাততক। তখন মড়ার মত ঘুমায় মানুষটা। সূর্যদেবের সঙ্গে তার মোলাকাত হয় হপ্তায় একদিন—ঐ রবিবার। অচেনা এই খেষ্টান ছোঁড়াটাকে দু-বেলা দুটো খেতে দেবার এ উট্‌কো ঝামেলা ঘাড়ে নিত না পাঁচু—নিয়েছে দুটি কারণে। এক নম্বর, নাথানিয়াল সাহেবকে খুশি করতে। সাহেব নিজে তাকে ডেকে অনুরোধ

করেছিলেন। আর দু নম্বর, ওর খোরাকিবাবদ অনেকগুলি মুদ্রা সে আদায় করবে কায়দা করে। কি খাওয়াচ্ছে, কতটা খাওয়াচ্ছে তা আর নিক্তি ধরে কে ওজন বুঝে নেবে?

আপত্তি করেছিল আন্নাকালি। বলেছিল—ঘরে তোমার সোমত্ত মেয়ে, আমি দেখ্‌ভাল করনে লারি, এমন একটা উট্‌কো জোয়ান মানুষ—

মুখ ভেঙচে জবাব দিয়েছিল পাঁচু,—আরে থও বাপু! চ্যাতরা তো আর চিরটাকাল দাঁড়ে বসে থাকবে না? ও এমনিতেই একদিন উড়বে। ওড়ে উড়ুক! ভাগ্‌নির বে দিল না বলে কেউ তো আর দুষবে না!

চন্দ্রভান অবশ্য স্বকর্ণে এ আলাপচারি শোনে নি।

রোজ সে এসে বসে বাইরের দাওয়ায়। চ্যাতরা কলাই করা থালায় ভাত বেড়ে নিয়ে আসে। ভাতের মধ্যেই মুরাম-পিটের গর্তের মত ছিদ্র করে ঢেলে দেয় দু-হাতা ডাল। সঙ্গে থাকে ধোঁধল কিংবা মেটে-আলুর তরকারি, কখনও বা পুঁইয়ের ডাঁটা, মুখি-কচুর তরকারি, কিংবা কুমড়ো সিদ্ধ। চন্দ্রভান মুখ নিচু করে খেয়ে যায় লাল চালের ভাত। মুখ তুলে পরিবেশনকারিণীকে দেখে নি কোনদিন। আহারান্তে পাতকুয়োর জলে মুখ-হাত ধুয়ে নেয়। এঁটো থালাটা মেজে রোয়াকের ওপরে কাত করে রেখে দেয়। হাত দিয়ে এঁটো জায়গাটা মুছেও নেয়। খ্রীষ্টানের সক্‌ড়ি না হলে ফেলবে কে?

একদিন মেয়েটি নিজে থেকেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল,—আপনার ভাতে কম পড়ে না তো?

—উঁ?—মুখ তুলে তাকায় চন্দ্রভান।

বছর পনের-ষোলো বয়স। একটু বাড়ন্ত গড়ন। একমাথা কোঁকড়ানো চুল, পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে। গায়ের রঙটি কালো। তা কালো হোক—মেয়েটি সুশ্রী। নাকটা টিকালো, চিবুকটা নিখুঁত। বন্য হরিণীর মত কাজলকালো দুটি চোখের দৃষ্টি।

—না, কম পড়ে না। আমি অল্পই খাই।

—মাছ-মাংস হয় না আমাদের বাড়িতে। আপনার নিশ্চয় খুব অসুবিধা হয়।

পঞ্চানন বৈষ্ণব বলে কি এ বাড়িতে মাছ আসে না? কর্তার নাম শৈব, গিন্নির নাম শাক্ত, যত গোঁসাইগিরি কি কেবল খাওয়ার পাতে? না কি এটা ওর মিতব্যয়িতার আয়োজনে? জমিদারের বাড়ির আদুরে গোপাল এককালে আমিষ ছাড়া এক গরাস ভাত মুখে দিতে পারত না। চন্দ্রভান মাথা নেড়ে বললে,—পেট ভরানো নিয়ে কথা।

মেয়েটি কী কথা বলতে গিয়েও বলল না। চন্দ্রভান বলে,—এতদিন আসছি, কিন্তু আপনার ভাল নামটাই জানি না।

মেয়েটি মুখ টিপে হাসে। হাসলে ওর গালে দিব্যি টোল পড়ে তো! বললে, —ভাল নাম জানেন না, অর্থাৎ খারাপ নামটা জানেন। সেটা কী?

—আপনার মামীমা সেদিন আপনাকে ছ্যাতরা বলে ডাকছিলেন মনে হল।

—হ্যাঁ, ঐটাই আমার নাম। ছ্যাতরা নয়, চ্যাতরা।

—ভাল নাম নিশ্চয় একটা আছে! সেটা কী?

—এককালে আমার নাম ছিল চিত্রলেখা। এখন সেটা নিজেই ভুলে গেছি।

তখনও চন্দ্রভান মেয়েটির গোটা ইতিহাসটা জানত না। চিত্রলেখা—চিত্রা—চ্যাতরায় কিভাবে রূপান্তরিত হল। সেটা জেনেছিল অনেক পরে। চিত্রলেখার বাবা ছিলেন স্কুলমাস্টার। মেয়েকে রীতিমত স্কুলে পড়িয়ে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তিনি। দুর্ঘটনাটা না ঘটলে এ বছর সে এন্‌ট্রাস পরীক্ষা দিত। ঐ দুর্ঘটনাটাই চিত্রলেখাকে চ্যাতরা

করেছে। দামোদরের বন্যায় এক রাত্রে ভেসে গিয়েছিল ওর বাপ-মা, ছোটভাই। ও যে কেমন করে বেঁচে গেল তা সে আজও ভেবে পায় না। মেয়েটি বললে,—আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন।

—তা ডাকব, তবে চ্যাতরা নয়, চিত্রলেখা বলে ডাকব।

—আমি কি বলে ডাকব আপনাকে?

—আমার নাম শ্রী—

হঠাৎ থেমে পড়ে চন্দ্রভান। এখনও শ্রী? আশৈশবের অভ্যাসবশে পৈতৃক নামটাই বলতে যাচ্ছিল, ভুলে গিয়েছিল তার নামের বি-শ্রী পরিবর্তনের কথা। কিন্তু কথাটা তাকে শেষ করতে হল না। চিত্রলেখা বলে ওঠে,—আপনার নাম আমি জানি। আমিও কিন্তু সে নামে ডাকব না। আমি ঐ মালকাটাদের দেওয়া নামেই ডাকব আপনাকে—ফাদারদা।

চন্দ্রভান দৃঢ় আপত্তি জানায়। বলে,—ওরা অশিক্ষিত মানুষ ; কিন্তু আপনি কেন এ ভুল করবেন? আমি পাদ্রী নই, ফাদার নই। তাছাড়া 'ফাদার' হলে কেউ 'দাদা' হতে পারে?

চিত্রলেখা খিল খিল করে হেসে ওঠে ওর অসহায় ভঙ্গি দেখে।

—চ্যাতরা! ওর খাওয়া হয়েছে? অত হাসি কিসের বাপু? কালই তোর মামাকে বলব—এসব—ছেনালিপনা চলবেনি আমার বাড়িতে।

চিত্রলেখা তাড়াতাড়ি ঢুকে যায় ভিতরে। চন্দ্রভানও মরমে মরে যায়।

সান্ধ্য আড্ডাটা বসেছিল ইয়াকুব মিঞার ভাঁটিখানার সামনে। পৌষ মাস পড়েছে। অথচ এখনও শীতটা তেমন জাঁকিয়ে নামে নি। তা হলেও খোলা মাঠের মাঝখানে সন্ধ্যার পর থেকে হিমেল হাওয়ায় একটা কাঁপুনি ধরে। খাদের নিচে সারাটা দিনমান উলঙ্গ মানুষগুলো উত্তাপে ঝলসাতে থাকে, দরদর করে ঘাম ঝরে তখন ; তারপর খাদ-ভস্কার খাঁচা বেয়ে সাঁই সাঁই করে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে হঠাৎ হিমেল সন্ধ্যার মর্ত্যলোকে উঠে এলে কার না হাড়ে কাঁপন জাগে? সারাটা দিন ওরা যে সর্বাঙ্গে রেণু রেণু কয়লার পাউডার মেখেছে এখন কি ঠাণ্ডা জলে তাই ধুতে বসবে? ক্ষেপেছ? কয়লার আস্তর—ও তো অঙ্গের ভূষণ! কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত ছয়-সাত বছর বয়সে ঐ ভূষণ অঙ্গে চড়ে, নামে চিতায় চড়লে। ভিখু বলে—সাবুন কি হে, গাঁইতা চালালেও এ শালার কয়লা গা থিকে ছাড়বেনি! ওরা বড় জোর হাত দুটি ধুয়ে ফেলে, ভিজে হাতটা বুলিয়ে নেয় মুখে-চোখে। তা সেদিন সাঁঝ-বেলায় ঐ রকম কালিমাখা একসার মানুষ বসেছিল ইয়াকুবের ভাঁটিখানার সামনে। আগুনের চারপাশ ঘিরে।

শাল আর অর্জুন গাছে ছাওয়া নিরালা পরিবেশ। বস্তী থেকে কিছুটা দূরে, নামালের দিকে। সিঙারণের খাদের ধারে ইয়াকুব মিঞার চোলাই মদের ভাঁটিখানা। পাশেই একটা তেলেভাজার দোকান। সাত-বাসি-ছোলা-ভাজা, কলাই-সিদ্ধ, প্যাঁজি, ফুলুরি সাজানো আছে একটা কাঠের বারকোশে। নগদ পয়সা ফেললেই শালপাতার ঠোঙায় চাঁট হিসেবে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাবেলাটা ইয়াকুবের মরবার সময় নেই। মাটির ভাঁড়ে ক্রমাগত সরবরাহ করে যেতে হয় অমৃতরস—পচাই, ধেনো, মহুয়ারস, কালিমার্কা।—আজও ওরা গুটি গুটি এসে বসেছে। তিন নম্বরের ভিখন, বুধন, যোসেফ, ঈশাক।

আন্টুনির বেশ নেশা হয়েছে। মাথাটা দোলাচ্ছে, আর আপন মনে বিড়বিড় করে কি বকে চলেছে। এসেছে ওভারম্যান এককড়ি সরখেল। মালকাটার দলে মিশে মদের আসর জমাতে তার আপত্তি নেই। ওর পদমর্যাদার স্বাতন্ত্র্যবোধটা বোধহয় পাতাল-রাজ্যের অতলেই সীমাবদ্ধ—উপরের এই নীল আকাশের নিচে মালকাটার যে দুঃখ, ওভারম্যানের তাই। একহারা মানুষ, মজবুত গড়ন। কিন্তু ভিতরটা বিলকুল ফোঁপড়া। হবে না? পাতালরাজ্যেই যে সে বিকিয়ে দিয়ে এসেছে জীবনের শেষ শক্তিটুকু। ন'বছর বয়সে ঢুকেছিল ওখানে, এখন ওর বয়স বেয়াল্লিশ। মালকাটা থেকে ধাপে ধাপে উঠে এসে আজ হয়েছে ওভারম্যান। ইয়াসিন মিঞা ওর জন্যে একখানা থান ইট বাড়িয়ে দিয়েছে। সেটাতেই জাঁকিয়ে বসেছে এককড়ি। মুখে বিড়ি, হাতে ধেনো।

—আরে ফাদারদা যে? কুথা চলিছেন গ ইদিক পানে?

চন্দ্রভান এগিয়ে আসে। বলে,—ধাওড়ায় গিয়েছিলাম যোসেফ, তোমাদের খোঁজে। তা দেখলাম তোমরা কেউ নেই। তোমার স্ত্রী বললেন,—সাঁঝের বেলা মরদরা কি আর ঘরে থাকে? দেখেন তালাশ করে ইয়াকুবের উখানে ; সিখানে না দেখতি পেলি—

সঙ্কোচে থেমে পড়ে চন্দ্রভান।

ঠা ঠা করে হাসল যোসেফ। বললে,—বাতটো খতম করেন কেনে ফাদারদা? সে মাগী বলে নাই—সিখানে না দেখতি পেলি ছুক্‌রি পাড়ায় তালাশ লিবেন?

ঐ রকমই একটা বক্র ইঙ্গিত করেছিল বটে যোসেফ মুর্মুর ধর্মপত্নী। ইয়াকুব একটা বাবুই ঘাসে বোনা জলচৌকি বাড়িয়ে দেয়। চন্দ্রভান বসে।

যোসেফের নেশা হয় নি। ক-পাঁট গিলেছে তার হিসেব নেই। নেশা আজকাল ওর হয় না। ইয়াকুব বড় জল মেশাচ্ছে ইদানীং। না হলে তিন ভাঁড় কালিমার্কায় নেশা লাগে না? বলে,—না ফাদারদা, যোসেফরে ও-পাড়ায় পাবেননি। দিন ভোর গাঁইতা হাতে লড়াই করি, সাঁঝের বেলা ইয়াকুব-দোস্তের অমর্ত খাই আর রাতভোর পড়ি থাকি কিষ্টোর মায়েরে আঁকড়ে। ব্যস্! বে-লাইনে যোসেফরে দেখবেননি কখনও।

হা-হা করে ঠারে ঠারে হেসে ওঠে কয়লা-কালো ভূতটা। কিষ্টো হচ্ছে যোসেফ-তনয়। 'কৃষ্ণ' নয়, কিষ্টোফার-এর অপভ্রংশ!

মাতাল আন্টুনি মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয়,—হ'ক কথা, ল্যায্য কথা! যোসেফ ভাই-রে বে-লাইনে পাবেন লাই। ও-শালা ধাম্মিক! মরলে ও-শালা সগ্‌গে যাবে!

—অ্যাইও!—চিৎকার করে ওঠে যোসেফ মুর্মু। বলে,—খবদ্দার আন্টুনি! মরণ কাঁড়বি না কিন্তুক! মরণ কেনে রে? মরণ অত সোজা, লয়?

মৃত্যুর কথায় যোসেফের ঘোর আপত্তি। মৃত্যুকে সে মানে না। তামাম কুলি-ধাওড়ায় সে বয়ঃজ্যেষ্ঠ। উনিশ'শ সাত সালের কয়লাকুঠি। মেয়ে-মদ্দ বুড়ো-বাচ্ছা সবাই নামে খাদে। বয়সের বাধা নেই। মেয়ে-পুরুষে ফারাক নেই। আট-ন' বছর বয়স হলেই শুরু হাতে-কালি। কি মেয়ে, কি মদ্দ। অবশ্য বুড়ো মানুষ তুমি দেখবে না কয়লাকুঠির ত্রিসীমানায়। ঐ শিশু বয়স থেকেই কয়লার রেণু পাকাপাকিভাবে বাসা বাঁধে ওদের ফুসফুসে। বিশ-বাইশ-পঁচিশ—যতদিন তাগদ আছে লড়ে যাও। মাদল বাজাও, পচাই খাও, নাচো গাও ফুর্তি কর। তারপর? শুরু হয় খুক্ খুক্ কাশি, ঘুস্ ঘুস্ জ্বর, হাপরের মত বুকটা ওঠে নামে। কফের সঙ্গে দু-এক ফোঁটা রক্তের ছিটে। ব্যস! তারপর হাজরির খাতায় একটা লম্বা ঢেরা। আসে একটা নতুন মানুষ, উঠতি জোয়ান—নাম লেখায় খাতায়। বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে লাগায় প্রথম কালির ছোপ। কালিমালিপ্ত

জীবনের প্রথম হাতে-কালি। খাজাঞ্চিবাবু খুশি হয়। নয়া ভর্তি মানেই কিঞ্চিৎ নগদ নজরানা। বাঁধা ব্যবস্থা। এভাবেই জোড়-জাঙ্গাল কয়লাকুঠি জাবর কেটে চলেছে চিরটাকাল। এখানে এলে খনা বোধহয় নতুন করে হিসাব কষতেন—'নরাগজা'র হিসাবটা পালটে লিখতেন—মালকাটার বয়সের ঊর্ধ্বসীমা হচ্ছে দু-কুড়ি। এ-হেন কয়লাকুঠি আইনের মূর্তিমান প্রতিবাদ—যোসেফ মুর্মু। কালো কষ্টিপাথরে কোঁদা মানুষটা আড়াই-কুড়ি পাড়ি দিয়েছে। একটা পা একবার জখম হয়েছে কয়লার চাঙড় ভেঙে পড়ায়; একটু খুঁড়িয়ে চলে তাই। কপালে প্রকাণ্ড একটা কাটা দাগ। খাদভস্‌কার খাঁচার পাটাতন খুলে একবার সাতজন মালাকাটর সঙ্গে আছড়ে পড়েছিল পিটের চাতালে। একমাত্র সে-ই বেঁচে ফিরেছিল। মৃত্যুকে তাই জয় করেছে মুর্মু। খাদের দৈত্যটা নানান অস্ত্র নিয়ে বারে বারে আক্রমণ করেছে তাকে—আগুনের বেড়াজালে আটকাতে চেয়েছে, বিষাক্ত গ্যাসে বধ করতে চেয়েছে, কয়লার চাঙড়ে সমাধিস্তূপ রচনা করতে চেয়েছে—কিন্তু হার মানে নি যোসেফ মুর্মু। একখানা গাঁইতা সম্বল করে সে আশৈশব লড়াই করে গেছে। মৃত্যুকে সে তাই মানে না। তাই জোর ধমক দেয় আন্টুনিকে,—মরণ কাঁড়বি না কিন্তুক! মরণ কেনে রে! মরণ অত সোজা, লয়?

এককড়ি ওদের ঝগড়া থামিয়ে দিয়ে বলে,—আপনিই লোতুন পাদরি সাহেব বটেন, লয়? কাল গীর্জা ঘরে বক্তিমে করিছেন?

চন্দ্রভান বলে,—না ভাই, আমি পাদ্রী নই—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যোসেফ বলে,—উনি হলেন গে ফাদারদা!

বস্তুত গতকাল রবিবার ভিন্সেন্ট ভান গর্গ তার জীবনের প্রথম সার্মন দিয়েছে। লোক মন্দ হয় নি। কাঠের বেঞ্চিগুলো সবই প্রায় ভেঙে গেছে। সেগুলিকে হটিয়ে মাটিতেই বসার ব্যবস্থা করেছিল। শুধু পিছনের দিকে দুটি কাঠের বেঞ্চি। তা অনেকেই এসেছিল প্রথম দিন। শুধু খ্রীষ্টান নয়—সাঁওতাল, বাগদি ভুঁই-হাররাও। দু-চারজন ভদ্দরলোক বাবু-মশাইও এসেছিলেন বৈচিত্রের সন্ধানে। কয়লাকুঠির জীবন বড় একঘেয়ে। ন'মাসে ছ'-মাসে আসে যাযাবর বেদেবেদিনীর দল। নাচ দেখায়, ভানুমতীর খেল দেখায়। কদাচিৎ আসে বাঁদরনাচওয়ালা। গীর্জায় অনেক অনেকদিন পর বাতি জ্বলতে দেখে তাই অনেক কৌতূহলী জীব সমবেত হয়েছিল প্রথম রবিবারে। সবচেয়ে অবাক করা খবর—স্বয়ং নাথানিয়াল সাহেব এসেছিলেন ওর সার্মন শুনতে। বসেছিলেন সামনের একখানা চেয়ার দখল করে। সেটাও নিয়ে এসেছিল তাঁর খিদ্‌মদগার। তা সেই প্রথম দিনের সার্মনের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে জানবার উদ্দেশ্য নিয়েই চন্দ্রভান বেরিয়েছে এখন। বললে,—কাল আমার বক্তৃতা কেমন লাগল বল?

মাতাল আন্টুনি বলে,—এক্কেরে ফাস্টু কেলাশ!

বুধন বলে,—হর রোব্বারেই উয়ারা মুড়ি-কদমা বিলাইবে নাকি ফাদারদা?

ভিন্সেন্ট বলে,—না। আমি বারণ করে দিয়েছি।

ব্যবস্থাটা ভাল লাগে নি তার। তাকে জানিয়ে ব্যবস্থাটা করা হয় নি আদপে। ও শুধু লক্ষ্য করে দেখেছিল, গীর্জার সামনে বসেছিল একজন দেহজীবিনী শ্রেণীর সাঁওতাল মেয়ে, বাতাসী। নিটোল স্বাস্থ্য, ইঙ্গিতময় হাসি, মাথার খোঁপায় গোঁজা ফুল। এক ধামা মুড়ি আর এক ঠোঙা কদমা নিয়ে বসে ছিল। যারা বক্তৃতা শুনতে এসেছে তাদের প্রত্যেককে এক কুন্‌কে মুড়ি আর দুটো করে কদমা বিলিয়েছে। প্রাপক জোয়ান বয়সের মরদ হলে উপরি পাওনা—মিষ্টি হাসি বা কটাক্ষ। ভিন্সেন্টের এ ব্যবস্থা একেবারেই ভাল

লাগে নি। খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, ব্যবস্থাটা খোদ নাথানিয়াল সাহেবের। সে আপত্তি জানিয়েছে। ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থা যেন না করা হয়, এটাই তার অনুরোধ। মুড়ি-কদমার লোভে ওরা উপাসনায় যোগ দিক, এটা সে চায় না।

মাতাল আন্টুনি পুনরায় মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,—বড় জবর বক্তিমে হয়েল ফাদারদা। আমি কিণ্ড্য বুঝি নাই। তা হোক! বক্তিমে যারে বলে,—এক্কেরে ফাস্টু কেলাশ!

যোসেফ বলে,—আমি কিন্তুক ল্যায্য কথাটো বুলব ফাদারদা। মোর ভাল লাগেক নাই।

ভিন্সেন্ট অবাক হয়ে বলে,—ভাল লাগে নি? তাই নাকি? কেন?

যোসেফ ইয়াকুবের দিকে ভাঁড়টা বাড়িয়ে দিয়ে বলে,—টুক অমর্ত দাও কেনে য়াকুব ভাই। কালিমার্কা—

চন্দ্রভানের দিকে ফিরে বলে—লিখাপড়া শিখি নাই ফাদারদা ; কিন্তুক মনে লাগে—বাতটো তুমি ঠিক বুল নাই! উঁহু! কিতাবটো পড়লে বুলতে পারতম! বাতটো বেবাক ভুল হই গেছে!

চন্দ্রভান কৌতূহলী হয়ে বলে,—কোন্ কথাটা তোমার মনে লাগে নি যোসেফ?

আরে হুই যে তুমি বললে না, জীবনভর কষ্ট করি যা, এ কষ্ট কষ্ট লয়, মরণের পর তুরা বেহেস্তে যাবি—ই বাতটো উ কিতাবে লিখে নাই। মরণের বাতটো কেনে লিখবে? মরণ কি সোজা! না কি বুলছ ওস্তাদ?

প্রশ্নটা এককড়িকে। সে একটা বিড়ি ধরাতে ব্যস্ত ছিল। বলে,—আবার আমারে কেন সালিশ মানো বড়ভাই? আমি শালা হিঁদুর ছেলে, বাইবেল পড়েছি নাকি? তায় তুমার ফাদারদা কাল কি বুলিছে তাও তো আমি শুনি নাই—

যোসেফ বলে,—মোদের ওস্তাদ বড় এলেমদার মানুষ বটে। আচ্ছা অরেই শুনাও কেনে বিত্তান্তটো! লও ওস্তাদ, শুন্যা মোরে বুঝাই দাও।

এককড়িও ভিন্সেন্টের দিকে ফিরে বলে,—বিত্তান্তটা কি?

মোমবাতিজ্বলা গীর্জায় দাঁড়িয়ে যে কথা অত লোকের সামনে কাল বলেছিল, আজ এই ইয়াকুব মিঞার ভাঁটিখানায় একদল মাতাল শ্রোতার সামনে সে কথাটা উচ্চারণ করতে কেমন যেন সঙ্কোচ হল ভিন্সেন্টের। কিন্তু সঙ্কোচকে সে জোর করে ঝেড়ে ফেলে। ফাদার শারদাঁর মন্ত্রশিষ্য সে। ও জানে গীর্জার পাদপীঠের চেয়ে এই ক্লেদাক্ত ভাঁটিখানাতেই মথীকথিত সুসমাচারের বেশী প্রয়োজন। ভিন্সেন্ট বলে,—কাল আমি বলেছিলাম, এই পৃথিবীটা আমাদের সত্যিকারের ডেরা নয়, আমরা এখানে দু-দিনের জন্য মুসাফিরের মত এসেছি। মৃত্যুর পরে আমরা আমাদের পৈতৃক বাস্তুভিটায় ফিরে যাব—সেটা হচ্ছে স্বর্গরাজ্য। প্রভু যীশু বলেছেন, সুখের চেয়ে দুঃখই বড়, কারণ দুনিয়াদারির সুখ আমাদের শুধু দুঃখই এনে দেয়। পরম-পিতাকে যে চিনেছে তার কাছে দুঃখটা বড় কথা নয়। সে দুঃখকে জয় করবেই ; কারণ সে জানে মৃত্যুর পরে আমরা সেই অনন্ত স্বর্গে ফিরে যাব। তাই বলেছিলাম—'Father, we pray Thee to Keep us from evil. Give us neither poverty nor riches, but feed us with bread approprite to us.'

যোসেফ ভক্তিভরে মদের ভাঁড়টা নামিয়ে রাখে। চোখ দুটো বুঁজে যায়। গম্ভীরভাবে বুকে একটা ক্রুশচিহ্ন এঁকে বলে,—আমিন!

তারপর চোখ খুলে তাকায়। ভাঁড়টা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে বলে,—ইঞ্জিরিটা

কিশ্‌শু বুঝি নাই। তবু হলপ করি বুলব, ফাদারদ.- -ইটো এক্কেরে ছেঁদো বাত! বিলকুল ভুল!

এককড়ি প্রশ্ন করে,—ইঞ্জিরি লজটার মানে কি দাঁড়াল?

ভিন্সেন্ট অনুবাদ করে,—'হে পরমপিতা, শয়তানের হাত থেকে আমাদের তুমি বাঁচাও। আমাদের হা-ভাতে করে রেখ না, আমরা সোনাদানাও চাই না। দু-বেলা দু-মুঠা খেতে পেলেই আমরা খুশি।'

শ্রীরামপুর চার্চের অনুমোদিত অনুবাদ নয়, তবু ভিন্সেন্টের মনে হল এ ভাষায় অনুবাদ হলেই ওরা বুঝবে। বুঝলেও ওরা। এককড়ি জোর দিয়ে বলে,—এর ভিতরে ছেঁদো কথা কুন্‌টো বড়ভাই। এ তো সাচ্চা কথা। দু-বেলা দু-মুঠো খাতি পেলি আর কি চাই?

আন্টুনি পুনরুক্তি করে,—হ'ক কথা। ল্যায্য কথা। এক্কেরে ফাস্ট কেলাশ।

যোসেফ তাকে প্রচণ্ড ধমক দেয়,—তু চুপ্ যা কেনে!

ওস্তাদের দিকে ফিরে বলে,—উ বাত লয়। পরথম বাতটো আমারে বুঝাও। আমি বুলছি, হেই ভগবান, আমারে শয়তানের হাত থিকে বাঁচাও ; শয়তানও বুলতিছে আমারে যোসেফের হাত থিকে বাঁচাও। এখন ভগবান কি করবে আমারে বুঝাও। সে তো আমারও ভগমান, শয়তানেরও ভগমান। লয়?

কঠিন প্রশ্ন! ভিন্সেন্ট জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু তার আগেই এককড়ি বলে ওঠে,—তুমার ঐ স্বর্গটা দেখি নাই ফাদারদা, তয় নরকটারে হাড়ে হাড়ে চিনি। চাও তো তুমাকেও দেখাই দিতি পারি। দেখবে পাতালরাজ্যটা?

ভিন্সেন্ট তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যায়। কয়লাকুঠির মূলকেন্দ্র হচ্ছে ঐ পাতালরাজ্য। ওটাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে এখানকার জীবনচক্র—ঐ পিট-হেডগিয়ারের আবর্তন ছন্দে। ওটার সঙ্গে এখনও তার পরিচয় হয়নি।

এককড়ি সরখেল তার কথা রেখেছে। পরদিনই ওকে নিয়ে দেখিয়ে আনল পাতালরাজ্যটা।

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা একটা। লোহার খাঁচায় আর দশজন মালকাটার সঙ্গে এককড়ি ওকে নিয়ে উঠল খাদ-ভস্‌কার মাথায়। ঘন্টা বাজল, হঠাৎ দুলে উঠল খাঁচাটা। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পাতকুয়োর গর্তে। নাগরদোলায় নাম্‌তির মুখে হঠাৎ যেমন পেটের মধ্যে গুলিয়ে ওঠে সেই অনুভূতিটাই চতুর্গুণ হয়ে জেগেছিল প্রথমে। দু-পাশে খাড়া পাথরের দেওয়াল। তির তির করে জল ঝরে পড়ছে শ্যাওলাধরা দেওয়াল বেয়ে। কখনও অঝোর ধারে ঝরে পড়ছে খাঁচার উপরে। ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। ঘোর অন্ধকার। কিছু ঠাওর হয় না। অবশেষে খাঁচাটা এসে থামল পাতালপুরীর একপ্রান্তে। সেটা আসলে শেষপ্রান্ত নয়, পাতালরাজ্যের সেটাই শুরু। সুরঙ্গ দিয়ে উপর পানে তাকিয়ে দেখলে এ পাতালরাজ্যের হিসাবে অতবড় আকাশটার দাম স্রেফ এক আধলা। অতি ক্ষুদ্র গোলাকৃতি একটা সাদা বিন্দু।

দু-মুখো দুটো রাস্তা। গোলাকার টানেল, চলে গেছে সামনের দিকে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুক চিরে। জোনাকি পোকার মত নীলাভ আলোর খাঁচালণ্ঠন নিয়ে এককড়ি রওনা হল একদিকে, বলে,—পিছন পিছন এস ফাদারদা।

রাস্তাটা প্রথমে বেশ চওড়া, খাড়াই অনেকটা। দু-জোড়া ছোট রেলের লাইন চলে

গেছে সাপের মত এঁকেবেঁকে। একটু পরেই পথটা আরও সরু হয়ে গেল। দুটো মানুষ পাশাপাশি যেতে পারে না। মাথা নিচু না করলে ঠুকে যাবে পাথরের দেওয়ালে। চন্দ্রভান কিছুই দেখতে পায় না ; এই আলো-আঁধারে দেখতে সে অভ্যস্ত নয়। বারে বারে ঠোক্কর খাচ্ছে ঢালু পথে। একটু পরেই একটা ফাঁকা মত জায়গা। দু-তিনটে সুরঙ্গ পথ এসে মিশেছে এখানে। এককড়ি বলে,—দেওয়াল সিঁটে দাঁড়াও কেনে ফাদারদা। কয়লা বোঝাই টব যাবে কিন্তুক এই রেলের লাইন বরাবর।

অসহ্য গরম। দরদর করে ঘাম ঝরছে। পায়ের নিচে জল। এত জল কোথা থেকে আসছে এ পাতালপুরীতে? অন্ধকারে আবছা নজর হল সুরঙ্গপথে কজন মানুষ গাঁইতা চালাচ্ছে। মেয়েরাও কাটছে কয়লার চাঁই—বোঝাই দিচ্ছে লোহার টবগাড়িতে। ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চারাও আছে—আট-দশ-বারো বছরের ছেলে ও মেয়ে। ওরা কয়লা বোঝাই দিচ্ছে টবে, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে হলারের দিকে।

—দৈত্যটারে দেখতি আসছি ফাদারদা? তা দেখি লও কেনে! বড় জবর লড়াই করে শালা। তা করুক। মর্মুও কম যায় না এ দৈত্যটারেও টুক্ দেখি লও। হঁ!

গাঁইতাটাকে কাঁধের উপর তুলে দৈত্যের মত দু-পা ফাঁক করে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় যোসেফ মুর্মু—যেন ফটো তোলাচ্ছে। ভেডিস-ল্যাম্পের নীলাভ আলোয় জখম ঠ্যাঙাখানায় ভর দিয়ে ওর সোজা হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিটা অদ্ভুত। সর্বাঙ্গ মিশ কালো, শুধু দু-চোখের সাদা অংশটুকু চক্‌চক্ করছে।

ওভারম্যান এককড়ি হাতের লণ্ঠনটাকে পরীক্ষা করে দেখল। তারপর শিকারী কুকুরের মত নাক উঁচু করে কি যেন শুঁকে বলে,—গ্যাস যান বেশি মনে লাগে বড়ভাই! এ পিটে কাম বন্ধ করি দাও বরং। গাঁইতার মুখে ফুল্‌কি উঠলি বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড হই যাবেক।

মুর্মু হেসে উড়িয়ে দেয় ; বলে,—ওস্তাদ, খালিটব হলারে পাঠালি হাজরিটো লিখে লিবে তো তুমি?

এ কথার জবাব নেই।

এককড়ি অসহায়ের মত মাথা নাড়ে। অনুনয়ের সুরে বলে, একটো দিন বই তো লয়। আমি আজই বড় সাহেবরে বলি। এ পিটে পেরথমে হাওয়া পাম্প করতে হবেক।

আমিনবাবু ছিল পিছনে। বললে,—ইটা তো যোসেফদার কথার জবাব লয় ওস্তাদ? খালিটব পাঠালি উয়াদের হাজরির কি হবেক?

হঠাৎ ধমকে ওঠে এককড়ি,—আর অগ্নিকাণ্ড হই গেলে হাজরিটো মিলবে? সওয়া শ' মালকাটা এখন খাদের ভিৎরি রইছে। সিটো খেয়াল আছে?

মুর্মু একগাল হেসেছে। মিশ্‌কালো মুখে একঝাঁক সাদা দাঁত ভুট্টার দানার মত। বলে,—দেড়শ' মালকাটার হিসাবটো তুমার, মোর লয় ওস্তাদ। মোর স্রেফ সাত পেটের হিসাব বটে! মাগভাতার আর পাঁচটো বাচ্ছা! ব্যস্! একদিনের খোরাকি দিবে তুমি?

এককড়ি জবাব দিতে পারে না। ওর অসহায় অবস্থাটা দেখে যোসেফ বোধহয় দুঃখিত হয়। এগিয়ে এসে কয়লামাখা হাতখানা রাখে এককড়ির কাঁধে। বলে, ডরাও কেনে গ ওস্তাদ? খাদের ভিৎরি জনম কাটল মোর। এ্যাঁরে চিনি না? আগুনের ফুল্‌কি ছুটতে দিব কেনে? গাঁইতা চালাইব যান মাগের মুখে চুমু খাইছি!

চুক্ করে অদ্ভুত একটা শব্দ করে ভেঙায়। ভিখু, বুধন আর আন্টুনি হা-হা করে

হেসে ওঠে। ও-পাশ থেকে বাতাসী বলে ওঠে,—মরণ!

এককড়িও রাগ করে বলে,—মর তা হলে!

—অ্যাই খবদ্দার! গাঁইতা উঁচিয়ে রুখে দাঁড়ায় মুর্মু। দু-তরফা মরণ-ডাক সে সইতে পারে না। এককড়িও ঘুরে দাঁড়ায়। এটা ইয়াকুবের ভাঁটিখানা নয়। এখানে সে ওভারম্যান। পাঁচটা মালকাটার সামনে সে আপন মর্যাদা ভুলে থাকতে পারে না। সুরঙ্গ থেকে লীলায়িত ছন্দে বেরিয়ে আসে বাতাসী—দাঁড়ায় দুই প্রতি-যোগীর মাঝখানে। যোসেফের দিকে ফিরে বলে,—হাই বাবা! কারে কি বুলছিস্ বড়ভাই! উ হল গে ওস্তাদ!

যোসেফ এক হাতে তাকে সরিয়ে দেয়। ওভারম্যানের দিকে এগিয়ে এসে বলে,—মরণ কেনে কাঁড়ছিস ওস্তাদ? মরণ কাঁড়লি মোর সব ভুল হই যায়, তু তো জানিস। লে ভাই, খৈনি লে—

এ জতুগৃহে বিড়ি খাওয়া মানা। তামাকপাতা চিবায় ওরা সারা দিনমান।

এককড়ি হেসে ফেলে। হাত বাড়িয়ে তামাকপাতা নিয়ে ডলতে থাকে।

এককড়ি আর যোসেফ। প্রভু আর ভৃত্য। মৃত্যুরাজ্যে রোজগারের ধান্দায় ওরা আজ স্বগোত্র, বন্ধু!

—'পঙ্খিরাজ! হো পঙ্খিরাজ! উঠ! গো-রসটুক্ খাইকরি আমারে রেহাই দাও কেনে!' ঐ এসেছে বাতাসী। রোজ এমন কাক-ডাকা ভোরে সে এসে ডেকে তোলে ভিন্সেন্টকে। কতবার বারণ করেছে। মেয়েটা শোনে না। বাতাসী সাঁওতালের মেয়ে। কারও স্ত্রী নয়, অথচ নান্‌কুর জননী। নান্‌কুর বয়স আট। এ বছরই হাতে-কালি হয়েছে। বাবুদের যে বয়সে হাতে-খড়ি হয় প্রায় ঐ বয়সেই ধাওড়ার ছেলেমেয়েদের হাতে-কালি উৎসব হয়। জীবনে প্রথম সে খাদে নামে, বাপ অথবা মায়ের হাত ধরে। নান্‌কু আজ এক বছর হল খাদে নামছে। হাজরির খাতায় নান্‌কুর নাম উঠেছে মাতৃ-পরিচয়ে। খাজাঞ্চিবাবু ঋষি গৌতম নন, আর কোলিয়ারির কাজ কিছু ব্রহ্মবিদ্যাও নয়—তাই নান্‌কুর পিতৃ-পরিচয় প্রসঙ্গটা ওঠেনি আদৌ! বয়সে বাতাসী ভিন্সেন্টের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়ই হবে। এক সন্তানের জননী ; কিন্তু স্বাস্থ্যটি নিটোল। কুচ্‌কুচে কালো রঙ, মাথায় সব সময় একটি লাল ফুল, ঠোঁট দুটি পানের রসে রাঙা, উরুনিতম্ব, পীনোদ্ধত উরস। মূর্তিমতী কামনা। কবে কার হাত ধরে প্রথম এ জোড়-জাঙ্গালে এসেছিল মনে নেই—কিন্তু জোড় ভেঙে গেছে অচিরেই। বাতাসী ক্ষীণকবাদিনী। তা ছাপড়ায় সে একাই থাকে নান্‌কুকে নিয়ে। মাঝে মাঝে অভিসারে বার হয়। ফেল-কড়ি-মাখ-তেলের আসন পেয়েছে। বয়ঃজ্যেষ্ঠরাও ঐ অষ্টদশবর্ষীয় ধর্মপ্রচারককে সমীহ করে চলে। একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ বাতাসী। সবাই ওকে ডাকে ফাদারদা, ও ডাকে পঙ্খিরাজ। আস্তাবলে বাস করে বলে ঐ নামকরণ। সূর্যোদয়ের আগেই বাতাসী ছেলের হাত ধরে খাদে নামে। তার আগেই ভিন্সেন্টকে খাইয়ে যায় এক ঘটি গরম দুধ। বাতাসীর একটি গোরু আছে। রূপোপজীবিনীর পক্ষেই সম্ভব এ জাতীয় বিলাসিতা। সকালে দুধটা খাইয়ে বাড়ি বাড়ি বেচে আসে। নান্‌কুকেও খাওয়ায়। দুধ খাওয়ার মত সামর্থ্য অবশ্য ভিন্সেন্টের ছিল না ; বাতাসী ওকে বলেছিল—দুধের টাকা কোম্পানি দেবে। কোম্পানির নির্দেশেই সে নাকি ঐ এক পোয়া দুধের নিত্য যোগান দিয়ে যায়। সেটা যে ডাহা মিথ্যা কথা এটা ভিন্সেন্ট জানতে পেরেছিল অনেকদিন পরে। এটা ছিল

বাতাসীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, ভালবাসার দান!

—হেই পঙ্খিরাজ! উঠ কেনে! গো-রসটুক্ খাই লও!

দরজা খুলে বাইরে আসে ভিন্সেন্ট। বলে,—কেন রোজ আমাকে বিরক্ত করতে আসিস বল্ তো? কাল থেকে আর আসবি না!

বাতাসী চোখ দুটি বড় বড় করে বলে,—ঈ বাবা! পঙ্খিরাজ ক্ষেপি গেছে আজ! তা হেই বাবা পঙ্খিরাজ, তুর টুক্ দয়া হয় না গ? গো-রস বেচি দুটি পয়সা কামাই ইটো তুর মন মানে না? একা মাইয়া লোগ্ বটি, মরদ লাই—তুর দয়া হয় না?

—একা থাকতে কে তোকে মাথায় দিব্যি দিয়েছে? বিয়ে করলেই পারিস?

—ঈ বাবা! আমাকে কে বিয়া করবে বল্? আমি তো সোন্দর নই—

—ন্যাকামি করিস না! মরদগুলোর মাথা না খেয়ে কারও ঘরে পাকাপাকিভাবে যা—

খিল্‌খিল্ করে হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়ে বাতাসী। বলে,—মনের মানুষ না হলি কি পাকাপাকি কুথাও থাকা যায় রে?

—তা ধাওড়ায় এত মরদ রয়েছে, বেছে নে তোর মনের মানুষ!

হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হবার ভান করে। লাস্যময়ী কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলে,—একটো মরদরে তো মনে ধরিছে গো পঙ্খিরাজ—কিন্তুক্ সি যে মোরে কিবল খিঁচায়!

প্রগল্‌ভা মেয়েটির মুখের কোন আড় নেই। ভিন্সেন্ট ওর বাঁকা ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে ঠিক, কিন্তু এ নিয়ে কথা বাড়ায় না। সে জানে ঐ ক্ষণিকবাদিনী রূপোপজীবিনী সকলেই ওকথা বলে সময়বিশেষে। ওর হাত থেকে ঘটিটা নিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে দুধটা খেয়ে ফেলে।

বাতাসী উঠে পড়ে। চলতে গিয়েও কি ভেবে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ায়। বলে,—তা হেই পঙ্খিরাজ, তু রিয়া করিস না কেনে? কারও নজরে ধরে না তুর?

—তাতে তোর কি? যা ভাগ্, পালা!

—মনের মত বউ পাস লাই, লা রে? তু যদি রাজি হ'স একটো সম্বন্ধ করি। খুব সোন্দর বটে! কী? করবি বিয়া?

ভিন্সেন্ট হেসে ফেলে। বলে,—মেয়েটি কে? বাতাসী সুন্দরী তো?

—ঈ বাবা! অমন বাতটো আমি মুখে আনবার পারি? আমি তো সাঁওতাল বটি! লিখাপড়া শিখি নাই! আমি হুই পাঁচু-সর্দারের বুইনঝির বাতটো বুলতেছিলম! হঁ!

ভিন্সেন্ট একটা ছড়ি উঠিয়ে ওকে ছদ্মতাড়না করে,—যা ভাগ, হতচ্ছাড়ি!

—ঈ বাবা গ!—ছদ্ম আতঙ্কের অভিনয় করে বাতাসী ছুটে পালায়।

কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে চন্দ্রভান। কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে। কী ভুল, তা সে জানে না, কিন্তু বিশ্বাসের ভিতটাই টলে উঠেছে। ফাদার শারদাঁর সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে হত।

কয়লাকুঠির জীবন-রহস্যের আরও গভীরে প্রবেশ করেছে ইতিমধ্যে। দেখেছে মালকাটাদের জীবন আরও নিবিড় করে, আরও নিকট থেকে। ওদের সেবা করতেই এসেছে এখানে। ঘরে ঘরে তার অবারিত দ্বার। ওদের সঙ্গে মিশেছে একাত্মভাবে। ওরাও ভিন্সেন্টকে আপনজন করে নিয়েছে। কাছে এসে ও দেখল—কী অপরিসীম দারিদ্র্য, জীবনের কী অতলান্তিক অবক্ষয়ী রূপ। দু-মুঠো অন্নের জন্য কোথায় নেমে গেছে মানুষগুলো। তবু কি দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন জুটছে? সূর্যোদয়ের আগে নেমে যায়

পাতালে, উঠে আসে দশ-বারো ঘন্টা পরে ধুঁকতে ধুঁকতে, আর কাশতে কাশতে। সপ্তাহান্তে নামমাত্র হাজরি—তাও কাটা যায় নানান ছুতায়। টবে মাল কম হয়েছে, কয়লার বদলে 'টেরিল' বেশি দেওয়া হয়েছে, হ্যান হয়েছে, ত্যান হয়েছে। আসলে মেট-মুন্সি-গিনতিদার-হলারম্যান-ওভারম্যানের দস্তুরি ঠিক মত না হলেই হাজরি কাটা যাবে। আবার সব ঘাটে দস্তুরি দিতে গেলেও নগদ প্রাপ্তিটা দাঁড়ায় শূন্যে! মরদগুলো সন্ধ্যা থেকেই পড়ে থাকে পচাইয়ের আড্ডায়। মেয়েগুলো কে কার খোঁয়াড়ে রাত কাটায় হিসাব থাকে না। বাচ্চাগুলো বেওয়ারিস। শুয়োরের ছানা যেন। অর্ধেকের উপর মালকাটা একা থাকে। বউ পুষবার খরচে কুলায় না। হপ্তায় একবার জৈবিক প্রয়োজনে যায় ও-পাড়ায়। ব্যবসায়ী মেয়ের দল একটা স্বতন্ত্র চাক্‌লা জমিয়ে বসেছে। এ ছাড়াও আছে বাতাসীর মত সুখের পায়রা—ফ্রি লান্‌সার! যাদের পয়সা নগদ কিছু জমেছে তারা আবার মাঝে মাঝে চলে যায় বরাকর, মুখ বদলাতে। হাঁটতে হয় না। জোড়-জাঙ্গাল থেকে বরাকর পর্যন্ত পাতা আছে ছোট রেলের লাইন। ক্রমাগত টব চলেছে তাতে। মানুষে ঠেলে নিয়ে যায়। দুটো বিড়ি ঘুষ দিলেই তারা উঠিয়ে নেয় টবের উপর। ওতে চড়ে শহর-বাজারের বেশ্যাপল্লী ঘুরে এস। সপ্তাহে একদিন বৈ-তো নয়?

এ কোন্ নরকে পবিত্র খ্রীষ্টধর্মের প্রচার করতে এসেছে ভিন্সেন্ট? এদের সে কোন্ মুখে বলবে—দুঃখটা মায়া, ওটা কিছু নয়, ওকে অস্বীকার কর! মৃত্যুর পরে স্বর্গরাজ্যে যাবে তোমরা, আর রক্ত-চোষা মালিকগুলো যাবে নরকে। কেমন করে এই থিওরিটা গলাধঃকরণ করবে ওরা? পৌষ পার হয়ে মাঘ শুরু হয়েছে। হাড়কাঁপানো শীত। নেংটি-সার-মানুষগুলো কেমন করে লড়বে ঐ শীত দৈত্যের সঙ্গে? বাচ্চগুলো? কয়লার রাজ্য, অথচ একফোঁটা কয়লা পায় না ওরা। কুড়িয়ে আনে ঝরা শালপাতা, কাঠকুটো ; তাই জ্বেলে আগুন করে। কুকুরছানার মত উলঙ্গ বাচ্চাগুলো শুয়ে থাকে সেই আগুনের চারপাশে। সর্দিজ্বর আর কাশি তো আছেই—নিমুনিয়ায় মারা গেল ক'টা বাচ্চা। চন্দ্রভান মরিয়া হয়ে শেষ-মেষ দরবার করতে গিয়েছিল খোদ নাথানিয়াল সাহেবের এজলাসে। এমনভাবে চলতে পারে না। জীবনধারণের জন্য একটা সর্বনিম্ন স্তর আছে—কয়লাকুঠির স্বার্থেই অন্তত সেই সমতলে ঐ মালকাটাদের উন্নীত করতে হবে। দয়া ভিক্ষা নয়, কোম্পানির প্রয়োজনে। কোম্পানির খরচে একজন ডাক্তার থাকা উচিত, বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া উচিত, জ্বালানির কয়লা ওদের বিতরণ করা উচিত। হাজরির হার এমন হওয়া চাই যাতে খেটে খাবার মত শারীরিক সামর্থ্য ওদের বজায় থাকে।

ভ্রু-কুঞ্চিত হয়েছিল সাহেবের। কড়া সুরে তাঁর বিচিত্র ভাষায় বলেছিলেন,—তুমি এখানে ট্রেড-ইউনিয়ানিস্ট হিসাবে আসনি বাবু, এসেছ ধর্মপ্রচার করতে। ওসব ব্যাপারে তোমাকে নাক গলাতে হবে না।

মাথা নিচু করে ফিরে এসেছিলে ভিন্সেন্ট।

খবরটা তার পরদিনই পেল। যোসেফ মুর্মুর মেজ ছেলে প্রবল জ্বরে বেহুঁস। খবর পেয়েই যোসেফের ছাপরায় ছুটে যায়। যোসেফ ছিল না ; তার বড় ছেলেও অনুপস্থিত। খাদে নেমেছে ওরা। যোসেফের বউ বাধ্য হয়ে কামাই করেছে। অচৈতন্য কিষ্টোর শিয়রে বসে আছে নির্বাক। বাকি বাচ্চা তিনটে কুঁকড়ি মেরে বসে আছে খড়ের বিছানায়। একটা কাঁথা নেই, একটা ছেঁড়া কম্বল নেই। চট বিছিয়েছে হিমশীতল মাটির

মেঝেতে। ভিন্সেন্ট বুঝতে পারে, বাচ্চাটার নিমুনিয়া হয়েছে। ওকে বাঁচাতে হলে ঔষধ নয়, সবার আগে ওকে শোয়াতে হবে একটা তোশকের উপর, গায়ে চাপাতে হবে একখানা কম্বল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। একটু পরেই যোসেফ আর রবার্ট ফিরে এল। বিনা ভূমিকাতে ভিন্সেন্ট বলে ওঠে,—আমার একটা কাজ করে দেবে যোসেফভাই?

সমস্ত দিনমান খাদ-দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করেছে যোসেফ মুর্মু। ক্লান্তিতে এখন ভেঙে পড়তে চাইছে তার দেহ। এদিকে ঘরে তার অচৈতন্য সন্তান কিষ্টো। তবু ফাদারদার কথায় সে বিরক্ত হল না কিছুমাত্র। বলে,—কী কাজ ফাদারদা?

—তুমি একটু এস আমার সঙ্গে।

বাইরে দুরন্ত হিমেল হাওয়া। যোসেফ বিনা প্রতিবাদে ওর পিছন পিছন নেমে আসে পথের উপর। কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে একবারও জানতে চায় না। ভিন্সেন্টের গায়ে একটা খদ্দরের হাফ-সার্ট, মোটাসূতোর আলোয়ান ; আর একপ্রস্থ কয়লার পলেস্তারা ছাড়া যোসেফের গায়ে কোন আবরণ নেই। ওরা নীরবেই পথটি অতিক্রম করে। নিজের আস্তাবলের ডেরায় পৌঁছে চন্দ্রভান বলে,—তুমি ঐ খাটিয়াটার ওধারটা ধর যোসেফ ভাই ; একা আমি এটা বয়ে নিতে যেতে পারছি না।

যোসেফ শুধু বলে,—ও! অ্যাই বিত্তান্ত!

লোকটা ঘুরে দাঁড়ায়। আর কিছু বলে না। চলতে শুরু করে তার জখম ঠ্যাঙখানা টানতে টানতে।

—কি হল যোসেফ? চলেছ কোথায়? এটা ধর!

যোসেফ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে আচমকা। বলে, —কিতাবের বুলিটো এক্কেরে ভুলি গেল ফাদারদা? এ দুনিয়ায় আমরা তো মুসাফির গ? দুশ্‌কু-কষ্ট কিছু লয়! মরি গেলি কিষ্টো তো সিরেফ বেহেস্তে যাবেগ গ!

চন্দ্রভান ছুটে এসে চেপে ধরে ওর কয়লামাখা হাতখানা। আর্তকণ্ঠে বলে,—না না যোসেফ! সে অর্থে আমি ওকথা বলিনি! কিষ্টোকে আমরা মরতে দেব না। মরণ কি অত সোজা?

ওরই বাঁধা বুলি। তাতে কোন ভাবান্তর হয় না যোসেফের। হাতখানা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নেয়। অনুচ্চকণ্ঠে বলে,—ভগবান কিষ্টোর মায়েরে পাঁচ-পাঁচটো বাচ্চা দিছে। একটো মরি গেলি চারটো বাকি থাকবে, লয়? সে দুশ্‌কু কিষ্টোর মায়ের সইব, আমারও সইবে। কিন্তুক, গোটা জোড়-জাঙ্গালের লেগে ঐ কিপ্‌টে ভগমান দিছে একটি মাত্তর ফাদারদা! সেটি নিমুনিয়া হই মরি গেলি আমাদের সইবে না। পথ ছাড় কেনে!

চন্দ্রভানের চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে।

হাত বাড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী খঞ্জ মানুষটা ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা বিরোধ যে অনিবার্যভাবে অলক্ষ্যে ঘনিয়ে উঠছে এটা ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারছিল ভিন্সেন্ট। অনেকেই সাবধান করে দিয়েছে তাকে। এককড়ি ওভারম্যান বলেছে—নাথানিয়াল সাহেব ভিন্সেন্টের পিছনে গুপ্তচর নিয়োগ করেছে। সে কোথায় যায়, কি করে, কোথায় কি বলে তার রিপোর্ট সংগ্রহ করছে। আন্টুনি একদিন পূর্বতন পাদ্রীসাহেবের বিতাড়নের কাহিনীটা সবিস্তারে ওকে শুনিয়ে দিল। আগেকার পাদ্রীসাহেবও ঐ একই দোষ করেছিলেন—মালকাটাদের ভাল করতে

চেয়েছিলেন। এমন কি পাঁচু পর্যন্ত ওকে অবাঞ্ছিত কিছুটা উপদেশ বর্ষণ করল। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করাটা যে নীতিশাস্ত্র বিরোধী এ সংবাদটা ওকে শুনিয়ে দিল। কিন্তু চন্দ্রভান নিরুপায়। তার নিজের অন্তরেই একটা সংশয় জেগেছে। প্রভু যীশুর বাণী সে কি ভুল বুঝেছে? এ দুনিয়ার হাটে সব দুঃখ-কষ্টকে নতমস্তকে স্বীকার করে নেওয়াই কি প্রকৃত খ্রীষ্টানের একমাত্র কাজ? মৃত্যুর পর স্বর্গবাসের পুরস্কার কি শুধুমাত্র একটা ধোঁকাবাজি? অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাতে ওরা দল বেঁধে রুখে না দাঁড়ায় তাই কি ও এসেছে এখানে? প্রতি রবিবার এক এক ডেলা আফিং খাইয়ে ওদের ঘুম পাড়িয়ে রাখাই কি তার ধর্মপ্রচারের মূখ্য উদ্দেশ্য?

প্রসঙ্গটা একদিন হঠাৎ চিত্রলেখাও তুলে বসে। প্রতিদিন আহার্য পরিবেশনের অবকাশে দু-চারটে কথাবার্তা হয়। পাশের ঘরে আন্নাকালী উৎকর্ণ হয়ে পড়ে থাকে। চিত্রলেখা অবশ্য তাকে ভ্রূক্ষেপ করে না। মামীর মুখঝামটা তার গা-সওয়া। সে যেন সারাটা দিনমান প্রতীক্ষা করে থাকে অভুক্ত মানুষটার জন্য। সেদিন হঠাৎ বলে বসে,—একটা কথা বলব ফাদারদা? আপনার পিছনে নাথানিয়াল টিকটিকি লাগিয়েছে, জানেন?

ভিন্সেন্ট মৃদু হাসে।

—আপনি জানেন, তা বুঝতে পারি। কিন্তু গোয়েন্দাটা কে তা জানেন?

—না, কে?

—আমার মামা।

—ও!

চন্দ্রভান আর কথা বাড়ায়নি। নীরবে আহার-পর্ব সমাধা করে যায়। চিত্রলেখা অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে,—আর একটা কথা। আপনি ঐ বাতাসীর কাছ থেকে দুধ নেওয়া বন্ধ করুন।

—কেন বল তো?

—মেয়েটা ভাল নয়।

—আমি জানি। কিন্তু দুধ তো আমি পয়সা দিয়ে কিনি না। কোম্পানি ওকে পয়সা দেয়।

চিত্রলেখা আকাশ থেকে পড়ে। বলে,—মামাকে জিজ্ঞাসা করব তো! তা পয়সা যেই দিক দুধ তো অন্য লোকের কাছেও পাওয়া যায়—

চন্দ্রভান হেসে বলে,—তুমি ওর উপর কোন কারণে রেগে আছ। ও কিন্তু তোমার উপকারই করতে চায়। বিশ্বাস না হয় ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ—

—কী জিজ্ঞাসা করব?

—ও আমার কাছে তোমার নামে কি বলেছে!

—আপনার কাছে আমার নামে লাগিয়েছে! ভারী আস্পর্ধা তো! আচ্ছা!

সাবধান কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতে পারেনি চন্দ্রভান। বরং পাঁচজনের কাছে বারে বারে শোনা সাবধান-বাণী ওকে আরও বেপরোয়া করে তোলে। কিসের ভয়, কাকে ভয়? সে ঈশ্বরের দূত, এসেছে যীশুর বাণী প্রচার করতে। ফাদার শারদাঁর মন্ত্র-শিষ্য সে—ভয় করবে কেন? কাকে?

পরের রবিবার। সান্ধ্য উপাসনা-সভায় ভিন্সেন্ট লক্ষ্য করে দেখে পিছনের সারিতে বসে আছে সপার্ষদ পঞ্চানন হালদার। নাথানিয়াল কেবলমাত্র সেই প্রথম দিনই এসেছিলেন। পাঁচুবাবু কখনও আসেনি। সন্ধ্যাবেলাটা সে অন্যত্র ব্যস্ত থাকে। ছুকরি-

পাড়ার একটি ঘরে সে বাঁধাবাবু। চন্দ্রভান বুঝতে পারে, সে আকর্ষণ ছেড়ে ওকে আজ এই উপাসনা-সভায় যোগ দিতে হয়েছে নিতান্ত প্রয়োজনবোধে। সাহেবের কাছে চুক্‌লি কাটতে হবে। ভিন্সেন্ট কি বলে, কি করে সব তাকে জেনে যেতে হবে। তাই পিছনের সারিতে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে চুপচাপ।

যেন প্রতিশোধ নিতেই ভিন্সেন্ট বেছে নিল সেন্ট মার্কের দশম অধ্যায়ের সেই অনবদ্য গল্পটি। বললে—

"প্রভু যীশুর সামনে হঠাৎ একজন বণিক ছুটে এসে নতজানু হয়ে বললে, মহান প্রভু, আপনি বলুন, কী করলে আমি সেই অনন্ত স্বর্গলোকে যেতে পারব? শুনে প্রভু বললেন, আমাকে কেন মিছিমিছি 'মহান' প্রভু বলছ? একমাত্র ঈশ্বরই মহান। তাঁর দশটি আদেশ তো শুনেছ—পরের বউকে মায়ের মত দেখবে, কাউকে হিংসা করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা সাক্ষী দেবে না, অন্যায় করবে না, বাপ-মাকে ভক্তি করবে—। শুনে বণিকটি বললে, এ সবই তো আমি ছেলেবেলা থেকে মেনে চলেছি প্রভু। তাহলে আমার উদ্ধারের আর কোন বাধা নেই তো? প্রভু বললেন, না, আছে। তোমার একটিমাত্র দোষ। তুমি অনেক টাকার মালিক। যা কিছু সম্পদ তুমি জমিয়ে তুলেছ তা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। এস, আমার সঙ্গে এই ক্রুশ-কাষ্ঠের ভার ভাগ করে নাও। আমাকে অনুসরণ কর। একথা শুনে লোকটি সরে পড়ল। অনেকের রক্ত-জল-করা অনেক টাকা সে জমিয়েছে। তার মায়া সে ছাড়তে পারল না।...তখন প্রভু তাঁর শিষ্যদের দিকে ফিরে বললেন, ছুঁচের ফুটো দিয়ে একটা উটের পক্ষে গলে যাওয়া অসম্ভব, কিন্তু তার চেয়ে অসম্ভব কোন ধনী ব্যক্তির পক্ষে এ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা!"

ঈশাক রুহিদাস দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করে,—ফাদারদা, সগ্‌গে কয়লাকুঠি আছে?

এমন প্রশ্নের জবাব বাইবেলে খুঁজে পায়নি ভিন্সেন্ট ; কিন্তু এ-জাতীয় প্রশ্নের জবাবও তাকে দিতে হয়। সে জানে ঐ সব নিরক্ষর বাগদি, ভুঁইহার, সাঁওতাল, কোল মুণ্ডাদের কাছে বাইবেল বর্নিত স্বর্গরাজ্য ধারনার বাইরে। হিংসা দ্বেষ মাৎসর্যশূন্য একটা চিরশান্তির অমরধাম ওরা কল্পনা করতে পারবে না। তাই বলে,—থাকতে পারে, কিন্তু সেখানকার মালকাটারা দু-বেলা ভরপেট খেতে পায়, তাদের গায়ে জামা আছে, তাদের বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ে না, আর তারা কয়লার আগুনে রান্না করে।

আন্টুনি বলে,—ঈ বাবা! তা হেই ফাদারদা, সিখানকার খাদের লিয়মটো কি? সেলাম বাজাতে ভুল হই গেলি সিখানে কি হাজরি কাটা যাবেক লাই?

বোধহয় এ-জাতীয় অপরাধে আন্টুনির এ-সপ্তাহে হাজরি কাটা গেছে। তাই ওটাই তার বেদনার স্থল। ভিন্সেন্ট বলে,—না। সেখানে অমন ঘড়ি ঘড়ি সেলাম বাজানোর কানুন নেই। সেখানকার মালকাটারা কাউকে সেলাম করে না—মুন্সি-সর্দার-গিন্‌তিদার-হলারম্যান-ওভারম্যান মায় ম্যানেজারকে পর্যন্ত সেলাম করে না। একমাত্র সেলাম বাজায় ভগবানকে, ঈশ্বরকে।

শ্রোতৃবৃন্দের চোখ বড় বড় হয়ে যায়। এ বড় আজব কয়লাকুঠি তো! এবার উঠে দাঁড়ায় যোসেফ। বলে,—বেহেস্তের বাতটো ছাড়ান দেন কেনে ফাদারদা। সিধে হিসাবটো আমারে বুঝায়ে দেন। ইখানে আমরা কারে সেলাম বাজাব? ভগমানরে, না ঐ উয়াদের?

নাটকীয়ভাবে হাতখানা সে বাড়িয়ে দেয় ওদিক পানে, যেখানে আঁধারে ঘাপটি মেরে বসে আছে পাঁচু হালদারের দল। ভিন্সেন্ট ইতস্ততঃ করে। এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া

মানে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ—সে এখানে এসেছে ওদের আত্মার উন্নতি কামনায়। বিদ্রোহের আগুন জ্বালতে নয়। কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। ওর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হল যোসেফের পরবর্তী প্রশ্নে,—উ কিতাবটোর ভিতর ই-কথা কিছু লিখে নাই? দেখেন কেনে?

হ্যাঁ, এ-প্রশ্নের জবাবে ঈভানজেলিস্ট ভান গর্গ তার অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করবে না। বলে,—আছে যোসেফ। সন্ত মার্ক লিখে গেছেন, প্রভু যীশুর জীবনের একটি ঘটনা। শোন বলি। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলতেন, একমাত্র ঈশ্বরকেই সেলাম বাজানো উচিত। তাই তাঁকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে একবার দুজন পুলিসের অনুচর তাঁর কাছে এসে বললে, প্রভু, তাহলে আমরা কি সীজারের জয়গান গাইব না? সীজার কে তা বুঝেছ তো যোসেফ? প্রভু যীশুর আমলে সে ছিল জমিদার, মানে খোদ মালিক আর কি! ওরা ফন্দি করেছিল, যেই যীশু বলবেন—না, সীজারকে সেলাম করার দরকার নেই, অমনি তারা ওঁকে বন্দী করবে। প্রভু ওদের সেই ফন্দিটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বললেন, আমাকে একটা পয়সা দাও দেখি! ওরা একটা পয়সা এনে দিল। প্রভু বললেন, এর উপর এই মুড্ডুর ছাপটা কার? ওরা বললে, মহামান্য সীজারের। তখন প্রভু বললেন, তাই তো! সীজারের মহিমা দেখছি একটা পয়সার উপর চকচক করছে, অথচ ঈশ্বরের মহিমা পয়সা দিয়ে মাপা যায় না। ফলে সীজারের যেটুকু প্রাপ্য তা সীজারকে দিতে হবে, আর ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দিতে হবে!

সেন্ট মার্কের সুসমাচারের দ্বাদশ অধ্যায়ে এ কাহিনীটা পড়া ছিল ভিন্সেন্টের। হুবহু অনুবাদ সে ইচ্ছা করেই করেনি। ও জানত, এটুকু অদল-বদল না করলে ওর শ্রোতার দল এ কাহিনীর অন্তর্নিহিত সত্যটা ধরতে পারবে না।

যোসেফ বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে,—হুঁ! বুঝলম।

পরদিন খোদ নাথানিয়াল সাহেবের এজলাস থেকে আহ্বান এল ভিন্সেন্টের। মালিক তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এটা আশঙ্কা করাই ছিল। ভিন্সেন্ট প্রস্তুত হয়েই ছিল। মাথা সোজা রেখে সে এসে হাজির হল বড়সাহেবের খাস-কামরায়। প্রকাণ্ড টেবিলের ও-প্রান্তে গদি-আঁটা চেয়ারে বিশাল দেহটা এলিয়ে দিয়ে বসেছিলেন নাথানিয়াল। কী একটা রিপোর্ট দেখছিলেন। পরনে নিখুঁত সাহেবি-স্যুট, মুখে পাইপ। পিছনে ফায়ার-প্লেসে কয়লার ধিকি ধিকি আগুন। ম্যান্টেলপীসের উপর পোর্সেলিনের তৈরী ছোট্ট একটা যীশুর মূর্তি। তার উপর দেওয়ালে ঝোলানো আছে ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের একটি প্রকাণ্ড চিত্র।

আর্দালি ভিন্সেন্টের আগমন ঘোষণা করার পরেও সাহেব মুখ তুলে চাইলেন না। একমনে রিপোর্টটা দেখতে থাকেন। ভিন্সেন্ট ঝকঝকে টেবিলের অপরপ্রান্তে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে বসতে বলা হয়নি। হঠাৎ মুখ তুলে সাহেব ওকে দেখতে পান। তাঁর বিচিত্র ভাষায় যা বলেন তা এই,—ও, তুমি এসেছ? মিস্টার গর্গ, এর আগেও তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি কর্ণপাত করনি। তুমি ধর্মপ্রচারের নামে আমার কোলিয়ারিতে বিদ্রোহ প্রচার করছ। অতএব তোমাকে আমি বরখাস্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। তুমি অবাঞ্ছিত ব্যক্তি।

ভিন্সেন্ট বুঝতে পারে তাকে বসতে বলা হবে না। নিজেই সে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বলে,—মিস্টার নাথানিয়াল, আপনি একটু ভুল করছেন না কি? আমি আপনার বেতনভুক কর্মচারী নই। আমাকে কি আপনি বরখাস্ত করতে পারেন?

—বাজে কথা বল না! তোমার যাবতীয় খরচ যোগাচ্ছে কোম্পানি। দুধকলা দিয়ে কালসাপকে আর আমরা পুষব না ; আমি আজই ফাদার মার্লোকে লিখব তোমাকে এখান থেকে উইড্রথ করে নিতে। তোমার খাওয়া-থাকার বাবদে কোম্পানি আর একটি পয়সাও খরচ করবে না, বুঝেছ?

—না বোঝার তো কিছু নেই, কারণ এবার আপনি আইনসঙ্গত কথা বলেছেন। বেশ, আমি আজই আপনার আস্তাবল ছেড়ে দিচ্ছি।

হঠাৎ ক্ষেপে ওঠেন নাথানিয়াল। বলেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, সূর্যাস্তের আগে এই কোলিয়ারির ত্রিসীমানা ছেড়ে চলে যাবে। আমি তোমার মুখদর্শন করতে চাই না।

ভিন্সেন্ট শান্তকণ্ঠেই জবাব দেয়,—আবার আপনি ভুল করছেন, মিস্টার নাথানিয়াল। এখানকার মাটির নিচেটাই আপনারা ইজারা নিয়েছেন, মাটির উপরের অংশটার মালিক আপনি নন—ঐ উনি, যাঁকে আপনি যীসাস ক্রাইস্টের উপরে স্থান দিয়েছেন—ভারত-সম্রাট! আমার মুখদর্শন করতে না চাইলে আপনাকে নিজগৃহে অন্তরীণ হয়ে থাকতে হবে।

সাট আপ, য়ু পিগ্ হেডেড্ আর্চিন! এ কোলিয়ারির ত্রিসীমানায় তুমি ঢুকবে না। যাও!

ভিন্সেন্ট নীরবে উঠে চলে যাচ্ছিল। আবার তাকে ফিরে ডাকে নাথানিয়াল।

—তুমি এখনই চলে যাচ্ছ তো?

—আপনার আস্তাবল থেকে তো নিশ্চয়। কোলিয়ারি থেকে নয়। আমি ঐ গীর্জায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি।

উঠে দাঁড়ায় নাথানিয়াল। চিৎকার করে ওঠে,—আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে মিস্টার ভান গর্গ! এক কথা কতবার বলব? ঐ গীর্জাটা আমার এলাকার, ওটা কোম্পানির পয়সায় তৈরী, ওটার মালিক আমি। ওখানে তোমার স্থান হবে না। জাস্ট ক্লিয়ার আউট অব মাই টেরিটারি।

ভিন্সেন্ট কিন্তু উত্তেজিত হয়নি। একই ভাবে বলে,—আপনি ক্রমাগত বে-আইনী কথা বলে চলেছেন। আপনার দলিলপত্র ভাল করে পড়ে দেখুন। গীর্জাটা কোম্পানির পয়সায় তৈরী হয়েছে, কোম্পানির জমিতে নির্মিত হয়েছে এটা কোন কথাই নয়—তার চেয়ে বড় কথা কোম্পানি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে মেথডিস্ট চার্চকে একদিন ওটা দান করেছিল। একটা কৌলিয়ারির অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হয়ে আপনি এই সামান্য আইনের কথাটা বুঝতে পারছেন না? ওর মালিক আপনি নন, ওর মালিক মেডডিস্ট চার্চ, যার তরফে আমি কথা বলছি!

জোড়-জাঙ্গাল কোলিয়ারির চতুঃসীমার ভিতরেই কোন দ্বিপদী জীব যে এ-ভাষায় সর্বশক্তিমান অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে পারে এ ছিল নাথানিয়ালের দুঃস্বপ্নেরও অগোচর। ভিন্সেন্ট আর দাঁড়ায়নি। দ্বারের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ পুনরায় পিছন থেকে ডাক শুনতে পায়।

—দাঁড়াও হে আইন-বিশারদ ছোকরা!

ভিন্সেন্ট চৌকাঠের উপরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘুরে তাকায়। উত্তেজনায় নাথানিয়াল হাঁপাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে,—আইনের কেতাব তুমি অনেক পড়েছ দেখছি! ইতিহাস কিছু পড়েছ? নীলকুঠির সাহেবের ইতিহাস? ঐ গীর্জার চৌহদ্দির মধ্যেই তোমাকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে আমি সিঙারণে ভাসিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখি, এটুকু কি

জানা আছে তোমার?

এবার হাসল ভিন্সেন্ট। বলে,—আছে। তা ইতিহাসের কথাই যখন তুললে নাথানিয়াল, তখন আমিও জিজ্ঞাসা করি—তুমি হেনরি দি সেকেণ্ডের ইতিহাস পড়েছ? তোমার চেয়ে লোকটার ক্ষমতা আর দম্ভ কোনটাই কম ছিল না। তোমার মত কোন কোম্পানির চাকুরে ছিল না সে, ছিল একটা দেশের রাজা! গীর্জার চৌহদ্দির মধ্যে সেও একটা কুকর্ম করে বসেছিল—ঠিক যেমন ইঙ্গিত তুমি এই মাত্র দিলে। ফল কি হয়েছিল জান? তিনশো আটানব্বই ঘা চাবুক খেতে হয়েছিল ইংলণ্ডেশ্বরকে নতজানু হয়ে, নগ্ন গাত্রে! উলঙ্গ অবস্থায় ঐ যোসেফ মুর্মুর মত মানুষের হাতে ক-ঘা চাবুক তুমি সহ্য করতে পারবে নাথানিয়াল?—কি হল? বুঝলে না? আমি সেন্ট টমাস বেকেটের ইতিহাসটা তোমাকে পড়ে দেখতে বলছি। আইনের বই নয়, ইতিহাস!

ধীরপদে বেরিয়ে গেল ভিন্সেন্ট।

নাথানিয়াল তখনও ভাষা খুঁজে পায়নি।

নিজের ডেরায় এসে মালপত্র বেঁধে-ছেঁদে নেয়। অন্ধকারের মধ্যে গুটিগুটি এসে দাঁড়ায় লেংটিসার কতকগুলি উলঙ্গ মানুষ—মালকাটার দল। ওরা সব খবর রাখে। ওরা জানে ওদের ফাদারদার ডাক পড়েছিল বড়সাহেবের ঘরে ; জানে, সাহেব ওকে চলে যেতে বলেছে। তাই অন্ধকারের মধ্যে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা—ঈশাক, ভিখু, বুধন, নবা, এককড়ি, আন্টুনি। যোসেফ বলে,—তুমার ব্যবস্থা হই গেছে ফাদারদা। ইখানে তুমি থাকতে পারবে, তা আমরা তখনই বুঝ্‌ছি। চল কেনে, ব্যবস্থা হই গেছে।

না, মালকাটার কুলি-ধাওড়ায় নয়। ওরা জানে সেখানেও ওদের ফাদারদাকে থাকতে দেবে না কোম্পানির সেপাইরা। ইতিমধ্যে ওরা বিকল্প ব্যবস্থা করে ফেলেছে। ওরা ফাদারদাকে রাখবে জোড়-জাঙ্গাল কোলিয়ারির চৌহদ্দির বাইরে। সিঙারণ নদীর ওপারে তেঁতুলডাঙা মাঠের মাঝখানে একটি পরিত্যক্ত কুটিরে। ঐ জোড়া-অশ্বত্থের তলায় গতবছর বর্ষার আগে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন একজন ভবঘুরে সন্ন্যাসী—মৌনীবাবা। বরাকরের এক বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী লালাজী ঐ সন্ন্যাসীর জন্য একটি পর্ণকুটির তৈরী করে দিয়েছিলেন কিছু পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে। সন্ন্যাসী কবে চলে গেছেন, পড়ে আছে শূন্য কুটির। ওটা কোলিয়ারি সীমানার বাইরে, আর ওর মালিক লালাজী। ভিন্সেন্ট বলে,—অতদূরে যাওয়ার কোন দরকার নেই যোসেফ। আমি ঐ গীর্জায় গিয়ে আশ্রয় নেব। গীর্জার মালিক নাথানিয়াল নয়—যীসাস্ নাজারেথ!

সে-রাত্রেই ওরা ওর মালপত্র গীর্জায় পৌঁছে দিয়ে এল। যোসেফ বলেছিল, এমন একা একা তার এখানে থাকাটা ঠিক হবে না। ভিন্সেন্ট কর্ণপাত করেনি। একাই সে আছে গীর্জায়। আশ্চর্য, কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন আপত্তি হল না, কোন উপদ্রব হল না। পরদিন থেকে পাঁচু হালদারের বাড়ি খেতেও আর গেল না। অসুবিধা নেই কিছু। মালাকাটর দল ওর দায়িত্ব নিল যৌথভাবে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান। ওকে খাবার দিয়ে যায়, লণ্ঠন দিয়ে যায়, খাবার জল ভরে দিয়ে যায়। সামর্থ্যে যেটুকু না কুলায় সহানুভূতিতে পুষিয়ে দেয়। ভিন্সেন্ট যথারীতি কুলিবস্তীতে ঘুরে ঘুরে তার সেবাধর্মের কাজ করে যায়। এখানেও কর্তৃপক্ষ থেকে কেউ বাধা দিতে এল না। ভিন্সেন্টের উনিশ বছরের তারুণ্য একটা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিল ; কিন্তু ও-পক্ষ একেবারে উদাসীন। এমন তো হবার কথা নয় ? অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার নাথানিয়াল এতবড় অপমানটা বেমালুম হজম করে যাবে এটা যে অবিশ্বাস্য। ভান গর্গ

সতর্ক হয়, তার ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় দিয়ে সে অনুভব করে আঘাত ঘনিয়ে উঠছে নেপথ্যে।

হয়তো ওর আশঙ্কা অমূলক নয়, হয়তো ওর উপর গোপন আঘাত হানবার আয়োজন সত্যই ঘনিয়ে উঠছিল নেপথ্যে ; কিন্তু তার আগেই এল একটা প্রকাণ্ড ঝড় একেবারে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। জোড়-জাঙ্গাল কোলিয়ারীটা সে ঝড়ের ক্ষ্যাপামিতে একেবারে তছনছ হয়ে গেল। এমন দুর্ঘটনা সব কোলিয়ারিতেই হয়—পাঁচ-দশ বছর অন্তর। সেবার হল জোড়-জাঙ্গালে। সাতান্নজন মালকাটা নিঃশেষে মুছে গেল সে দুর্ঘটনায়। উনিশশো আট সালের সতেরই জানুয়ারী। কোলিয়ারির ইতিহাসে একটা চিহ্নিত তারিখ।

কিন্তু দুর্ঘটনা যেদিন ঘটল তার আগের দিন রাত্রে গীর্জার ভিতরে ঘটেছিল আর একটি নাটকীয় ঘটনা, যেটার কথা আগে বলা দরকার ঃ

রাত তখন কত হবে? ঘড়ি নেই ওর, প্রথম প্রহরের যাম-ঘোষণা হয়ে গেছে। শীতের রাত। জোড়-জাঙ্গাল কোলিয়ারিতে এমন মাঘের রাতে এক প্রহরেই মধ্য রাত্রি। কয়লা কাটার কাজ অবশ্য দিবারাত্রি চলে ; কিন্তু কাঁটাতারের বাইরের জীবনে সেই কয়লা কাটার স্পন্দন শোনা যায় না। চারদিক নিযুতি। খড়ের বিছানায় সতরঞ্চি পেতে গুটি-গুটি হয়ে শুয়ে পড়েছিল চন্দ্রভান। গীর্জার দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। হঠাৎ ওর মনে হল কে যেন ধীরে ধীরে সেই রুদ্ধদ্বারে টোকা মারছে। চট্ করে উঠে বসে। এত রাত্রে কে এল? লণ্ঠনটা নিবিয়ে রেখেছিল, সেটা জ্বেলে দেয়। সাড়া দেয়,—কে?

—আমি! দরজা খুলুন!

—স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। বাতাসী? সে তো এমন রাতে আসে না কখনও? সকালবেলা যথারীতি এসে দুধ দিয়ে যায়। বারণ করলেও শোনে না।

—আমি কে?

—দরজা খুলে দিন, আমি চিত্রলেখা!

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় চন্দ্রভান। দ্বার খুলে দিতেই খোলা দরজা দিয়ে গীর্জায় ঢুকে পড়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া, আর সেই সঙ্গে একটি ভয়ত্রস্তা অভিসারিকা! একেবারে চন্দ্রভানের পায়ের উপর।

—ও কি করছ চিত্রলেখা? কী হয়েছে? এত রাত্রে তুমি কেমন করে এলে?

—আপনি আমাকে বাঁচান ফাদারদা!

—বাঁচান? কেন, কী হয়েছে তোমার?

—আপনাকে ওরা মেরে ফেলবে। আপনি পালান!

—তার মানে? ওঠ, উঠে বস তুমি। আমাকে ওরা মেরে ফেলবে, তাই তোমাকে বাঁচাতে হবে—কী আবোলতাবোল বকছ?

ওর কাঁধ ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় দেখে চিত্রলেখার মুখে একবিন্দু রক্ত নেই। ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। থর থর করে একবার কেঁপে ওঠে সে। পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ভিন্সেন্টের বুকের উপর। সবলে আঁকড়ে ধরে ওকে। বলে,—তুমি এখনই পালাও ফাদারদা, আজ রাত্রেই' আমাকেও নিয়ে চল!

সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যায় চন্দ্রভানের। ওর উনিশ বছরের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কোমল একটি নারী-দেহের অমন অতর্কিত আলিঙ্গনে ভিন্সেন্ট একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ে। ওর বুকে মুখ লুকিয়ে চিত্রলেখা তখন ফুলে ফুলে কাঁদছে।

ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। আস্তে আস্তে নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করে

মেয়েটিকে বসিয়ে দেয় খড়ের বিছানায়। বলে,—এত উতলা হচ্ছ কেন চিত্রলেখা? কী হয়েছে বল?

দু-হাতে মুখ ঢেকে চিত্রলেখা বলে,—যা বলার তা তো বলেছি।

—না, কিছুই বলনি তুমি। কেন আমি পালাব? কাকে ভয় করি আমি? আর তুমিই বা কেন যাবে আমার সঙ্গে? কোন্ অধিকারে তোমাকে আমি নিয়ে যাব? আমি খ্রীষ্টান, তুমি—

—আমিও যদি খ্রীষ্টান হয়ে যাই?

—তা কেন হবে চিত্রলেখা? কেন ধর্মত্যাগ করবে? আমার জন্য?

একটু চুপ করে থাকে মেয়েটি। কী ভাবে জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। শেষকালে যে জবাবটা দেয়, তার অর্থ ঠিকমত বোধগম্য হয় না চন্দ্রভানের। সে নিজেই যদি অতটা উত্তেজিত না হয়ে থাকত তাহলে হয়তো বুঝবার চেষ্টা করত। চিত্রলেখা বললে,—মেয়েদের ধর্ম অন্য জিনিস! সেই ধর্ম বাঁচাতেই আমি ধর্ম ত্যাগ করতে চাইছি। তুমি আমাকে খ্রীষ্টান করে নাও।

—আমি যাজক নই। কাউকে ব্যাপটাইস করবার অধিকার আমার নেই।

এ-কথা চিত্রলেখার উত্থাপিত প্রসঙ্গের পুরো জবাব নয়। চিত্রলেখার বক্তব্যের ভিতর কী একটা গূঢ় ব্যঞ্জনা ছিল, তার আত্মসমর্পণের ভঙ্গিটায়, তার ভাষায় সে আর কিছু একটা বলতে চাইছিল। সেটা নজর এড়াল চন্দ্রভানের। কেন? ওর কি তখন মনে পড়ে গিয়েছিল তার নিজের ধর্মত্যাগের ইতিকথা? এই কৃষ্ণসার অভিসারিকার ভিতর সে কি আর একটি গোরোচনা গোরিকে দেখতে পেয়েছিল তখন? বর্তমানের কি গলা টিপে ধরেছিল অতীত?

এতক্ষণে মুখ থেকে হাতখানা সরালো মেয়েটি। পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলে,—জানি, অত্যন্ত নিলর্জ্জের মত ব্যবহার করছি। কিন্তু জীবনে এমন পর্যায় আসে যখন মানুষ নিলর্জ্জ হতে বাধ্য হয়। তাই জিজ্ঞাসা করছি, আমি কি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম?

—তুমি কী বুঝেছিলে তা আমি জানি না। কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস কর। এখন আমি কিছুতেই এ কোলিয়ারি ছেড়ে যেতে পারব না। এভাবে পালাতে আমি রাজী নই। আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখতে চাই। কোলিয়ারির মালিকের কাছে এভাবে হার স্বীকার করাটা হবে যীসাসের অপমান! সে আমি পারব না। তুমি আমাকে মাপ কর।

চিত্রলেখা উঠে দাঁড়ায়। গায়ের কাপড়টা ঠিক করে নেয়। নিজের প্রগলভতায়, নিজের নির্লজ্জ ব্যবহারে এতক্ষণে সে যেন মরমে মরে যায়। বলে, —মাপ করবেন আমাকে। আপনি আপনার লড়াই করুন। আজ রাতে আমার এ-নির্লজ্জতার কথাটা যদি ভুলে যেতে পারেন খুশি হব।

ধীরপদে চিত্রলেখা বেরিয়ে যায় হিমেল-হাওয়ার অন্ধকারে।

—তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব?

—থাক, দরকার হবে না। ফেরার পথ আমার জানা।

দুর্ঘটনাটা ঘটল তার পরদিন দুপুরে। উনিশশো আট সালের সতেরই জানুয়ারী বেলা এগারোটা দশে। জোড়-জাঙ্গাল কোলিয়ারির প্রাচীন নথিপত্র ঘেঁটে দেখতে পার, দেখবে ঐদিন এগারজন মালকাটাকে জীবন্ত কবর দিয়েছিল ঐ কয়লাখনির দৈত্যটা। কর্তৃপক্ষ চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তিন শিফ্‌টে নিরবচ্ছিন্নভাবে উদ্ধারকার্য চালানো

হয়েছিল—কিন্তু মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা যায়নি। আর উদ্ধার করা হলেই বা কি লাভ হত? কবর টেনে বার করে আর এক কবরে শুইয়ে দিতে হত তাদের। ধাওড়ার মালকাটারা অবশ্য অন্য কথা বলে। তাদের হিসাবমত ঐদিন কুলি-ধাওড়া থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিল সাতান্নজন মানুষ—মেয়ে-মদ্দ-বাচ্চা ছেলেমেয়ে। ঐ সাতান্নজন মানুষকে আর কোনদিন কেউ দেখেননি খোলা আকাশের নিচে। কর্তৃপক্ষের নথীপত্র সেকথা বলে না। তাঁদের হিসাবে বাকি ছেচল্লিশজন মানুষ আদৌ কোন দুর্ঘটনায় মারা যায়নি। তারা তারপরেও কাজ করে গেছে, কেউ তিনদিন, কেউ সাত-দশদিন। বিশ্বাস না হয় কোলিয়ারির খাতাপত্র দেখতে পার। হাজিরা খাতায় তাদের নাম আছে। পিট-অ্যাটেণ্ডন্স রেজিস্টারে তাদের নাম উঠেছে, বাতিঘরের হিসাব খাতায় তাদের নামে লণ্ঠন ইসু করা হয়েছে ; সপ্তাহান্তে রীতিমত টিপ ছাপ দিয়ে তারা হাজরির টাকাও নিয়ে গেছে। তারপর তারা কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে, কেন চলে গেছে তা কে জানে? কোলিয়ারির হিসাবে সাতান্ন নয়, এগারোজন মারা যায় ঐদিন।

চন্দ্রভান খবর পেয়ে যখন খাদ-ভস্‌কার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন সেখানে চাপ ভীড়। অসহায় মানুষগুলো ছোটাছুটি করছে, আর্তকণ্ঠে বিলাপ করছে, খাদে নামতে চাইছে। গুর্খা সেপাইয়ের দল কাঁটাতারের বাইরে ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে। ভিতরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ভীড় হঠাও—তফাৎ যাও!

চন্দ্রভান হঠাৎ দেখতে পায়—বাতিঘর থেকে লণ্ঠন নিয়ে এককড়ি এদিকেই আসছে ছুটতে ছুটতে। চন্দ্রভান ছুটে এসে চেপে ধরে ওর বাহুমূল। বলে,—কতজন আছে খাদের ভিতরে?

—বারোটা সেল। প্রতি সেলে পাঁচজন।

—ওদের বাঁচানো যাবে না?

—তা কেমনে বলব? হাত ছাড়ুন, আমি নিচে যাব।

—আমাকেও সঙ্গে নাও সরখেল।

—না। এলেমদার না হলে চলবে না। আপনি উপরে থাকুন।

আরও চারজন এক্সপার্ট হেল্‌পারের সঙ্গে এককড়ি সরখেল নেমে গেল অগ্নিগর্ভ খাদের ভিতরে।

কাঁটাতারের ওপারে একটা অবর্ণনীয় দৃশ্য। ভয়ে আতঙ্কে হতাশায় মানুষগুলো দিশেহারা। শিশু আর নারীর দল বীভৎস চিৎকার জুড়েছে। কারও মরদ, কারও জেনানা, কারও বাচ্চা নিচে আছে। গুর্খা সেপাইয়ের শাসন ওরা মানছে না, কাঁটাতারের বাধা মানছে না, ভীড় ঠেলে বারে বারে এগিয়ে আসছে।

—মুনিয়া রে! এ মেরা মুনিয়া!

কারও মুনিয়া, কারও নানকু, কারও বুলাকি। মায়ের প্রাণ, ওরা মানবে কেন?

একটু পরেই খাঁচাটা উঠে এল উপরে। খাঁচা থেকে ধরাধরি করে তিনটি অচৈতন্য অগ্নিদগ্ধ দেহ নামিয়ে আনে হেল্‌পারের দল। দুটি বাচ্চা, একটা পূর্ণদেহী মানুষ। সর্বাঙ্গ পুড়ে গেছে।

—কৌন হ্যয়? কৌন? জিন্দা ইয়ে মুর্দা?

—নাম বুলছ না কেনে গ তুমরা?

নাম বলবে কেমন করে? চিনতেই কি পেরেছে ছাই! খাদের আগুনে শুধু রূপ নয়, নাম ও রূপ দুই-ই বিসর্জন দিয়ে এসেছে যে ওরা। সনাক্তের অতীত। মাথার চুল থেকে

পায়ের নখ পর্যন্ত এমনভাবে ঝল্‌সে গেছে যে, তারা এখন পরিচয়ের বাইরে। গেটের সামনে ওদের নামিয়ে দিয়ে রেসকিউ-পার্টির ছেলেগুলো আবার ছুটে ফিরে গেল খাঁচায়। আবার নিচে যাবে ওরা।

আতঙ্কের যে তুঙ্গশীর্ষে উঠলে মানুষের হিতাহিত বোধ হারিয়ে যায় ওরা সেখানে এসে পৌঁছেছে। আত্মীয়-বিয়োগব্যথা ভুলে মানুষগুলো ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় ঐ অগ্নিদগ্ধ বীভৎস মূর্তি তিনটি দেখে। চন্দ্রভান চিৎকার করে ওঠে,—কি দেখছিস তোরা? তেল, তেল, কিছু নারকেল তেল নিয়ে আয় শীগগির! ঢেকে দে পোড়া ঘাগুলো, হাওয়া না লাগে!

গায়ের সুতির চাদরটা খুলে সে প্রথমেই ঢেকে দেয় পূর্ণাবয়ব মানুষটির সর্বাঙ্গ।

চারদিকে তাকিয়ে দেখে ভীড়ের মাঝখানে যারা আছে তাদের সঙ্গে লেংটি অথবা খাটো ধুতি। মেয়েদের একটি করে লাজবস্ত্র। একেবারে উলঙ্গ না হলে ওরা একটুকরো কাপড় দিয়েও সাহায্য করতে পারবে না। তাছাড়া ওদের কাপড় কয়লায় ভর্তি, ময়লায় ভরা। ঐ কাপড়ে অগ্নিদগ্ধ অঙ্গগুলি ঢেকে দিলে সেপ্‌টিক হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে কে বুঝি কোথা থেকে এক বোতল নারকেল তেল এনে ফেলেছে। চন্দ্রভান নিজের হাফসার্টটা খুলে ফেলে, গেঞ্জিটাও। ফালা ফালা করে ব্যাণ্ডেজ বানায়। তেলে ডুবিয়ে বাচ্চা দুটোকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলে।

সমস্ত দিনরাত এবং তার পরের পুরোটা দিন উদ্ধারকারীর দল কাজ করে গেল। বরাকর, আসানসোল থেকে গাড়ি করে সাহেবরা এলেন। খাদের ত্রিসীমানায় মালকাটাদের যেতে দেওয়া হল না। সর্বসমেত এগারোটি মৃতদেহ উঠিয়ে আনতে পেরেছিল ওরা। প্রথম খেপে যে তিনজন উঠেছিল তার ভিতর বাচ্চা দুটি বাঁচেনি। শুধু বেঁচেছিল তখনও ঐ পূর্ণাবয়ব মানুষটা। দুর্জয় প্রাণশক্তি তার। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাকে সনাক্ত করা গেছে। দেহটা তিন নম্বর পিটের মালকাটা যোসেফ মুর্মুর। একমাত্র সেই বেঁচে ফিরেছে। তবে এবার সেজন্য তাকে অভিনন্দন জানাবার কেউ নেই। যোসেফের বউ, বড় ছেলে এবং কিষ্টো রয়ে গেছে খাদের নিচে!

আটচল্লিশ ঘন্টা একটানা উদ্ধার-কার্য চালানোর পর এ ব্যর্থ প্রয়াস বন্ধ হল। এখন আর ওদের উদ্ধারের চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম। এতক্ষণ ওরা বেঁচে থাকতে পারে না। পারা সম্ভবপর নয়। আগুনে যদি নাও পুড়ে থাকে, বাতাসের অভাবে এতক্ষণে মারা গেছে নিশ্চয়।

শেষ মৃতদেহ যেটি ওরা উঠিয়ে আনল সে দুর্ঘটনায় মরেনি। কারণ সে পিটে নেমেছিল বিস্ফোরণের আধ ঘন্টা পরে। লোকটা ওভারম্যান এককড়ি সরখেল।

নিদারুণ শোকের আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল জোড়-জাঙ্গাল কোলিয়ারির জীবন-যাত্রা। বলয়ার হাউসে আগুন নিভল, পিট-হেড গিয়ারের বিরাট চাকাটা থেমে রইল, সিটি বাজল না সকাল সন্ধ্যায়। ঘরে ঘরে শুধু মড়াকান্না। কারও মরদ, কারও স্ত্রী, কারও বা সন্তান। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা ছাড়া আর কি জানে ওরা? যোসেফ মর্মু বেঁচে আছে এখনও, জ্ঞান আছে, কথা বলতে পারে না। হাসপাতাল বলে কোন কিছু নেই জোড়-জাঙ্গালে। যোসেফ আছে তার নিজের ছাপরায়। একাই পড়ে আছে। ওর একটা বাচ্চা আশ্রয় পেয়েছে ঈশাকের কাছে ; দ্বিতীয়টা নিয়ে গেছে বাতাসী। আশ্চর্য মেয়েটা! মান্‌কুর মৃত্যুতে আছাড় খেয়ে পড়েছিল প্রথমটায়। কিন্তু সামলে নিতে সময় লাগেনি তার। দুদিনেই উঠে বসেছে আবার। তার শূন্য ঘর আবার পূর্ণ করেছে যোসেফের মা-

মরা শিশুটিকেই আশ্রয় দিয়ে। ভিন্সেন্ট ঘরে ঘরে ঘুরে মরে। কী সান্ত্বনা জানাবে ভেবে পায় না। ঈশাক রুহিদাসের মেয়ে যোসেফের সেবার ভার নিয়েছে। বাতাসীর ছাপরায় ভিন্সেন্ট যখন গিয়ে দাঁড়াল, মেয়েটা ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের উপর। ওর পায়ের উপর মুখ ঘষতে ঘষতে বললে,—কেনে? কেনে? কেনে? তু তো বুল্‌তিস ভগবান দয়াময়? তাইলে কেনে উ মোর নান্‌কুরে পুড়ায়ে মারলে? তু বল্ ফাদারদা—কী এ্যান্যায়টো করছিলম মোরা?

পঙ্খিরাজ নয়, আজ ফাদারদা বলেই ডাকল ওকে।

কোনদিন বাতাসীর গাত্রস্পর্শ করেনি। আজ ঐ কুলটা মেয়েটির বাহুমূল ধরে ভিন্সেন্ট ওকে উঠিয়ে বসায়। কোঁচার খুঁটি দিয়ে ওর কয়লামাখা মুখটা মুছিয়ে দেয়, রুক্ষ চুলে হাত বুলায়। কী সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায় না।

চারদিনের দিন আবার সিটি বাজছে কারখানার হাজরি-ঘরে। শোকসম্বরণের নির্দেশ। যে-যার কাজে যাও। মৃত্যু যেন জীবনের পথরোধ করে না দাঁড়ায়। পৃথিবীর বুক থেকে কালো-হীরে আহরণের এ বিরাট উদ্যোগ তো চিরকাল বন্ধ হয়ে থাকবে না কজন মালকাটার অকাল মৃত্যুতে। পেট বড় অবুঝ। সেই পেটের দায়ে ফিরে এসো আবার। চোখের জল মোছ, তুলে নাও গাঁইতা আর খাঁচিয়া। আর ডেভিস-ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোকবর্তিকা। নেমে যাও গুটিগুটি অবক্ষয়ী জীবনের ঐ অতল খাদে!

ওরা সে নির্দেশ মানল না। কেউ হাজিরা দিতে এল না।

স্ট্রাইক কাকে বলে ওরা জানে না, ধর্মঘট কথাটা ওরা শোনেনি। কেউ কোন নির্দেশ দেয়নি, মিটিং করেনি, কারও পরামর্শ অথবা প্রচারের প্রয়োজন হল না। কলয়াখনির হাজিরার ভোঁ বেজেই গেল। ওরা কাজে এল না কেউ।

কোলিয়ারির কাজ বন্ধ রইল। একদিন। দুদিন।

পাঁচু হালদারের দল এল ধাওড়ায়। বোঝালো। শাসালো। নতুন মালকাটা আমদানি করার হুমকি দেখালো। এরা কোন জবাব দিল না। জবাবদিহি করল না। ভিন্সেন্ট ওদের কাজ বন্ধ করার কথা বলেনি, সে-কথা ওর মনেও আসেনি। ও শুধু ওদের সকলকে ডাক দিল গীর্জায়। সন্ধ্যাবেলা সকলকে সমবেত হতে বলল। যে আটান্নজন মানুষ ঐ দুর্ঘটনায় মারা গেল, যাদের আর দেখা যাবে না এই জোড়-জাঙ্গাল কয়লাকুঠিতে তাদের আত্মার সদ্‌গতি কামনায় ওরা সমবেত প্রার্থনা করবে। ব্যাপারটা ওরা বুঝতে পারল না ঠিক। এমন কথা ইতিপূর্বে ওরা শোনেনি। আত্মার সদ্‌গতি কামনা আবার কি? নিদারুণ শোকে এমনিতেই ওরা বিহ্বল। তবে নাকি ওদের ফাদারদার আহ্বান। তাই সাড়া দিল ওরা। সন্ধ্যাবেলা গুটিগুটি এসে হাজির হল শোকবিহ্বল শীর্ণকায় নগ্নগাত্র কজন মানুষ। সাঁওতাল, ভুঁইহার, কুর্মি, কোল, বাগদি, নমশূদ্র। হিন্দু-মুসলমান এবং খ্রীষ্টান। উবু হয়ে বসল গীর্জার ভিতর।

দুর্ঘটনা ঘটার পর পাঁচদিন কেটে গেছে। এ ক-দিন বস্তুত চন্দ্রভানের পেটেও কিছু অন্নজল পড়েনি। পাঁচু হালদারের বাড়ির ব্যবস্থা তো অনেকদিন ঘুচে গেছে। এতদিন মালকাটারাই তাদের মুখের গ্রাস থেকে যা হোক কিছু দিয়ে যেত। এখন তাও বন্ধ। তাদের মাথার ঠিক নেই। বাতাসীও তার সকালের দুধের যোগান দিতে আসে না। নান্‌কুর মৃত্যু আর যোসেফের শিশুর ব্যাপারে সেও ভুলে গেছে ফাদারদার কথা। এ ক-দিন কি খেয়েছে মনে নেই ওর। কোথাও কারও ছাপরায় কেউ যদি হাত বাড়িয়ে কিছু দিয়ে থাকে অভ্যাসবশে মুখে পুরেছে। চোখদুটো তার কোটরে বসে গেছে। গালে

গজিয়েছে কদিনের না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। খালি গা, খালি পা। কোঁচার খুটটা জড়িয়েছে গায়ে। খ্রীষ্টান শোকাচার নয়—মহাগুরুনিপাতের অশৌচ পালন করছে যেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। খড়ের বিছানাতেই আধশোয়া অবস্থায় সার্মন দিল ভিন্সেন্ট ভান গর্গ। জোড়-জাঙ্গাল কোলিয়ারির ঈভানজেলিস্ট। খাদের ভিতর অগ্নিদগ্ধ হয়ে, দম বন্ধ হয়ে যারা মারা গেছে তাদের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করল। এ দুনিয়ায় এসে সেই হতভাগ্য মানুষগুলো শুধু বঞ্চনাই সয়ে গেছে, যন্ত্রণাই ভোগ করে গেছে—যে করুণাময় ঈশ্বর! এবার তুমি তাদের কোলে টেনে নিয়েছ, তোমার স্বর্গরাজ্যে তারা যেন শান্তি পায়।

কালি-ওঠা লণ্ঠনের ভূতুড়ে আলোয় মানুষগুলো উবু হয়ে বসে আছে। যোসেফ রোগশয্যায়। অনুপস্থিত। না হলে হয়তো শোনা যেত,—'আমিন'! ওরা কেউ কিছু বলল না। মাথা নিচু করে বসেই রইল।

হঠাৎ তীব্র একটা আলোর ঝলকানি। জোরালো একটা আলোর ধুমকেতু সমস্ত চত্বরটার উপর ঝাঁটা বুলিয়ে গেল। গীর্জার সামনে এসে দাঁড়ায় একটা হাওয়া গাড়ি। তারই হেডলাইটের আলো। মশ্‌মশ্‌ ভারি জুতোর শব্দ। লোকগুলো ভয়ে কুঁকড়ে যায়। টর্চের আলো এসে পড়ে ভিন্সেন্টের মুখে। হাত দিয়ে সে চোখটা আড়াল করে। চিনতে পারে সে। কোনক্রমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। আগন্তুকদল বিশিষ্ট অতিথি। ওঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে পাঁচু হালদার। ভিন্সেন্ট কোনক্রমে বলে,—আসুন রেভারেণ্ড মার্লো, আসুন ব্রাদার দাভিদ। আপনারা ঠিক সময়েই এসে পৌঁচেছেন। জোড়-জাঙ্গাল কোলিয়ারির আজ বড় দুর্দিন। দুর্ঘটনায় যে আটান্নজন দুর্ভাগা মানুষ মারা গেছে—

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ভীড়ের পিছন থেকে নাথানিয়াল বলে ওঠে, —আটান্নজন নয়, এগারোজন!

তাঁকেও থামিয়ে দেন রেভারেণ্ড মার্লো। বলেন,—আপনি শান্ত হন মিস্টার নাথানিয়াল। লেট মি ট্যাকল দ্য সিচুয়েশন।

রেভারেণ্ড দাভিদের দিকে ফিরে বলেন,—এ যে অবিশ্বাস্য! আমরা কি ভারতবর্ষে আছি, না আফ্রিকার জঙ্গলে এসে পৌঁছেছি?

মাথা নেড়ে দাভিদ বলেন,—জানি না কতটা ক্ষতি ও করেছে। এ মানুষগুলোকে আবার কোনদিন ক্রিশ্চিয়ান করা যাবে কিনা তাই ভাবছি আমি।

রেভারেণ্ড মার্লো পঞ্চাননকে বলেন,—ঐ লোকগুলোকে চলে যেতে বল।

ইংরাজি আদেশটা অনুবাদ করা প্রয়োজন হল না। লোকগুলো বুঝতে পারে। তারা উঠে দাঁড়ায়। আতঙ্কতাড়িত মানুষগুলো দ্বারের দিকে এগিয়ে যায়।

ভিন্সেন্ট আপত্তি তোলে,—সে কি! আমাদের ফিউনারাল সার্ভিস এখনও শেষ হয়নি!

—তুমি থাম তো হে ছোকরা!—ধমক দিয়ে ওঠেন রেভারেণ্ড মার্লো।

মালাকাটর দল সদলবলে বেরিয়ে যায়।

ঘর খালি হতে রেভারেণ্ড মার্লো মুখোমুখি দাঁড়ালেন অনশনক্লিষ্ট কঙ্কালসার মানুষটার সামনে। রেভারেণ্ড সাহেবের নিখুঁত পাদ্রীর পোশাক। ভিন্সেন্টের অনাবৃত দেহটা আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন,—তোমার লজ্জা হয় না! হ্যাভ য়ু নো সেন্স

অফ ডিসেন্সি অর ডেকোরাম? খালি পা, খালি গা,—তুমি সার্মন দিচ্ছ শুয়ে শুয়ে মেথডিস্ট চার্চে! প্রভু যীসাসের মহিমা তুমি কোণ্ আস্তাকুড়ে লুটিয়ে দিয়েছ বুঝতে পার না? তুমি কি পাগল?

—পাগল নয়, শয়তান! ডেভিল!—ফোড়ন কাটে নাথানিয়াল।

ভিন্সেন্ট কি যেন বলতে যায়, পারে না।

রেভারেণ্ড মার্লো গম্ভীরস্বরে বলেন, —মঁসিয়ে ভান গর্গ, আমি দুঃখিত ;—কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আপনাকে বরখাস্ত করছি। পবিত্র মেথডিস্ট চার্চের সঙ্গে অতঃপর আপনার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। আপনি আপনার মালপত্র নিয়ে এ চার্চ ছেড়ে এখনই চলে যান। একে আর অপবিত্র করবেন না।

—এবারেও কোন জবাব দিল না ভিন্সেন্ট।

—ওয়েল, মঁসিয়ে ভান গর্গ, আত্মপক্ষ সমর্থন করে আপনার কি কিছুই বলার নেই?

একমাথা রুক্ষচুল সমেত মাথাটা নেড়ে ভিন্সেন্ট জানায়,—না!

—আপনাকে ফিরে যাবার ট্রেন ভাড়াটা দিয়ে যাব কি?

নিচু হয়ে বিছানাটা গুটিয়ে তুলছিল সে। এবারও মুখ না তুলে মাথা নেড়ে অস্বীকার করে।

রেভারেণ্ড এবার নাথানিয়ালের দিকে ফিরে বলেন,—এ লোকটি বেরিয়ে গেলে দরজায় তালা দিতে বলুন। যতদিন আমরা পুনরায় কোন ক্রিশ্চিয়ান মিনিস্টার পাঠাতে না পারছি ততদিন চার্চ বন্ধ থাকবে।

নাথানিয়াল একটি অভিবাদন করে বলেন,—যথা আজ্ঞা ফাদার। এবার দয়া করে আমার গরীবখানায় চলুন। ওখানে সব ব্যবস্থা হয়েছে।

ওঁরা সদলবলে বেরিয়ে গেলেন।

চন্দ্রভানও তার বিছানার বাণ্ডিল ও ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে আবার পথে নামে।

সামনে নীরন্ধ্র অন্ধকার।

নতুন করে জীবনের সালতামামি করতে বসেছে ভিন্সেন্ট। সব কিছুই শূন্য হয়ে গেছে হঠাৎ। উনিশ বছরের জীবনেই সব কিছু ফুরিয়ে গেল যেন। বাপ-মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল শৈশবে—দুরন্ত অভিমানে সব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল ; জীবনের নূতন অর্থ খুঁজে পেয়েছিল ফাদার শারদাঁর আশীর্বাদে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে শিখেছিল। দৃঢ় বিশ্বাসের সম্বলটুকু নিয়ে এখানে এসেছিল সেবা করতে, ঈশ্বরের জয়গান গাইতে। বাধা পেল দু-দিক থেকেই। চার্চ থেকে বিতাড়িত হল, গীর্জায় তার প্রবেশ মানা। মুখ ফিরিয়ে নিল কুলি-ধাওড়ার মানুষগুলো—যাদের সেবা করতে, যাদের ভালবাসতে সবকিছু ছেড়ে সে ছুটে এসেছিল এখানে। সে আঘাতটাই বেশি করে বেজেছে ওর।

দুর্ঘটনায় ওরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তিল তিল করে ওদের স্বাভাবিক করে তুলবার চেষ্টা করছিল ভিন্সেন্ট! যোসেফ মুর্মু নেই, এককড়ি সরখেল মারা গেছে—ওরা ওদের ফাদারদাকেই দলপতি ঠাওরালে। ভিন্সেন্ট শ্রমিক আন্দোলনের কিছুই জানে না ; সাধারণ বুদ্ধিতে ওর মনে হয়েছিল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে কব্জা করতে হলে এদের দলবেঁধে প্রতিবাদ করতে হবে। বেশি কিছু চায়নি তারা—কিছু নিরাপত্তার ব্যবস্থা, ভরপেট খাওয়ার মত মজুরি, আর দুর্ঘটনায় মৃত মালকাটাদের অসহায় পরিবারবর্গের জন্য কিছু সাহায্য। কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করল না। ভিন্সেন্ট ওদের ঘরে ঘরে গিয়ে পরামর্শ দিয়েছিল,—কেউ কাজে যাবি না, দেখি ওরা কতদিন কয়লাকুঠি বন্ধ করে রাখতে পারে?

নিদারুণ অভিমানে ওরা সায় দিয়েছিল,—হঁ! ই কি মঘের মুলুক বটে? মোরা কেউ যাব্‌ক নাই!

ফলে যা হয়ে থাকে। তিল তিল করে অনশনের মুখে এগিয়ে যায় মানুষগুলো। অর্ধাহার, অনাহার—পেট বড় অবুঝ! জমানো পুঁজি কারও নেই। ধার মেলে না। ওরা মরিয়া হয়ে ওঠে।

ভিন্সেন্ট বলে,—তোরা ধাওড়া ছেড়ে নিজের নিজের দেশঘরে ফিরে যা!

দেশঘর? সেটা আবার কি? ওরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এই ধাওড়াই তো তাদের দেশঘর। এখানেই জন্মেছে, এখানেই মরতে দেখেছে বাপ-জ্যাঠাদের। জোড়-জাঙ্গাল কোলিয়ারির বাইরে যে দুনিয়া আছে এটা ওরা জানেই না। মাঝে মাঝে গেছে রাণীগঞ্জ, বরাকর, আসানসোল ; কিন্তু সেখানে কে ওদের খেতে দেবে? থাকতে দেবে?

শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করতে হল। মাথা নিচু করে বারোদিন অনশনের পরে ওরা গুটি গুটি এসে হাজির হল কয়লাকুঠির ফটকের সামনে।

পাঁচু হালদারের দল হেসে বলে,—সেই তো পানি খেলি, তবে কেন জল ঘোলালি?

সবচেয়ে করুণ অধ্যায়—এ নিদারুণ পরাজয়, এ অপমানের জন্য ঐ মালকাটার দল ঈশ্বরকে অভিশাপ দিল না, কর্তৃপক্ষকে গাল পাড়ল না, উল্টে দায়ী করল তাদের

ফাদারদাকে। সে-ই তো কাজ বন্ধ করার পরামর্শটা দিয়েছিল প্রথমে! ওরা তাকে এড়িয়ে যায়। পাঁচু হালদারের দলও তাই চায়, বলে,—ঐ ফাদারদার সাথে যে বাৎ করবে তারে ছাঁটাই করব কিন্তুক্—হঁ!

গীর্জা থেকে বিতাড়িত হয়ে ভিন্সেন্ট এসে উঠেছে তেঁতুলডাঙার মাঠে, সন্ন্যাসীর পরিত্যক্ত কুটিরে। হেরে গেছে সে। সব দিকে। কোলিয়ারিতে সে অবাঞ্ছিত। কর্তৃপক্ষ, চার্চ-সম্প্রদায়, মায় মালকাটারাও তাকে পরিহার করে চলে। এ-পাশে তেঁতুলডাঙার কোলিয়ারি। মাঝখানে সিঙারণ নদী। ভিন্সেন্ট আজ অন্তেবাসী। একা।

তার চেয়েও করুণ অধ্যায় ওর বিশ্বাসের ভিতটা গেছে নড়ে। কোথায় তার দীনের বন্ধু পরম করুণাময় ঈশ্বর? কোথায় সেই শিষ্টপালন দুষ্টদমন ন্যায়াধীশ? সব মিথ্যা! সব ভুল! ঈশ্বর নেই! থাকলেও তিনি হয় মূক, নয় বধির—নাহলে উদাসীন! ধরা যাক যোসেফ মুর্মুর মৃত্যুর কথাটা। লোকটা মৃত্যুর উল্লেখ সইতে পারত না। কয়লাখনির আগুনের বেড়াজাল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল ঠিক—অথচ বাঁচল না। কী প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের ঐ ধর্মভীরু মানুষটাকে বাইরে টেনে এনে ওভাবে দশ দিন বাঁচিয়ে রাখার? সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা নিয়ে লোকটা ক্রমাগত কাতরেছে আর মৃত্যু কামনা করেছে। জ্ঞান ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল তার। ভিন্সেন্ট বসেছিল ওর মৃত্যুশয্যার পাশে। ও শুধু দেখছিল ঐ অসহায় মানুষটাকে—যার একমাত্র কামনা ছিল, যন্ত্রণার অবসান—মৃত্যু! এই কি করুণাময় ঈশ্বরের লীলা? দশ দিন লোকটাকে ঐভাবে জিইয়ে রাখায়?

এরই মধ্যে ওর কাছে একটা হাতচিঠি পাঠিয়েছিল চিত্রলেখা। মালকাটাদের একটা বাচ্চার হাতে। প্রেমপত্র পড়ে মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল ভিন্সেন্টের। এরা কি মানুষ? কোলিয়ারির এতবড় সর্বনাশের সময় চিত্রলেখা গৃহত্যাগের স্বপ্ন দেখেছে! ঐ ছেলেটার হাতেই কড়াসুরে জবাব পাঠিয়েছিল ভিন্সেন্ট। লিখেছিল, এভাবে যেন ভবিষ্যতে চিত্রলেখা তাকে আর বিরক্ত না করে!

ফাদার শারদাঁকে কোন চিঠি দেয়নি এখানে আসার পর। এবার লিখেছে। সব লিখেছে। সব কথা জানিয়ে। নির্দেশ চেয়েছে এবার সে কি করবে। ফিরে যাবে? উত্তরের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে ভিন্সেন্ট। কয়লাকুঠির জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কেউ ওর সঙ্গে কথা বলে না। একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ নষ্ট মেয়েমানুষটা—বাতাসী। রোজ সকালে এসে একঘটি দুধ সে আজও খাইয়ে যায় তাকে। নান্‌কু নেই—দুধের পরিমাণটা বেড়েছে। কমেছে প্রগল্‌ভতাটা। কৌতুকময়ী দেহোপজীবিনী যেন সে নয়, সন্তানহারা অভাগিনী আজ।

হাতে কাজ নেই, মনটা ফাঁকা, প্রতীক্ষা করছে ফাদার শারদাঁর নির্দেশের। অলস ভঙ্গিতে দিন কেটে যায়। একদিন হঠাৎ কি খেয়াল হল, এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে সামনের ঐ সেতুটা আঁকতে বসল। আর কিছু নয়, সময়টা তো কাটবে। এ-পারে তেঁতুলডাঙার ঊষর বন্ধ্যা মাঠ, ও-পাশে জোড়-জাঙ্গাল কেলিয়ারির নিষিদ্ধ জীবনছন্দ—মাঝখানে ক্ষীণ একটা কাঠের সেতু। কতকগুলি মালকাটা স্নান করছে। কাপড় কাচছে। একটা ছোট ডিঙি নৌকাও বাঁধা আছে। সাঁকোর উপর দিয়ে মাঝে মাঝে পার হয়ে যাচ্ছে এক ঘোড়ার গাড়ি, গো-যান।

সারাটা দিনমান ভিন্সেন্ট ঐ সাঁকোটার ছবি আঁকল বসে বসে।

আশ্চর্য একটা অনুভূতি। দিনটা কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পায়নি। ও বিশেষ

কিছু মনে করে আঁকতে বসেনি, চেয়েছিল শুধু সময়টা কাটাতে—কিন্তু ছবিখানা শেষ করে ওর মনে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি এল।

কাগজের চতুঃসীমায় আবদ্ধ ঐ ছোট্ট ভূখণ্ডে ঈশ্বরের সৃষ্ট দুনিয়া নয়—এ তার নিজের সৃষ্ট জগৎ! এখানে তার হুকুমে সব কিছু চলবে। এখানকার মালকাটারা নেমকহারাম নয়, এখানকার যোসেফ মুর্মু আগুনে পুড়ে মরে না, এখানকার নান্‌কুকে সে তার বারাঙ্গনা মায়ের কোল খালি করে পালাতে দেবে না! এ রাজ্যের একছত্র মালিক ভিন্সেন্ট ভান গর্গ—কোনও খেয়ালী, উদাসীন বিশ্বনিয়ন্তা নন!

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এ এক অদ্ভুত অনুভূতি!

ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ছবিটা ভাল হয়নি। চোখের সামনে যা দেখেছে তা ফুটে ওঠেনি কাগজের বুকে। পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে ওর ধারণা নেই। দৃশ্যপটের বিলীয়মান বিন্দু কাকে বলে জানে না। দেবনারায়ণবাবুর ক্লাসে যদি আর একটু মন দিয়ে ছবি আঁকা শিখত, তাহলে আরও ভাল করে আঁকতে পারত। তা হোক, ও তো ঐ সাঁকোটার হুবহু ছবি আঁকতে চায়নি। ও চেয়েছিল ওর মনগড়া একটা মিলন-সেতু রচনা করতে। ওর সেতু তেঁতুলডাঙার ঊষর বন্ধ্যা মাটির সঙ্গে জোড়-জাঙ্গালের কোলিয়ারিকে যুক্ত করেনি—করেছে ওর নিরীশ্বর নিরানন্দ ঊষর জীবনের সঙ্গে শিল্প-জগতের নূতন আনন্দলোকের। এ তার মনোময় সাঁকো, তার অন্তর্লোকের একটি ভাবরূপ সে মূর্ত করেছে ঐ কাঁচা হাতের ছবিখানায়।

একটা নূতন অনুভূতি, নূতন চেতনা। না, ভিন্সেন্টের সবকিছু শূন্য হয়ে যায়নি। সে নূতন মনোময় জগৎ সৃষ্টি করবে—কাগজের বুকে, ক্যানভাসের উপর! ফাদার শারদাঁ ওকে উপনিষদ থেকে পড়িয়েছিলেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা! আজ অপরিসীম বেদনার মধ্যে দিয়ে ভিন্সেন্ট উপলব্ধি করল আর একটা নূতন সত্য—ব্রহ্ম মিথ্যা, জগৎ সত্য!!

এ জগৎকে সে নূতন করে সৃষ্টি করবে। সে শিল্পী হবে, চিত্রকর হবে। এই তার জীবনের নূতন দীক্ষা!

মনে পড়ল সিস্টিন চ্যাপেলে আঁকা মিকেলাঞ্জেলোর 'শেষবিচারে'র সেই অনবদ্য চিত্রটির কথা। ঈশ্বর অলীক, ঈশ্বর মায়া—কিন্তু যীসাস বাস্তব সত্য! তাঁর দুঃখ ভোগ কোন ধর্মযাজকের কল্পনাবিলাস নয়! মিকেলাঞ্জেলো সেই যীসাস ক্রাইষ্টকে চিরাচরিত পদ্ধতিতে আঁকেননি—অনশনক্লিষ্ট, শীর্ণকায়, নতশির প্রৌঢ় মানুষটি নন, তাঁর হাতেপায়ে পেরেকের দাগ আর আনত মস্তকে মৃত্যু-যন্ত্রণার ব্যঞ্জনা নয়—মিকেলাঞ্জেলো যীসাসকে এঁকেছেন উনিশ বছরের তরুণের রূপে। শালপ্রাংশু মহাভুজ তিনি, পেশীবহুল দীর্ঘ অবয়ব, গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর মত, গোলিয়াথ্-দমন ডেভিডের মত, নিমীয়ান্ সিংহদলন হারকিউলিসের মত! এমন যীসাসকে ঈশ্বর গড়তে পারেননি, পেরেছেন মিকেলাঞ্জেলো বুয়োনারতি! ঈশ্বর যা পারেন না, শিল্পী তাই পারে!

ভিন্সেন্টও এমন অবাক দুনিয়া সৃজন করবে!

ওর ব্যাগে ছিল কিছু কাগজ আর একটা পেন্সিল। ভিন্সেন্ট সাঁকো পার হয়ে জোড়-জাঙ্গালে প্রবেশ করল গুটিগুটি। কেউ তাকে কিছু বলে না। সে আপন মনে বসে পড়ে পথের ধারে, কয়লা স্তূপের উপর, কখনও বা কারও দাওয়ায়। যা দেখে তাই আঁকে। শুধু যা দেখে তাই নয়, যা দেখলে সে খুশি হত তাও। মালকাটার দল সার বেঁধে চলেছে, টেবিল থেকে কয়লার টুকরো বেছে তুলছে, মালবোঝাই টব ঠেলে নিয়ে

চলেছে। দ্রুত হাতে স্কেচ এঁকে যায় ভিন্সেন্ট। আঁকে আর দেখে। পছন্দ হয় না। ছিঁড়ে ফেলে। আবার আঁকে। মনের মত হয় না। আবার ছেঁড়ে।

হঠাৎ খেয়াল হল, আচ্ছা অবসর নেবার পর দেবনারায়ণবাবু তো আসানসোলেই থাকেন। ঠিকানাটা ঠিক জানা নেই, কিন্তু খুঁজে নিতে পারবে না? আসানসোল এখান থেকে পঁচিশ ক্রোশ, মানে পঞ্চাশ মাইল। ট্রেন ভাড়ার সম্বল নেই—কিন্তু এটুকু পথ হেঁটে যেতে আর কতক্ষণ লাগবে? বড় জোর দুদিন। সকাল সকাল রওনা হলে পরদিন সন্ধ্যের মধ্যেই পৌঁছে যাবে। পরদিন প্রত্যুষেই সে বার হয়ে পড়ল খানকতক স্কেচ হাতে নিয়ে। তখনও সূর্যোদয় হয়নি।

খালি গা, খালি পা, কদিন অনাহারে শরীরও বেশ দুর্বল। তা হোক। ছবির বাণ্ডিলটা নিয়ে সে চলল আসানসোল মুখো।

ভিন্সেন্ট ফিরে এল প্রায় তিন মাস পরে। এবার তার গায়ে জামা, পায়ে জুতো,—হাতে রঙ, তুলি, ক্যানভাস, কাগজ। দেবনারায়ণবাবু ওকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। ভান গর্গ জীবনের নূতন অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। অধরাকে ধরবার কৌশল শিখে এসেছে। সে শিল্পী হতে চায়। নূতন পৃথিবী সৃজন করবে সে এই। চাক্ষুষ বাস্তব জগতের মত ক্লেদাক্ত, পঙ্কিল, অন্ধকার, দুনিয়া নয়—তার মনোমত নূতন ত্রিভুবন! ঈশ্বর-বিশ্বাসী ঈভানজেলিস্ট ভিন্সেন্ট গর্গ আজ স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী! দাউ শ্যাল ক্রিয়েট দ্য ক্রিয়েটার।

দেবনারায়ণবাবু প্রথমটা ওকে চিনতে পারেননি। তাঁর দোষ নেই। খালি গা, খালি পা, একমাথা রুক্ষ চুল, একমুখ খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি—ভিখারী ভেবেছিলেন তাকে। পথশ্রমে ক্লান্ত ধূলি-ধূসরিত মানুষটা যে সেই জমিদার বাড়ির আলালের ঘরের দুলাল এ-কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ওর কাছে সব কথা শুনেছিলেন। দেবানারায়ণবাবু নিজেও একদিন সংসার ছেড়ে এভাবে বেরিয়ে এসেছিলেন। গোঁড়া কায়স্থ পরিবারের সন্তান তিনি—দীক্ষা নিয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মে। শিবনাথ শাস্ত্রীর সাক্ষাৎ শিষ্য। ছবি আঁকার সখ ছিল দেবনারায়ণবাবুর। শিখেছিলেন আর্ট স্কুলে। শিক্ষকতা করেছেন আর্য মিশনে, সংসার করেছেন, উপাসনা করেছেন, উপার্জন করেছেন—আজ অবসরপ্রাপ্ত জীবনে আশ্রয় নিয়েছেন ছেলের সংসারে। ছেলে রেলের মালবাবু—রেলের কোয়ার্টার্স পেয়েছে। ছাত্রকে চিনতে পারার পর তাকে কোলে টেনে নিয়েছিলেন দেবনারায়ণবাবু। ওর আগ্রহ দেখে প্রাণ ঢেলে শিখিয়েছেন এ কদিন। পরিপ্রেক্ষিতে মূল সূত্র, টেম্পারা আর ওয়াশ পদ্ধতির পার্থক্য, ট্রান্সফারিং, তেলরঙের কাজ। অসীম উৎসাহ তাঁর ছাত্রের। দিনের মধ্যে আঠারো ঘন্টা কাজ করত সে। ছোট্ট রেলের কোয়ার্টার্স। দু-কামরার বাড়ি। একটিতে থাকে পুত্র পুত্রবধূ, দ্বিতীয়টায় থাকতেন বিপত্নীক বৃদ্ধ। চন্দ্রভানকে থাকতে দিয়েছিলেন সেখানেই।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটা ভিন্সেন্ট কোনদিন ভুলবে না।

চন্দ্রভান যে ক্রমাগত ওঁর ড্রইংক্লাসে ফাঁকি দিত একথা দেবনারায়ণবাবু ভোলেননি। পরীক্ষায় নম্বরও সে কোনদিন বেশি পায়নি। ওদের ক্লাসে ফার্স্ট হত বটুকেশ্বর, কখনও বা দ্বৈপায়ন। ফাঁকিবাজ চন্দরটা আজ ছবি আঁকা শিখবার জন্য তাঁর কাছে এভাবে ছুটে এসেছে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ। বলেছিলেন,—কতদিন হল এ ভূত ঘাড়ে চেপেছে?

—দিন পনের হল, স্যার।

—তা হঠাৎ ছবি আঁকার জন্য এমন পাগল হয়ে উঠলি কেন রে?

—ঐ যে বললাম স্যার। কোলিয়ারির মালকাটাদের লড়াইয়ে মাথা গলিয়েছিলাম। হেরে গিয়ে মনটা একেবারে ভেঙে পড়ল। সময় কাটাবার জন্য একদিন ছবি আঁকতে বসেছিলাম। অদ্ভুত ভাল লাগল। তারপর ক্রমাগত অনেকগুলো ছবি এঁকেছি। কিন্তু ঠিক মনোমত হয়নি। আঁকতে ভীষণ ভাল লাগে, অথচ, আঁকতে পারছি না। কোথায় ভুল হচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। তখন আপনার কথা মনে হল—

—আর অমনি পঞ্চাশ মাইল পথ হেঁটে চলে এলি? পাগল কোথাকার!

ভিন্সেন্ট একটি স্কেচ বের করে দেখায়। টেবিলের স্তূপ থেকে একটি মেয়ে কয়লার টুকরো বেছে ঝুড়িতে ভরছে. ছবিখানা দেখে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন অভিজ্ঞ আর্টিস্ট। বলেন,—চন্দ্র! কিছু মনে করিস নে বাবা! তোর দ্বারা হবে না! এ কিছুই হয়নি।

ছবিটা যে ঠিকমত আঁকা হয়নি এ বোধ ভিন্সেন্টের নিজেরই ছিল। সে মাথা নিচু করে বসে থাকে। দেবনারায়ণবাবু তাঁর দৃঢ় ভাষণে বোধহয় ঈষৎ লজ্জিত হয়ে পড়েন, সামলে নিয়ে বলেন,—মানে, অনেক দিন মক্‌সো করতে হবে। এ ছবি কিচ্ছু হয়নি। 'ফিগর অব এইট হেডস্' কাকে বলে জানিস?

ভিন্সেন্ট মাথা নাড়ে।

একটি প্রামাণিক বিলাতি বই বার করে দেবনারায়ণবাবু ওকে দেখাতে থাকেন 'হিউম্যান ফিগার' আঁকার মূলসূত্রগুলি। একটা মানুষের মুখটা যত বড় তার গোটা দেহের উচ্চতা তার আটগুণ। কেন্দ্রবিন্দু তার যৌনমণ্ডল—উপর দিকে চার ভাগ, নিচের দিকে চার ভাগ। ফিমার-বোন দু-ভাগ। হাঁটু থেকে গোড়ালি দু-ভাগ। তেমনি উপর দিকে যৌনমণ্ডল থেকে নাভি, নাভি থেকে স্তনবৃন্তের সংযোজন-রেখা, সেখান থেকে চিবুক, এবং চিবুক থেকে ব্রহ্মতালু এরা প্রত্যেকে দৈর্ঘ্যে সমান একভাগ। এই হল পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে মানবদেহের অক্টেভ! এই 'সারেগামা-পাধানিসা'র ছন্দে গ্রীক ভাস্কর্য থেকে রেনেসাঁ, সেখান থেকে মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগে নানান সঙ্গীত গেয়েছেন চিত্রকরের দল। এই প্রপোর্সান হচ্ছে মানবদেহ অঙ্কনের মূলসূত্র। আবার দেখ প্রাচ্য পণ্ডিতদের হিসাব। প্রাচীন হিন্দু শিল্পশাস্ত্রকারেরা বললেন,—সব মূর্তি এক রকম হবে না। প্রথমে দেখতে হবে কী ভাবের ব্যঞ্জনা করতে চাইছ। সাধারণ নরমূর্তি হবে দশতাল ; ক্রূর মূর্তি দ্বাদশতাল ; আসুর মূর্তি—ষোড়শতাল। আবার যদি স্নিগ্ধভাব ফোটাতে চাও, তাল কমাও। কুমার মূর্তি ষট্‌তাল, বালামূর্তি পঞ্চতাল। তাল কি? তাল হচ্ছে একটা মাপ। শিল্পীর নিজমুষ্টির এক-চতুর্থাংশকে বলে এক আঙুল। এই রকম দ্বাদশ আঙুলে, বা তিন মুষ্টিতে হয় এক তাল। দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে শেষে বলেন,—তাহলে বুঝে দেখ্ চন্দর, তোর এই কুলি-রমণীটি না পাশ্চাত্য আর্দশে না ভারতীয় আর্দশে কোনভাবেই কোন তাল-লয়-মান মেনে আঁকা হয়নি!

ভিন্সেন্ট বলে,—তাইতো হবে স্যার। তা আঁকবার চেষ্টা করেছিস মাত্র। যা দেখেছিস তা আঁকতে পারিসনি।

—তা হবে। আচ্ছা আপনি হলে ঐ মেয়েটিকে কিভাবে আঁকতেন?

—আমি? আচ্ছা দেখাই তোকে। দেখ।

দেবনারায়ণবাবু এক টুকরো কাগজে ঐ কুলি-রমণীকে পুনরায় আঁকতে শুরু করেন। মেয়েটির ভঙ্গি ভিন্সেন্টের চিত্রের অনুকরণে—নিচু হয়ে কয়লার টুকরো বাচছে।

প্রথমেই স্কেল ফেলে প্রপোর্সান ঠিক করে নিলেন। প্রায় আধ-ঘন্টা সময় লাগল ভিন্সেন্টের কুলি-রমণীটিকে পুনরায় আঁকতে। ভিন্সেন্ট তীব্র আগ্রহ নিয়ে পেন্‌সিলের প্রতিটি টান লক্ষ্য করতে থাকে। আঁকা শেষ করে দেবনারায়ণবাবু খুশি হয়ে বলেন,—এবার লক্ষ্য করে দেখ, প্রপোর্সান নিখুঁত হয়েছে।

ভিন্সেন্ট মুখে কিছু বলল না। তার নিজের আঁকা ছবিটা আর মাস্টার মশায়ের সদ্যসমাপ্ত স্কেচটা ঈসেলের উপর বসিয়ে দেয়। একটু পিছনে সরে এসে দেখতে থাকে। কি যেন বলতে চায়, কিন্তু বলে না। দেবনারায়ণবাবু একদৃষ্টে দেখছিলেন পাশাপাশি রাখা ছবি দুটো। হঠাৎ বলে ওঠেন,—হুঁ! বুঝেছি, কী বলতে চাইছিস্! আমি ঐ কুলি-মেয়েটিকে ঠিকমত প্রপোর্সান দিয়েছি বটে, কিন্তু ওর ক্যারেকটারটা কেড়ে নিয়েছি!

ভিন্সেন্ট এবারও কিছু বললে না।

মাস্টার মশাই আরও কয়েক মিনিট চুপ করে ছবি দুটো দেখলেন। তারপর বলে ওঠেন,—না রে চন্দর, তোর ছবিখানা খুব খারাপ হয়নি, বুঝেছিস! ওর সারাটা শরীরই বেঢপ, মুখটা তো একেবারেই যাচ্ছেতাই—তা হোক, তবু ঐ কদাকার মেয়েটাকে আমার কি জানি কেন ভাল লাগছে! কেন এমন হচ্ছে বল তো চন্দর? মনে হচ্ছে ওকে যেন কোথাও দেখেছি—

—কোন কয়লাকুঠিতে অমন মেয়ে দেখে থাকবেন স্যার। ওরা আসানসোলেও আসে—

—হুঁ! আসলে কি জানিস, তোর ছবিটা টিপিক্যাল কয়লাকুঠির মালকাটা-মেয়ের। আমার আঁকা মেয়েটার হাতে একটা হাতা বা খুন্তি ধরিয়ে দিলে মনে হবে রান্না করছে। এমন কি সুদৃশ্য টি-টপ এঁকে দিলে মনে হবে ও চা ঢালছে ; মানে আমার আঁকা মেয়েটি একটা সুন্দরী মেয়ে, সে যে কোন পরিবেশে ঠিক মানিয়ে নিতে পারবে নিজেকে। কিন্তু তোর ঐ কদাকার মেয়েছেলেটা তা নয়। ও টিপিক্যাল কুলির মেয়ে! ও জীবনভর কয়লা ঘেঁটেছে, কয়লা ঘাঁটবে! ওর হাতে হাতা-খুন্তি-বই-টি-পট কিছুই ধরানো চলবে না!...হেত্তরি! আমার স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে চন্দর, কিন্তু...কি বলব...তোর ছবিখানা সত্যিই ভালরকম উৎরেছে।

চন্দ্রভান বলে,—স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে কেন স্যার?

—হবে না? বলিস কি তুই! এ একখানা ছবি হয়েছে? কিচ্ছু হয়নি! ছবি আঁকার সব আইন-কানুন তুই যে চুলোর-দোরে পাঠিয়েছিস! পার্সপেকটিভ ভুল, প্রপোর্সান ভুল—ড্রইং পরীক্ষায় এমন একখানা ছবি কেউ দাখিল করলে আমি স্রেফ গোল্লা দিতাম! কিন্তু...মানে...না রে চন্দর! আমি স্বীকার না করে পারছি না—তোর ছবিখানা অপূর্ব হয়েছে।

প্রাণ ঢেলে এ কদিন শিখিয়েছেন ওকে। জামা-জুতো কিনে দিয়েছেন, রঙ-তুলি-ক্যানভাস কিনে দিয়েছেন। গুরুগৃহে এককালে যেভাবে শিষ্যরা ব্রহ্মবিদ্যা শিখত তেমনি যত্ন করেই শেখাতে চেয়েছিলেন ওকে। ভিন্সেন্ট কিন্তু ওখানে আর বাঁধা পড়তে চায়নি। সে শুধু হাল-ধরা, পাল-খাটানোটুকুই শিখতে চেয়েছিল—কোন্ দরিয়ায় নাও ভাসাবে তা শুধু সে-ই স্থির করবে। ভিন্সেন্ট বোধকরি 'আশঙ্কা করেছিল আরও দীর্ঘদিন দেবনারায়ণবাবুর স্নেহচ্ছায়ায় থাকলে তার স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যাবে, অথবা ফাদার শারদাঁর চিঠি এল কিনা জানবার জন্য মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল—কিম্বা হয়তো

কয়লাকুঠির আকর্ষণটা সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মোটকথা মাস তিনেক পরে আবার সেই তেঁতুলডাঙার পর্ণকুটিরে ফিরে এল চন্দ্রভান।

ফিরে এসেই প্রচণ্ড একটা আঘাত পেল। বাওয়ালী থেকে ইতিমধ্যে একটা পোস্টকার্ড এসেছে ওর নামে। ফাদার শারদাঁ লেখেননি ; লিখেছে ওর সর্দার পোড়ো রাখাল রুহিদাস। আঁকা-বাঁকা হরফে সে নিবেদন করেছে কয়েকটি মর্মন্তুদ দুসংবাদ। ফাদার শারদাঁ ইতিমধ্যে দেহ রেখেছেন। হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গেছেন। ওখানেই কবর দেওয়া হয়েছে তাঁকে। ওদের পাঠশালাটি উঠে গেছে, অনাথ আশ্রমটাও। ন'পিসি কোথায় চলে গেছে রাখাল তা জানে না। সে নিজে এখন মণ্ডল মশায়ের ক্ষেতে কাজ করে। জনমজুর। সাহেবের টালির ঘর, জমি-বাড়ি বাগান সব বিক্রি হয়ে গেছে। সাহেবের ভাইঝি ঊর্মিলা ঐ সম্পত্তিটা পেয়েছিল। রাখেনি। অমন অজ পাড়াগাঁয়ে ঐ সম্পত্তি রাখার কোন অর্থ খুঁজে পাননি ডেভিডসন সাহেব। মানে ঊর্মিলার স্বামী!

ছোট্ট চিঠি। ছোট খবর। রাখাল রুহিদাসের প্রথম পত্র। কিন্তু ভিন্সেন্টের বুকে সেটা শেল হানল। ঊর্মিলার স্বামী ডেভিডসনকে আর কেমন করে দোষ দেওয়া যায়? তিনি তো ফাদার শারদাঁর স্বপ্নের কথা কিছুই জানেন না। কিন্তু ঊর্মিলা কেমন করে রাজী হল? সে যে আবাল্য ঐ পরিবেশে মানুষ হয়েছে। একটু মায়া হল না? কিম্বা কি জানি, এই বোধহয় জগতের নিয়ম। সেও তো আবাল্য মানুষ হয়েছে পাগলাচণ্ডীতে। সেখানকার রাধাকান্তজীর মন্দির, দ'য়ের ছবি, দিগন্ত অনুসারী ধানের ক্ষেতের কথা কি এখন দিনান্তে একবারও মনে করে? যাক, ফাদার শারদাঁ তাহলে শান্তি পেয়েছেন! ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি—তাঁর ক্রোড়েই ফিরে গেছেন হয়তো। ভিন্সেন্ট নতজানু হয়ে মনে মনে বলল,—ফাদার! তোমার আত্মার শান্তি কামনায় আমি তোমার পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে পারছি না—কারণ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছি। আজ জানি না, ঈশ্বর আদৌ আছেন কি না। আর থাকলেও তিনি কারও প্রার্থনায় আদৌ কর্ণপাত করেন কি না। কিন্তু তোমার দেওয়া পতাকাকে আমি ধূলায় লুটাতে দেব না, ফাদার! তুমিই আমাকে প্রথম দেখিয়েছিলে কীভাবে রঙে আর রেখায় একটা নূতন জগৎ গড়ে তোলা যায়। তুমিই আমার আদি গুরু। তোমার সে পতাকা আমি কাঁধে তুলে নিয়েছি।

রোজ ভোরবেলা উঠে চন্দ্রভান বেরিয়ে পড়ে তার রঙ্-তুলি নিয়ে। কয়লা-কুঠির জীবনছন্দকে আবদ্ধ করে ক্যানভাস অথবা কাগজের চতুঃসীমায়। মালকাটাদের জীবনের ছবি রূপায়িত করে নূতন করে। ওরা কয়লা ঢোলাই করছে, টব ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, গাঁইতা চালাচ্ছে ; টেবিলের স্তূপ থেকে কয়লা বাচছে বাচ্চা ছেলে-মেয়ের দল। মালাকাটার বস্তীতে গিয়েও এঁকেছে ওদের নানান জীবনযাত্রার ছবি। ওরা কুয়ো থেকে জল তুলছে, গল্প করছে, ঝগড়া করছে, বিশ্রাম করছে। ঈশাকের ছাপরায় সেদিন এঁকেছে একটা অনবদ্য ছবি—'পোটাটো ইটাস' বা 'আলুর ভোজ'!

বিষয়বস্তুটা করুণ। ভিন্সেন্ট সেদিন সন্ধ্যায় ঈশাকের ছাপরায় গিয়ে দেখে ওরা সপরিবারে নৈশ-আহারে বসতে যাচ্ছে। ভিন্সেন্ট অনেকদিন পরে এসেছে ওদের বাড়িতে। ঈশাক ওকে বলল,—কি ফাদারদা, মোদের সাথে টুক্ খায়ে লিবেন নাকি? আসেন, বসেন!

ভিন্সেন্ট দেখে ওদের গোল হয়ে বসার বিচিত্র ভঙ্গিটা। বলে,—না ভাই ঈশাক। তোমরা সকলে বরং খেতে থাক। আমি তোমাদের একটা ছবি আঁকি।

—আরে পেরথমে খায়ে লেন টুক!

ঈশাক-মালাকাটার ভাঁড়ারে সেদিন মা লক্ষ্মী বাড়ন্ত। আটা-ময়দার জোগাড় নেই যে রুটি বানাবে। ঈশাকের বউ এক-কড়াই আলু সিদ্ধ করেছে। ওরা সবাই মিলে দাওয়ায় গোল হয়ে বসেছে—নুন দিয়ে আলু-সিদ্ধ খাচ্ছে। এই আজ ওদের নৈশ-ভোজের আয়োজন! মাঝখানে জ্বলছে একটা কেরোসিনের টেমি। এপাশে ঈশাক, ওপাশে তার বউ। ঈশাকের মা আর দিদিও আছে। আর আছে যোসেফ মুর্মুর অনাথ মেয়েটি—মেরী! বাপ-মা মরা আবাগীটাকে ঈশাকই আশ্রয় দিয়েছিল। সে এখন এ পরিবারভুক্ত। ঈশাকের মা দুটি খোসা ছাড়ানো আলু অতিথির দিকে বাড়িয়ে ধরে। বিনা-বাক্য-ব্যয়ে ভিন্সেন্ট সে দুটি মুখে পোরে। ঐ সঙ্গে সে বসে যায় ওদের নৈশ-ভোজের এই বিচিত্র দৃশ্যটা তেল-রঙে আঁকতে।

ঈশাক হাসে। ফাদারদা যে নতুন খেয়ালে মেতেছে—দিবারাত্র কয়লাকুঠির ছবি এঁকে বেড়াচ্ছে সবাই তা জানে। ঈশাকের তা অজানা নয়। এতদিনে আবার ফাদারদা তিল তিল করে ফিরে পাচ্ছে কুলি-ধাওড়ায় তার হারানো সম্মানের আসর। আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ঈশাক বলে,—মেরীটা যে আপনকার দিকে পিছন ফিরে বসিছে ফাদারদা। অরে ইবাগে লয়্যা আসি? নইলে অর মুখটা যে আঁধারে পড়ি যাবেক!

যোসেফ মুর্মুর সাত বছরের মেয়ে, মেরী। মেয়েটি বসেছিল দৃশ্যপটের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে—আলোর নিচেই ; অথচ তার দেহের যে অংশ চিত্রকরের গোচর সে অংশে আলো পড়েনি। সে আছে অন্ধকারে। ভিন্সেন্টের মনে হল এর গূঢ় ব্যঞ্জনা আছে। ঈশাক তার হা-ভাত সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে এনে বসাতে চেয়েছে প্রতিবেশীর ঐ বাপ-মা মরা আবাগীটাকে! বসিয়েছে আলোর নিচেই। কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে মেয়েটিকে ঘিরে আছে শুধুই অন্ধকার। জীবনের দিকে পিছন ফিরিয়ে ঈশ্বর তাকে বসিয়ে দিয়েছেন। অদ্ভুত ঘটনাচক্র। আপনমনেই হেসে ওঠে ভিন্সেন্ট। বলে, —না ঈশাকভাই, মেরী যেখানে আছে ওখানেই থাক। ওর পিছন-ফেরা ছবিই আঁকব আমি।

ওরা আপনমনে আলুর ভোজে আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়ে। ঈশাক তার কোলিয়ারির পোশাকটি ছাড়েনি। মায় মাথার টুপিটাও খোলেনি। ঈশাক আর তার বউ দৃশ্যপটের দু'প্রান্তে দুজন বসেছে মুখোমুখি—যেন গতরে খেটে মাঝের ক-জনকে ওরা এ আলুর ভোজে ডেকে এনেছে। মেরী কেন্দ্রস্থলে, ঘন অন্ধকারে। কিন্তু না! খোদার উপর খোদগিরি করবে ভিন্সেন্ট। মেরীর মাথায় আর দু-কাঁধের উপর, ঘাড়ের কাছে বাঁ দিকে কয়েকটি ক্ষীণ আলোর রেখা এঁকে দিল সে। এই তার বিদ্রোহ! এই তার ফরিয়াদ! প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ। ও মনে মনে বললে,—তুমি যতই ওকে অন্ধকারে টেনে আন না কেন, আমি আমার শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখছি, ওর মাথায় আর কাঁধে লেগেছে আলোর ছোঁওয়া। এ আলোকপাত তোমার কোন কীর্তি নয়! তুমি ওর মাকে মেরে ফেলেছ খাদের অন্ধকূপে, বাপকে পুড়িয়ে মেরেছ দশদিনের যন্ত্রণা ভোগের পর! ঐ সাত বছরের মেয়েটিকে পেড়ে ফেলেছ নীরন্ধ্র অন্ধকারে! এই তোমার কীর্তি! কিন্তু সেখানেই তো মেরীর ইতিহাস শেষ নয়—ওকে ঐ ঈশাকের বউ বুকে টেনে নিয়েছে—ঈশাক ওকে এনে বসিয়েছে তার অর্ধাহারের আলুর ভোজে! ওর মাথায় ঐ যে আলোকবিন্দু তা ঐ ঈশাক পরিবারের আশীর্বাদ!

'আলুর ভোজ'—ভিন্সেন্টের এক অমর কীর্তি!

কিন্তু ওর প্রতিদ্বন্দ্বীও অত সহজে হার মানার পাত্র নন! কঠিনতর আঘাত হানলেন

তিনি ভিন্সেন্টের মস্তক লক্ষ্য করে। আঘাতে আঘাতে উন্মাদ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যেন করুণাময় ঈশ্বরের ক্লান্তি নেই!

এ তিন মাসে এই জোড়-জাঙাল কয়লাকুঠির জীবনযাত্রায় আরও পরিবর্তন হয়েছে। বাইরে থেকে তা ঠিকমত ঠাওর হয় না। ক্রমে ক্রমে সব কথা সে জানতে পারে। এককড়ি সরখেলের শূন্যপদে উন্নীত হয়েছে পাঁচু হালদার। মেটমুন্সি থেকে ওভারম্যান। বিরাট উন্নতি। এ খবরটা শুনে ভিন্সেন্ট ভেবেছিল মালকাটাদের বিদ্রোহের সময় পাঁচু হালদার যে প্রভুভক্ত কুকুরের ভূমিকাটা নিয়েছিল এই রুটির টুকরোটা বুঝি তারই পুরস্কার। কিন্তু কানাঘুষায় শুনতে পেল, ওর ওই বিরাট উন্নতির মূলে আরও গূঢ় কিছু রহস্য আছে। পাঁচুবাবু কি এক বিচিত্র কায়দায় খোদ নাথানিয়াল সাহেবকে একেবারে খুশি করে দিয়েছে। কী করে? তা ওরা বলেনি—মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছে শুধু!

ব্যাপারটা খোলাখুলি জানা গেল বাতাসীর কথায়। তার কোন ঢাক্ ঢাক্ গুর্ গুর্ নেই। স্পষ্টবাদিনী সে—ভালকে ভাল বলতে জানে, মন্দকে নির্ভেজাল গাল পাড়তেও তার কসুর নেই। বললে,—ঈ বাবা গ! তু জানিস নাই ফাদারদা? তা তখন আর শুনায়ে কী হবেক? অমন সোন্দর সম্বন্ধটো করলম, তুর মন মানলেক নাই। সোনার কোসম লাগলেক ঐ চামারের ভোগে! চামার! চামার! উটা মানুয লয় বটে!

—কী পাগলের মত বকছিস বাতাসী! কে চামার?

—হুই নাথানেল সাহেব গ!

—সে তো জানি। কিন্তু সোনার কুসুমটা কে?

—তু শুনিস নাই? পাঁচু মিসতিরি কেমনে সাহেব হৈ গেল?

—না। কেমন করে?

—বুইনঝিটারে জবাই করলেক! হুই চামারটার ছামুতে—

উত্তেজনায় রুখে ওঠে ভিন্সেন্ট,—কী! কী বললি?

—ঈঃ! অখন কুলোপানা চক্কর দেখাইলে কী হবেক রে? মাইয়াটা তুর পায়ে আছাড়ি-পিছাড়ি পড়লেক, তুর দয়া হল নাই! হাত-চিঠি দিলেক, তু ফিরায়ে দিলি! সব জানে রে ই বাতাসী! অখন পাঁচু মাইয়াটারে বেচে দিলেক আর তু কুলোপানা চক্কর দেখাইছিস্—'কী! কী বুললি!' তু মরদ, না কী বটেরে! থুঃ!

পর্ণকুটিরের সামনে পথের উপর থুতু ফেলে চলে গিয়েছিল বাতাসী। সাঁওতালি মেয়েটার কাছে মরদের এ জাতীয় কাপুরুষতার বুঝি ক্ষমা নেই। চন্দ্রভান বজ্রাহত হয়ে যায়! চুপ করে বসে থাকে সে তার পর্ণকুটিরের দাওয়ায়!

ক্লান্ত সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। চৈত্রের শেষ। শীত গেছে, এসেছে বসন্ত। এই কয়লা-কালো জোড়-জাঙালেও দখিনা বাতাস আসে। দূরে দূরে পলাশ গাছের মাথায় মাথায় লেগেছে অস্তরবির ফাগ্-আবীর। ভার্মিলিয়ান টিন্ট্! উদাস হয়ে বসে থাকে ভিন্সেন্ট। সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে থাকে ! ধীরে ধীরে এই ন্যক্কারজনক দুর্ঘটনাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পেল এতক্ষণে!

চিত্রলেখার প্রগলভতায় সে রাত্রে ভিন্সেন্ট বিব্রত হয়েছিল। তার প্রেমপত্র পড়ে ক্ষেপে উঠেছিল আর একদিন ; কিন্তু ভিন্সেন্ট একবারও ভেবে দেখেনি—কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে এভাবে চিত্রলেখা ওর সাহায্য চাইতে ছুটে এসেছিল বারে বারে! চিত্রলেখা তার মামার চোখে দেখেছিল তার নিজের সর্বনাশের ছায়া। উদ্ভিন্নযৌবনা বোনঝিটাকে পাঁচু হালদার টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, ভেট হিসেবে উপহার দিতে

চেয়েছিল নাথানিয়ালকে। মেয়েমানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিবশে সে এ সত্যটা বুঝতে পেরেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। তাই আকারে-ইঙ্গিতে এবং শেষের দিকে নিলর্জ্জের মত সাহায্য চেয়েছে চন্দ্রভানের কাছে। অথচ চন্দ্রভান নিষ্প্রাণ পাথরের মত বারে বারে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে! কেন? মনের অগোচরে পাপ নেই। ভিন্সেন্ট নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হল—সে সময় তার মনে ঊর্মিলার স্বপ্নের রেশ লেগেছিল। ঊর্মিলার গায়ের রঙ মেমসাহেবের মত ফর্সা, সে বারে বারে চন্দ্রভানকে নাকাল করেছে, তাই কি সে দুর্লভ ; আর কালো-কোলো বাঙালী-ঘরের অনাথা মেয়েটি যেচে এসে ধরা দিতে চেয়েছিল বলেই সে সুলভ? চকমকির স্ফুলিঙ্গই শধু চোখে ধাঁধা লাগায়, নিবাত, নিষ্কম্প ঘৃতপ্রদীপের দীপ্তিটা নজরে পড়ে না? ঊর্মিলার আশায় অন্ধ ছিল বলেই চিত্রলেখার নীরব আত্মদানের মহিমাটা ওর নজরে পড়েনি। না ; পাপ একা পাঁচু হালদার করেনি, করেছে চন্দ্রভানও।

তখনই উঠে পড়ে। ভুল—ভুলই। তাকে শোধরাতে হবে। এখনই, আজ রাত্রেই সে উদ্ধার করবে চিত্রলেখাকে ঐ কামুক পাষণ্ডটার কবল থেকে। বেরিয়ে পড়বে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। নাথানিয়াল চিত্রলেখার ধর্ম নষ্ট করেছে? তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না ভিন্সেন্ট। ধর্ম কি? বাইবেল-কোরান-উপনিষদ সব বুজরুকি! সতীত্ব ধর্মটাও তাই। ভিন্সেন্টের ধর্ম তার বিবেক! সেই বিবেকের নির্দেশেই সে গ্রহণ করবে চিত্রলেখাকে—দেবে সহধর্মিণীর মর্যাদা!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। হন্‌হন্ করে সাঁকো পার হয়ে ভিন্সেন্ট এসে প্রবেশ করে কয়লাকুঠিতে। কুলি-ধাওড়াকে বাঁ-হাতে রেখে এগিয়ে যায় টিলার দিকে। সাহেব-কুঠির দিকে। বাধা পেল লোহার ফটকটায়। গুর্খা সেপাই হটিয়ে দিল তাকে। ঢুকতেই দিল না পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সাহেব-কুঠির চৌহদ্দিতে।

অগত্যা মাথা নিচু করে ফিরে আসছিল। কেমন করে চিত্রলেখার দেখা পাওয়া যায়? কেমন করে ঐ পাঁচিল-দিয়ে-ঘেরা দুর্গের ভিতর বন্দিনী নারীর কাছে সংবাদ পাঠানো যায়? বাতাসী কি পারবে ওর ভিতর ঢুকতে? আপনমনে পথ চলছিল,—হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে! টিলার নিচের দিক থেকে ধীর গতিতে উঠে আসছে চিত্রলেখা। একা। আশ্চর্য! সে তাহলে বন্দিনী নয়! প্রতি সন্ধ্যায় কি তাকে আসতে হয় এমনি করে বাবু কোয়ার্টার্স থেকে ঐ টিলার উপর! চিত্রলেখাও আপনমনে পথ চলছিল ; খেয়াল করেনি উপর থেকে আর একজন নেমে আসছে। হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—লেখা! কোথায় চলেছে এমন একা একা?

মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে যায় মেয়েটির। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে। কয়েক মিনিট সময় লাগে তার নিজেকে সামলে নিতে। তারপর বলে,—সে খোঁজে আপনার কি প্রয়োজন?

—প্রয়োজন আছে বলেই ছুটে এসেছি লেখা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। চল, আজ রাত্রেই আমরা পালিয়ে যাই এখান থেকে।

হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল চিত্রলেখা। দু-হাতে মুখটা ঢাকা। ভিন্সেন্ট এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরে। বলে,—আমাকে ক্ষমা করেছ?

যেন অনেক দূর থেকে জবাব দেয় চিত্রলেখা,—এখন আর তা সম্ভব নয়!

—আলবাৎ সম্ভব! কে বাধা দেবে? আমার অবশ্য কোন রোজগার নেই। আমি

বেকার। তা হোক, যা পাব দুজনে ভাগ করে খাব। ঐ কামুক পাষণ্ডটার—

আবার একই কথা বললে চিত্রলেখা, —বললাম তো! আজ আর তা হবার নয়!

—কেন অসম্ভব?

—সেকথা মুখ ফুটে বলতে পারব না আমি!

—বুঝেছি। বলতে তোমাকে কিছুই হবে না লেখা। আমি ওসব মানি না। তুমি আমার স্ত্রী। তোমাকে এভাবে মরতে দেব না আমি।

চিত্রলেখা তার হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। বলে,—মরার আর কিছু বাকি নেই আমার।

—কী আশ্চর্য! বুঝছ না কেন তুমি? ওসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না আমি।

—আমি করি! আজ আর আমি রাজী নই!

ভিন্সেন্ট আরও কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলা হয় না। দেখতে পায় আরও কজন পথচলতি লোক এদিকে আসছে। চিত্রলেখা ধীর পদে পাকদণ্ডী বেয়ে টিলার মাথায় উঠে যায়। চন্দ্রভান চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে আসে তার কুঁড়েঘরে।

পরের কটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেছে খেয়াল নেই ভিন্সেন্টের। ছবি আঁকাতেও মন দিতে পারছে না। জিনিসটা নিয়ে যতই ভেবেছে ততই নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়েছে। ও বুঝতে পেরেছে চিত্রলেখাকে ঐ নরক থেকে উদ্ধার করতে না পারলে তার মনের শান্তি কোনদিনই ফিরে আসবে না। চিত্রলেখাকে সব কথা বুঝিয়ে বলা দরকার। যেটাকে সে দূরতিক্রম্য বাধা বলে মনে করেছে সেটাকে ভিন্সেন্ট আদৌ আমল দিতে চায় না। একথাটা ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। ভিন্সেন্ট সুযোগ খুঁজতে থাকে। পর পর তিনদিন ঐ সাহেববাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করেছে—কিন্তু চিত্রলেখাকে দেখতে পায়নি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে ওখানে আসে না। বরং ঐ বাড়িতেই থাকে আজকাল। না হলে এ তিনদিনের মধ্যে একবার সে তাকে পথের ভিতর ধরতে পারত।

অবশেষে মরিয়া হয়ে ভিন্সেন্ট একটা দুঃসাহসিক কাজ করে বসে। প্রাচীর-বেষ্টিত সাহেব-কুঠির ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে না পেরে সে শেষ পর্যন্ত একদিন পাঁচিল টপকালো। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে লাফিয়ে নামল পাঁচিল থেকে। কিন্তু যা ভেবেছিল তা হল না। ধরা পড়ে গেল। গুর্খা সেপাইদের হাতে নির্মম প্রহারে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। চিৎকার চেঁচামেচিতে সাহেবের সান্ধ্য-অবকাশ বিঘ্নিত হয়। দ্বিতলে বসে মদ্যপান করছিলেন সাহেব, নেমে এলেন বাধ্য হয়ে। পরনে তাঁর সৌখিন সিল্কের গাউন, মুখে পাইপ, হাতে টর্চ, ভ্রূযুগলে বিরক্তির আভাস।

—ক্যা হুয়া হ্যায় ব্রীজ সিং, এৎনা হল্লা কেঁউ মচাতা?

ব্রীজ সিং এগিয়ে এসে লম্বা সেলাম করে। সবিনয়ে নিবেদন করে একটা চৌট্টা কুঠিতে ঘুঁসেছিল এবং ব্রীজ সিং-এর অতন্দ্র পাহারায় লোকটা ধরা পড়েছে। সাহেব হুকুম করলেন চোরকে আলোর সামনে নিয়ে আসতে। দুজন সেপাই দু-দিকে ধরে নিয়ে এল প্রহারজর্জর মানুষটাকে আলোর সামনে। বছর উনিশ-কুড়ি বয়স, একমাথা রুক্ষ চুল, হাফ-সার্টটা ছিঁড়ে ফালা ফালা, ঠোঁটের কষ বেয়ে নেমেছে রক্তের একটা ধারা। সন্ধ্যা থেকে বেশ কয়েক পেগ 'বিলাইতি' ওঁর পাকস্থলীতে আশ্রয়লাভ করেছিল, তবু চিনতে অসুবিধা হল না নাথানিয়াল সাহেবের। এক চিলতে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে ওঠে তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে। বলেন, —হ্যাল্লো! ওয়েল-কাম সেন্ট টমাস বেকেট!

ভিন্সেন্ট জবাব দেয় না। তার দু-চোখে আগুন। স্থির দৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে।

ব্রীজ সিং পুনরায় সেলাম করে বলে,—সা'ব?

অর্থাৎ নূতন করে প্রহার শুরু করার অনুমতি চায়।

সাহেব কিন্তু অনুমতি দিলেন না। বোধকরি দৈহিক পীড়নের চেয়ে অন্যভাবে পীড়ন করার একটা বাসনা জাগল তাঁর। সান্ধ্য কৌতুকটা লোভনীয় মনে হল বুঝি। নাথানিয়াল পাকা ঘুঘু—কলয়াকুঠির সব সংবাদ তাঁর নখদর্পণে ; এমন কি ঐ বাউণ্ডুলে ছেলেটা যে তাঁর গৃহ-বন্দিনীর সঙ্গে প্রেম করত সে খবরও তাঁর অজানা নয়। তাই ব্রীজ সিংকে সাহেব হুকুম দিলেন, ওকে তাঁর ড্রইংরুমে পৌঁছে দিতে।

বাইরের ঘরে আরাম কেদারায় আরাম করে বসল নাথানিয়াল। এ সেই ঘর—পিছনে ফায়ার প্লেসে এখন অবশ্য আগুন নিভে গেছে ; পড়ে আছে কিছু যীশুমূর্তির উপর ভারতসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের ফ্রেমে-বাঁধানো সেই সদম্ভ ভঙ্গিমা। নাথানিয়ালের খাস-কামরা কুঠি-সংলগ্ন। এখানে বসেই সে কয়লাকুঠির কল-কাঠি নেড়ে থাকে।

নাথানিয়ালের নির্দেশে ব্রীজ সিং বিদ্রোহী বন্দীকে এ ঘরে পৌঁছে দিয়ে বাইরে চলে যায়। নাথানিয়াল ওয়াইন-গবলেটে হলুদ রঙের কিছুটা পানীয় ঢেলে হাসি হাসি মুখে তার বিচিত্র ভাষায় যে প্রশ্নটা করে তার নির্গলিতার্থ—তুমি তো আইনের অনেক কেতাব পড়েছ হে। অনধিকার প্রবেশের দায়ে পিনাল কোডের ধারায় কত বছরের মেয়াদের ব্যবস্থা আছে সেটা জান?

ভিন্সেন্ট কোন জবাব দিল না। ঠোঁটটা মুছে নেয়। হাফ-সার্টের বাঁ-হাতে কাঁধের কাছটা লালে লাল হয়ে ওঠে। রক্তক্ষরণটা বন্ধ হয়নি। নাথানিয়াল গম্ভীর স্বরে বলে,—জবাব দিচ্ছ না কেন? পাঁচিল টপকিয়ে আমার কুঠিতে ঢুকেছ কেন?

—সদর দরজা দিয়ে আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে।

—বাঃ! বেশ যুক্তি তো তোমার? তোমাকে পুলিস ডেকে ধরিয়ে দিতে পারি, তা জান?

—না, পারেন না। পুলিস ডাকলে আপনিও ধরা পড়ে যাবেন!

—হোয়াট ডু য়ু মীন?

—ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডে অনধিকার প্রবেশের জন্য যেমন সাজার ব্যবস্থা আছে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে আটকে রাখলেও তেমনি সাজার ব্যবস্থা আছে।

—তুমি পাঁচিল টপকে ঢুকেছ, তাই তোমাকে আটকে রেখেছি—

—আমি আমার কথা বলছি না। আমি বলছি পাঁচু হালদারের বাড়ির মেয়েটির কথা।

—আই সী! ও, আজ বুঝি তুমি টমাস বেকেটের চরিত্র অভিনয় করছ না? নাইটহুড শিভ্যাল্‌রি, এ? এ লেডি ইন ডিস্ট্রেস্! বন্দিনীকে উদ্ধার করতে এসেছ?

ভিন্সেন্ট জবাব দেয় না।

নাথানিয়াল আর এক পাত্র গলাধঃকরণ করে। পাইপটা নিভে গিয়েছিল—টেবিলের উপর থেকে প্রকাণ্ড মোমবাতিটা টেনে নিয়ে পাইপটা ধরায় ফের। রূপার সৌখীন মোমদানে রক্ষিত হাতখানেক লম্বা মোটা মোমবাতি এ-ঘরে একমাত্র আলোর উৎস। নীলাভ ধোঁয়ায় নাথানিয়াল ভাসিয়ে দেয় তার পরবর্তী বক্তব্য,—পাঁচুবাবুর বোনঝি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে।

—আপনি তাকে ডাকুন। আমি তার কাছ থেকে স্বকর্ণে শুনে যেতে চাই।

—তুমি কি তার গার্জেন?

—এ প্রশ্ন অবান্তর।

—অবান্তর মোটেই নয়। এ কৈফিয়ত তুমি দাবী করছ কোন্ অধিকারে?

—সে আমার বাগদত্তা। আমি তাকে বিবাহ করব বলে প্রতিশ্রুত। এই অধিকারে।

নাথানিয়াল একটু থমকে যায়। সামলে নিয়ে বলে,—প্রতিশ্রুত ছিলে! এখন এ অবস্থায় নিশ্চয় তুমি তাকে বিবাহ করতে চাও না?

—একথা জেনেও সে আজ তিন মাস ধরে আমার রক্ষিতা?

রক্ষিতা! কী অবলীলাক্রমে ঐ কুৎসিত শব্দটা উচ্চারণ করল নাথানিয়াল। ভিন্সেন্টের চোখ দুটি জ্বলে ওঠে। তবু শান্তভাবে বলে,—তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি তার উপর পাশবিক অত্যাচার করেছেন! এজন্যে তার কী অপরাধ? ওকে ডেকে দিন। আমি নিয়ে যাব।

এবার স্পষ্টই বিচলিত হয়ে পড়ে নাথানিয়াল। এতটা বোধকরি সে আশঙ্কা করেনি। একবার পিছন ফিরে ওদিকে পর্দাটার দিকে তাকায়। হয়তো পর্দার ও-প্রান্তে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছিল সেই মেয়েটি, যার ভাগ্য নিয়ে এরা দুজন ছিনিমিনি খেলছে!

একটু নড়েচড়ে বসে নাথানিয়াল। বলে,—তুমি ভুল করছ হে ছোকরা! মেয়েটাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি এখানে আটকে রাখিনি। তুমি নিজে খেতে পাও না, ওকে কি খাওয়াবে, অ্যাঁ? আমি তাকে রাণীর হালে রেখেছি। শাড়ি, গহনা—

—চুপ করুন। আমি বিশ্বাস করি না। আপনি তাকে এখানে ডেকে আনুন। সে আমাকে বলুক যে, সে এখানেই থাকতে চায় ; আমি স্বকর্ণে শুনে চলে যাব।

হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে নাথানিয়াল,—গো, গো! গেট আউট, য়ু ভ্যাগাবণ্ড!

ভিন্সেন্ট নিশ্চল পাথরের মূর্তি।

নাথানিয়ালের হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে,—তোমাকে খুন করব আমি! য়ু আর ইনকরিজিব্‌ল্!

ভিন্সেন্ট অবিচলিতভাবে বলে,—তাতে লাভ হবে না মিস্টার নাথানিয়াল। আপনি ভুলে গেছেন, পর্দার ও পাশে একজন সাক্ষী আছেন। শাড়ি-গহনা দিয়ে ওর মুখ আপনি বন্ধ করতে পারবেন না। ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ! ফাঁসীর দড়িতে ঝুলতে হবে আপনাকে!

নাথানিয়ালের দৃষ্টি আবার ফিরে যায় পিছনের পর্দাটার দিকে। হাওয়ায় সেটা দুলছে। উঠে পড়ে চেয়ার ছেড়ে। ঘরময় পায়চারি করে বার কতক।

ভিন্সেন্ট বলে ওঠে,—তার চেয়ে ওকে ডেকে দিন। আমি ওর সঙ্গে কথা বলি।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে নাথানিয়াল। ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে,—কিন্তু তুমি তো ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে। তুমি ওকে চিঠি লিখে সেকথা জানাওনি?

ভিন্সেন্ট অবাক হয়ে যায়। ও লোকটা কি কয়লাকুঠির চৌহদ্দির ভিতর যেখানে যা কিছু ঘটছে তার খবর রাখে? সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না সে, বলে—হ্যাঁ লিখেছিলাম। সেটা ভুল হয়েছিল আমার। আমার ডান হাতখানা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আমার মনের কথা সে লেখেনি।

ডান হাতখানা সে আলোর সামনে বাড়িয়ে ধরে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে হাতটার দিকে।

হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে মাতালটা। বলে,—বটে! বেশ মেলোড্রামাটিক কথা বলতে পার তো হে ছোকরা! ডান হাতখানা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, অ্যাঁ? তা সেই

বিশ্বাসহন্তার কী শাস্তির ব্যবস্থা করেছ?

ভিন্সেন্ট কেমন যেন বদলে যায়। হাতখানা আলোর সামনে বাড়িয়ে ধরে কী যেন দেখতে থাকে। জবাব দেয় না। কী দেখছে সে হাতের দিকে তাকিয়ে! তার চোখে উন্মাদের দৃষ্টি!

নাথানিয়াল এতক্ষণে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। ভিন্সেন্টের ছিদ্রটা তার নজরে পড়েছে। তাহলে শুধু নাথানিয়ালের একারই নয় ঐ আদর্শবাদীটার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিশ্বাসঘাতকতা করে? তবে আর ও লোকটাকে সমীহ করে চলার কি আছে? এতক্ষণে খোশ মেজাজে সে আবার গিয়ে বসে তার আরাম কেদারায়। এক পাত্র পানীয় ঢেলে নিয়ে তার আক্রমণের পদ্ধতিটা পালটে ফেলে। হাসতে হাসতে বলে,—বাবু! আমার সঙ্গে চালাকি কর না। ও মেয়েটাকে যে আর বিয়ে করা চলে না তা আমিও জানি, মেয়েটাও জানে, আর তুমিও জান! কেন মিছে কথা বলছ?

—আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি—

—ঈশ্বর! সেটা আবার কে? শুনেছি তুমি নাকি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না আজকাল!

—আই টেক মাই ওথ্ অব অনার—চিত্রলেখাকে আমি বিবাহ করতে চাই।

হঠাৎ আবার হেসে ওঠে মাতালটা। বলে, বাজে কথা। সেদিন তোমার হাত-খানা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, আজ জিহ্বাটা করছে। সোজা কথা বল না বাবু, মেয়েটাকে নিয়ে দু-দিন ফুর্তি করতে চাও! তা আমার সখ মিটে যাক—উচ্ছিষ্ট যা থাকবে—

—সাট আপ্!—গর্জে ওঠে ভিন্সেন্ট।

নাথানিয়াল কিন্তু রাগ করে না। চোখ তুলে একবার শুধু তাকায়।

—আপনি ওকে ডেকে দিন। বেশি সময় আমি নেব না!

কতটা সময় তুমি নেবে বাবু?

হঠাৎ কি হল ভিন্সেন্টের। ডান হাতখানাকে আর সহ্য করতে পারল না। বিশ্বাসঘাতক হাতখানাকে তখনই শাস্তি না দিলে যেন ওর তৃপ্তি নেই। ধীরপদে এগিয়ে আসে সে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরে। বলে,—এই বিশ্বাসঘাতক হাতখানা যতক্ষণ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে তার বেশি সময় আমি নেব না নাথানিয়াল!

হাতখানা সে হঠাৎ বাড়িয়ে ধরে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার উপর!

ঘরের আলো স্তিমিত হয়ে আসে। মোমবাতির শিখা ডানহাতের তালুতে প্রায়শ্চিত্তের একটা কালো দাগা বুলিয়ে দিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেই কলঙ্কের কালো চিহ্নটা অনুশোচনায় লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে ওঠে! ভিন্সেন্ট যেন পাথরে গড়া একটা ভাস্কর্যের নিদর্শন। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত সে অচঞ্চল! তার মর্মভেদী দৃষ্টি নাথানিয়ালের ভ্রূ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট! দু-সেকেণ্ড, তিন সেকেণ্ড, পাঁচ সেকেণ্ড! চামড়ার রক্তিম অংশটা স্ফীতকায় হয়ে ওঠে। জলভরা কাজলকালো চোখের মত টলটল করতে থাকে কার্বনের বেড়া দেওয়া প্রকাণ্ড একটা ফোস্কা! নাথানিয়ালের নেশা ছুটে যায়! চোখ দুটো তার ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আপ্রাণ চেষ্টায় সে কিছু বলতে যায়—পারে না। কণ্ঠে তার স্বর ফোটে না। নাথানিয়াল বজ্রাহত। দশ সেকেণ্ড, পনের সেকেণ্ড! স্ফীতকায় ফোস্কাটা আর সহ্য করতে পারে না উত্তাপ—ফেটে গেল সেটা সশব্দে! নৈঃশব্দের মাঝখানে একটা ছোট্ট শব্দের তরঙ্গ রুদ্ধদ্বার কক্ষের বাতাসে ভাসতে থাকে। আর তখনই ঘরের পিছনের পর্দাটা বিদীর্ণ করে ভেসে এল একটা জান্তব আর্তনাদ!

সম্বিৎ ফিরে পেল নাথানিয়াল। এ কী হচ্ছে কি? বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফ দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। অগ্নির উৎসটা সবলে আঁকড়ে ধরে। ছুঁড়ে ফেলে দেয় মোমবাতিটা ঘরের ও-প্রান্তে।

নীরন্ধ্র অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মাঝখানে শোনা যায় আতঙ্কতাড়িত নাথানিয়ালের গর্জন,—য়ু ক্রেসি ম্যান! য়ু ইনসেন ফুল!

কিন্তু সে শব্দকে খান্ খান্ করে জেগে ওঠে আর একটি আর্ত কণ্ঠস্বর। অন্ধকার ঘরের ও-প্রান্তে পর্দাটা ঠেলে কেউ প্রবেশ করেছে পূর্বমুহূর্তে। কায়াহীন একটা নারীকণ্ঠ চিৎকার করে ওঠে,—ওকে যেতে বল! ও পাগল! ও বদ্ধ উন্মাদ!

আরও পনেরটা দিন সে ছিল ঐ জোড়-জাঙালে, তেঁতুলডাঙা মাঠের মাঝখানে তার পাতায় ছাওয়া কুটিরখানিতে। এমন দুরন্ত অবসাদে আর কোনদিন তার দেহমন ভেঙে পড়েনি। আঘাত তো সে জীবনে কম পায়নি। মায়ের মৃত্যু, খুড়িমার অনাদর, কাকার কাছে অপমান। দুঃখ কী, তা ছেলেবয়স থেকেই বুঝতে শিখেছে। তারপর যত বয়স বেড়েছে ক্রমাগত আঘাত সইতে হয়েছে তাকে। ঊর্মিলার কৌতুক আর প্রত্যাখ্যান, গীর্জা থেকে বিতাড়ন, মালকাটাদের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়াও সয়েছিল। শারদাঁ ওকে দিয়েছিলেন দুঃখকে জয় করবার এক নূতন মন্ত্র—ঈশ্বরে বিশ্বাস। তাও ধোপে টিকল না। ঈশ্বরে বিশ্বাস হারালো। তবু ভেঙে পড়েনি ভিন্সেন্ট। নূতন তন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল দেবনারায়ণবাবুর কাছে। নূতন জগৎ সৃষ্টি করবার স্বপ্ন নিয়ে ফিরে এসেছিল জোড়-জাঙালে। কিন্তু নিয়তি আজও ওর পিছন ছাড়েনি। বিদায় নিলেন ফাদার শারদাঁ, সরে গেল ওর জীবন থেকে ঊর্মিলা। আর বিসর্জন দিয়ে এল চিত্রলেখাকেও। সে নাকি পাগল! সে নাকি বদ্ধ উন্মাদ!

ডানহাতের তালুতে দগদগে ঘা। ছবি আঁকার প্রশ্নই ওঠে না। তুলি ধরা বন্ধ থাকবে কতদিন কে জানে? সাঁকো পার হয়ে ইদানিং মালকাটার দল আর তেঁতুলডাঙার মাঠে আসে না ওর সন্ধান নিতে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বাতাসী। সেও আর আসে না। ভিন্সেন্ট জানতে পারেনি শীতের অন্তে ধাওড়ায় বসন্ত এসেছে তার ভীষণ রূপে। নিদারুণ মারী রোগে বাতাসী শয্যাগতা।

তিল তিল করে অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষটা দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। কোনমতে বয়ে নিয়ে আসে খাবার জলটুকু। সারাদিন ঐ তার সম্বল। চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাকে সারাদিন। এখন সে কি করবে? কলকাতায় ফিরে যাবে? ট্রেনভাড়া পাবে কোথায়? সূরযকে চিঠি লিখবে? কিন্তু সূরয কোথায় থাকে এখন? কি করছে সে?

ভিন্সেন্টের মনে হল, বিশ বছর বয়সেই সে ফুরিয়ে গেছে। আর তার কিছু করণীয় নেই। আজকাল সে বিছানা ছেড়ে উঠে বসতেও পারে না। মাথার মধ্যে টলে ওঠে। অন্তত বাতাসীটাও যদি আসত! মনে পড়ে বার বার যোসেফ মুর্মুর কথা। যোসেফ মরতে চায়নি ; তবু শেষ সময়ে মৃত্যুই তার একমাত্র কাম্য ছিল। ভিন্সেন্টও মরতে চায় না—না, আজও সে বাঁচতেই চায়। মনে পড়ে ফাদার শারদাঁর ঘরে টাঙানো সেই শেষ বিচারের ছবিখানা। মিকেলাঞ্জেলোর অনবদ্য সৃষ্টি—সিস্টিন চ্যাপেলে আঁকা শেষ বিচারের দৃশ্য। ঈশ্বর অলীক ; কিন্তু যীসাস তো ঐতিহাসিক সত্য। মিকেলাঞ্জেলোর স্বপ্ন কি সার্থক হবে না কোনদিন! আঠারো বছরের ন্যায়াধীশ তরুণের বেশে সাধুদের পরিত্রাণ করতে, আর দুষ্কৃতদের নরকে পাঠাতে যীসাস কি সত্যিই একদিন ফিরে

আসবেন না? আর মনে পড়ে কোম্পানির বাগানে দেখা সেই সন্ন্যাসীকে। তিনি বলেছিলেন, পূর্বজন্মে ভিন্সেন্ট নাকি বৈকুণ্ঠবাসের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছিল এই দুনিয়াদারির পঙ্কিল পরিবেশে। এবারকার খেলাও তো শেষ হয়ে এল। এবার যখন যমদূত এসে প্রশ্ন করবে তাকে, সে কী জবাব দেবে? আবার কি নতুন করে শুরু করতে চাইবে ঐ একই খেলা?

সেদিন সন্ধ্যায় নিজেকে এত দুর্বল লাগল যে, বিছানা থেকে মাথাটা আর তুলতে পারল না। ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছিল ; কিন্তু উঠে গিয়ে জল গড়িয়ে খাবার মত সামর্থ্য আর বাকি নেই। হঠাৎ ভিন্সেন্টের মনে হল খোলা দরজায় কার যেন ছায়া পড়ল। চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করে। উন্মুক্ত দ্বারপথে একমুঠো আকাশের পশ্চাৎপটে মনে হল কে যেন দাঁড়িয়ে আছে! মৃত্যু কি আসন্ন? ঐ কি মৃত্যুর রূপ? কিন্তু তা কেমন করে হবে—যে এসেছে সে তো যমদূতের মত ভয়াবহ নয়? সে যে আঠারো বছরের তরুণ। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সুপুরুষ একজন।

—কে? কে তুমি?—আর্তকণ্ঠে বলতে গেল ভিন্সেন্ট। কথা ফুটল না।

আগন্তুক এগিয়ে এল। নিচু হয়ে দেখল একবার। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল ওর সামনে। তুলে নিল ওর মাথাটা নিজের কোলে। হাত বুলিয়ে দিল ওর জ্বরতপ্ত কপালে।

যীসাস ক্রাইস্ট! হ্যাঁ ; কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ শীর্ণকায় দুর্বল প্রৌঢ় মানুষটা নন—মিকেলাঞ্জেলোর স্বপ্নে দেখা বৃষস্কন্ধ মহাকায় যীসাস! অ্যাপালোর মত, ডেভিডের মত আঠারো বছরের তারুণ্যে ভরপুর!

—জল!—অস্ফুটে বলল ভিন্সেন্ট।

লোকটা ওর মুখের কাছে ধরল জলের পাত্র!

—যীসাস! তুমি এসেছ? এতদিনে সময় হয়েছে তোমার?

লোকটা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। বললে,—দাদা! আমাকে চিনতে পারছ না? আমি সূরয!

মৃত্যু আপাতত হার স্বীকার করল। মরা হল না ভিন্সেন্টের। সূরয ওকে মরতে দিল না, দিতে পারে না। সাত রাজ্য ঘুরে সে এসে পৌঁচেছে ঠিক সময়ে। চন্দ্রভান গর্গের লক্ষ্মণভাই সূরযভান গর্গ!

জোড়-জাঙালের জীবন শেষ হয়ে গেল ভিন্সেন্টের। সূরয ইতিমধ্যে চাকরিতে ঢুকেছে। ইতিমধ্যে ওদের কাকার মৃত্যু হয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে শুধু খ্রীষ্টান ভিন্সেন্ট একাই নয়, তার ভাইও বঞ্চিত হয়েছে। তাতে দুঃখ নেই সূরযের। সেও সব ছেড়েছুড়ে চলে এসেছে। কলকাতায় একটি মেস বাড়িতে থাকে। নর্মান অ্যাণ্ড হ্যারিস কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে। অল্প আয়, তা হোক, দাদার দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা সে রাখে। দাদাকে সে নিয়ে গিয়েছিল তার কলকাতার মেসে। ভিন্সেন্টের জীবনে শুরু হল আবার এক নূতন অধ্যায়।

গগন পালের গল্প বলি এবার। গগন-চরিত্রটিকে আমি ঠিকমত বুঝে উঠতে পারিনি। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে যা শুনেছি তাই লিখে যাওয়া। দাদু বলেছিলেন ঃ

...বুঝলে নরেন, গগন ছেলেটা চিরকালই ছিল একটু ডাকাবুকো ধরনের। আপনমনে থাকত সে, কারও সাতে-পাঁচে নেই। পড়াশুনায় মন ছিল না। টিকিয়ে টিকিয়ে ক্লাস প্রমোশন পেত। মাস্টার মশাইদের হাতে চড়টা-চাপড়টা ছিল তার নিত্য বরাদ্দ ; কিন্তু অসুরের মত শক্তি ছিল ওর গায়ে—চড়-চাপড়ে বড়-একটা কিছু হত না। খুব চাপা ধরনের ছেলে ; আমরা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আলোচনা করতাম, ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখতাম এবং বন্ধু মহলে তাই নিয়ে কথাবার্তাও হত। সে সব আড্ডায় গগনটা স্রেফ চুপচাপ বসে থাকত, অথবা মাঠ থেকে চোরকাঁটা উপড়ে নিয়ে তার ডাঁটি চেবাতো। গায়ে পড়ে কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে বসে—বড় হয়ে সে কী হতে চায়, তবে জবাবে বলত,—ঝাঁট দে ওসব কথা! ঐ তার এক মুদ্রাদোষ! সব কথাতেই শুধু 'ঝাঁট দে'! ভালমন্দ সব কিছুই সে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চায়। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় আমাদের চার বন্ধুর মধ্যে একমাত্র সে-ই ফেল করে। কিন্তু সান্ত্বনা দেওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। ক'দিন তার দেখাই পাইনি। পরে শুনলাম, সে দেশে চলে গেছে। দেশ কোথায়, সেখানে কে আছে কিছুই জানতাম না। এমন চাপা ধরনের ছেলে ছিল সে। প্রথম প্রথম আমরা আশা রেখেছিলাম, দেশে গিয়ে সে নিশ্চয় আমাদের চিঠি দেবে। তা সে দেয়নি। এতদিনের স্কুল-জীবনের বন্ধুত্ব সে বুঝি ঝেঁটিয়েই বিদায় করে দিল।

মাঝে মাঝে হয়তো ওর কথা উঠে পড়ত। কেউ হয়তো বলত,—পল্ গগ্যার খবর জানিস?

আমরা বলতাম,—সে বেটা দেশে গিয়ে ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়েছে নিশ্চয়। না হলে একটা পোস্টকার্ড অন্তত লিখত।

গগন পালের ডাকনাম ছিল গগ্যা। আমরা ওর উপাধিটা সামনের দিকে পাচার করে মাঝে মাঝে সাহেবি-ঢঙে ওকে ডাকতাম 'পল্ গগ্যা'। তা সেই পল্ গগ্যার সাক্ষাৎ আবার পেয়েছিলাম অনেক অনেকদিন পরে। ঢাকা শহরে। সেটা বোধহয় উনিশশো তেইশ বা চব্বিশ। তার মানে তখন আমার বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ; গগন চল্লিশ ছোঁয়-ছোঁয়। ডাক্তারী পাস করে আমি তখন ঢাকায় প্র্যাকটিস্ করি। বুড়িগঙ্গার সমান্তরালে একটি খাল বেঁকে এসে শেষ পর্যন্ত ঐ বুড়িগঙ্গাতেই পড়েছে। রেলগুমটি থেকে খোয়া বাঁধানো যে পাকা রাস্তাটি ঐ খালকে অতিক্রম করে সদরঘাটের দিকে চলে গেছে তারই উপর রায়সাহেবের বাজার। ওখানেই ছিল আমার ডিস্পেনসারী। জনসন রোডের উপর, মসজিদটার কাছাকাছি। ঢাকা কোর্ট থেকে নবাবপুর রোড পর্যন্ত অনেকগুলি

পরিবারেই আমি ছিলাম পারিবারিক চিকিৎসক। জনসন রোডের পশ্চিমপারে মোটামুটি হিন্দুদের বাস, পূর্বপারে মুসলমানদের। আমার ডাক্তারখানাটা ছিল মুসলমান মহল্লার কাছাকাছি। সবাই শ্রদ্ধা করত, সম্মান করত। পসারটা ক্রমে রেল-লাইনের ওপারেও বিস্তৃত হতে শুরু করেছিল। এই সময় একদিন পুরানো-পল্টন এলাকা থেকে আমার একটি ডাক এল। ডাকতে এসেছিল বছর বারো-তের বয়সের একটি কিশোর ছেলে। অসুখ তার ছোট বোনের। ছেলেটিকে দেখেই মনে হয়, এ যেন আমার চেনা-চেনা! মুখের আদলটা যেন আমার পরিচিত। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, এ আমাদের সেই গগন পালের ছেলে। চুলগুলো রুক্ষ, চোখ দুটো উজ্জ্বল। ও এসেছিল একটা সাইকেলে চেপে। সীটে বসতে পারে না, হাফ-প্যাডল্ করতে করতে এতটা পথ চলে এসেছে আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে। আমিও তখন সাইকেলে চেপে রুগী দেখতে যেতাম। ব্যাগটা কেরিয়ারে বেঁধে নিয়ে আমি রুগী দেখতে গেলাম। ঐ ছেলেটিই পথ চিনিয়ে নিয়ে গেল। এতদিন পরে অবশ্য ঠিক মনে নেই,—মেয়েটির কী অসুখ করেছিল, তবে সে আমার চিকিৎসাতেই শেষ পর্যন্ত সেরে ওঠে। ঐ সূত্রে আলাপ হয়ে গেল পরিবারটির সঙ্গে। ছেঁড়া-বেড়ার দেওয়াল, উপরে করগেট-টিন—পাশাপাশি দু-খানি ঘর। পিছনে উঠান পার হয়ে রান্নাঘর। দরজার ধারে লক্ষ্য পড়েছিল নেম-প্লেটটার উপর। তাতে গৃহস্বামীর নয়, গৃহকর্ত্রীর পরিচয়টাই ঘোষিত। মিসেস্ শান্তি পাল, বি. এ.। স্থানীয় মেয়েদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন তিনি। বছর ত্রিশেক বয়স, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বেশ সপ্রতিভ এবং সুরুচিশীলা। বাইরের ঘরেই রোগিণী শুয়েছিল। সে ঘরে খান-তিনেক ছবি—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও শরৎচন্দ্রের। পিছনের দেওয়ালে হুক থেকে টাঙানো একটি কিংখাবে মোড়া সেতার অথবা সরোদ। জানলার পর্দাতেই সেলাই-এর কাজ। সে-আমলে সেলাই-এর কাজ বলতে আমরা বুঝতাম কার্পেটের অথবা চটের উপর পাড়ের সুতো দিয়ে বোনা "পতি পরম গুরু" জাতীয় গুরুতর বাণী। মনে হল, এ ভদ্রমহিলার রুচি সূক্ষ্মতর।

গৃহকর্তা বলে যাকে প্রথমটা ভুল করেছিলাম দেখা গেল তিনি গৃহকর্ত্রীর ফুলদা। ঝোলা গোঁফ, গলার কণ্ঠীটা কথা বলার সময় নড়তে থাকে, মাথায় পরিপাটি টেরি। তিনি অযাচিত কয়েকটি মন্তব্য করলেন। আমাকে ইনজেক্শান দেওয়ার পরামর্শ দিলেন, এবং পথ্য সম্বন্ধে একটা মন্তব্য করবার চেষ্টা করতেই গৃহকর্ত্রী তাঁকে বললেন,—তুমি একটু বাইরে নজর রাখ ফুলদা, ওঁর সাইকেলটা নিয়ে কেউ না পালায়।

ফুলদা অতঃপর আমার সাইকেলটাই পাহারা দিলেন। ঔষধ-নির্দেশ ভদ্রমহিলাকেই দিতে হল। ভিজিটও তিনি দিলেন এবং রোগী দেখার পর সেই কিশোর ছেলেটি আমার পিছন পিছন ডাক্তারখানায় এল, এবং ওষুধটা সার্ভ করিয়ে নিয়ে গেল।

গৃহস্বামীর সাক্ষাৎ পাইনি। ভদ্রমহিলার সিঁথিতে নির্দেশ ছিল তিনি কোথাও না কোথাও আছেন। সম্ভবত ঢাকায় নেই—নাহলে সেকথা উঠত। ওঁরা সে প্রসঙ্গ যখন তুললেন না তখন আমিও তা তুলিনি। বস্তুত প্রথমদিন সেকথা আমার মনেই পড়েনি। পড়েছিল পরে। চার-পাঁচ বার ও-বাড়িতে যেতে হয়েছিল আমাকে। কোনবারই গৃহস্বামীর সাক্ষাৎ পাইনি। কিন্তু নেপথ্যচারী গৃহস্বামীর উল্লেখ কেউ না করায় সৌজন্যবোধে আমিও কোনদিন ও-প্রশ্ন করিনি। করতে হল ক'দিন পরে। মেয়েটি ভাল হয়ে যাবার পর আবার একদিন সেই কিশোর ছেলেটি আমাকে আমন্ত্রণ করতে এল—সান্ধ্য চায়ের নিমন্ত্রণ। প্রশ্ন করলাম,—হঠাৎ চায়ের নিমন্ত্রণ?

—মিষ্টি ভাল হয়ে উঠেছে কিনা, তাই মা' সত্যনারায়ণ করেছেন।

—চা দিয়ে সত্যনারায়ণের সেবা হয় নাকি?

—ছেলেটি হাসল। জিজ্ঞাসা করি,—তোমার নামটি কি?

—শ্রীরাধাগোবিন্দ পাল। ডাকনাম বাবলু।

সত্যনারায়ণের সিন্নীর সঙ্গে গোকুল-পিঠে, চন্দ্রপুলি, কড়াই শুঁটির কচুরি ও চা এল।

সেদিন প্রশ্ন করেছিলাম,—মিস্টার পাল কোথায়?

শান্তি দেবীকে জবাব দিতে হয়নি। তাঁর ফুলদা আগ বাড়িয়ে বলে ওঠেন, সে গেছে দোকানে। সেই সক্কাল বেলা যায় দোকানে, আর ফিরতে যার নাম সেই রাত দশটা! মস্ত দোকান দিয়েছে যে ভায়া! দেখেননি? শান্তি স্টোরস—ঐ রমনার দিকে!

শান্তি দেবী বললেন,—ফুলদা, একটা দেশলাই কিনে আন না!

আঁচল খুলে একটি একানি বার করে দিলেন তিনি।

ফুলদা বেজার হলেন ; কিন্তু যেতে হল। এই ফুলদা ব্যক্তিটি সংসারে নিতান্ত উদ্বৃত্ত, এবং শান্তি দেবী তাঁকে আমার দৃষ্টির আড়ালে রাখতে চান। তাছাড়া হঠাৎ এখন দেশলাই কেনার এমন জরুরী প্রয়োজন কি হল তা বুঝে উঠতে পারিনি। শান্তি দেবীর কাছেই শুনলাম পালমশাই রমনার দিকে একটি মনিহারী দোকান দিয়েছেন। রমনা অঞ্চলে দ্রুতহারে হাল-ফেশানের নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। দুদিনেই এলাকাটা জমজমাট হয়ে উঠবে। এই সুযোগে একটি দোকান খুলে বসেছেন মিস্টার পাল। আখেরে কাজ দেবে সেটা। তখনও কল্পনা করতে পারিনি, এই দোকানদারই আমার সহপাঠী সেই ঝাঁটদেনেওয়ালা গগন পাল।

সেদিনই ওঁর টেবিলের উপর একটা মাসিক পত্রিকা দেখেছিলাম। সেটা তুলে নিয়ে বলি,—'প্রগতি'? এটা কি ঢাকা থেকে বের হয়?

—'বের হয়' নয় ; বের হল! ওটাই প্রথম সংখ্যা। খবর পাননি?

—না, সাহিত্য আলোচনা করবার আর অবকাশ কোথায় আমার? আমি তো নিতান্ত ডাক্তার মানুষ। তবে এককালে খুব ঝোঁক ছিল।

—আসুন না আমাদের প্রগতিতে। আসবেন?

বলি,—আপনার ঘরে তিনজন দিকপাল সাহিত্যিকের ছবি দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনি সাহিত্য-রসিকা ; কিন্তু আমার কি সময় হবে?

শান্তি দেবী বিচিত্র হেসে বলেছিলেন,—সময়ের অভাবটা উপলক্ষ—আসল কথা ইচ্ছেটা।

বলি,—দেখি, সুযোগ-সুবিধা হয় তো—

আরও মাস তিনেক পরের কথা। মনে আছে সেটা চৈত্র মাস। বাবলু এসে আমাকে একটি হাতে-লেখা নিমন্ত্রণ-চিঠি দিয়ে গেল। মুক্তোর মত ঝরঝরে হাতের লেখা। বাবলুর মা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন—ওঁর বাড়িতে সন্ধ্যায় একটি সাহিত্য-বাসর হবে। তাতে যোগদানের জন্য।

আমি তখন সিউডো-ব্যাচিলর। তোমার দিদিমা তখন কলকাতায়—কল্যাণী অথবা খোকা সেবার হবে। সন্ধ্যার পর আমার অখণ্ড অবসর। শেষ রুগীটিকে বিদায় দিয়ে তাই সাহিত্য-আসরে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। আড্ডাটা ওঁদের বৈঠকখানায় বসেনি, বসেছিল বাড়ির পিছনের উঠানে। সমস্ত দিনমান দাবদাহের পর দিব্যি দখিনা বাতাস দিতে শুরু করেছে ; রাতটাও চাঁদনি, শুক্লপক্ষের। শান্তি দেবী কয়েকজন নবীন সাহিত্যিকের সঙ্গে

আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। আট-দশজন পুরুষ আর জন-তিনেক মহিলা। গান হল, স্বরচিত কবিতা পাঠ হল, প্রবন্ধও পড়লেন কেউ কেউ। কোথা দিয়ে তিন-চার ঘন্টা সময় কেটে গেল টের পেলাম না। শান্তি দেবী নিজে কোন অংশ নিলেন না দেখে আমি বলি,—এবার আপনার একখানা গান হোক—

—গান? আমি জীবনে কোনদিন গান গাইনি!—বলেন শান্তি দেবী।

আমি বলি,—সেকথা কে বিশ্বাস করবে বলুন? আপনার বাইরের ঘরে কিংখাবে-মোড়া যন্ত্রটা আপনার বিরুদ্ধে নীরব সাক্ষী।

—যন্ত্র? কী যন্ত্রণা! ওটা আমি বাজাই না, উনি বাজান।

একজন আগন্তুক ভদ্রলোক বলেন,—ভাল কথা, দাদা কোথায়? গগনদা?

—গগনদা? আমি সচকিত হয়ে উঠি।

—হ্যাঁ। শ্রীগগনবিহারী পাল। এ বাড়ির খোদ কর্তা। আপনি যে গগন থেকে পড়লেন ডাক্তারবাবু!

আমি বলি, —বলেন কি? গগন পাল? আচ্ছা, উনি কি কলকাতার আর্যমিশন স্কুলে পড়তেন?

প্রশ্নটা শান্তি দেবীকে। তিনি বলেন,—আর্য মিশনে পড়তেন কিনা জানি না, তবে ছাত্রাবস্থায় কলকাতাতেই ছিলেন, বাগবাজারের দিকে।

আমি বলি,—কী আশ্চর্য! এটা গগনের বাড়ি? গগন যে আমার...তা তিনি কখন ফিরবেন?

—ওঁর ফিরতে সেই যার নাম রাত দশটা। দোকান বন্ধ করে ফেরার পথে আজ উনি একটি টিউশানি সেরে আসবেন।

—ও বুঝি প্রাইভেটে ছেলে পড়ায়?

শান্তি দেবী বলেন, —ছেলে নয়, মেয়ে ; আর পড়ান নয়, গান শেখান।

তবে এ গগন পালই। প্রাইভেট ট্যুইশানি শুনে একটু হতাশ হয়েছিলাম। আর্য মিশনে যে জ্ঞান সে অর্জন করেছে তাতে ছেলে পড়ানোর আশা কম। কিন্তু হতভাগার গানবাজনার দিকে বরাবরই একটা ঝোঁক ছিল। খালি গলাতেই চমৎকার গাইতে পারত, আর পারত সুন্দর আড়বাঁশী বাজাতে। কিন্তু খবরটা কি করে জানা যায়? ওর বাবার নাম জানি না। কোথায় দেশ তাও জানি না। মরিয়া হয়ে বলি,—ওর কপালে কি একটা কাটা দাগ আছে?

শান্তি দেবী জবাব দেন না। নিঃশব্দে উঠে যান ঘরে। একটু পরে ফিরে আসেন একখানি বাঁধানো ফটো সমেত। বিয়ের পরে তোলা ছবি। যুগলে। বরবধূ বেশ। ক্যামেরাম্যানের নির্দেশটা বেশিমাত্রায় মেনেছে গ্যগা—এক গাল হেসেছে সে। লাফিয়ে উঠি আমি,—এই তো গগ্যা! এ যে আমার বিশিষ্ট বন্ধু!

দেবেনবাবু হেসে বলেন, —সে তো বোঝাই যাচ্ছে। বিশিষ্ট বন্ধু না হলে ঢাকা শহরের দুপ্রান্তে দুজনে এমন গা-ঢাকা দিয়ে ঘুরছেন?

সবাই সমস্বরে হেসে ওঠে।

চিড়ে ভাজার প্লেটটি নামিয়ে রেখে আমি উঠে পড়ি।

বলি,—এখনও আমার দু-চারটি রুগী মরতে বাকি আছে। ফেরার পথে তাদের একটু খোঁজখবর নিয়ে যেতে হবে। আজ উঠি। আপনাদের কাব্যালোচনা চলুক। শান্তি দেবীর দিকে ফিরে বলি,—গগ্যাকে বলবেন কাল সকালেই যেন আমার ডিস্‌পেনসারীতে

এসে চা খেয়ে যায়। উফ্ কতদিন দেখিনি ওকে! আপনাদের সাহিত্যের ভাষায় শতাব্দীর পঞ্চমাংশ!

গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন শান্তি দেবী। বিদায় নমস্কার করে বললেন,—আবার আসবেন।

—এবার তো আপনাদের যাওয়ার কথা। এখন তো আপনি আমার বন্ধুপত্নী। তবে আপনাকে এখনই আমন্ত্রণ করছি না। আমার 'বেটার হাফ' কলকাতা গেছেন। তাই আপাততঃ কর্তাটিকেই পাঠাবেন রিটার্ন ভিজিট দিতে। কাল সকালেই।

—বলব। তবে আপনার খেয়ালী বন্ধুকে তো চেনেন!

বাগানটা পার হয়ে সাইকেলে উঠতে যাব, পিছন থেকে আওয়াজ হল,—ডাক্তারবাবু নাকি?

দাঁড়িয়ে পড়ি। শান্তি দেবীর ফুলদা। খাপটি মেরে বসেছিলেন কালভার্টের উপর। এগিয়ে এসে বলেন,—মাচিস্ আছে ডাক্তারবাবু আপনার পকেটে?

দেশলাইটা বার করে দিলাম। ফুলদা সেটি গ্রহণ করে নিজের ফতুয়ার পকেট তল্লাশি করে বললেন,—দূর ছাই, বিড়ির বাণ্ডিলটাও ফেলে এসেছি।

বাধ্য হয়ে প্যাকেট থেকে একটি বার্ডস-আই বার করে দিলাম। উনি ধন্যবাদ জানিয়ে মৌজ করে সিগারেট ধরালেন। আমি রওনা দিলাম।

পরদিন সকালে কিন্তু গগ্যা এল না। তার পরদিনও নয়। ক্রমে দিন সাতেক কেটে গেল। আমিও ওদিকে যাবার কোন সুযোগ করতে পারিনি। দিন দশেক পরে রমনার দিকে যাচ্ছি রুগী দেখতে। সকাল তখন গোটা দশেক হবে। নবাবপুর রোড ধরে চলেছি সাইকেল চেপে। লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে পুরানো পল্টনের ফাঁকা মাঠটা ডাইনে রেখে রমনার দিকে মোড় নিতে গিয়েই মনে পড়ল গগ্যার কথা। হতভাগাটা এল না কেন? শরীর খারাপ হয়ে থাকলে সবার আগে আমারই খবর পাওয়ার কথা। ডান দিকেই মোড় নিলাম। সেটা ছুটির দিন। শান্তি দেবী বাড়ি ছিলেন। ছেলেমেয়েরাও। আমাকে দেখতে পেয়ে মিষ্টি চিৎকার করে ওঠে,—মা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

—আর ডাক্তারবাবু নয় রে, পাগলি! এবার থেকে ডাক্তারকাকু বলবি।

শান্তি দেবী বোধকরি রান্নাঘরে ছিলেন। হাতটা ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে এসে বসেন, —আসুন, আসুন।

—না, আমি আসব না আজ। গগ্যা কোথায়?

—সে তো এই একটু আগেই দোকানে চলে গেল।

—আজ ছুটির দিনেও দোকান?

—ছুটির দিন বলে কি আপনারই রেহাই আছে?

তা বটে। দোকানদার অথবা ডাক্তারের আবার ছুটির দিন কি? বলি,—অভিযোগ আছে। এখন বলুন, আসামী কে? আপনি, না আপনার কর্তা? আপনিই বলতে ভুলেছেন, না সে-ই যেতে ভুলেছে?

—যায়নি সে?

—কেন, গেলে আপনি জানতে পারতেন না? ফিরে এসে গল্প করত নিশ্চয়?

বিচিত্র হেসে শান্তি দেবী বলেন,—স্কুল-জীবনে ও বুঝি খুব গপ্পুড়ে ছিল?

আমি জবাব দিইনি। দোকানের নামটা জানা ছিল। অবস্থানটা জেনে নিয়ে ফের রওনা হয়ে পড়ি। হতভাগাটাকে কষে গালাগাল দিতে হবে। ওকে খুঁজে বার করবই।

শান্তি স্টোরস্ খুঁজে পেতে অবশ্য আমাকে বেগ পেতে হয়নি। যে আমলের কথা বলছি তখন ওখানে দোকান-পাট একেবারেই ছিল না। কিন্তু দোকানেও তার দেখা পেলাম না। দোকানে সে নেই। ছিল একজন কর্মচারী। বছর ষোলো-সতেরর একজন কিশোর। নাম বললে, প্রফুল্ল। বললে—আজ্ঞে না, বাবু তো আসেননি।

ছোট্ট দোকান। বিস্কুট, লজেন্স, খাতা-পেন্সিল, স্নো-পাউডারের আয়োজন। কাঠের তাকে সাজানো। সামনে একটা গ্লাস-কেস। এতটুকু দোকানে এই জনহীন প্রান্তরে ওর কতই বা বিক্রি হয়, যে একজন কর্মচারী রেখেছে? যাক, আমার কি! প্রফুল্লকে নিজ পরিচয় দিয়ে বললাম, বাবু এলে বল—আমি এসেছিলাম। রুগী দেখতে যাচ্ছি। ফেরার পথে আবার খোঁজ নিয়ে যাব।

ফিরতে আমার রীতিমত বেলা হয়ে গেল। কিন্তু দোকানে তার দেখা পেলাম না। তখনও সে আসেনি। ফেরার পথে ওর বাড়িতে আবার খোঁজ নিলাম। শান্তি দেবী একটু অবাক হলেন যেন। বলেন,—সে কি! এখনও দোকানে আসেনি? কি জানি তাহলে কোথায় গেছে!

মোটকথা, আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হল না।

সেদিন হয়নি, হয়েছিল তার পরদিন।

সকালবেলা দোকান খুলে সবে বসেছি, হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল গগ্যা। প্রায় বিশ বছর পরে ওকে দেখলাম। বেশ বদলে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। প্রকাণ্ড দৈত্যের মত চেহারা হয়েছে তার। মাথায় আমার চেয়ে এক বিঘৎ লম্বা। চুলগুলো পিছনে ফেরানো—একটুও পাক ধরেনি। ইয়া চওড়া কাঁধ, ইয়া বুকের ছাতি। কে বলবে ওর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। আমি আনন্দে লাফিয়ে ওঠার আগেই ও আমার টেবিলটা ধরে হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে কড়া স্বরে বললে, —আমার পিছনে লেগেছিস কেন?

অবাক হয়ে বলি,—কী বলছিস রে গগ্যা?

—বলছি, কাল দুবার আমার বাড়িতে গিয়ে বলে এসেছিস আমি দোকানে যাইনি, আর দুবার দোকানে গিয়ে বলে এসেছিস আমি বাড়িতে নেই। কেন? আমার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করা ছাড়া কি তোর কাজকর্ম নেই?

হাসব না রাগ করব বুঝে উঠতে পারি না। গগ্যাটা চিরকালই পাগল। ওর কথাগুলো চিরদিনই কড়া কড়া। বলি,—চটছিস কেন রে? ধরা পড়ে গেছিস বলে? কোথায় গিয়েছিলি সত্যি করে বল তো? কোন ছাত্রীকে গান শেখাতে নয় নিশ্চয়!

গগ্যা ইতিমধ্যে বসে পড়েছিল চেয়ারটায়। চট করে উঠে দাঁড়ায়। বলে,—দীপু, আমি তোদের সাতে-পাঁচে নেই—তুই কেন আমার সব ব্যাপারে নাক গলাচ্ছিস?

আমি রীতিমত ঘাবড়ে যাই। গগ্যা যদি প্রেম করে বেড়ায় তাতে আমার কি? বললাম সেকথা,—কী পাগলামি করছিস গগ্যা? এতদিন পরে দেখা, আর তুই ঝগড়া করছিস এমনভাবে? আচ্ছা, তুই কী রে—কোন্ ডাক্তার তোর মেয়েকে চিকিৎসা করল তার নামটা পর্যন্ত বউকে জিজ্ঞাসা করিসনি?

—কেন করব না? আমি তো জানতামই তুই মিণ্টির চিকিৎসা করছিস।

এবার আর অবাক নয়, আহত বোধ করলাম। বলি,—তাহলে তুই আমার পরিচয় এই ক'মাস ধরে জানিস? সে ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে দেখা করিসনি কেন?

—ঝাঁট দে ওসব ছেঁদো কথা! আমি তো তোর মত নই যে, পরের রোজগারে নাক গলাব!

—তার মানে?

—তার মানে মিন্টি যে আমার মেয়ে একথা জানতে পারলে তুই ফি নিতে পারতিস?

—তা হয়তো পারতাম না। সে লোকসান অন্যভাবে পুষিয়ে যেত। পঁচিশ বছর আগে হারিয়ে-যাওয়া বন্ধুত্বটা ফেরত পেতাম।

গগ্যা বলে,—থাক ভাই, পুরানো বন্ধুত্বের জের আর নাই টানলি! তোদের কাব্যপাঠ, সাহিত্য-আলোচনা আর প্রগতিচর্চায় আমি ভাগ বসাতে চাই না। দয়া করে তোমরা যদি আমাকে নিজের মত থাকতে দাও তাহলেই আমি ধন্য।

আমি বলি,—সমাজে বাস করতে হলে সামাজিকতার দায় তোকে মিটিয়ে দিতে হবে বইকি।

গগ্যা বলে,—আমি তোদের সামাজিকতার ধার ধারি না। সোজা কথা বলে যাচ্ছি দীপু, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এলে ভাল হবে না কিন্তু!

যাবার জন্য ও পা বাড়ায়।

আমি পিছন থেকে ডাকি,—যাচ্ছিস কোথায়? না হয় তোর ছাত্রীদের ব্যাপারে আর নাক গলাব না ; কিন্তু এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যা।

—না। চায়ের পর আসবে সিগারেট ; তারপর নস্যি। তারপর আবার নাক সুরসুর করবে তোমার। ওসব ছেঁদো সামাজিকতার জড় একেবারে গোড়াতেই ঝাঁট দিয়ে ফেলা ভাল।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল গগ্যা।

বলা বাহুল্য রীতিমত মর্মাহত হয়েছিলাম আমি। ব্যাপার কি? গগ্যা এভাবে আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে কেন? নিঃসন্দেহে ওদের দাম্পত্য-জীবনে কোথাও গোলমাল আছে। গগ্যা সুখী নয়। বোধকরি শান্তি দেবীও নন। মনে পড়ে গেল, সেদিন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—'ও বুঝি ছেলেবেলায় খুব গণ্ডুড়ে ছিল?' কিন্তু কেন ওদের মনের মিল হয়নি? বোধ হয় শান্তি দেবীর সাহিত্যকাব্য আলোচনা, তাঁর প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটা গগন পছন্দ করত না। গগ্যা ম্যাট্রিক ফেল, ওর স্ত্রী বি. এ. পাস। এটাই কি অশান্তির কারণ? না কি ওর স্ত্রীর রোজগার ওর চেয়ে বেশি বলে? মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে শান্তি দেবী বোধকরি মাসান্তে যতগুলি মুদ্রা নিয়ে আসেন তার অর্ধেকও আনতে পারে না সে তার দোকান থেকে। কিন্তু তাহলে দোকানে একজন কর্মচারী রেখেছে কেন? যাই হোক, বেশ বোঝা যাচ্ছে গগ্যা আমাদের পুরানো বন্ধুত্বের জের টেনে চলতে চায় না। ছেলেটা চিরকালই রুক্ষ প্রকৃতির—কাঠ কাঠ কথা বলতে ওস্তাদ। শান্তি দেবীর কোন দোষ নেই ; কোন মেয়েই বোধহয় ওকে সুখী করতে পারত না, সুখী হত না ওকে পেয়ে। সে যা হোক, মন থেকে গগ্যাকে বিদায় দিলাম—ওর ভাষায় ঝাঁট দিয়ে দিলাম।

ক্রমশঃ ওর কথা ভুলেই গেলাম। তখন অন্য একটা ব্যাপারে আমার মন এমনিতেই বিভ্রান্ত হয়ে ছিল। আমার ডাক্তারখানাটা জনসন রোডের পশ্চিম পারে। বাজারের উপর। রাস্তার পুব পারে মুসলমানদের বাস। কিছুদিন আগে ঐ অঞ্চলে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মত হয়ে গেছে। সিনেমা হলের সামনে একটি হিন্দু যুবক বেমক্কা খুন হয়ে গেল। হিন্দু পাড়াতে তার বদলাও নেওয়া হয়েছে। অনেক শুভানুধ্যায়ী বলছেন, এ

দোকানটা ছেড়ে আমি যেন হিন্দু মহল্লায় উঠে যাই। আমি ডাক্তার মানুষ—একা থাকি ; আর্ত মানুষের কোন ধর্ম নেই। ম্যালেরিয়ায় কাঁপুনি যখন ধরে তখন নেড়ের দাড়ি আর কাফেরের টিকি সমানভাবে দুলতে দেখি! কিন্তু দাঙ্গাটা একটু ঘোরালো হয়ে ওঠার পর বেশ দুশ্চিন্তায় আছি। এ মহল্লার কয়েকজন বর্ধিষ্ণু মুসলমান ভদ্রলোক—কাজী ওদুদ সাহেব, মৌলভি জিয়াউদ্দিন সাহেব প্রভৃতি একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার ডাক্তারখানায় এলেন। আমাকে নানাভাবে আশ্বাস দিয়ে গেলেন। আমি যেন অন্যত্র যাওয়ার কথা না ভাবি। ওঁরা জান দিয়ে আমাকে রক্ষা করবেন। এদিকে কলকাতা থেকে বাবা লিখছেন, আমি যেন ঢাকার বাস তুলে দিয়ে সেখানেই ফিরে যাই। বাবা প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন। বয়স হয়েছে তাঁর। আমি যেন গিয়ে তাঁর শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হই এবং তার পসারের সুযোগটা গ্রহণ করি। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর তাই স্থির হল। ঢাকার পাঠ তুলেই দেব। শুনে অনেকেই ক্ষুব্ধ হলেন ; দুঃখ প্রকাশ করলেন।

প্রায় মাসখানেক পরের কথা। একদিন বাজারে দেখা হয়ে গেল শান্তি দেবীর ফুলদার সঙ্গে। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে বলেন,—ডাক্তারবাবু না? কই, আর তো আসেন না আপনি? কেমন আছেন?

সৌজন্যবোধে বলতে হল,—ভাল আছি। ওঁরা কেমন আছেন প্রশ্ন করা মাত্র ফুলদা যেন লাফিয়ে ওঠেন,—আমাদের কথা আর বলবেন না ডাক্তারবাবু। গগনটা তো মানুষ নয়, চামার! কোথায় কোথায় ঘোরে পাত্তাই পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়েগুলোও হয়েছে তেমনি। শিক্ষার বালাই নেই। আমি হলাম গিয়ে তোদের মামা, তা আমাকেও ছেড়ে কথা বলে না। ফুলমামা বাজার থেকে ফেরার সময় একটা খাতা কিনে এন, ফুলমামা আমার জন্য একটা লাল ফিতে কিনে এন। কেন রে বাবা? আমি কি তোদের খানাবাড়ির চাকর? আসল কথা কি জানেন—আসলে মায়ের শাসন না থাকলে ছেলেমেয়েগুলো কখনও মানুষ হয়? নিজের বোন হলে কি হয় ওর নাম শান্তি নয়, অশান্তি হওয়া উচিত—

বাধা দিয়ে বলি,—শান্তি দেবী আপনার নিজের বোন?

—না, নিজের বোন নয়। মামাতো বোন। তাও দূর সম্পর্কের মামা নয়, ওর বাবা হল আমার মায়ের আপন পিসতুতো ভাই। একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ কিনা।

পিসতুতো ভাইয়ের আপন পিসতুতো বোন? সম্পর্কটা ঠিক বোধগম্য হল না। একান্নবর্তী সংসারটা কার ছিল? কার অন্ন কে ধ্বংস করত? তা অতীতের সে কথা বোঝা না গেলেও বর্তমানটা বেশ পরিষ্কার! বর্তমানে ফুলদা ঐ শান্তি দেবীর অন্ন ধ্বংস করে থাকেন এবং তিনি যে বাজার-সরকার নন এটা প্রমাণ দিতে তিনি উদ্‌গ্রীব।

পাশ কাটাবার জন্য বলি,—আচ্ছা, চলি ফুলদা।

—যাবেন? তা যাবেন বৈকি। আপনারা হলেন কাজের মানুষ। পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড কথা বলারই বা সময় কই আপনার। তবে একটা কথা। আমি যে শান্তির নামে আপনাকে এসব কথা বলেছি তা যেন ওকে বলবেন না। ভারি অভিমানী মেয়ে তো!

ভয়ও করে তাহলে। করবে নাই বা কেন? বেকার মানুষটার ঐ তো একমাত্র ভরসাস্থল। পিসতুতো মামার মাসতুত বোনের কী একটা ক্ষীণ সম্পর্ক ধরে দুনিয়াদারী করতে হচ্ছে বেচারিকে। সর্বক্ষণই তাই সে কাঁটা হয়ে থাকে। হয়তো পদে পদে তাকে ধমক খেতে হয়—কর্তার কাছে, গিন্নির কাছে, মায় ছেলেমেয়েদের কাছে।

—ডাক্তারবাবু!

আবার ফিরতে হল। একটু ইতস্ততঃ করে ফুলদা আবার বলেন,—আপনার কাছে

একটা টাকা হবে ডাক্তারবাবু? একখানা খাতা আর ফিতে নিয়ে যেতে বলেছিল ওরা, অথচ বাজার করতে সব ফুরিয়ে গেল।

বুঝতে পারি ফুলদার অবস্থা। আহার এবং আশ্রয় জুটেছে! হাত-খরচটাই সমস্যা। একটা আধুলি বার করে দিলাম। ফুলদা তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিলেন পরদিনই তিনি সকাল বেলায় এসে ধারটা শোধ করে যাবেন।

ভেবেছিলাম ঢাকা ছেড়ে চলে যাবার আগে শান্তি দেবীর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব। গগন নয়, তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসব। বাঁধাছাঁদা এবং নানান বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার সময় করে উঠতে পারিনি। হঠাৎ একদিন সকালে তার স্কুলে যাবার পথে গগ্যার ছেলে এসে হাজির। এবার আর হাতচিঠি নিয়ে আসেনি, মুখেই বললে,—মা আপনাকে একবার যেতে বলেছেন।

বললাম,—হ্যাঁ যাব, দু-একদিনের মধ্যেই। আমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি বাবলু। আর হয়তো তোমাদের সঙ্গে দেখাই হবে না কোনদিন।

বাবলুর তাতে কোন ভাবান্তর হল না। বললে,—না, দু-একদিন পরে নয়, মা এখনই একবার আপনাকে যেতে বলেছেন।

—কেন? কারও অসুখ করেছে নাকি?

বাবলু মুখটা নীচু করে নখ খুঁটতে খুঁটতে বললে,—না, অসুখ নয়। বাবা হঠাৎ দিন-চারেক আগে কলকাতা চলে গেছেন। কী একটা বিশ্রী মামলা বেধেছে। আমি ঠিক জানি না। আপনি এখনই একবার আসুন ডাক্তারকাকু।

—এখনই? কিন্তু এখন তো তোমার মা স্কুলে যাবেন?

—না, মা আজ ক'দিন স্কুলে যাচ্ছে না। ছুটি নিয়েছেন।

—তোমার ফুলমামা কোথায়?

—বাড়িতেই আছেন। ফুলমামাও কলকাতায় যেতে চেয়েছিলেন, মা যেতে দেননি। ঐ বাবার ব্যাপারে—

হঠাৎ মাঝপথেই থেমে গেল বাবলু। অবাক হয়ে দেখি, ওর দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছে। ব্যাপার কি? কিসের মামলায় জড়িয়ে পড়ল গগন? বাবলু আমার দিকে পিছন ফিরে চোখ দুটি মুছে নেয়। আর লজ্জা লুকাতে তখনই সাইকেলে চেপে রওনা হয়ে পড়ে। আমিও দোকান তালাবন্ধ করে পুরানো পল্টনের দিকে যাত্রা করি।

ওদের বাড়িতে গিয়ে যা শুনলাম তা রীতিমত বিভ্রান্তিকর। ঘরে ঢুকতে প্রথমে দেখা হয়ে গেল ফুলদার সঙ্গে। আজ আর তাঁর সেই সাবেকি গোরুচোরের ভঙ্গি নয়। ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কী যেন গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন তিনি। আমাকে দেখতে পেয়ে দগ্ধাবশেষ বিড়িটায় একটা অন্তিম সুখটান দিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জানলা পার করে।

—আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু, বসুন।

আমি বেতের একটা মোড়া টেনে নিয়ে ভাল করে বসতে না বসতেই একেবারে ঝুঁকে পড়লেন আমার দিকে। যেন অত্যন্ত গোপন কোন কথা হচ্ছে এভাবে প্রায় আমার কানে কানে বলেন,—গগনের সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছে?

—দিন দশেক আগে। মিসেস পাল কোথায়?

—ও, দশদিন আগে?—ফুলদা আবার লম্বমান হয়ে পড়েন ইজিচেয়ারে। আমার প্রশ্নটা ওঁর কানে যায়নি। আবার গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন উনি। চোখ দুটি বুজে

যায়। বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে কপালে ধীরে ধীরে টোকা মারতে থাকেন।

ওঁর এই গাম্ভীর্যে বিরক্তবোধ করি। হঠাৎ এই ভাব পরিবর্তনটাও কেমন যেন বিসদৃশ লাগে। তাই পুনরায় বলি,—মিসেস্ পালকে একটু ডেকে দিন। শুনলাম গগন কী একটা বিশ্রী মামলায়—

চোখ দুটি খুলে যায় ফুলদার। বিচিত্র হেসে বলেন,—কে বলেছে? বাবলু? ও জানে না।

—কী হয়েছে বলুন তো?

উৎসাহে আবার উঠে বসেন। চোখ দুটি মিটমিট করে। বলেন,—গগন সট্‌কেছে!

—সট্‌কেছে? তার মানে?

—ইলোপমেন্ট কেস্ মশাই। নারী-ঘটিত ব্যাপার!

আমি তো স্তম্ভিত। লোকটা বলে কি! কিন্তু আমাকে কোন প্রশ্ন করতে দিলেন না উনি। পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে হাত বাড়ালেন আমার দিকে.—দিন, একটা বার্ডস আই ছাড়ুন। বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে দেখি---

এ আর ভিক্ষা নয়। রীতিমত উপার্জন। প্যাকেটটা বার করে দিলাম। একটি তুলে নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেন। প্যাকেটটা উনি নিজের কাছেই রাখলেন। বুদ্ধির গোড়ায় বোধকরি ভবিষ্যতে ধোঁয়া দিতে হবে ওঁকে।

বাধ্য হয়ে আলাপ চালিয়ে যেতে হল,—কী বলছেন মশাই গগনের বয়স যে প্রায় চল্লিশ?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসি হাসি মুখে ফুলদা বলেন,—এ কি সরকারী চাকরি ডাক্তারবাবু, যে বয়সের বাধা হবে? প্রেমে পড়ার আবার বয়স আছে নাকি? ওর তো সবে চল্লিশ। ষাট বছরের বুড়োও যে ঘাড় গুঁজড়ে পড়ে। যার যাতে মজে মন—বুয়েছেন না?

আমার আদৌ বিশ্বাস হয়নি। বারো-তের বছরের ছেলে আছে ওর—পনের-যোলো বছর বিবাহিত জীবনের পর গগন নারীহরণের মামলায় জড়িয়ে পড়বে, এ যে অবিশ্বাস্য! একটা ঢোক গিলে বলি,—মেয়েটি কে?

জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনটার দিকে তাকিয়ে ফুলদা গম্ভীর হয়ে বলেন,—পুরো নামটা এখনও জানা যায়নি। তবে কতকগুলো ক্লু পেয়েছি—যা থেকে অনেকগুলি সিদ্ধান্তে আসা গেছে। প্রথমতঃ, মেয়েটি বড়লোকের ঘরের ; দ্বিতীয়তঃ, সে ছবি আঁকতে জানে ; তৃতীয়ত, তার নামের আদ্য অক্ষর দুটি হচ্ছে—জি. এস.।

এ যে রীতিমত গোয়েন্দা কাহিনী!

এই সময়ে এসে উপস্থিত হল গগনের দোকানের সেই কর্মচারী ছোকরা। প্রফুল্ল। রোদে রোদে ঘুরে বেচারির মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে। তাকে দেখতে পেয়েই ফুলদা নূতন করে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

—এই যে প্রফুল্ল, তুমি এসে গেছ। কী খবর? অমলেন্দু সেনের বাড়ি গিয়েছিলে? না, না, ইতস্ততঃ করার কিছু নেই। ডাক্তারবাবু আমাদের ঘরের লোক। তুমি অসঙ্কোচে সব কথা বলতে পার।

প্রফুল্ল কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছতে মুছতে বললে,—না, অমলেন্দুবাবুর বাড়িতে কিছুই হয়নি। তাঁর মেয়ে গীতা বাড়িতেই আছে।

—তুমি নিজে চোখে দেখেছ? না শুনে এলে?

—না। গীতাই দরজা খুলে দিয়েছিল।

—আই সী! গীতা সেন নয় তাহলে? বেটাচ্ছেলে খুব ভোগাবে মনে হচ্ছে!

ফুলদা আবার চোখ দুটি বুজে খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করেন। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি নোটবই বার করে দেখে নিয়ে বলেন,—বেশ, এবার তুমি একবার জীতেনবাবুর বাড়ি যাও। জীতেন সামন্ত। ওঁর মেয়ের নাম অবশ্য কমলা। তা হোক—

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলেন,—'জি' দিয়ে কোন ডাকনাম থাকতে পারে। তাছাড়া প্রেমিক-প্রেমিকা অনেক সময় আপোষে নিজেদের আদরের নাম রাখে, কি বলেন?

প্রফুল্ল খিঁচিয়ে ওঠে, —আপনারা আর কাউকে পাঠান। আমার দ্বারা হবে না।

—কেন কেন? তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে?

—অসুবিধা নয়? ওভাবে কি বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করা যায়—ওগো তোমাদের মেয়ে ভেগেছে কিনা একটু দেখে বলবে!

—আহা ওভাবে জিজ্ঞাসা করবে কেন? একটু ঘুরিয়ে—

হঠাৎ ভিতরের দিক থেকে এবার দৃঢ় প্রতিবাদ শুনলাম,—না! যাও প্রফুল্ল, তুমি বাড়ি যাও। আর কোথাও যেতে হবে না তোমাকে।

ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখি অন্দরমহলের দরজার পর্দা সরিয়ে শান্তি দেবী এসে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্কোচে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলাম না। ফুলদা রীতিমত ধমক দিয়ে ওঠেন,—তুমি আবার কেন উঠে এলে শান্তি? তোমাকে বললাম না—চুপচাপ শুয়ে থাকতে? যা করবার আমি করছি।

শান্তি দেবী এ কথার জবাব দিলেন না। প্রফুল্লকেই পুনরায় বললেন,—তুমি যাও প্রফুল্ল। আজও দোকান খুলতে হবে না। কাল একবার এস সকালে। ডাক্তারবাবু কতক্ষণ এসেছেন?

এবার চোখ তুলে দেখতে হল। প্রফুল্ল চলে গেল। দশদিন আগে যে শান্তি দেবীকে চিনতাম এ মহিলার সঙ্গে তাঁর আকাশপাতাল তফাত। চুলগুলো রুক্ষ, চোখ দুটি টকটকে লাল। কিন্তু এখন অশ্রুর বাষ্পমাত্র নেই। বোধকরি এ কয়দিনে মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া সেরে নিয়েছেন তিনি। ভেঙে পড়লে তাঁর চলবে না, এটা বুঝেছেন। সংসারের অর্থনৈতিক সমস্যাটা তাঁর তত বড় নয়, আসল সমস্যা হচ্ছে লোকলজ্জা। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তবু এখনও তারা কিছু জানে না। কেমন করে খবরটা তাদের বলবেন? কেমন করে গোপনই বা করে রাখবেন? কতদিনই বা এই ফুলদার মোড়লি সহ্য করতে হবে?

—তুমি যদি আমার কথা না শোন শান্তি, তবে তো আমাকে এ ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়!

শান্তি দেবী ক্লান্ত বিষণ্ণ দুটি চোখে মিনতি মেলে চুপ করে বসে থাকেন। বুঝতে পারি কতদূর অসহায় হয়ে পড়েছেন উনি। ঐ পরগাছা ফুলদার ধমকও আজ তাঁকে মাথা পেতে মেনে নিতে হচ্ছে!

ফুলদা পুনরায় বলেন,—তুমি আমাকে কলকাতায় যেতে দিলে না, না হলে ঠিক ঘাড় ধরে স্কাউন্ড্রেলটাকে নিয়ে আসতাম এখানে।

শান্তি দেবীর চোখ দুটি হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। বলেন,—পথে-ঘাটে যদি তার দেখা পাও ফুলদা, তাহলে ও দুঃসাহস কর না। টুলের উপর না উঠলে ওর ঘাড়ের নাগাল তুমি পাবে না, সে কথা নয়—নিজের ঘাড়টার কথা খেয়াল রেখ!

বোমার মত ফেটে পড়লেন ফুলদা,—ঈস্! যা ভাবছ তা নয়! হোঁৎকা চেহারা হলেই শুধু চলে না। ছেলেবেলায় আমি স্যাণ্ডো করতাম, বুয়েছ! তাছাড়া এক্ষত্রে জোরটা হচ্ছে নৈতিক। ও স্কাউন্ড্রেলটা আমাকে দেখলে এখন ইঁদুরের গর্তে—

শান্তি দেবী আমার দিকে ফিরে বলেন,—আপনাকে এ নোংরামির মধ্যে টেনে আনতে সত্যিই লজ্জা হচ্ছে ডাক্তারবাবু। তবু আমার অবস্থার কথা বিবেচনা করে আশা করি ক্ষমা করবেন। আপনি ওর বন্ধু—হয়তো আপনি চেষ্টা করলে—

সঙ্কোচে থেমে পড়েন মাঝপথেই। আমি বলি,—আমার পক্ষে যেটুকু সম্ভব নিশ্চয় করব ; কিন্তু ব্যাপারটা কী, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি!

শান্তি দেবী কোন সঙ্কোচ করেন না আর। মনকে শক্ত করে ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত ইতিহাসটা জানিয়ে দেন। যেন এ বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক ও নায়িকা গগন আর শান্তি নয়—দুটি অচেনা ছেলেমেয়ে। যেন মাসিক পত্রিকায় ছাপা একটা নিতান্ত ভ'লো ছোটগল্পের কাহিনী উনি আমাকে শোনাচ্ছেন ঃ

শান্তি দেবীর বাপেরবাড়ি যশোর। বাবা আছেন, মা আছেন। বাবা সম্পন্ন গৃহস্থ। তিনি বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন গগনের সঙ্গে। সেখানে এখনও শান্তি দেবী কিছুই জানাননি। জানিয়ে লাভ নেই কিছু। ওঁর বাপ বৃদ্ধ—ছোট ছোট ভাইবোনেরা আছে। তারা কী সাহায্য করতে পারে? এদিকে গগনের পৈতৃক পরিবারেরও কেউ নেই, যাকে জানানো যেতে পারে। সুতরাং নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে কোন সাহায্য তিনি প্রত্যাশা করেন না। আর অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য তাঁর অতটা মাথাব্যথা নেই। আসল সমস্যা হচ্ছে—ব্যাপারটা কী, তাই ঠিক মত বুঝে নেওয়া। হঠাৎ এভাবে গগন সংসার ত্যাগ করে গেল কেন?

—কেন আবার? সেই মেয়েটা! জি. এস.! মাঝখানেই ফোড়ন কাটেন ফুলদা।

সে কথায় কান দিলেন না শান্তি দেবী। আমিও উপেক্ষা করলাম মন্তব্যটা। বস্তুত মিসেস্ পালের সহজ-স্বাভাবিক বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এতবড় আঘাতটা কি অপরিসীম উদাসীনতায় গ্রহণ করেছেন তিনি। বেশ বুঝতে পারছি মর্মান্তিক অপমানে, অবর্ণনীয় অভিমানে তাঁর অন্তঃকরণ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল। অনেকটা দমে গেছেন তিনি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। না হলে অন্তত এরপর আঁচল খুলে একটি আনি বার করে তিনি তাঁর ফুলদাকে একটি দেশলাই কিনে আনতে বলতেন ; কিন্তু সে মনের জোর আজ আর তাঁর নেই। তবু ভেঙে পড়েননি। শান্তি দেবী শুধু শিক্ষিতাই নন, সত্যিকারের আধুনিকা। শ্রদ্ধায় আমার অন্তঃকরণ আপ্লুত হয়ে গেল। বলি,—যাবার আগে কোন চিঠিপত্র লিখে রেখে গেছে?

না। চিঠিপত্র কিছুই সে লিখে রেখে যায়নি। গৃহত্যাগের দিনও যথারীতি সকালে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে দোকানে গিয়েছিল। দোকানে বসেনি কিন্তু। প্রফুল্লকে সে বলেছিল, হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজনে তাকে বাইরে যেতে হচ্ছে,—কবে ফিরবে তার স্থিরতা নেই। কোথায় যাচ্ছে, তা বলেনি। দোকানের ক্যাস থেকে বত্রিশটা টাকা সে নিয়ে গেছে। বাড়িতে কাউকে কিছু বলেনি। রাত্রে সে না ফেরায় এঁরা উদ্বিগ্ন হলেন। দাঙ্গা-জনিত কারণে এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে খুন-জখম হচ্ছে। তাই রাত্রেই শান্তি দেবী বাবলুকে পাঠিয়েছিলেন প্রফুল্লর বাড়িতে। বাবলুই খবর নিয়ে আসে, গগন হঠাৎ কোথায় চলে গেছে। পরদিন প্রফুল্ল এসে সব কথা জানালো। বাবু কোথায় গেছেন, কেন গেছেন কিছুই সে জানে না। শান্তি দেবী স্তম্ভিত হয়ে যান। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন গগন

একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ নিয়ে গেছে, তাতে নিয়েছে খানকতক ধুতি-জামা। আর দু-একটা টুকিটাকি। মায় তার দাড়ি কামানোর ক্ষুরটা পর্যন্ত নিয়ে যায়নি। আলমারি খুলে দেখেন টাকাপত্র সে কিছুই নিয়ে যায়নি। সবচেয়ে মজার কথা, গগনের একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল—শান্তি দেবী লক্ষ্য করে দেখেন তার চেক বইতে গগন প্রতিটি পৃষ্ঠায় তারিখহীন স্বাক্ষর রেখে গেছে।

আমি বলি,—কিন্তু এ পর্যন্ত যা বলেছেন, তা থেকে তো আমার মনে হচ্ছে না যে, এর পেছনে নারী-ঘটিত কোন ব্যাপার আছে।

এই প্রথম লক্ষ্য করলাম শান্তি দেবী লজ্জা পেয়েছেন। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে উনি নীরবই রইলেন এবং সেই নীরবতার সুযোগ গ্রহণ করে আসরে এতক্ষণে অবতীর্ণ হলেন তাঁর ফুলদা ; বলেন,—তার কারণ শান্তি সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছে না। আমি আপনাকে কি কি বলেছি ডাক্তারবাবু? গগন যে ছুঁড়ির প্রেমে পড়েছে—

শান্তি দেবী উঠে গেলেন। যাবার সময় একটা আল্‌তো কৈফিয়ৎ ফেলে রেখে গেলেন স্থানত্যাগের। বললেন,—একটু চা করে আনি।

চায়ের প্রয়োজন ছিল না। এই মারাত্মক অবস্থায় চা-পানের সৌজন্যও নিষ্প্রেয়োজন ; কিন্তু শান্তি দেবীর অন্তরালে যাওয়ার অছিলাটাকে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। ফুলদাকে সাড়ম্বরে সায় দিলেন,—হ্যাঁ, বেশ কড়া দু কাপ চা বানিয়ে নিয়ে এস বরং। আসুন ডাক্তারবাবু, ততক্ষণ বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিন।

সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটি বাড়িয়ে ধরেন ফের।

—কি বলছিলাম যেন? ও হ্যাঁ, গগন যে মাগীর প্রেমে পড়েছে তার সম্বন্ধে আমি কি কি বলেছি। প্রথম কথা মেয়েটি বড়লোকর ঘরের ; দ্বিতীয়তঃ, সে ছবি আঁকতে পারে ; তিন নম্বর তার নামের আদ্যক্ষর হচ্ছে—জি. এস.! এই তো? শুনুন এবার।

ফুলদা আকৈশোর গোয়েন্দা গল্প পড়েছেন। অপরাধ-বিজ্ঞান জিনিসটা তাঁর নখদর্পণে। এতদিন এ বাড়ির সকলের সম্মিলিত ধমকে ছাইচাপা আগুনটা কারও নজরে পড়েনি। এখন তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। বাড়ির কর্তা অন্তর্হিত হওয়ার পরেই উনি উঠে-পড়ে লেগেছেন। সমস্ত বাড়িটা সার্চ করেছেন। বাড়িতে অবশ্য কোন প্রেমপত্র-ফত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে দোকানে। প্রফুল্ল ছোঁড়া কিছুই জানে না। ও কী বুঝবে এসব ঘোরপ্যাঁচের? গগন সাড়ে নটার মধ্যে নাকে-মুখে খেয়ে দোকান যাচ্ছি বলে রওনা হত, আর দোকানে গিয়ে পৌঁছাত কখনও বিকেল চারটেয়, কখনও পাঁচটায়। তাহলে সারাটা দুপুর সে থাকে কোথায়? করে কি? যদি বল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়ে, তাহলে প্রশ্ন হবে—বইটা দোকানে নিয়ে এসে পড়লেই চলে। যদি বল, নির্জনে গিয়ে সাধন-ভজন করে, তাহলে জিজ্ঞাসা করব বাড়ি কি দোষ করল? তোর বউ যায় মেয়ে ঠেঙাতে, ছেলে-মেয়ে ইস্কুলে—বাড়ির চেয়ে তোর নির্জন জায়গা কোথায়? ফুলদা সুতরাং সিদ্ধান্তে এসেছেন—ব্যাপারটা তাহলে নিষিদ্ধ কোন কিছু আছে। কী হতে পারে? হয় প্রেম, নয় বোমাবাজি। মাত্র ক'মাস আগে পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর মোড়ে বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা টেগার্টভ্রমে একজন ইংরজেকে গুলি করে মেরেছে। দেশের আকাশ-বাতাসে তারই গোপন অনুরণন। ফুলদার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল বিপ্লবীদের সঙ্গে গগনের যোগাযোগ আছে। কিন্তু দোকানখানা তল্লাসী করে ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। দোকানের এক গোপন দেরাজ থেকে বার হল একগাদা ছবি। হাতে আঁকা ছবি, পেনসিলে, কলমে অথবা লাল-নীল রঙিন পেনসিলে আঁকা ছবি। সব জাতের

ছবিই আছে। মাঠ-ঘাট, ফুল-গাছ, মেয়ে-মদ্দ। সব ছবির নিচেই লেখা আছে—টু পল গগা, উইথ লাভ ফ্রম জি. এস.। আর আছে তারিখ। গত তিন-চার মাসের। ফলে ব্যাপারটা স্পষ্টই বোঝা গেল। প্রফুল্লকে চেপে ধরলেন ফুলদা। ছোঁড়া শেষ-মেষ স্বীকার করে ফেলল—ছবির কথা যদিও সে জানে না, তবে বাবু যাবার আগে একটা ঠিকানা দিয়ে গেছেন। বলেছেন, তাঁর অবর্তমানে অনেক পাইকার এসে হয়তো মিথ্যা বিল পাঠাবে, দোকানের নামে। সে-ক্ষেত্রে প্রফুল্ল যেন ওর সঙ্গে পত্রালাপ করে এই ঠিকানায়।

ঠিকানা লেখা কাগজটা আমার সামনে মেলে ধরে ফুলদা নাটকীয়ভাবে বলেন,—এই হল সেই ক্লু। এখন আপনিই বিচার করে দেখুন ডাক্তারবাবু। ঠিকানায় জানা যাচ্ছে, গগনবাবুর অর্থকষ্ট নেই। মাত্র বত্রিশটা টাকা সে বেটা হাতিয়েছে দোকান থেকে। তাহলে কোন্ সাহসে কলকাতার টাওয়ার হোটেলে ওঠে? ওখানে তো এক মাসেই তার টাকা ফুঁকে যাবে! ফলে অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে—ঐ 'জি. এস.' নামে যে ছুঁড়ি ওর সঙ্গে ভেগেছে তার কাছেই কিছু রেস্ত আছে। হয় নগদ অথবা গহনা। না কি বলুন? এই যে চাও এসে গেছে। কিছু চিড়ে ভাজা বানালে পারতে শান্তি।

শান্তি দেবী দুটি চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে নীরবে আসন গ্রহণ করেন। বলি,—আপনি চা খাবেন না?

—নাঃ। বড় অম্বল হয়! যাক, সব তো শুনলেন ডাক্তারবাবু, এখন বলুন—কি করা যায়? ফুলদা কলকাতায় যেতে চেয়েছিল। আমি বাধা দিয়েছি। ফুলদার যাওয়াটা ঠিক হবে না। প্রফুল্লকে উনি বারে বারে বারণ করে দিয়েছিলেন—আমাদের কাউকে ঠিকানাটা না জানাতে। তাই বলছিলাম, আপনার জানা কেউ কলকাতায় আছেন—যিনি একটু খোঁজ নিয়ে...মানে, আমি জানতে চাইছি আসলে কী এমন ব্যাপার ঘটেছে যাতে...

আমি বলি, —ঠিক আছে। অন্য লোকের প্রয়োজন নেই, আমি নিজেই যাব।

—আপনি যাবেন? আপনার প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে?

বললাম,—এমন বিপদে সাহায্য না করলে আর কি রকম বন্ধু হলাম আমি?

—তাহলে আপনার যাতায়াতের খরচটা কিন্তু নিতে হবে ডাক্তারবাবু।

—কিছু দরকার নেই। আমাকে এমনিতে একবার কলকাতা যেতে হত। আপনাকে বলা হয়নি—আমি এখানকার বাস উঠিয়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতা চলে যাচ্ছি। সুতরাং তার আগে একবার সেখানে ঘুরে আসা দরকার। আপনাকে দিন সাতেকের ভিতরেই আমি খবর দিতে পারব।

শান্তি দেবীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

দু-এক মিনিট কেউই কোন কথা বলি না। যে যার চিন্তাতে বিভোর ছিলাম। হঠাৎ নীরবতাকে খান্ খান্ করে ভেঙে দিয়ে চাপা গর্জন করে ওঠেন ফুলদা,—চামার, চামার, মশাই! সতের বছরের বিয়ে করা বউকে ফেলে যে হারামজাদা নতুন মাগী নিয়ে ফুর্তি করতে ছোটে সে মানুষ, না জানোয়ার? নেহাৎ বেজন্মা! বাপের ঠিক নেই!

শান্তি দেবীর মুখটা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। হঠাৎ কেমন যেন রক্ত চড়ে গেল মাথায়। আমিও চাপা গর্জন করে উঠি,—দেখুন মশাই! কিছুই যখন জানা নেই তখন এভাবে আপনি আমার বন্ধুকে গাল দেবেন না।

—কিছুই না জেনে মানে? জানতে আর বাকি আছে কি? সে মাগীর নাম?

—সাট আপ্!—আমি উঠে দাঁড়াই।

ফুলদা একেবারে ঘাবড়ে যায়। আমি বলি,—খুনী আসামীও আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ পায়। গগন আমার বাল্যবন্ধু। তার সম্মান রক্ষা করবার দায় আমার। তার স্ত্রীর সম্মুখে বারে বারে আপনি যদি অমন অশ্লীল ভাষায় কথা বলেন, তবে আপনাকে আমি চুপ করিয়ে দিতে বাধ্য হব। গগন করেছেটা কি? ক'দিনের জন্যে গা-ঢাকা দিয়েছে। টাকা-পয়সা নিয়ে যায়নি। ঠিকানা রেখে গেছে, মায় তার চেকবুকে সই পর্যন্ত করে গেছে। আপনি তারই অন্ন ধ্বংস করে এতদিন এখানে বাস করছেন—আর আজ তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাপ-মা তুলে গাল দিচ্ছেন! আপনি কি মানুষ?

ফুলদা একেবারে কুঁকড়ে যান। আমতা আমতা করে উঠে পড়েন চেয়ার ছেড়ে।

শান্তি দেবীর মুখে রক্ত ফিরে এসেছে এতক্ষণে। স্বাভাবিক স্বরে তিনি কথা বলতে পারেন এর পর। আঁচল থেকে খুলে একটা দো-আনি বের করে বাড়িয়ে ধরেন ফুলদার দিকে—দু-আনার বাতাসা কিনে আনবে ফুলদা? আজ বিষ্যুৎবার, বাজারের সময় তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

মনে হল আমার ধৈর্যচ্যুতিটা মঙ্গলই ঘটিয়েছে এ সংসারে। আউট-অফ গীয়ার যন্ত্রপাতিগুলো মুহূর্তে ফিরে আসছে যে যার জায়গায়। শুধু শান্তি দেবীই আত্মবিশ্বাস একা ফিরে পাননি, ফুলদাও ফিরে এসেছেন তাঁর স্বস্থানে। দো-আনিটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নীরবে স্থান ত্যাগ করেন তিনি।

আর তখনই ভেঙে পড়লেন শান্তি দেবী। দু হাতে মুখ ঢেকে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন ভদ্রমহিলা। আমি নীরবে উঠে যাই ভিতরের উঠানে। খানিকটা কাঁদবার সুযোগ ওঁকে দিতে হবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সামলে নিলেন নিজেকে। ভিতরের বারান্দায় এসে বলেন,—আসুন ডাক্তারবাবু। চলুন আমরা বাইরের ঘরে গিয়ে বসি।

আবার সেই বাইরের ঘরে। মুখ মুছে শান্তি দেবী অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছেন এতক্ষণে। বললেন,—ডাক্তারবাবু, একটা কথা এতক্ষণ বলিনি। ফুলদা ছিল বলেই বলিনি। ও কলকাতা পৌঁছে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে। ফুলদা জানে না।

মিসেস্ পাল উঠে যান ভিতরের ঘরে। ফিরে আসেন চিঠিখানা হাতে করে। আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেন। আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে বলেন,—পড়ুন আপনি।

পাঁচ-সাত লাইনের ছোট্ট চিঠি। কোন পাঠ নেই উপরে। কোন সান্ত্বনাও নেই, বা কৈফিয়ৎও নেই। গগন লিখেছে—"শান্তি, আমার অনুপস্থিতিতে তোমার কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। দোকানের হিসাব প্রফুল্ল জানে। আমি কোন ধার-দেনা করিনি। এ চিঠি কলকাতায় পৌঁছে ডাকে দেব। আমি তোমার সংসারে আর ফিরে আসব না। এ সিদ্ধান্ত বদলাবার নয়। দোকান থেকে বত্রিশটা টাকা নিয়ে গেলাম। মিথ্যে আমার খোঁজ-খবর কর না। আমি রগচটা মানুষ তা তো জানই। অশান্তি আমার বরদাস্ত হয় না। ইতি গগন।"

আমি শুধু বললাম,—আশ্চর্য!

এত দুঃখেও শান্তি দেবী হেসে উঠলেন,—আশ্চর্য কোন্‌টা? ঐ শেষ লাইনটা? না, ডাক্তারবাবু—ওর মধ্যে কোন অলঙ্কার নেই। শান্তি-অশান্তি কোনটাই ওর বরদাস্ত হয় না। সব ও ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চায়।

একটু ইতস্ততঃ করে বলে,—কিছু মনে করবেন না শান্তি দেবী ; কিন্তু আপনার কি মনে হয় এর ভিতর আর একটি মেয়ে আছে?

—মনে করার কি আছে? বন্ধুভাবেই তো আপনার সাহায্য চাইছি। হ্যাঁ, তাও হতে

পারে।

—আপনি কিছুই টের পাননি?

—না। এ কি টের পাওয়া যায়?

আবার কিছুটা চুপচাপ্। শেষে উনি আবার বলেন,—ও যা একরোখা, ওর সিদ্ধান্ত বদলাবে বলে মনে হয় না। আমি...মানে, আমি ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝে নিতে চাই। আসলে কী ঘটেছে? কেন এমনভাবে সে চলে গেল? যদি অন্য কোন মেয়ের মোহেই চলে গিয়ে থাকে, তাহলে একদিন সে নাটকের শেষ হবে। ওকে তাহলে বলবেন...আমি ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করব না কোনোদিন। সে যদি ফিরে আসতে চায়, আজ না হোক দু-দশ বছর পরেও, তবু তার জন্য আমার দরজা খোলা থাকবে। আর অন্য কোন মেয়ে যদি এর ভিতর না থাকে, তাহলে তার সব ছেড়ে যাবার আর কি কারণ থাকতে পারে তাও তো বুঝি না—

—ওর সঙ্গে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি হয়নি তো?

—তেমন কিছু নয়। অন্তত মাসখানেকের ভিতর নয়।

—কিন্তু আপনার ফুলদার হিসাব মত সে মাসকতক গোপনে কিছু একটা করত। সেটা কী হতে পারে?

—ফুলদার ধারণা অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে ওর ইয়ে ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে আজ চার-পাঁচ দিনের মধ্যে কি আমরা খবর পেতাম না? ঢাকা শহর কলকাতা নয়, একটি মেয়ে খোয়া গেলে সে খবর কি চাপা থাকত? তারও বাপ-মা কি খোঁজ নিতে আসত না?

আবার ইতস্ততঃ করে বলি,—ওর সঙ্গে দেখা হলে কি বলব?

—কি আবার বলবেন আসল ব্যাপারটা শুধু জেনে আসবেন।

—সে যদি ফিরে আসতে শেষ পর্যন্ত না চায় তাহলে বাবলুকে কোন চিঠি লিখতে বলব কি?

জবাব দিতে দেরী হল শান্তি দেবীর। আবার দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। অতি কষ্টে চোখের জলকে ঠেকিয়ে রেখেছেন উনি। তারপর বললেন,—ছেলে-মেয়ে আমার একার নয়। কিন্তু আমার হয়ে সে অনুরোধও আপনি করবেন না। সত্য কথাটা শুধু আমি জানতে চাই। বাবলু আমার বুঝমান ছেলে—সত্য কথাই বলব তাকে আমি, তা সে যতই রূঢ় হোক, যতই কদর্য হোক! মিন্টিকেও বলতে হবে—হয়তো কিছুদিন পরে। যখন তার বোঝবার বয়স হবে।

আবার মনে পড়ল ফুলদার সেই অনবদ্য উক্তিটি—ছেলেমেয়ে বয়ে যায় মায়ের আশকারাতে।

—আর কিছু বলার নেই তো? আমি তাহলে যাই?

—একটু বসুন।

শান্তি দেবী হুক থেকে সেতারটা পেড়ে আনেন। আমার হাতে সেটা দিয়ে বলেন,—এটাও নিয়ে যান। ওর সখের জিনিস।

অদ্ভুত ক্ষমতা ভদ্রমহিলার।

বয়সে ছোট আর সম্পর্কে বন্ধুপত্নী না হলে আমি সেদিন তাঁকে প্রণাম করতাম।

আবার নিজে থেকেই বলেন,—ও হো, আপনি তো সাইকেলে চেপে এসেছেন! আচ্ছা থাক, আমি পাঠিবে দেব। কবে যাচ্ছেন আপনি?

বললাম,—কালই।

কলকাতায় পৌঁছে টাওয়ার হোটেলে দেখা করতে গেলাম গগ্যার সঙ্গে। হোটেলে কিন্তু তার দেখা পেলাম না। হোটেলের ম্যানেজার একটি ঠিকানা দিলেন আমার হাতে। বললেন, —গগন পাল এই ঠিকানাতে আছে। তার নামে কোন চিঠি এলে এ ঠিকানাতে পাঠিয়ে দিতে বলেছে।

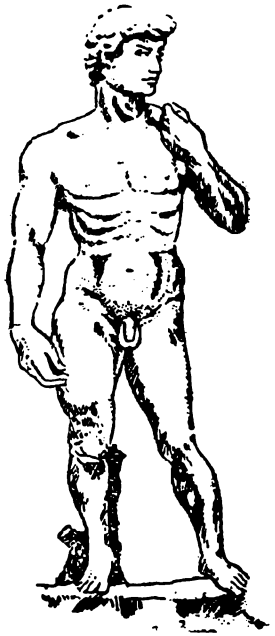

যেন নিতান্ত কথার ছলে কথা বলছি, বললাম,—ও তো প্রথমে এখানেই সস্ত্রীক এসে উঠেছিল, তাই নয়?

—না। ও এখানে ওঠেনি। গগনকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। একদিন এসে এই ঠিকানা দিয়ে বলে গেল চিঠিপত্র এলে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে। এখানে ওঠেনি।

অগত্যা ঠিকানা খুঁজে কলকাতার একেবারে উত্তর প্রান্তে এসে হাজির হলাম। বরাহনগরের একটি চটকলের বস্তীতে। একটি বেলা গেল ঘর খুঁজে বার করতে। অবশেষে সন্ধান পাওয়া গেল। খোলার চালের বস্তী। চতুর্দিকে নোংরা আর কাদা। অধিকাংশই হিন্দুস্থানী মজদূর। তারই একটা খোপে নাকি বাস করে গগন পাল। ঘরটা দেখিয়ে দিল একজন ভাজিওয়ালা। বলে,—নয়া আদমি তো? ইয়া পাট্টা জোয়ান? বাঙ্গালিবাবু? হাঁ হাঁ, পালমোশা! যাইয়ে না সিধা। সতের নম্বর কামরা।

বলি,—শেঠজি, বাঙ্গালিবাবু কি একা আছে, না ওর বিবিও আছে?

শেঠজি সম্বোধনে ভাজিওয়ালা কিছু খুশি হল। বললে,—রামজি জানে বাবুমোশা। অগর বিবি না লিয়ে এসে থাকে তবে এতোদিনে জুটে গেছে লিস্‌চয়! ঐসান পাট্টা জোয়ান কি সাত রাত একা একা থাকবে?

—কেক্‌রাকে বাত করতে হো ভিখন্?—প্রশ্ন করে পানওয়ালা।

—ঐ বাঙ্গালিবাবু রে! পালমোশা!

—নেহি নেহি, বিবি-উবি কুছ নেহি আছে. যাইয়ে না সিধা।

এবার ভরসা করে এগিয়ে যায়। পাশাপাশি খুপরি। খোলার চাল, বাঁশের খুঁটি, ছেঁচা বাঁশের দেওয়াল আর মাটির মেঝে। বারোঘরের এক উঠান। সতের নম্বরের দরজা খোলাই ছিল। একটা ছোট চারপাইতে চিৎ হয়ে পড়ে ছিল গগন। খালি গা, পরনে একখানি লুঙ্গি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে। আমাকে দেখে উঠে বসে। হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে তার চোখ দুটো। তারপর কি ভেবে হেসে ফেলে। গামছা দিয়ে বগলদুটো মুছে নিয়ে বলে,—দূত অবধ্য! বল, শুনি।

আমি চুপচাপ বসে পড়ি ওর খাটিয়ার একপ্রান্তে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরাই। ওকে দিই না ; কিন্তু প্যাকেটটা পকেটেও ভরি না। রাখি ওর নাগালের মধ্যে। গগ্যা নেয় না তা থেকে। পুনরায় বলে,—শুরু কর। আমি প্রস্তুত।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আমি বলি,—আমি তো বলতে আসিনি গগন। আমি শুনতে

এসেছি।

—এই কথা? কিন্তু আমার যা বক্তব্য তা তো চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছি। সে চিঠি কি পায়নি তোমার বন্ধুপত্নী?

—বন্ধুপত্নী? তার মানে 'বন্ধু' এবং 'পত্নী' দুটো সম্পর্কই স্বীকার কর তুমি?

—তুই ভীষণ চটে আছিস মনে হচ্ছে?

আমি নীরবে ধূমপান করে চলি।

—এই দীপু! সেদিন তুই চা খাওয়াতে চেয়েছিলি। আমি খাইনি। আজ খাওয়াবি মাইরি এক কাপ? পকেটে একটা পয়সা নেই।

—বত্রিশটা টাকা সাত দিনে ফুঁকে দেবার মত নবাবিয়ানার আয়োজন তো দেখছি না।

—ও বাবা ; তুই যে পাই-পয়সার হিসাব রাখিস দেখছি! হ্যাঁ, সব খরচ হয়ে গেছে। অনেক সাজ-সরঞ্জাম কিনতে হল কিনা।

—কিসের সাজ-সরঞ্জাম?

—থাক বাবা ; চা খেতে চাই না আমি।

পকেট থেকে একটা দোয়ানি বার করে ওর হাতে দিই। ও বলে,—পয়সা আমি নিয়ে কি করব? দোকানিকে দিবি। আয়, চা-টা খেয়ে আসি বরং।

দুজনে উঠে এলাম ঘর ছেড়ে। গগন গায়ে গেঞ্জিটা চড়ালো না। পায়েও দিল না কিছু। দরজাটা হাট করে খোলা রইল। ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। দোকান রাস্তার ওপরেই। দু'হাত বাই দু'হাত দোকান! উপরে পান-বিড়ির আয়োজন, নিচে তোলা-উনুনে জল ফুটছে. মাটির ভাঁড়ে করে দু ভাঁড় চা দিল দোকানি। চায়ের সঙ্গে তার সাদৃশ্য শুধু মাত্র উত্তাপে। তারিয়ে তারিয়ে ভাঁড়টা নিঃশেষ করে গগ্যা বললে,—চল ঘরে গিয়ে বসি।

আবার মুখোমুখি বসলাম দুজন। দুই বাল্যবন্ধু। বর্তমানে প্রতিপক্ষ। আমি বলি, —আমার সময় কম গগ্যা। ভণিতা ছেড়ে সোজা কথায় আসা যাক। এভাবে পালিয়ে এসেছিস কেন?

—পালিয়ে মোটেই আসিনি। ঠিকানা জানিয়েই এসেছি। না হলে তুই এ বস্তীতে আমাকে কিছুতেই খুঁজে পেতিস না।

—না হয় পালিয়ে নয়, চলে এসেছিস। তাই বা এসেছিস কেন? তোর বউ ছেলে মেয়ে খাবে কি?

—এতদিন যা খেয়ে এসেছে। ওরা আমার উপার্জনে খেত না।

—শান্তি দেবীর বিরুদ্ধে তোর আসল অভিযোগটা কি?

—অভিযোগ? কিছুমাত্র না।

—কিন্তু এ-ভাবে স্ত্রীকে ত্যাগ করলে পাঁচজনে তোকে গালমন্দ দেবে না?

—গালমন্দ দেওয়া পাঁচজনের স্বভাব। ও আমি ভ্রূক্ষেপ করি না।

—স্বভাব কেন? অন্যায় করছে দেখলে সবাই বলবে। তোর বাপান্ত করবে।

—করুক। ওরা বাপান্ত করার আগেই বাপ আমার 'অন্ত ' লাভ করেছেন।

—তোর লজ্জা হচ্ছে না?

—কিছুমাত্র না।

—তুই মানুষ না, জানোয়ার! একটা পাষণ্ড! একটা চামার!

—মেনে নিলাম।

আমার দম ফুরিয়ে গেল। একতরফা ঝগড়া চলে না। গগন অহেতুক ঝগড়া

বাধাতো। অথচ এখন নির্বিবাদে সব গাল হজম করে নিল। এবার কি বলব? কিন্তু এত সহজে হার মানা চলে না। আবার নবোদ্যমে শুরু করি,—এইমাত্র বললি, তোর কাছে একটা পয়সা নেই, তুই খাবি কি?

—রোজগার করব।

কোনও বিকার নেই ওর। জবাবগুলো ওর ঠোঁটের আগায়। মনে মনে ও বোধহয় এসব প্রশ্নোত্তরের মহড়া করে রেখেছে। আবার বলি,—জানিস, আমরা আইনত তোকে বাধ্য করতে পারি বউয়ের কাছে ফিরে যেতে? তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তুই অস্বীকার করতে পারিস না!

—ভুল করছিস দীপু। আইনের মাধ্যমে আমাকে বউয়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তোদের নেই। আইনত তোরা হয়তো আমাকে জেল খাটাতে পারিস। তাও ঠিক পারিস কিনা জানি না। সেটা আদালতে ফয়সালা করা চলে।

—হ্যাঁ জানি। এটা হতভাগ্য ভারতবর্ষ! তাই এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে আর একটা বিয়ে করায় আইনত কোন বাধা নেই ; কিন্তু নিতান্ত অমানুষ না হলে কেউ সেটা করে?

মাথা ঝাঁকিয়ে গগ্যা এতক্ষণে বিরক্তি প্রকাশ করে। বলে,—ঝাঁট দে ওসব ছেঁদো কথা! থিওরেটিক্যাল কথাবার্তা আপাতত বাদ দে। দুটো বিয়ে তো আমি করিনি।

—করিসনি ; কিন্তু করবি তো?

—কি করব? আর একটা বিয়ে? ঝাঁট দে ওসব ছেঁদো কথা!

—বিয়ে করবি না তো কি রক্ষিতা করে রাখবি?

—কাকে?

—যাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিস?

গগ্যা অনেকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর এতক্ষণে আমার প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরায়। বলে,—কী আবোল-তাবোল বকছিস দীপু?

—তুই অস্বীকার করতে চাস 'জি. এস.' নামে একটা মেয়েকে তুই নিয়ে আসিসনি?

—'জি. এস.?' তার মানে? এসব কার কল্পনা? শান্তি না তার ফুলদা?

—কল্পনা কারও নয় গগ্যা। আমি নিজের চোখে দেখেছি। তোর দোকানঘর থেকে বের হয়েছে রাশি রাশি ছবি। আর তাতে লেখা 'টু প'ল, ফ্রম জি. এস.।'

কোথাও কিছু নেই প্রচণ্ড স্বরে হাসতে গিয়ে কেশে উঠল গগ্যা। সিগারেটের ধোঁয়া ছিল তার মুখে। কাশতে কাশতে চোখে জল এসে গেল বেচারির। তারপর মুখ চোখ মুছে স্থির হয়ে বসে বলে—বেচারি শান্তি ! প্রেম আর ভালবাসা ছাড়া আর কিছু জানে না। এ ঐসব ম্যাগাজিন পড়ার ফল। ঐ প্রগতি-মগতি।

—তুই বলতে চাস এর মধ্যে দ্বিতীয় একটি মেয়ে নেই?

—ঝাঁট দে! আমি ঢাকা থেকে খোলা মনে একা এসেছি। এখানে একাই আছি।

—ছবিগুলো তাহলে কে এঁকেছে?

—আমি।

—তুই? তুই তো ছবি আঁকতে জানিস না। তাছাড়া ছবিগুলো তো তোকেই উৎসর্গ করা। তাহলে 'জি. এস.' কে?

—ছবিগুলো 'গগ্যা দি আর্টিস্ট'কে দিয়েছে 'গগ্যা দি শপ-কীপার'!

মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। বলি,—তুই এখানে কি করতে চাস?

—ছবি আঁকতে চাই।

—ছবি আঁকতে চাস? তুই গগন পাল? আর্য মিশনের সেই গগ্যা?

এতক্ষণে সোজা হয়ে উঠে বসে। আমার চোখে চোখ রেখে যেন প্রতিধ্বনি করে,—ঠিক্ তাই ছবি আঁকতে চায়, গগন পাল? আর্য মিশনের সেই ফেল করা ছেলে, গগ্যা! কেন, আপত্তি আছে?

—না, আপত্তি করলেই বা শুনছে কে? কিন্তু দোকানদারী করতে করতেও তো ছবি আঁকা যায়?

—সে-সব সৌখীন মজদুরী। আমি সর্বতোভাবে ছবি আঁকায় আত্মনিয়োগ করতে চাই।

—অর্থাৎ প্রফেসনাল আর্টিস্ট? ও জিনিসটা বিলাতে আছে, এদেশে নেই। আর তাছাড়া ছবি এঁকে তুই নাম করতে পারবি তার স্থিরতা কোথায়?

—কে চাইছে নাম করতে? আমি যশের কাঙাল নই। আমি স্রেফ ছবি এঁকে যেতে চাই। সে ছবি কেউ দেখল কি দেখল না, সুখ্যাতি না কুখ্যাতি করল এ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

আমি ধমক দিয়ে উঠি,—পাগলামিরও একটা মাত্রা থাকে গগ্যা। এ কী বলছিস তুই? পাঁচজনে দেখবে বলেই তো মানুষ ছবি আঁকে? না কি?

—অন্তত আমি সেজন্য আঁকব না!

—তবে কি জন্য আঁকবি?

—না এঁকে আমার নিস্তার নেই—তাই আঁকব!

—এ একটা কথা হল? মনে কর প্রশান্ত মহাসাগরের এক নির্জন দ্বীপে তোকে নির্বাসন দেওয়া হল ; সেখানে সভ্য মানুষ নেই। সেখানে কেউ তোর ছবি দেখবে না। তা সত্ত্বেও তুই সেখানে একা একা বসে ছবি আঁকতে পারিস?

গগন জবাব দিল না। জানলা দিয়ে আগুন-ঝরা বৈশাখী আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। দূর আকাশে পাক খাচ্ছে সূর্যসাক্ষী একটা নিঃসঙ্গ চিল।

—কই, জবাব দিলি নে যে বড়?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল গগ্যার। যেন স্বপ্নের ঘোরে বললে,—তাহলে আমি আর কিছুই চাইব না রে দীপু! নারকেল গাছ ছাওয়া একটা নির্মল নিস্তরঙ্গ অ্যাটল ...দু-চারটে পাতায়-ছাওয়া কুঁড়েঘর...দু-চারজন উলঙ্গ আদিম আদিবাসী, যাদের ভাষা আমি বুঝি না, প্রখর সূর্যালোক, সবুজ বন...নীল আকাশ আর ধূসর সমুদ্র! উফ্!

আবেশে চোখ বুজল গগ্যা।

হেসে বলি,—ওসব রোমান্টিসিস্‌ম্ কাব্যেই ভাল লাগে গগ্যা। বাস্তবে ও কল্পনাবিলাসের কোন অর্থ হয় না। ছবি আঁকতে চাস, তা ঢাকায় বসে আঁক না?

যেন বাস্তবেই ফিরে এল সে। বললে, —ওখানে হবে না। ঝাঁট দে!

—কেন হবে না? গগন, কিছু মনে করিস নে ভাই। ছবির বিষয়ে আমি কিছু কিছু বুঝি। দেবনারায়ণবাবুর ড্রইং ক্লাসে তোর চেয়ে আমি অথবা বটুক বরাবর বেশি নম্বর পেতাম। তোর দ্বারা ওসব হবে না।

—মট্‌কুও তাই বলে ; কিন্তু আমার উপায় নেই। আমাকে আঁকতে হবে। ছবি না এঁকে আমার নিস্তার নেই।

—মট্‌কু? মানে বটুক? বটুক কোথায় জানিস?

—জানি। হগসাহেবের বাজারে সে দোকান দিয়েছে। ভাল রোজগার করছে।

—কিসের দোকান?

—ছবির।

ওকে আবার বলি,—গগ্যা, বটুকের ভাল রোজগার হচ্ছে বলে তোরও যে হবে এমন কোন কথা নেই। বটুক পাক্কা চার বছর আর্ট স্কুলে শিখেছে। সে পাস করা আর্টিস্ট। সে গোড়া থেকেই ঐ লাইনে লেগে ছিল। তোর বয়স চল্লিশ। এ বয়সে কি ছবি আঁকা শেখা যায়? না তা থেকে রোজগার করা যায়?

একগুঁয়ে গোঁয়ারটা জবাবে ঐ একই কথা বললে,—তা জানি না ; কিন্তু ছবি আমাকে আঁকতেই হবে। ছবি না এঁকে আমার নিস্তার নেই।

অগত্যা উঠে পড়ি। বলি,—চলি তাহলে?

—যাবি? তা যা।

—ও, ভাল কথা। শান্তি দেবী তোর সেতারটা আমাকে দিয়েছেন তোকে দিতে। সেটা আমার বাড়িতে আছে. তুই নিয়ে আসবি? না হলে আবার কষ্ট করে আমাকে—

—না না। তুই আবার কেন কষ্ট করবি? চল, এখনই চল, নিয়ে আসি।

কোন বিকার নেই। এই সেতার ফেরত দেওয়ার ভিতর যে তীব্র অভিমান আছে—এর ভিতর যে একটি কাব্য আছে এটা ওর যেন খেয়ালই হল না। সেতার সে বাজাতে ভালবাসে। সেতারটা সে ফেলে এসেছিল। এখন সেটা হাতে পাওয়া যাবে এতেই ও খুশি। পাথরে মাথা খুঁড়ছি জেনেও বললাম,—সেতারটার জন্য খুব অভাব বোধ করছিলি নিশ্চয়। তোর বউ মনে করে—

গগন একটা হাফ সার্টের মধ্যে মাথা গলাচ্ছিল। জুতোটা পায়ে দিয়েছে এবার। ঐ অবস্থাতেই আমাকে বাধা দিয়ে ও বললে,—আরে ঝাঁট দে! সেতারের কথা এতদিন মনেই ছিল না আমার। তুই বললি অমনি মনে পড়ল।

—তাহলে এখনই ছুটছিস কেন?

—না হলে আজ রাতে খাব কি? বললাম না, পকেট একেবারে গড়ের মাঠ! ওটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ডে আজই বেচে কিছু নগদ টাকা রোজগার করতে হবে। সিপিয়া আর আলট্রামেরিন রঙের টিউব দুটোও ফুরিয়েছে ও দুটোও কিনে আনব। কি হল, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? চল?

কেন যে হঠাৎ পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম তা আর ওকে বলিনি।

কিন্তু মোড়ের মাথাতেই দেখা হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে আর একজন বন্ধুর সঙ্গে। বটুকেশ্বর দেবনাথ। উৎসাহের আতিশয্যে একেবারে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

—উঃ! কতদিন পর দেখা! চল চল ঘরে গিয়ে বসি। নে, সিগ্রেট খা।

অগত্যা আবার ফিরে গিয়ে বসি গগ্যার ছাপরায়। বটুকেশ্বর একনাগাড়ে কিছুটা বকবক করে চলে। হগমার্কেটে দোকান দিয়েছে সে। নানান জাতের ছবি আঁকে। গত তিন-চার বছর ধরে সরকারী চিত্রশালার বার্ষিক প্রদর্শনীতে তার ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রাইজ এখনও পায়নি, তবে গত বছর তার প্রদর্শিত তিনখানি ছবিই বিক্রি হয়েছে। বেশ ভাল দামে। একটি একশোয় এবং বাকি দুটি পঞ্চাশে। এবার সে একখানা বড় ছবি আঁকছে। পাঁচ বাই তিন। অয়েল কালার। বিষয়বস্তুটা কী, তা সে বলবে না ; আমাকে দেখে বলতে হবে। আমার খোঁজ-খবরও নিল। ঢাকা ছেড়ে কলকাতা আসছি শুনে খুব খুশি হল ; বললে,—তোর পাকাপাকিভাবে কলকাতা আগমনে আমি পার্টি দেব। পোলাও আর মাংস। ওঃ! হাঁড়ি-কাবাব যা বানায় সুলেখা! সিম্প্লি সুপার্ব!

—সুলেখা? তোর বউ? বিয়ে করেছিস?

চোখ দুটি ছোট ছোট করে বটুক তাকায়, বলে,—তুই কী, ভেবেছিলি বটুকের কোনদিন বে হবে না? কেন? এই খানদানি বদনখানির জন্যে?

বটুকেশ্বর দেবনাথের উচ্চতা পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি। গগ্যার বুকের কাছে তার মাথা। মাথাটা দেহের তুলনায় বড়, এবং সেই মাথা ভরা টাক! কন্দর্পকান্তি নয় বটুক—এটা সেও জানে, আমরাও জানি। কিন্তু তার সাজ-পোশাকের বাহার আছে। কোট-প্যান্ট-টুপি চড়িয়েই সে এসেছে এই বরাহনগরের বস্তীতে। পায়ে তার চক্‌চকে গ্লেসড-কিড জুতো —খাস চিনেবাড়ির।

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে বলি,—ছেলেমেয়ে কি?

—ছেলেপুলে হয়নি।

—এখনও হয়নি? কতদিন বিয়ে করেছিস?

—ওঃ! সে অনেক দিন! তের-চোদ্দ বছর হয়ে গেছে!

অর্থাৎ সন্তান হওয়ার আশাও আর নেই। ঐ চিত্রগুলিই ওর সন্তান।

বটুক মনিব্যাগ খুলে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে গগ্যার দিকে,—নে ধর!

গগ্যা ছোঁ মেরে নোটটা নিয়ে আমার দিকে ফিরে বলে,—সেতারটা কাল পরশু গিয়ে নিয়ে আসব।

বটুক বলে,—স্টিল-লাইফটা শেষ করেছিস?

প্রশ্নটা গগ্যাকে। সে হাফ সার্টটা খুলে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে খাটিয়ার নিচে থেকে টেনে বার করল কাগজে জড়ানো ক্যানভাস। বটুক সেটা ঘরের এক কোণে রেখে সমঝদারের মত একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বললে,—কিশ্‌শু হয়নি। বললাম, ড্রইংটা আরও চালিয়ে যা। তা নয়, তুলি ধরব। ওরে বাবা, এ এত সহজ নয়! বুঝলি? ড্রইংটা মক্‌সো না হলে কিছুই হবে না। গেলাসটা সিমেট্রিকাল হয়নি। সেন্ট্রাল লাইনের ডাইনে সরে গেছে। খাটিয়ার পায়াগুলো ভার্টিকাল নয়। দে, তুলি দে—

ছবিটা ঘরের ভিতরেই এঁকেছে গগ্যা। খাটিয়ার একটা অংশ, একটা কলসি, একটা তালপাখা, একটা গেলাস। তেলরঙে আঁকা ক্যানভাস। রঙ ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া করে লেগেছে। কাঁচা হাতের আঁকা। ঠিকই বলেছে বটুক। গেলাসটা ঠিকমত আঁকা হয়নি। খাটিয়ার পায়াও বেঁকে গেছে।

খাটিয়ার নিচে থেকে প্যালেট আর তুলিটা নিয়ে বটুক এগিয়ে যেতেই ছবিখানা ছোঁ মেরে তুলে নিল গগ্যা। বললে,—আমার ছবিতে মেরামত করতে হবে না তোকে। আর কিছু শেখাতেও হবে না। কিভাবে লিনসিড অয়েলে রঙ গুলতে হয় এটুকুই শিখতে চেয়েছিলাম তোর কাছে—

—ওঃ! বাদবাকি তুই নিজেই শিখে নিবি? একলব্য হয়েছিস?

গগ্যা হাসল। বললে,—তাই হতে চাই রে মট্‌কু।

ফেরার পথে অনেকটা পথ বটুকের সঙ্গে এলাম। ও ভবানীপুরের দিকে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছে। দুটি তো মাত্র প্রাণী। দুখানি ঘর। কল ও স্নানাগার অপর একজন ভাড়াটের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়। তাও মাসে বারো টাকা ভাড়া। বটুকের ইচ্ছে ছিল সেদিনই আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে যায়। আমি রাজী হতে পারি না। পরে একদিন যাব বলে পাশ কাটালাম। বলি,—বটুক, তুই গগ্যাকে টাকা দিলি কেন? ধার?

—ধার বলেই দিলাম। তবে শোধ পাবার আশা না রেখে। কি করব? একেবারে ধরে পড়েছিল।

—ওর সব কথা তুই জানিস? গগ্যা তার সতের বছরের বিয়ে-করা বউকে ফেলে চলে এসেছে।

বটুক বললে,—জানি! তাতেই তো শ্রদ্ধা হল ওর ওপর। ওর বুকের পাটা আছে।

আমি বললাম,—বুকের পাটা যে আছে, সেটা ওর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বাঙালি ছেলের অমন চওড়া বুক আমি খুব কমই দেখেছি. কিন্তু সেটাই কি সব বটুক? বুকের পাটাটাই দেখলি তুই? কিন্তু ঐ বুকের ভিতর স্নেহ-ভালবাসা-মমতা কি একতিলও থাকতে নেই?

পথ চলছিলাম দুজনে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বটুক। বলে,—দেখ দীপু, ওভাবে ওকে বিচার করিস না। ও হল আর্টিস্ট! ওর জাত আলাদা! তোর আমার মত সহজভাবে ওকে বিচার করা চলে না!

এবার আমিও দাঁড়িয়ে পড়ি। বলি,—কী বলছিস তুই? গগ্যা আর্টিস্ট? ওর লাইন-জ্ঞানই তো হয়নি এখনও। খাটিয়ার পায়াগুলো কিভাবে এঁকেছে দেখেছিলি?

—হ্যাঁ, ওর হাতটা এখনও আর্টিস্টের নয় ; কিন্তু চোখ আর্টিস্টের। কতবড় দিল্ থাকলে তবে অমন গোছানো সংসার, নিশ্চিত রোজগারকে এভাবে ফেলেছেড়ে মানুষ ছবি আঁকবার উন্মাদনায় বস্তীতে এসে উঠতে পারে ভেবে দেখেছিস!

আমি বলি,—কিন্তু বস্তীতে ওঠার কি প্রয়োজন ছিল ওর?

—সে তুমি বুঝবে না ডাক্তারসাহেব!

—কিন্তু তোকে তো ঘর সংসার ছেড়ে রাস্তাতে এসে বাস করতে হচ্ছে না?

—যে অর্থে গগ্যা আর্টিস্ট সে অর্থে আমি আর্টিস্ট নই—এ থেকে সেটাই প্রমাণ হয়। ব্যাপারটা তোকে বুঝিয়ে বলতে পারব না দীপু। আমি নিজেও বুঝিনি ঠিকমত। কিন্তু ওর চোখে আমি আগুন দেখেছি. সেখানে ভুল হয়নি আমার।

একটু থেমে আবার বলে—কোম্পানির বাগানের সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে আছে দীপু? গগ্যাকে তিনি বলেছিলেন—'তেরা বনৎ বনৎ বনি যাই! বিগড়ি বনৎ বনি যাই।' মনে পড়ে?

—কথাটার মানে কি রে?

—ওটা তুলসীদাসজীর একটা দোঁহার অপভ্রংশ। অর্থাৎ 'তোমার চেষ্টা করতে করতে হয়ে যাবে, ভুল করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে!'

বিশ বছর আগেকার ভবিষ্যদ্বাণী। আমার একটুও মনে ছিল না সেকথা। বটুক কিন্তু ভোলেনি। ঐ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল আর একটি বন্ধুর কথা। প্রশ্ন করি—

—হ্যাঁরে, চন্দ্রভানের খবর রাখিস?

—হ্যাঁ। চন্দ্রভান মারা গেছে।

—মারা গেছে? ঈস্! কবে? কেমন করে?

—চন্দ্রভান মরে জন্মেছে ভিন্সেন্ট ভান গর্গ! ধ্রুবানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। যবন কাঁহকা! চন্দ্রভান খ্রীষ্টান হয়ে গেছে!

আমি বলি,—কিন্তু তোর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী তো ফলেনি! তুই পাসও করেছিস। নামকরা আর্টিস্টও হয়েছিস। একশো টাকা দিয়ে তোর ছবি কিনছে লোকে—

বটুক কি একটা কথা বলতে গেল। বলল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত। ম্লান হেসে বললে,—

কি জানি! হ্যাঁ, তা তো বটেই ; আমি আর্টিস্ট হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছি। দেবী বীণাপাণির প্রসাদ পেয়েছি আমি! না, ধ্রুবানন্দ অগ্নিহোত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী অন্তত আমার ক্ষেত্রে ফলেনি!

বটুক কী কথা বলতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গিয়েছিল, সেদিন তা বুঝিনি। সেটা বুঝতে পেয়েছিলাম অনেক অনেকদিন পরে।

সাতদিনের মাথায় ফিরে এলাম ঢাকায়। ইতিমধ্যে গগ্যা এসেছিল একদিন সেতারটা নিতে। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি বাড়িতেই ছিলাম। চাকরের হাতে যন্ত্রটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। গগ্যা চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি আছি কিনা। আছি শুনেও সে কিন্তু দেখা করতে চায়নি। সেতারটা নিয়ে ফিরে গিয়েছিল।

আমি কিন্তু বটুকের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। তার যুক্তির কোনও অর্থ হয় না। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের দায় তাকে মেটাতে হবে। আর্টিস্ট হতে চাই বললে তার সাত-খুন মাপ হয় না। ঢাকাতে পৌঁছেই পরদিন গিয়ে দেখা করলাম শান্তি দেবীর সঙ্গে। দুপুরবেলাতেই গিয়েছিলাম, যাতে ছেলেমেয়েরা স্কুলে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে ওঁর ফুলদাও বাড়ি ছিলেন না। এ কয়দিনে আরও যেন ভেঙে পড়েছেন শান্তি দেবী। চোখের কোলে কালি পড়েছে। মুখটা শুকিয়ে গেছে।

—আসুন ডাক্তারবাবু, কবে এলেন?

—কালই এসেছি। শুনুন, গগ্যার সঙ্গে দেখা হয়েছে—

ক্লান্ত বিষণ্ণ দুটি দৃষ্টি মেলে বসে থাকেন শান্তি দেবী। যেন আমার বক্তব্যের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ নেই। একটু অবাক হতে হল আমাকে। এতটা অনীহার কারণ কি? যাইহোক, যা দেখেছি, যা বুঝেছি—যা যা কথাবার্তা হয়েছে আনুপূর্বিক বলে গেলাম। দীর্ঘ সময় শান্তি দেবী কোন কথা বলেননি। ক্রমে ক্রমে তাঁর উদাস দৃষ্টিতে স্বাভাবিকতা ফিরে এল। ওঁর চোখের তারায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠল আগ্রহের রেশ। সব কথা শেষ হতে বললেন,—ছবি আঁকতে চায়? আর কিছু না?

—না। আর কিছু নয়। বারে বারেই সে বললে ঐ কথা। সে বুঝেছে, ছবি না এঁকে তার নিস্তার নেই। আর এখানে বসে বসে তার ছবি আঁকা হবে না।

হঠাৎ উঠে পড়েন উনি। বলেন,—ডাক্তারবাবু, আপনাকে একটু কষ্ট দেব। আমাকে যা বললেন, সেই কথাগুলি আবার আপনাকে বলতে হবে বাবলুকে। কিছুই বাদ দেবেন না। সব কথা খুলে বলবেন।

—বেশ। বাবলু ফিরে আসুক স্কুল থেকে।

—না। ও স্কুলে যায়নি আজ। পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। আসুন, দেখুন।

পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে উনি দেখালেন। এ কী? বাবলু শুয়ে আছে চৌকির উপর ; কিন্তু মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

—কি ব্যাপার? মাথা ফাটলো কেমন করে?

—স্কুলে মারামারি করে এসেছে। ফুলদার কল্যাণে সারা ঢাকা শহরে রটে গেছে আপনার বন্ধুর কাহিনী। স্কুলে কে বুঝি তাই নিয়ে বাবলুকে কি বলেছে. বাপের অপমান ছেলে সহ্য করেনি। মাথা ফাটিয়ে বাড়ি এসেছে। আপনি ওকে সব কথা খুলে বলুন। ওর জানা দরকার—ওর বাপ ব্যভিচারী নয়!

আবার মনে হল, অদ্ভুত মেয়ে এই শান্তি দেবী।

ঢাকার বাস তুলে দিয়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতাতেই এসে বসলাম। প্রথম মাসকতক নিজেকে নিয়েই এত ব্যস্ত ছিলাম যে বটুক অথবা গগনের কোন খোঁজখবর নিতে পারিনি। গগনের সঙ্গে অবশ্য সম্পর্ক রাখবার আদৌ কোন ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু বটুকের সাদর আমন্ত্রণ রাখতে যাবার ইচ্ছে ছিল—নানান ঝঞ্ঝাটে ঘটে ওঠেনি। ক্রমে ভুলেই গিয়েছিলাম সেকথা। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন মাসিক বসুমতীর পাতা ওলটাতে বসে। প্রথম পাতাতে যে ছবিটি ছাপা হয়েছে তার চিত্রকর—শ্রীবটুকেশ্বর দেবনাথ। ছবির ক্যাপসান—'পূজারিণী'। ফুলের সাজি ও নৈবেদ্যের থালা হাতে একটি পূর্ণযৌবনা রমণী মন্দিরের ধাপ বেয়ে উপরে উঠছে। পশ্চাদপটে একটি পুকুর, নারকেল গাছ, রোমন্থনরত গাভি। মেয়েটির পরিধানে একটি ভিজে শাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। ফলে মন্দিরের বাতাবরণে একটা স্বর্গীয় ভাবের সঙ্গে আর্টিস্ট পার্থিব সৌন্দর্যকে সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন।

সেদিনই দেখা করতে গেলাম হগমার্কেটে। দোকানের ঠিকানা বটুক আগেই দিয়ে রেখেছিল। ছোট্ট দোকান। ছবি সবই বটুকেশ্বর দেবনাথের আঁকা। প্রতিটি ছবির দাম লেখা আছে ছবির নিচে। বটুক আমাকে দেখে খুশি হল। দোকানের টুলটা টেনে বসালো আমাকে। পাশের দোকান থেকে কেক আর চা এনে খাওয়ালো। বললে,—এতদিন পরে অধমকে মনে পড়ল?

—পড়ত না। আজ মাসিক বসুমতীতে তোর ছবিখানা দেখে মনে হল আর্টিস্টকে কংগ্র্যাচুলেট করে আসা উচিত!

—কেমন লেগেছে? সুন্দর নয়?

—হ্যাঁ, চমৎকার হয়েছে। বিশেষ করে ব্যাকগ্রাউণ্ডটা।

—আরে দূর! আমি ছবিটার কথা বলছি না। বলছিলাম, 'সুলেখা' সুন্দর নয়?

—তার মানে? ঐ তোর বউ সুলেখা নাকি?

খুশিতে বটুকেশ্বরের চোখ দুটো মিটমিট করতে থাকে। ও বসেছিল কাউন্টারের ওপাশে একটা উঁচু টুলে। সেখানে বসে বসে পা নাচায় টুক্‌টুক্ করে। বেঁটে মানুষটা টুলে বসে বেশ দোলনায় বসার আনন্দ লাভ করে। আমি বলি,—আরে সেকথা জানা থাকলে আরও ভাল করে মেয়েটাকে দেখতাম। আমি তো 'পূজারিণী'কে দেখিনি, দেখেছি গোটা ছবিখানা।

বটুক তুরুক্ করে নেমে পড়ে টুল থেকে। বলে,—দেখ না যত খুশি!

র‍্যাকের নিচে থেকে টেনে বার করে অরিজিনালখানা। একটু দূরে বসিয়ে দেয় আলোর নিচে। নিজেও একটু দূরে সরে গিয়ে ঘাড় নেড়ে দেখতে থাকে।

বলি,—বিক্রি করবি? কত দাম ধরেছিস?

না ভাই, এখানা নয়! সুলেখাকে কথা দেওয়া আছে।

আমি হো হো করে হেসে উঠি। বলি,—কেন রে? ভিজে কাপড় পরে আছে বলে? ও ছবি তো এখন ঘরে ঘরে। অত কনসার্ভেটিভ হলে এ ছবি আঁকবারই বা কি দরকার, আর সেটা মাসিকপত্রে ছাপানোরই বা কি দরকার?

যেন অত্যন্ত গোপন একটি খবর জানাচ্ছে—বটুকেশ্বর মুখটা আমার কানের কাছে সরিয়ে এনে বললে, —সুলেখাকে মডেল করে ছবিখানা এঁকেছি বটে, তবে মুখটা ইচ্ছে করেই বদলেছি। না বলে দিলে কেউ বুঝতে পারবে না এটা সুলেখার চেহারা। আসলে ফিগারটা সুলেখার, মুখটা কাল্পনিক!

—তবে আর ওটা বিক্রি করতে আপত্তি কিসের?

—ওর পিছনে একটা সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু আছে বলে। ছবিটা এবার একজিবিশানে যাবে 'নট ফর সেল' মার্কা নিয়ে।

—সুলেখার পোর্ট্রেট এঁকেছিস? কই, দেখি?

—আলেখ্য কেন দীপু, গোটা মানুষটিকেই দেখে এস না বাবা। ও তো প্রায়ই বলে—কই, তোমার সেই ডাক্তার-বন্ধু আসবেন বলেছিলেন, তা এলেন না তো। একবার তোকে দিয়ে ওকে দেখাতেও চাই। মাঝে মাঝে ফিট হচ্ছে আজকাল। হজমেরও গণ্ডগোল আছে, কন্সটিপেশন! তাছাড়া এতদিনেও ওর ছেলেপুলে হল না।

বটুকেশ্বর তার স্কেচবই বার করে দেখালো। ওর বউয়ের অনেক স্কেচ এঁকেছে. নানান গৃহকর্মে ব্যাপৃতা। রান্না করছে, তরকারি কুটছে, সেলাই করছে, বসে আছে বা শুয়ে আছে। পেনসিল, পেন-অ্যাণ্ড-ইঙ্ক, টেম্পারা এবং অয়েল। দু-চারখানা রঙিন ক্রেয়নে। বটুক ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকে না, স্টিল লাইফও নয়, অধিকাংশ চিত্রই মানুষের, বরং বলা উচিত মেয়েমানুষের—আর সেই মেয়েমানুষ ওর মনের মানুষ। পাছে লোকে চিনে ফেলে বলে মুখটা শুধু বদলে দেয়। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পৌরাণিক বা মহাকাব্যের বিষয়বস্তু নিয়ে কেন সে কাল্পনিক ছবি আঁকে না। বললে,—মুশকিল কি জানিস, পৌরাণিক ছবি আঁকতে গেলে কোন স্টাইলে আঁকব? সুলেখাকে মডেল করে 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' একখানা এঁকেছিলাম। সেটা দেখে অবন্‌দা বললেন—বটুক, তোমার সীতা অগ্নিপরীক্ষায় পার পাবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমাকে এ কোন্ অগ্নিপরীক্ষায় ফেললে তুমি?

—অবন্‌দা মানে?

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছবিখানা জোড়াসাঁকোয় দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।

—কেন, অবনীন্দ্রনাথ ও কথা কেন বললেন?

বটুক আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়। অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, নন্দলাল, অসিতকুমার ইত্যাদি পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে অনেক ছবি এঁকেছেন ও আঁকছেন। তাঁদের একটা নতুন 'স্কুল' হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় সেটা ভারতীয় চিত্রাদর্শ। অ্যানাটমি সেখানে বড় কথা নয়, বড় কথা ভাবের ব্যঞ্জনা। সাহিত্য পত্রিকায় এঁদের ক্রমাগত গালাগাল দিয়ে যাওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু দেশে-বিদেশে ক্রমে ক্রমে এই ধরনের ছবি সমাদর পাচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথের বুদ্ধ ও সুজাতা, নির্বাসিত যক্ষ, যমুনাতটে

রাধিকা, শিব-সীমন্তিনী ; ক্ষিতীশ মজুমদারের—রাসলীলা, শকুন্তলা, গঙ্গা ; নন্দলালের—সতী, কৈকেয়ী, সাবিত্রী ও যম, গান্ধারী, কিংবা অসিতকুমারের—রাসলীলা, অশোকবনে সীতা, শিব-পার্বতী সার্থক সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হয়েছে। এসব ছবির কোথাও অ্যানাটমিকে পুরোপুরি মেনে চলা হয়নি। সুরেশ সমাজপতি তাঁর 'সাহিত্যে' এ জাতীয় ছবির কঠিন সমালোচনা করে চলেছেন। নন্দলালের মহাদেবের তাণ্ডব-নৃত্যের সমালোচনায় লিখেছেন, 'মহাদেব কেন হাড়গিলার মত একপায়ে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা বুঝিলাম না।' অবনীন্দ্রনাথের 'কাজরী' চিত্রের প্রসঙ্গে লিখলেন, 'রমণীর প্যাকাটিবিনিন্দিত হাতের ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গী।' বটুকেশ্বর যে বছর ম্যাট্রিক পাস করে সেই বছরই অবনীন্দ্রনাথ সরকারী আর্ট স্কুলের সহ-অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। আর্ট স্কুলে যখন পড়ছে তখন অবনীন্দ্রনাথের নূতন ভারতীয় ভাবাদর্শ সেখানে নবরূপ পরিগ্রহ করছিল। আর্ট স্কুলে তখন একটি 'পিকচার গ্যালারি' ছিল। তাতে অতি সাধারণ স্তরের য়ুরোপীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের নমুনা ছিল। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষই ই. বি. হ্যাভেল এটা সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন, তাতে সায় দিলেন সহ-অধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথ। ওঁরা সম্পূর্ণ নূতন ভারতীয় আদর্শে আর্ট স্কুলকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন। কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আর্ট স্কুলের ছাত্রদল ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ সংগ্রহশালা অবনীন্দ্রনাথ অপসারিত করিয়েছিলেন। ওরিয়েন্টাল আর্টের আসন নিরঙ্কুশ হল আর্ট স্কুলে। সুরেশ সমাজপতির শ্লেষাত্মক আক্রমণ সত্ত্বেও নূতন ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত শিল্পীর দল এগিয়ে চললেন তাঁদের পথে। দেশে-বিদেশে ক্রমে ক্রমে স্বীকৃতি পেলেন তাঁরা। ইতিমধ্যে আর্ট স্কুলে একটি সংগ্রহশালা খোলা হয়েছে। লর্ড কারমাইকেলের আমলে এই সংগ্রহশালার 'পারচেস কমিটি'তে যাঁরা সভ্য হয়ে এলেন তাঁরা সকলেই ভারতীয় ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত—মিস্টার মোলার এবং মিস্টার রুবেনসন নামে দুজন সুইডিশ শিল্পরসিক, মিঃ নর্মান ব্রান্ট, এ ছাড়া গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। স্যার জন উডরফ ছিলেন কমিটির সভাপতি এবং আর্ট স্কুলের নূতন অধ্যক্ষ মিঃ পার্সিব্রাউন ছিলেন সেক্রেটারী। এই সংগ্রহশালাতে নূতন চিন্তাধারায় যাঁরা ব্রতী তাঁদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম স্থান পেতে শুরু করল। ওদিকে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টও তখন জন্ম নিয়েছে। লর্ড কিচেনার তার পৃষ্ঠপোষক, স্যার জন উডরফ এবং বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরীও ছিলেন। শিল্পী ও সি. গাঙ্গুলিও আছেন তার ভিতর ; ফলে ওরিয়েন্টাল আর্টের জয়যাত্রায় বাধা পড়েনি।

এই আবহাওয়াতেই বটুকেশ্বরের শিল্পকর্মে হাতেখড়ি। সে কিন্তু ভাবাদর্শ পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি। অবনীন্দ্রনাথ তার গুরু বটে—কিন্তু মনে মনে সে গুরুত্বে বরণ করেছিল রবি বর্মাকে। পাশ্চাত্যখণ্ডের মিকেলাঞ্জেলো, রাফেল, তিশান, রেমব্রান্টও তার গুরু। ভারতীয় সমসাময়িক চিত্রকরদের মধ্যে একমাত্র যামিনী প্রকাশকে তার ভাল লাগতো। তাঁর ছবিতে মানুষের হাত-পা অস্বাভাবিক মনে হত না। ফলে, পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা তার প্রথম প্রচেষ্টা দেখে অবনীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, —তুমি যে আমাকেই অগ্নিপরীক্ষায় ফেললে বটুক!

আমি বলি,—তা পৌরাণিক বিষয়বস্তু না হোক ঐতিহাসিক বিষয় নিয়েও তো আঁকতে পারিস?

—ওরে বাবা! সুরেশদার 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' নিয়ে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তারপর আর ঐতিহাসিক ছবি আঁকতে আছে? অত ইতিহাসজ্ঞান আমার নেই।

তাই বটুক এঁকে যায় একটি নারীমূর্তির আলেখ্য। নানান ভঙ্গিতে। যার দেহসৌষ্ঠব

তার অতি পরিচিত, আর লোকলজ্জার ভয়ে যার মুখখানি ওকে কল্পনা করতে হয়।

আমাদের আলোচনা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় গগন পাল এসে হাজির। একমুখ দাড়ি, চুলগুলো উসকো-খুসকো। কাটে না আজকাল—পিছনদিকে বাবরির আকার নিয়েছে। বেশ রোগা হয়ে গেছে গগ্যা। ভাল করে খেতে পায় না বোধহয়। গায়ে একটা ময়লা ছেঁড়া হাফসার্ট। তার বোতামগুলো খোয়া গেছে। তাই রোমশ বুকের অনেকটাই প্রকট। পায়ে তালপাতার চটি।

—এই যে, ডাক্তারসাহেবও আছেন দেখছি!

আমি জবাব দিই না। বটুক কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে,—আয় আয়! বাঃ, কী যোগাযোগ! একই দিনে দুজন এসে হাজির। এ অকেশান সেলিব্রেট করতে হয়।

আবার তিন কাপ চায়ের অর্ডার দিল বটুক।

গগন একটা টিনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। বলে,—মট্‌কু, গোটা দশেক টাকা দিবি?

—আরে দাঁড়া ভাই। আগে বল্, নতুন কি আঁকলি?

—ঝাঁট দে ওসব ছেঁদো কথা!

বটুক রুখে ওঠে,—ছেঁদো কথা মানে? তুই তো সব কিছুকে ঝাঁট দিচ্ছিস ঐ ছবির জন্যে। সেটাও তোর কাছে ছেঁদো কথা?

গগন সে-কথার জবাব দিল না। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল আলোর নিচে রাখা 'পূজারিণী'র দিকে। বললে,—মট্‌কু, কেন বাওয়া রঙের শ্রাদ্ধ করছিস? একটা ক্যামেরা কিনে ফেল। তাতে তবু তো বউকে চেনা যাবে।

বটুকের উৎসাহ নিভে গেল হঠাৎ। আমতা আমতা করে বললে,—দূর! ও বুঝি আমার বউ? ও তো 'পূজারিণী'। একটা আইডিয়া।

হো হো করে হেসে উঠল গগন। বললে,—তুই আমার কাছেও চাল মারবি? ও ছুকরির আপাদ-কণ্ঠ যে আমার চেনা আছে ব্রাদার। মুণ্ডুখানা হয় কল্পনা করেছিস, না হলে আঁকতে পারিসনি। তা ডাক্তারসাহেবকে ডাকতে হল কেন? নিমুনিয়া হয়েছে বলে?

—নিমুনিয়া? কার?

—কার আবার, তোর বউয়ের। ভিজে কাপড়ে তাকে সিটিং তো কম দিন দিতে হয়নি! তা একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে দে তো মট্‌কু। ছুঁড়ি ভিজে তাঁতের শাড়ি পরে মন্দিরে যাচ্ছে কেন? শুকনো গরদ কি তসরের শাড়ি পরলে ক্ষতি কি ছিল?

বটুক স্পষ্টতই আহত হয়েছিল। গম্ভীরভাবে বললে,—শিল্পী বোধহয় কল্পনা করেছেন—ঐ পুকুরে স্নান সেরে মেয়েটি মন্দিরে যাচ্ছে, ভিজে কাপড় এখনও সে ছাড়েনি।

—বুঝলাম। কিন্তু সায়া-সেমিজ-জ্যাকেট খুলে বুঝি গাঁয়ের মেয়েরা নাইতে যায়?

এবার বটুকের তরফে আমিই অগ্রসর হয়ে আসি। বলি,—এতে রিয়ালিস্টিক ভাবই ফুটেছে। গ্রামের মেয়েরা দরিদ্র—সায়া-সেমিজ-জ্যাকেট তারা দিবারাত্র পরে না।

—ও, রিয়ালিস্‌ম্! কথাটা আমার খেয়াল ছিল না। তা তো ঠিকই। গাঁয়ের মেয়েদের অত পয়সা কোথায়? রুজ, আলতা, লিপস্টিক কিনতেই তো সব খরচ হয়ে যায়!

—তার মানে?

—তাই দেখছি কিনা! বটুকের বউ—আই মীন, ঐ পূজারিণীর কাপড় ভিজে একসা হয়েছে, অথচ প্রসাধনটা ধুয়ে যায়নি। মায় কপালে সিঁদুরের টিপটা পর্যন্ত স্নানের সময়

ধেবড়ে যায়নি। রিয়ালিস্টিক ছবি কিনা!

বটুক কোন প্রতিবাদ করে না। খবরের কাগজে মুড়ে ছবিখানা সরিয়ে রাখে।

—দে, সিগ্রেট দে।

বটুক নিঃশব্দে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দেয়। চা খেয়ে, সিগারেট ধ্বংস করে এবং আশ্চর্য—নগদ দশ টাকা ধার নিয়ে গগন উঠে পড়ে। যাবার সময় আমার দিকে ফিরে বলে,—ডাক্তারসাহেবের পসারের এখন কোন্ স্টেজ? শতমারী, না সহস্রমারী?

আমি জবাব দিইনি। গগনও আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না। বটুকের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট নিয়ে ফুঁকতে ফুঁকতে চলে যায়।

ও চলে যাবার পর বটুককে বলি,—গগ্যাকে এ পর্যন্ত কত টাকা ধার দিলি?

এবারও বটুক জবাব দেয় না। টুকিটাকি নাড়তে থাকে। বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে সে।

—কি রে? জবাব দিলি নে যে বড়? কেন তুই ঐ লোফারটাকে প্রশ্রয় দিস?

হঠাৎ মুখ তুলে তাকায় বটুক। বলে, —দীপু! আমার একটা কথা বিশ্বাস করবি? আজ থেকে একশো বছর পরে যদি কেউ তোর-আমার নাম উচ্চারণ করে তবে তা করবে এইজন্য যে, আমরা গগন পালের বন্ধু ছিলাম!

এর চেয়ে ও যদি আচমকা আমাকে একটা চড় মেরে বসত আমি কম অবাক হতাম!

আমার চমকটা ভাঙার আগেই ও বললে,—হতভাগাটা কিছুতেই ওর ছবি বেচবে না। কাউকে দেখাবে না—

—ওর ছবি এখন বাজারে ছাড়লে বিক্রি হবে?

—বোধহয় না। গতবছর আর্ট এক্‌জিবিশানে আমি জোর করে ওর দুখানা ছবি পাঠিয়েছিলাম। সিলেকশান পায়নি। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। আর ও হতভাগা বললে,—'মট্‌কু, এ আমি জানতাম রে! আমার ছবি সিলেকসান পাবে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে।' তুই জিজ্ঞাসা করছিলি এ পর্যন্ত কত টাকা ওকে ধার দিয়েছি? তা শতখানেকের উপর হবে। জানি, শোধ ও দেবে না ; কিন্তু তবু না দিয়ে পারি না। আর টাকার কথাই যদি বলিস—তাও শোধ হবে! আজ ব্যাঙ্কে ঐ শতখানেক টাকা রাখলে সুদসমেত সেটা যত টাকা হবে তার দশ-বিশগুণ বেশি টাকা পাবে আমার নাতি এই ছবিখানা বিক্রী করলে।

দোকান ঘরের পিছন থেকে একখানা ক্যানভাস নিয়ে এল বটুক। ১৮"×১২" মাপের ছবি। প্রথমটা মনে হল ক্রোম-ইয়ালো, সিপিয়া আর কোবাল্টব্লুর বাটিতে ডুব দিয়ে তিনটে ইঁদুর ঐ ক্যানভাসটার উপর যৌথ-নৃত্য করেছে। কিছুই বোঝা গেল না—ছবিটার বিষয়বস্তু কী। তারপর অনেকক্ষণ দেখতে দেখতে মনে হল—একটা খোলার চালের বস্তী। একটা চায়ের দোকান। একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি। পায়ের কাছে কাদা-মাখা ঘোলা জল, একটা ল্যাংটো বাচ্চা, আঁস্তাকুড়, আর এই সব কিছুর উপর দুটি খোলার চালের মাঝখানে আটকা পড়েছে একমুঠো নীল আকাশ। তাতে একটি মাত্র সূর্যসাক্ষী নিঃসঙ্গ চিল। এমন ছবি আমি জীবনে দেখিনি একথা অনস্বীকার্য। এর আঙ্গিক, এর অঙ্কন-পদ্ধতি, এর ব্যঞ্জনা সবই নতুন। বলি,—এর মধ্যে সুন্দর কোন্‌টা?

বটুক বললে, ছবিতে সব সময় সুন্দর কিছু যে থাকতেই হবে তার মানে কি? আর ব্যাপক অর্থে যদি বলিস, তবে ঐ বস্তী পরিবেশের বাস্তব কদর্যতার মধ্যেই ওর সৌন্দর্য।

ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। তাই প্রশ্ন করলাম অন্যদিক থেকে,—এই যদি

সার্থক ছবি, তবে তুই এই স্টাইলে আঁকিস না কেন?

—তার একমাত্র কারণ আমি বটুক দেবনাথ, গগন পাল নই!

আমি বলি,—কি জানি ভাই, আমার আর্ট সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা আছে, তাতে এ-ছবিকে কিছুতেই একটি সার্থক সৃষ্টি বলতে পারছি না। প্রথমত, ছবিটা অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে আঁকা। আমার তো মনে হয় আধঘন্টার বেশি সময় লাগেনি। ফলে এটা সৌখীন মজদুরী। এর পিছনে দীর্ঘ সময়ের সাধনা নেই। দ্বিতীয়তঃ, এ বাচ্চা ছেলেটার গায়ের রঙ সবুজ কেন হল তার মাথা-মুণ্ডু বোঝা যাচ্ছে না। মহিষাসুর ছাড়া সবুজ রঙের মানুষের চেহারা কোথাও দেখিনি। তৃতীয়তঃ, সামনে এই কাদার মধ্যে ঘোলা জল যেটা জমে আছে সেটা কোন্ দুঃখে টকটকে লাল রঙের হল? চতুর্থতঃ, ঐ আঁস্তাকুড়টা বাদ দেওয়াই শোভন হত—বিশেষ করে ঐ মরা বেড়ালটাকে। ওটা ছবিটাকে বীভৎস করে তুলেছে।

বটুক একদৃষ্টে ছবিটা দেখছিল। অনেকক্ষণ কোন জবাব দিল না। তারপর ধীরে ধীরে বললে,—আমি তোর সঙ্গে একমত দীপু। ঠিক ঐ ত্রুটিগুলিই আমি দেখিয়েছিলাম ছবিখানা প্রথম দেখে। গগ্যা তার নিজের ছবির সমালোচনা করে না। কিন্তু সেদিন সে মুডে ছিল। দুটি বোতল শেষ করে ভাম হয়ে বসেছিল ওর ছাপরায়? জবাবে কি বললে জানিস?

—কি?

—বললে, 'বাবা মট্‌কু, এ ছবির অর্থ তুমি বুঝবে না চাঁদু। এটি নিয়ে যাও। যত্ন করে রেখে দিও। অনেক টাকা ধার দিয়েছ আমাকে, পঞ্চাশ বছর পরে এই ছবিখানা সে ধার শোধ দেবে। যাও!'—আমি বলেছিলাম, 'ওসব বাজে কথা শুনছি না। ছেলেটা সবুজ, জলটা লাল কেন হল বল্ আগে!'—ও বললে, 'ছবিটা দেখতে হবে আমার চোখ দিয়ে। বাস্তবে কি ছিল জানতে হলে তো তার ফটো তুলতাম। এ তো ফটো নয়—এ হচ্ছে শিল্পীর চোখে দেখা বরানগরের চটকল বস্তী! মাইণ্ড দ্যাট! শিল্পীর চোখে দেখা। শিল্পী ঐ খণ্ডমুহূর্তে দেখেছিলেন ঐ ল্যাংটো ছেলেটার মধ্যে ভবিষ্যৎ তারুণ্যের বিদ্রোহ। তাই তার রঙ সবুজ। সবুজ হচ্ছে তারুণ্যের প্রতীক। শিল্পীর চোখে ওটা বস্তীর কাদা-গোলা জল নয়—বস্তীমজদুরের পাঁজর নিংড়ানো রক্ত! শিল্পী বলতে চান—তবুও এখানে আকাশ বন্দী হয়নি। মরা বেড়ালের ছানাটাই এখানে শেষ কথা নয়, তবুও আছে আকাশ! এ ছবির মানে বুঝতে হলে শিল্পী যে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাকে দেখতে হবে!'—সব কথা আমি বুঝতে পারিনি ; তবু বলেছিলাম,—'বেশ, তাহলে তোর নামটা লিখে দে। নিয়ে যাই।' গগ্যা হেসে বলেছিল,—'মট্‌কু কোথাকার! আমার স্বাক্ষর তো রয়েছে ছবিতে। দেখতে পাচ্ছিস না? ঐ একমুঠো আকাশের নিঃসঙ্গ চিলটাই আমার স্বাক্ষর।'

সেদিন আমার কাছে সবটাই পাগলের প্রলাপ মনে হয়েছিল।

বটুকের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলাম।

ভবানীপুর অঞ্চলে যোগেশ মিত্র রোডে। দ্বিতল বাড়ি, তার একতলায় দুখানি ঘর ভাড়া নিয়ে বটুক বাস করে। দক্ষিণ-চাপা ঘর, বটুক অবশ্য তাতে দুঃখিত নয়—দখিনা বাতাসের চেয়ে 'নর্থ-লাইট'টাই নাকি তার বেশি প্রয়োজন। সরু গলির ভিতর। তা হোক, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি নেই। মনের একাগ্রতা নষ্ট হয় না। বাইরের ঘরটাই ওর স্টুডিও।

পাশে ওর শয়নকক্ষ। পিছনে একফালি বারান্দা। তার ও-প্রান্তে রান্নাঘর। উঠানের ওপাশে স্নানাগার—সেটা দ্বিতলবাসীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়।

বটুক আমাকে আপ্যায়ন করে বসালো। ঘরে মস্ত একটা চৌকি, প্রায় ঘরজোড়া। তার উপর ফরাস। চৌকির উপর একটা কাঠের ডেক্‌সো। বটুক ছবি আঁকে ভারতীয় পদ্ধতিতে—চৌকিতে বসে, টুলে বসে নয়। রঙ, তুলি, রঙের বাটি একপাশে সাজানো। আর্টিস্টের স্টুডিও বলতে যে অগোছালো ছবিটা মনে ভেসে ওঠে এ-ঘরের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নেই। দেওয়ালে অসংখ্য তৈলচিত্র। ওপাশে থাক দেওয়া আছে আরও অনেক ক্যানভাস। ডেস্‌কের উপর একটি ছবি খবরের কাগজে ঢাকা দেওয়া।

আমি ঘুরে ঘুরে ছবিগুলি দেখলাম। প্রথম যুগে অনেক স্টিল-লাইফ ও নিসর্গচিত্রও সে এঁকেছে দেখছি। ইদানিং কালে সে শুরু করেছে নারীচিত্র আঁকতে। বোধহয় বিবাহের পর থেকে। তন্ময় হয়ে ছবিগুলি দেখছি, হঠাৎ পিছন থেকে শুনলাম নারীকণ্ঠে,—নমস্কার!

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি শিল্পীর স্ত্রীকে। সুলেখা দেবী। বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়স হবে। বটুকের চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট। ওঁকে দেখেই বুঝতে পারি কেন বটুক য়ুরোপীয় পদ্ধতির দিকে ঝুঁকেছে। ভদ্রমহিলার দেহসৌষ্ঠব মোটেই বাঙালী মেয়ের মত নয়। লম্বায় বটুকের চেয়ে অন্তত চার আঙুলের বড়। অথচ সেজন্য শীর্ণকায়া মনে হয় না তাঁকে। হয়তো সন্তান হয়নি বলেই দেহের বাঁধুনি এখনও অটুট। পীনোদ্ধত উরস ও গুরু নিতম্বের মাঝখানে মধ্যে-ক্ষামা কটিদেশ। রঙ কালো ; কিন্তু এতটুকু কুঞ্চন নেই গাত্রচর্মে। চোখ দুটি গভীর, চিবুকটা নিখুঁত এবং মাথার চুল অজস্র। মাথায় ঘোমটা ছিল, কিন্তু খোঁপা ছিল না। ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল পাতলা শাড়ির মধ্যে দিয়েও দেখা যাচ্ছে গুরু নিতম্বে আছড়ে পড়েছে।

বটুক বললে,—কেমন হয়েছে বউ?

সুলেখা দেবী লজ্জা পেলেন। স্বামীর দিকে ফিরে বলেন,—কথা বলার কি ছিরি! চোদ্দ বছর হয়ে গেছে মশাই—এখন কি আমি নতুন বউ?

বটুক তার কুতকুতে চোখ দুটো পিট পিট করে বলে,—চল্লিশ বছর পরেও তুমি নতুন বউ থাকবে! না কি বলিস দীপু?

আমি হেসে বলি,—তা জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি 'পূজারিণী' ছবিতে তুমি যদি কল্পনার আশ্রয় না নিতে তবে ভাল করতে।

একটু রাঙিয়ে ওঠেন সুলেখা দেবী। বলেন,—বসুন, আমি ওদিকটা দেখি।

উনি আহারের আয়োজন করতে গেলেন। আমরা দুই বন্ধু গল্প করতে বসি। জিজ্ঞাসা করলাম,—তুই এখন কি আঁকছিস?

বটুক মুখে জবাব দিল না। কাপড়ে মোড়া ক্যানভাসখানা খুলে চৌকির ও-প্রান্তে বসিয়ে দিল। বেশ বড় একখানা ক্যানভাস। ওর স্ত্রীর পোর্ট্রেট। মেয়েটি শুয়ে আছে খাটে—ঠিক শুয়ে নেই, অর্ধ-শয়ান। তার পিঠের নিচে একটা বালিশ, মাথার নিচে আর একটা। দুটি হাত মাথার উপর বেষ্টন করে আছে। পরিধানে একটা কল্কা পাড় বেনারসী শাড়ি। মাথার চুল খোলা—বালিশের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। ছবিটা অসমাপ্ত।

আমি বললাম,—এখানা খুব ভাল ছবি হবে। হয়তো পোর্ট্রেট সেকশানে প্রাইজ পাবে।

বটুক তার ছোট ছোট চোখ দুটি তীক্ষ্ণ করে বললে,—আচ্ছা দীপু, এ ছবিতে তোর

চোখে কোন কিছু বিসদৃশ লাগল? কোন অসঙ্গতি?

—বিসদৃশ? কই, না তো! আমার বরং মনে হচ্ছে ঠিক এই পোজে আঁকা পোর্ট্রেট আরও কোথাও দেখেছি। কোন বিখ্যাত শিল্পীর—ঠিক মনে আসছে না।

—হ্যাঁ, গইয়ার। ছবিটার নাম ডাচেস অফ্ আলভা। মাদ্রিদে আছে। কিন্তু আনন্যাচারাল কোন কিছু লাগছে না তো?

আমি মাথা নেড়ে বললাম,—কই, না!

—অথচ এই ছবিখানা নিয়েই গগ্যার উপর ভীষণ চটে গেছে বউ। ইন ফ্যাক্ট্ আজ তাকেও নিমন্ত্রণ করতে চেয়েছিলাম আমি। বউ রাজী হল না। ও তাকে দু'চোক্ষে দেখতে পারে না।

—তোর বউয়ের সঙ্গে গগ্যার আলাপ করিয়ে দিয়েছিস বুঝি?

—হ্যাঁ। ওকে একবার টেনে এনেছিলাম এখানে। তা সেই প্রথম দিন থেকেই ওকে একেবারে শনির দৃষ্টিতে দেখছে সুলেখা। বলেছে, খবরদার তোমার বন্ধুকে আর বাড়িতে আনবে না।

আমি বলি,—গগ্যাটা যা ঠোঁটকাটা, কিছু বেঁফাস কথা বলে ফেলেছিল নিশ্চয়!

—তা ফেলেছিল। গগ্যাকে ছবিটা দেখাতেই বললে,—'এ আবার কি রে? এমন পাটভাঙা বেনারসী পরে কেউ শুতে আসে?' তাতে আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, —ঐ আশ্লেষ-শয়নার ভঙ্গিতে যে আমন্ত্রণ আছে সে কি নিদ্রাদেবীর? ও তো প্রসাধন সেরে দয়িতের প্রতীক্ষা করছে! আর হতভাগা ফস করে বললে, —'তাহলে বেনারসী কেন বাবা—রিয়ালিসমের চূড়ান্তই কর না কেন? ন্যুডস্টাডি আঁক!' তখন বউ ছিল পাশের ঘরে। কথাটা তার কানে গেছে।

আমি বলি,—গগনের অন্যায় হয়েছে।

—নয়? আর শুধু কি তাই! আমার সবগুলো ছবি দেখে বললে,—'মট্কু, তোর তো পয়সার অভাব নেই বাবা। তুই একটা ক্যামেরা কিনে ফেল্।' হতভাগাটাকে তুলি ধরতে শেখালাম আমি, আর সেই আমাকেই—

খেতে বসেছিলাম আমরা ভিতরের একফালি বারান্দায়। একজন পাচক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করছিল। সুলেখা দেবী একটা হাতপাখা নিয়ে বসেছিলেন একটু দূরে। বলি,—কই, মাংসের হাঁড়িকাবাব কই? শুনেছি আপনি খুব ভাল হাঁড়িকাবাব বানাতে পারেন—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বটুক বললে,—দেখলে? আমি তখনই বলেছিলাম? তুমি বেশি পণ্ডিত্বেমি করলে?

ব্যাপার কি? একটু পরেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। বামুনের জাত যাতে মারা না যায়, তাই বটুক একটি পাচক ব্রাহ্মণকে একদিনের জন্য ঠিকা নিয়েছে। রান্নায় হাত দেয়নি সুলেখা।

আমি বলি,—এটা উনিশ শো চব্বিশ সাল! আর আমি ডাক্তারমানুষ—অত জাতের পুতুপুতু নেই আমার। মাংসের হাঁড়িকাবাব কিন্তু আমার পাওনা থাকল সুলেখা দেবী!

সুলেখী দেবী বলেন,—বেশ তো, আসছে রবিবার আসুন।

—না, এবার আপনারা যাবেন আমার বাসায়। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি এখনও।

আহারান্তে সুলেখা দেবীকে পরীক্ষা করলাম। মাঝে মাঝে ওর ফিট হয়। হজমেরও গণ্ডগোল আছে। জনান্তিকে বটুককে বলি,—ছেলেপুলে না হলে ওঁর এ ফিটের ব্যারাম

সারবে না। মেয়ে-ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে।

বটুক ভিতরের দিকে নজর দিয়ে দেখল ; তারপর নিম্নস্বরে বলল,—ওর পেটে একবার সন্তান এসেছিল। বাঁচেনি।

—কতদিন আগে?

—অনেক আগে। প্রায় চোদ্দ বছর।

একটু চমকে উঠি। চোদ্দ বছর হল বিয়ে হয়েছে ওদের। জিজ্ঞাসা করি,—বিয়ের আগে থেকেই ওঁকে চিনতিস বুঝি?

বটুক সচকিত হয়ে বলে,—পরে তোকে সব বলব।

সে কাহিনী আর শোনা হয়নি তখন।

আরও মাস চার-পাঁচ পরে আবার ওদের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল চৌরঙ্গীর উপর। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। হঠাৎ পিছন থেকে কে নাম ধরে ডাকছে শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি শ্রীমান বটুকেশ্বর। তিন-পিসের একেবারে কায়দা-দূরস্ত বিলাতি সুট, হাতে ঘড়ি, মাথায় বাউলার হ্যাট। ওয়েস্ট-কোটের পকেটে রূপালি চেনে পকেট ঘড়ি।

—কি হে ডাক্তারসাহেব? কোথায় চলেছ?

এতক্ষণে নজর হল বটুকের পাশেই যে মহিলাটি আছেন তিনি সুলেখা দেবী। সাজগোজ তিনিও কম করেননি। বেনারসী শাড়ির আঁচলটা গেঁথেছেন জড়োয়া ব্রোচে, গায়ে পুরো-হাতা জ্যাকেট, পায়ে খুরওয়ালা জুতো--যা বাঙালী মেয়েরা পায়ে দিয়ে পথ চলতে সাহস পায় না। নমস্কার করে বলি,—কী খবর? ভাল আছেন?

সুলেখী দেবী কিছু বলার আগেই বটুক বলে ওঠে,—এবারে এক্‌জিবিশান দেখেছিস? আয় না, একসঙ্গে দেখা যাক। সুলেখা এবার প্রাইজ পেয়েছে যে—

—সুলেখা?—আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

—আই মীন সুলেখার সেই ছবিখানা। সেই পোর্ট্রেটখানা। চল্ দেখাই।

আজ ওর আনন্দের দিন। তিন-চার বছর প্রদর্শনীতে ওর ছবি থাকছে, এই প্রথম সে প্রাইজ পেয়েছে। আমার অনেক কাজ ছিল হাতে। বিয়ের বাজার করতে বেরিয়েছি। কিন্তু সেকথা ওদের বললাম না। রাজী হয়ে গেলাম। বটুক আমাকে নিয়ে গেল প্রদর্শনীতে। ছাপানো প্রোগ্রাম বই সে-ই কিনল। আমাকে এক একখানা করে দেওয়ালে টাঙানো ছবি দেখিয়ে নানা জ্ঞানগর্ভ আর্টের তত্ত্ব বোঝাতে থাকে। সুলেখা দেবী সঙ্গে সঙ্গে আছেন। যতদূর মনে পড়ছে সেবার অসিতকুমারের 'সুরের আগুন', সমরেন্দ্র গুপ্তের 'নটরাজের মন্দিরে', যামিনীবাবুর 'গণেশজননী' আর দেবীপ্রসাদের 'বুদ্ধের নির্বাণ' প্রদর্শিত হয়েছিল। আর প্রতিযোগিতার বাইরে দেখানো হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের 'শাজাহানের মৃত্যু'। গগনেন্দ্রনাথের একখানি ছবি ছিল ; তার গঠন পদ্ধতিটা ঠিকমত বুঝলাম না। বটুক বলল,—এটা একটা নতুন পদ্ধতি, এর নাম ভারতীয় শিল্পকলায় চতুষ্কোণবাদ।

—এ নাম কে দিয়েছে?

স্টেলা ক্রামরীশ বলেছেন, এ হল 'ইণ্ডিয়ান কিউস্টিক' ছবি। কিউবিসম্ জানিস তো? বছর আট-দশ আগে একবার বার্লিন থেকে ক্যানডিন্‌স্কি আর জার্মান কিউবিস্টদের ছবি এনে সোসাইটিতে দেখানো হয়েছিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই চিত্রকরদের উদ্দেশ্য আর আদর্শের কথা বুঝে নিয়ে নিজস্ব ধ্যানধারণায় আর স্বকীয় পদ্ধতিতে এই নতুন চতুষ্কোণবাদের রূপ দিয়েছেন।

এর পরে সে কিউবিস্‌মের গোড়ার কথায় এল। সেখান থেকে ডাডাইসম্‌ ইম্প্রেশানিসম্‌ সুররিয়ালিসম্‌—কত নূতন নূতন তথ্য। সুলেখার কাছে বোরিং হয়ে যাচ্ছে মনে করে একসময় বলি—জানিস দীপু, এই ঘরে ঠিক ঐ জায়গাটায় বছর পাঁচেক আগে একটা মজার কাণ্ড হয়। আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। সেবার বার্ষিক প্রদর্শনীতে গগনেন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন খানকতক কার্টুন ছবি। কার্টুন আঁকায় তিনি ওস্তাদ, তা তো জানিসই, একটা ছবি ছিল বিবাহ-বিশারদ কুলীন বামুনদের আক্রমণ করে, একটা ছিল ইঙ্গ-বঙ্গ বাবুদের ব্যঙ্গ করে, আর একখানার ক্যাপশান ছিল "পীস্‌ ডিক্লেয়ার্ড ইন দ্য পঞ্জাব"। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের উপর। নর-কঙ্কাল আর নর-মুণ্ডে আকীর্ণ জালিয়ানওয়ালাবাগের মাঠ। দু-একটি বুড়ো শকুন ঝিমোচ্ছে। আর মড়ার খুলির পাহাড়ে শান্তভাবে অর্ধশয়ান ইংরাজশাসক ও'ডায়ার! তা সেবার বড়দিনে কলকাতায় এসেছিলেন ভাইসরয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ড। বড়লাটকে প্রদর্শনীতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হল। কেউ কেউ বললেন, পাঞ্জাবের উপর কার্টুনখানি সরিয়ে রাখলেই ভাল হয়। কিন্তু অবন-গগন তা মানবেন কেন? অগত্যা ছবিখানা থাকল যথাস্থানে। লর্ড চেমস্‌ফোর্ড এলেন। প্রদর্শনীর বড়কর্তারা সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। ক্ষিতীনদা আছেন, স্যার আর. এন. আছেন, অতুল বসু ছিলেন, গগনেন্দ্রনাথ, ও. সি. গাঙ্গুলীরা ছিলেন—আর আমিও ছিলাম দলের সঙ্গে। স্টেলা ক্রামরীশই প্রতিটি চিত্রের ইন্ট্রোডাকশান হিসাবে দু-চার কথা বলতে বলতে আসছিলেন। ব্যঙ্গ-চিত্রটির কাছে এসে তিনি নীরব হলেন। বড়লাট হয়তো খেয়াল করতেন না। ঐ নীরবতাই তাঁর দৃষ্টিটা আকৃষ্ট করল দৃশ্যপটের দিকে। হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়েছেন বড়লাট। থমকে পিছিয়ে আসেন। ঘুরে দেখেন ক্রামরীশের দিকে। তিনি হেসে বলেন,—আই শ্যুডন্ট, অফ কোর্স, ট্রাই টু অ্যানালাইস এ কার্টুন অ্যাণ্ড মার্‌ ইটস্‌ হিউমার! লাটবাহাদুর ঝুঁকে পড়ে দেখলেন চিত্রকরের স্বাক্ষর। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন নির্ভীক চিত্রকরও দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। মাথায় কাজ-করা টুপি, গায়ে সিল্কের জোব্বা। উপযুক্ত খুড়োর উপযুক্ত ভাইপো। খুড়ো যদি অত বড় নাইটহুড ছাড়তে পারেন তবে ভাইপো একখানা ছোট্ট মতো কার্টুন ছাড়তে পারবেন না!"

সুলেখা দেবী বললেন,—চল, এবার ও-ঘরের ছবিগুলো দেখি।

—চল। ওটা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান আর্ট সেকশান।

কিন্তু সেদিকে অগ্রসর হতে গিয়েই বাধা পেলাম আমরা। মঁসিয়ে পল গগ্যা তাঁর বিশাল বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দোরগোড়ায়। আমাদের দেখতে পেয়ে তাঁর প্রকাণ্ড দেহটি বিনয়াবনত করে বলেন,—কী সৌভাগ্য! একসঙ্গে ত্রিরত্ন! আর্টিস্ট, আর্ট সমঝদার আর আর্ট মডেল?

ভ্রু দুটি কুঁচকে ওঠে সুলেখা দেবীর। গগ্যার ঐ প্রকাণ্ড দেহটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। যেন গগ্যাকে সে দেখেনি। বটুক বলে,—দেখলি?

—আমি তো দেখলাম, কিন্তু উনি বোধ হয় আমার মত ক্ষীণদেহী নগণ্য জীবকে দেখতে পেলেন না।

—না, আমি বলছি এক্‌জিবিশান দেখলি?

—তাও দেখলাম। চল্‌, আবার দেখি তোদের সঙ্গে।

এই এক ফ্যাচাং জুটল। বটুক কিন্তু নির্বিকার। বেশ বুঝতে পারি বটুকের স্ত্রী বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু পথে-ঘাটে দেখা হলে বটুকই বা কি করবে? আমরা চারজনেই পাশের ঘরে ঢুকি। বটুক গগ্যাকে বলে,—এবার আমার একখানা ছবি প্রাইজ পেয়েছে।

—প্রাইজ পেয়েছে? কই, কোন্‌খানা?

—সুলেখার পোর্ট্রেটখানা।

—ও তো কন্‌সোলেশান প্রাইজ। ও, ঐটার কথা বলছিস! আমি ভেবেছি কোন ছবি প্লেস পেয়েছে বুঝি?

সুলেখা দেবী ফস করে বলে বসেন,—আপনার ছবি কোন্ ঘরে আছে গগনবাবু?

গগ্যা ঘুরে দাঁড়ায়। আপাদমস্তক সুলেখা দেবীকে দেখে নিয়ে বলে,—আমার ছবি এখানে নেই।

—সাবমিট করেছিলেন সিলেকশান পাননি, না কি সাবমিট করবারই সাহস হল না!

গগ্যা ম্লান হেসে বলে,—না, আমি কোন ছবি দাখিলই করিনি।

—গতবার করেছিলেন, না? সিলেকশান পায়নি?

—না, গতবারও আমি সাবমিট করিনি। করেছিল বটুক।

—আপনার বিনা সম্মতিতে?

—না, সম্মতি ছিল ; কিন্তু আমি জানতাম ওরা আমার ছবির মানে বুঝবে না—

এবার সুলেখা দেবী তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন,—ঐ ধারণাটাই বুঝি আপনার তরফে 'কনসোলেশান প্রাইজ'?

গগ্যা জবাব দিল না। এক নম্বর হার হল বোধ হয় তার।

ছবি দেখতে দেখতে আমরা এসে উপস্থিত হই পোর্ট্রেট সেকশানে। অতুল বসুর একটি ছবি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। দ্বিতীয় প্রাইজ পেয়েছেন দক্ষিণ ভারতের কে একজন চিত্রশিল্পী—নাম ভুলে গেছি। বটুক পেয়েছে 'কনসোলেশান প্রাইজ'। ছবিটা বেশ ভালই উৎরেছে। আমি এটা অর্ধসমাপ্ত দেখেছিলাম মাস কয়েক আগে। গগ্যা ছবিটা দেখে হঠাৎ সুলেখা দেবীর দিকে ফিরে বললে,—আজকের দিনে ঐ বেনারসীটা না পরে এলেই পারতেন। ঐ দেখুন সবাই আপনার দিকে তাকাচ্ছে!

এতক্ষণে লক্ষ্য হয়, চিত্রে বটুক যে বেনারসীখানা এঁকেছে সেখানাই পরে এসেছেন সুলেখা দেবী। কিন্তু এভাবে গগ্যার বলা উচিত হয়নি। সুলেখা দেবী কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলেন না, বেশ সপ্রতিভভাবে বললেন,—আপনি নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দেন, অথচ রূপসজ্জার এই ফাণ্ডামেন্টাল কথাটাই জানেন না? সজ্জার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করা। এই যে আপনি দাড়ি কামান না, চুলে তেল দেন না এর বেসিক মোটিভটা কি? ব্লেড কেনবার পয়সা নেই, দু'পয়সার সরষের তেল কিনতে পারেন না বলে তো নয়! আপনি পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। বলতে চান—ওগো তোমরা আমাকে চিনে নাও, আমি আর্টিস্ট! আমার ছবি এক্‌জিবিশানে সিলেকটেড না হলেও আমি বোহিমিয়ান আর্টিস্ট!

শুধু গগ্যাই নয় আমিও অবাক হয়ে যাই। সুলেখা দেবী কি রীতিমত লেখাপড়া জানা মেয়ে?

গগ্যার এবারও বাক্যস্ফূর্তি হল না। দু নম্বর হার হল তার।

সুলেখা দেবী হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন,—বড্ড স্টাফি লাগছে, চলুন বাইরে গিয়ে কোথাও বসি।

হঠাৎ গগ্যার দিকে ফিরে বলেন,—আচ্ছা চলি, নমস্কার!

অর্থাৎ—তুমি আমার লেজুড় ধরে সঙ্গে সঙ্গে এস না বাপু!

গগ্যা নক-আউট!

এই সময়ে, বুঝলে নরেন, নিতান্ত ঘটনাচক্রে একদিন আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল চন্দ্রভানের। শ্যামবাজারের দিকে একটি রোগী দেখতে গিয়েছিলাম। রোগী দেখে কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট ধরে মেডিক্যাল কলেজে ফিরছি, হঠাৎ নজর হল হেদোর ধারে একটা প্যাকিং বাক্সের উপর বসে আছে আমারই বয়সী একজন লোক। দেখেই চেনা চেনা লাগল, পরমুহূর্তেই চিনে ফেললাম তাকে। প্রায় বিশ বছর পরে তাকে দেখছি, কিন্তু চিনতে আমার ভুল হয়নি। এ নিশ্চিত সেই চন্দ্রভান। গাড়ি থামিয়ে নেমে এলাম। লোকটা চুপ করে বসে আছে—কী ভাবছে। গায়ে একটা হাফ-সার্ট, তার উপর আলোয়ান, নিম্নাঙ্গে একটা পাৎলুন—পায়জামার মত ক্রীজহীন। পায়ে ছেঁড়া চটি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ ; চুলে বহুদিন তেল-চিরুনি পড়েনি। বয়সে বেড়েছে, বেশ রোগাও হয়ে গেছে সে। জমিদার-বাড়ির আলালের ঘরের সেই দুলালটির চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। ওকে চিনতে পারলাম ওর সেই অদ্ভুত চোখ দুটো দেখে। আর কান দুটো। চন্দ্রভানের কান দুটো যেন ওর বিদ্রোহী আত্মার বিজয় কেতন। সহজে ভুল হবার নয়!

—কি রে, চিনতে পারিস?

ও কি যেন ভাবছিল আপন মনে। চমকে ওঠে আমার ডাক শুনে। তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় প্যাকিং বাক্সটা ছেড়ে। বলে,—আরে! তুই দীপু না?

জড়িয়ে ধরল একেবারে। ম্যাট্রিক পাস করার পর পাক্কা উনিশ বছর কেটে গেছে। আমার কোন সংবাদই সে রাখত না। ওর সম্বন্ধে আমিও তখন বিশেষ কিছু জানতাম না। লোকমুখে শুনেছিলাম, সে সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়ে গিয়েছিল। আর শুনেছিলাম সে নাকি ধর্মত্যাগ করে খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। আর কিছু জানতাম না।

—তুই যে একেবারে সাহেব হয়ে গেছিস রে, অ্যাঁ? মটোর গাড়ি? তোর? কিনেছিস?

আমার নিখুঁত স্যুট আর গাড়িটা সে দেখছিল। ঈর্ষার কণামাত্র লক্ষ্য হল না ওর বিস্মিত দৃষ্টিতে। সে যেন খুব খুশি হয়েছে আমার এ উন্নতিতে। বললে,—তুই আজকাল কি করছিস রে দীপু? তোর খবর বল্?

—ডাক্তার হয়েছি আমি। মেডিক্যাল কলেজে অ্যাটাচ আছি। প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ও করি।

—বাঃ! বাঃ! তুই তা হলে জীবনে সফল হয়েছিস! ভারি ভাল লাগছে শুনে।

—তুই এখানে বসে কি করছিলি?

চন্দ্রভান হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল হেদোর রেলিঙে টাঙানো একগাদা ছবি। রেলিঙের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে দড়ি খাটানো। তাতে ক্লিপ দিয়ে আটকানো খান দশ-বারো ছবি। ফ্রেম নেই, বাঁধানো নয়। কিছু পেনসিল স্কেচ, কিছু ক্রেয়নে, খান তিনেক জলরঙে। এছাড়া রেলিঙের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা আছে খান চার-পাঁচ তেলরঙের ক্যানভাস। হায় ঈশ্বর! শেষে চন্দ্রভানও ছবি আঁকতে শুরু করল? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলো দেখলাম। কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য। একটা ভাঙা গীর্জা, পশ্চাৎপটে কি একটা ফ্রেম-স্ট্রাকচার, তাতে গোল গোল দুটো চাকা। দেবদারু গাছের সারির মাঝখান দিয়ে রাঙা মাটির আঁকা-বাঁকা পথ। কতকগুলি কুলি রমণীর ছবি। জনা-কতক সাঁওতাল গোল হয়ে বসে বোধকরি হাঁড়িয়া খাচ্ছে। সাঁওতালী নাচের পালা—মাদল বাজাচ্ছে, বাঁশি বাজাচ্ছে, মেয়েরা নাচছে। একটা কাঠের সাঁকো—নিচেকার জলে সাঁকোটা প্রতিবিম্বিত, একটা নৌকা, ক'জন জলে কাপড় ধুচ্ছে, সাঁকোর উপর একটা এক-ঘোড়ার গাড়ি। আর একটা তেল-রঙের ছবি—মাঝখানে জ্বলছে কেরোসিনের টেমি, তিনটি কুলি রমণী ও একজন পুরুষ গোল গোল ডিমের মত কি যেন খাচ্ছে ; চিত্রকরের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে, চিত্রের কেন্দ্রস্থলে।

নেহাৎ মামুলি ছবি সব। বিষয়বস্তুতে আকর্ষণীয় কিছু নেই। তবে রঙের ব্যবহারটাতে সাহসের পরিচয় আছে। কখনও কখনও তুলির সোজা টান না দিয়ে সে পাশাপাশি বিন্দু বিন্দু রঙের ফুটকি বসিয়েছে। কখনও বা—বিশেষ করে অয়েল কালারে, রঙ লাগিয়েছে রীতিমত ধ্যাবড়া করে—লিনসিড অয়েল-তৃষিত কাঁচা রঙ বোধহয় আঙুলে করে থুপ্ থুপ্ করে বসিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের রঙের ব্যভিচার আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি।

—কেমন লাগছে?

সেই চিরন্তন সমস্যা! নবীন সাহিত্যিক, নবীন শিল্পীর বন্ধুদলের এ এক সর্বকালের সমস্যা। মুখ ফুটে বলাও যায় না যে, মোটেই ভাল লাগছে না! একটু ঘুরিয়ে বলি,—স্টাইলটা নতুন, কিন্তু এ কি পাবলিকে নেবে?

—পাবলিকের জন্য তো আঁকিনি আমি!

—তাহলে হেদোর ধারে সাজিয়ে বসেছিস কেন?

চন্দ্রভান ম্লান হাসে। বুঝতে পারি তার সমস্যা। সাধারণ মানুষে ছবি কেনে না, কেনে রাজা মহারাজা জমিদার এবং বিলাতি কোম্পানির ধনকুবেররা। তাদের নাগাল কেমন করে পাবে চন্দ্রভান? তাছাড়া তারা এ জাতীয় ছবি পচ্ছন্দই করবে না।

—ছবির কথা থাক। তোর খবর বল্। কোথায় আছিস?

চন্দ্রভান বললে, সে কাছেই থাকে। ঠিকানা জানাল না।

—বিয়ে করেছিস?

এবার সে হাসল। বললে,—করেছি। তুই তো ডাক্তার হয়েছিস দীপু, একটা উপকার করবি?

—কি বল্?

—ওকে একবার ডাক্তার দিয়ে দেখাতে চাই।

—বেশ তো, নিয়ে যাস একদিন। হাসপাতালে কিংবা আমার বাড়িতে—

ছাপানো কার্ড বার করে দিলাম। সেটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মুখ নিচু করেই

বললে,—তোকে দিয়ে দেখানো চলবে না, কোন লেডি ডাক্তার তোর জানাশোনা আছে?

আমি হেসে উঠি। বলি,—তোর বউ পর্দানশীন নাকি? তুই না খ্রীষ্টান হয়েছিস? তোর বউও তো আলোকপ্রাপ্তা? না কি?

—না রে! ও কিছুতেই পুরুষমানুষের সামনে বের হতে চায় না। সে অনেক ব্যাপার। তোকে পরে সব বলব একদিন। কোন মেয়ে ডাক্তার হলে—

—কি হয়েছে তোর বউয়ের? অসুখটা কি?

—না, অসুখ কিছু নয়। ওর...ছেলেপুলে হবে।

—আচ্ছা! কংগ্র্যাচুলেশন্স! এই কি ফার্স্ট কনফাইনমেন্ট? প্রথম সন্তান সম্ভবনা?

—না। এর আগেও একটি ছেলে হয়েছিল। সেটি মারা গেছে।

—জন্মাবার সময়?

—না না। অনেক বড় হয়ে—প্রায় আট বছর বয়সে।

—ওঃ! অনেকদিন বিয়ে করেছিস তাহলে। তা এত বছর আর বাচ্চা হয়নি?

—না।

—বুঝলাম। তা তুই কালই ওকে হাসপাতালে নিয়ে আয়। আমি ব্যবস্থা করে দেব। ভয় নেই, আমি ঘোমটা দিয়ে থাকব। মেডিক্যাল কলেজে একজন লেডি ডাক্তার আছেন। ডক্টর মিসেস স্মিথ। কাল তাঁর ভিসিটিং ডে। তুই সোজা আমার ঘরে চলে আসিস।

পরদিনই চন্দ্রভান সস্ত্রীক মেডিক্যাল কলেজে এসে হাজির। স্লিপ দেখে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। চন্দ্রভানকে নিয়ে এলাম। মিসেস স্মিথের ঘরে। আমার চেম্বারের বাইরে বেঞ্চিতে যারা সারি সারি বসেছিল তাদের মধ্যে একজনকে চন্দ্রভান ইঙ্গিতে আহ্বান করল। উঠে এলেন একজন মহিলা। মুখের উপর এত প্রকাণ্ড ঘোমটা তিনি দিয়েছেন যে, চন্দ্রভানের বউ দেখা আমার হল না, তবে হাত-পাগুলি অনাবৃত ছিল। তাতে মালুম হল, চন্দ্রভান যদি কখনও বটুকেশ্বরের মত তার বউয়ের ছবি আঁকতে বসে তাহলে তার প্রয়োজন হবে একটি মাত্র রঙ—চাইনিস ইংক। বলিষ্ঠগঠনা। দীর্ঘাঙ্গী। নিঃসন্দেহে তার ফিগারটি অনিন্দ্যনীয়, যদিও বর্তমানে তাকে মধ্যে-ক্ষামা বলার উপায় নেই।

মিসেস স্মিথের কাছে ওকে জিম্মা করে আসার আগে বলি, —কাল আবার আসিস। ইতিমধ্যে মিসেস স্মিথের কাছ থেকে প্রাথমিক রিপোর্টটা আমি শুনে নেব।

প্রাথমিক রিপোর্টটা আমাকে গরজ করে শুনতে যেতে হল না। ভিসিটিং আওয়ার শেষ হলে ডক্টর মিসেস স্মিথ নিজেই চলে এলেন আমার ঘরে। আমারও রোগী দেখার পর্ব শেষ হয়েছিল। উঠব উঠব করছি, হঠাৎ উনি আসায় আবার বসে পড়ি। উনি বলেন,—ডক্টর লাহিড়ী—মিস্টার গর্গ কি আপনার বিশিষ্ট বন্ধু?

—হ্যাঁ, আমার সহপাঠী। আমরা একসঙ্গে আর্য মিশন স্কুলে পড়তাম।

—তারপর? তারপর আপনাদের বন্ধুত্বটা কি পর্যায়ে আছে?

—কেন বলুন তো? ম্যাট্রিক পাস করার পর আর ওর খবর কিছু জানতাম না। গতকাল মাত্র দেখা হয়েছে। এ-কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

মিসেস স্মিথ একটু ইতস্ততঃ করে বলেন,—না, কিছু নয়। ওঁর আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, নয়?

—হ্যাঁ। অথচ ও জমিদারের ছেলে। সব ছেড়ে-ছুড়ে ও বিবাগী হয়ে যায়।

—জমিদারের ছেলে! ও, তাই বলুন!

কেমন যেন অসংলগ্ন কথাবার্তা ওর। মনে হল কি একটা কথা উনি বলি-বলি করেও বলতে পারছেন না। অমন একটা লোফারের সঙ্গে আমার মত ডাক্তার মানুষের বন্ধুত্বটা ঠিকমত বরদাস্ত করতে পারছিলেন না বোধ হয়।

—মিসেস গর্গকে কেমন দেখলেন বলুন? কোন কমপ্লিকেশান আছে?

এতক্ষণে মুখ তুলে মিসেস স্মিথ চাইলেন আমার দিকে। বললেন,—আছে! কিন্তু চিকিৎসাটা আপনাকে করতে হবে, আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়!

এ আবার কি হেঁয়ালি? আমাকে প্রশ্ন করতে হল না। উনি এক নিঃশ্বাসে বলে যান,—চিকিৎসার প্রয়োজন ওর স্ত্রীর নয়, মিস্টার গর্গের। আর সে ওষুধটা আপনার পক্ষে প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়!

—কি ওষুধ?

—শঙ্কর মাছের চাবুক!

আমি স্তম্ভিত। কি বলছেন উনি? কী বলতে চাইছেন?

মিসেস স্মিথ নিঃশব্দে একটি রিপোর্ট আমার সামনে বাড়িয়ে ধরেন। দেখলাম লেখা আছে—রোগিণী মিসেস গর্গ, বয়স ছত্রিশ, ওজন একশ' বারো পাউণ্ড, গর্ভস্থ ভ্রূণের বয়স পঁচিশ সপ্তাহ, এবং আসন্ন জননী উপদংশ রোগে আক্রান্ত!

—ওঁর স্ত্রী নিতান্ত গ্রাম্য মহিলা। কথায় জড়তা আছে। লজ্জায় জড়সড়। বোধকরি আপনার বন্ধু তাঁকে নিয়ে কোনদিন থিয়েটার্স দেখতেও যান না, পর্দানশীন যে! আর এদিকে নিজে প্রস্ কোয়ার্টার থেকে নিয়ে এসেছেন এ রোগ—চাপিয়ে দিয়েছেন নির্বিচারে একটা অসহায় মেয়ের দেহে। মাপ করবেন ডক্টর লাহিড়ী—আপনার বন্ধু বলে আমি রেয়াৎ করব না। হান্টার পেটা করা ছাড়া ও রোগের চিকিৎসা নেই!

আমি জবাব দিতে পারিনি। জবাব ছিলও না কিছু। সেই চন্দ্রভান এত নিচে নেমে গেছে?

পরদিন আবার চন্দ্রভান এল হাসপাতালে। ঘরে ঢোকবার মুখেই দেখি বেঞ্চির কোণ দখল করে বসে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে—কিছু একটা কথা বলতে চায়। আমি দেখেও দেখি না। সোজা ঢুকে পড়ি চেম্বারে।

একটু পরে আর্দালি খানকতক স্লিপ রেখে গেল টেবিলে। সবার উপরে চন্দ্রভানের চিরকুট। আমি সেটা বাঁ-হাতে সরিয়ে রাখি। থাক বসে। অন্যান্য দর্শনপ্রার্থীদের একে একে বিদায় করতে থাকি। একটি বেলা ওকে বসিয়ে রেখে উঠবার উপক্রম করছি, আর্দালি পুনরায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল স্লিপ কাগজটার দিকে।

—এর আউটডোর টিকিট কোথায়? এখানে কি চায়?

—না স্যার, উনি এমনিই দেখা করতে চান। বললেন, আপনার বন্ধু।

বন্ধু! নাঃ! এ অধ্যায়ের শেষ করতে হয়। না হলে সকাল-সন্ধ্যা লোকটা বিরক্ত করবে, যেখানে-সেখানে পরিচয় দেবে ডাক্তার দ্বৈপায়ন লাহিড়ী ওর বন্ধু। ঐ চরিত্রহীন, ইন্দ্রিয়াসক্ত লম্পট লোকটা—যে বেশ্যাপল্লী থেকে কুৎসিত ব্যাধি বয়ে নিয়ে এসে সেটা ধর্মপত্নীর দেহে পাচার করেছে—তার সঙ্গে সব সম্পর্ক এখনই চুকিয়ে নেওয়া দরকার।

—ডেকে দাও।

চন্দ্রভান পর্দা সরিয়ে ঢুকল। সে নিশ্চয় কিছু আন্দাজ করেছে। বিনা অনুমতিতে বসল না আমার ভিসিটার্স চেয়ারে। কেমন যেন গোরু চোরের মত আতঙ্কিত দৃষ্টি। কান দুটো খরগোশের মত খাড়া হয়ে আছে। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

—কি চাই?

একেবারে থতমত খেয়ে গেল চন্দ্রভান। ঢোক গিলে বললে,—না, মানে কাল তুই আসতে বলেছিলি কিনা? ইয়ে—মিসেস স্মিথ কি বললেন? কোন কম্‌প্লিকেশান নেই তো?

আমি ওকে বসতে বললাম না। বরং নিজেই উঠে পড়ি। হ্যাঙার থেকে কোটটা পেড়ে গায়ে দিতে দিতে বলি,—কম্‌প্লিকেশান যে আছে তা তুমি জান না?

ও বোকার মত তাকিয়ে থাকে। অস্ফুটে বলে,—না! কী?

—তোমার স্ত্রী একটি কুৎসিত ব্যাধিতে ভুগছেন, এ-কথা তোমার জানা নেই বলতে চাও?

—বিশ্বাস কর্ দীপু, আমি কিছুই জানি না!

ও আমাকে বিশ্বাস করতে বলছে! স্ত্রীর উপদংশ রোগ হয়েছে, তা স্বামী জানে না! ঘুরে দাঁড়িয়ে বলি,—তোর লজ্জা হয় না স্কাউন্ড্রেল? সমাজে মুখ দেখাস কি করে?

ওর মুখটা একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলে,—কী বলছিস?

—ন্যাকা! কতদিন ধরে প্রস্ কোয়াটার্সে যাচ্ছিস?

মাথাটা নিচু হয়ে গেল ওর।

—কই, তুই তো বললি না—'প্রস্ কোয়ার্টার্সে আমি জীবনে যাইনি দীপু!'

মুখটা তুলল না। মাথা নিচু করেই বলল,—মিছে কথা আমি বলি না। আমি শুধু ভাবছি তুই কেমন করে জানতে পারলি!

—রোগ চাপা থাকে না। ও-রোগের চিকিৎসা হচ্ছে চাবুক। চাবকে শায়েস্তা করলে তবে ও রোগ ছাড়বে। তবে আমার ও-সব ভাল লাগে না। আমার সময়ও নেই, ধৈর্যও নেই। অন্য কোন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাস।

একটি কথাও বলল না চন্দ্রভান। মুখ তুলে চাইল না পর্যন্ত।

—আর একটা কথা। আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটাও আজ এখানে শেষ হল।

—আর কোনদিন এখানে আসব না, এই কথা বলতে চাস?

—না। এটা সরকারী হাসপাতাল—ও-কথা বলার অধিকার আমার নেই। তবে ডাক্তার দ্বৈপায়ন লাহিড়ীর বন্ধুর পরিচয়ে এখানে আর এস না।

এতক্ষণে চন্দ্রভান হাসল। পাণ্ডুর ম্লান হাসি। বললে,—ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি।

বলল বটে, কিন্তু চলে গেল না। জানালা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর আপন মনে বললে,—আজব এ দুনিয়া! ক্রিশ্চান ফাদারদের দেখলাম—পাপের সঙ্গে দিব্যি আপস করেছেন তাঁরা, যত আক্রোশ পাপীর উপর, আর কে পাপী তাও চিনতে পারছেন না! আজ আবার মেডিক্যাল কলেজের পাস করা ডাক্তারদের দেখলাম—রোগের বিরুদ্ধে তাঁদের কোন জেহাদ নেই, যত আক্রোশ রোগীর উপর, আর কে রোগী তাও চিনতে পারছেন না তাঁরা।

—তার মানে? তুই নিরোগ? ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বল্ দেখি তোর রতিজ রোগ নেই?

—তা আমি বলব না দীপু। কারণ ঈশ্বরকে আমি মানি না! ঈশ্বরের নামে শপথ নিই না আমি!

—না, মিস্টার ভিন্সেন্ট ভান গর্গ! আমি কালী-দুর্গা-মা-শীতলার দিব্যি দিতে বলছি না

তোমাকে। তোমাদের গড-দি-ফাদারের নামে 'ওথ' নিতে বলছি!

—হ্যাঁ, আমি ও তাঁর কথা বলছি! ঈশ্বর মানি না আমি! আমি নাস্তিক!

—খুব আনন্দের কথা! সমাজ মানো না, ধর্ম মানো না, ঈশ্বরও মানো না! বাঃ! বেশ কথা, তবে দয়া করে ঐ সঙ্গে আরও একটি জিনিস অস্বীকার কর—আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটা!

চন্দ্রভান জবাব দেওয়ার সুযোগ পায়নি। পরক্ষণে আমি নিজেই ঘর ছেড়ে চলে যাই।

তারিখটা মনে আছে। চব্বিশে ডিসেম্বর। ক্রিস্টমাস ঈভ। এতদিনে বাবা গত হয়েছেন। আমিই সংসারের কর্তা। আমাদের তখনও ছিল একান্নবর্তী পরিবার। আমার মেজ ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে স্থির হয়েছে। দূর দূর থেকে আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভরে গেছে। আমার মরবার ফুরসৎ নেই। কি একটা কাজে চৌরঙ্গীর দিকে গিয়েছিলাম, ভাবলাম বটুকের দোকানে একবার যাই। ওকে নিমন্ত্রণ করে আসি। সেদিন এক্‌জিবিশানে হাটের মাঝে ইচ্ছে করেই নিমন্ত্রণ করিনি। সেটা শোভন হ'ত না। ওর দোকানে যেতেই বটুক একেবারে লাফিয়ে উঠল—

—আরে ব্বাস রে! তোর কথাই ভাবছিলাম। আয় আয়। শোন্, কাল তোর নেমন্তন্ন! আমার বাড়িতে, রাত্রে। লেখা হাঁড়িকাবাব খাওয়াবে। জমিয়ে বড়দিন করা যাবে।

আমি বলি,—আপাততঃ সে গুড়ে বালি ভাই। আমার ভাইঝির বিয়ে। দোসরা মাঘ। তোকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। এখন আমার মরবার ফুরসৎ নেই—

—আরে সে তো পরে বছরের কথা। ঢের দেরী আছে। কাল তোকে আসতেই হবে।

বলি,—হ্যাঁরে বটুক, চন্দ্রভানের খবর রাখিস?

—না। শুনেছি সে খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। ওর ভাই সূরযের সঙ্গে বছরখানেক আগে দেখা হয়েছিল। সে আজকাল দিল্লীতে থাকে। তার কাছেই শুনেছিলাম। স্কুল ছাড়ার পর আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কোথায় আছে জানি না।

—চন্দ্রভান কলকাতাতেই আছে। দিন তিনেক আগে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

—বলিস কি? বল্, তার ঠিকানা বল্। কাল তাহলে তাকেও নিমন্ত্রণ করি বরং।

আমি বাধা দিয়ে বলি,—না রে! প্রথমত, তার ঠিকানা আমি জানি না, দ্বিতীয়ত, তার সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব স্থাপন না করাই মঙ্গল। চন্দরটা একেবারে গোল্লায় গেছে—

—মানে? কী বলছিস তুই?

আমি আদ্যোপান্ত ইতিহাসটা ওকে শোনাই। বটুক ধৈর্য ধরে সবটা শুনল, তারপর বললে,—ঐ তোর বড় দোষ দীপু। বড় সহজে তুই কনক্লুশানে আসিস। চন্দ্রভানের ভি. ডি. হয়েছে শুনেই তুই শুচিবায়ুগ্রস্তের মত নাক সিঁটকালি। তুই না ডাক্তার?

আমি বলি, —দ্যাখ বটুক, সেজন্য আমি রাগ করিনি। রাগ করেছি ওর ন্যাকামি দেখে। ওর নিজের স্ত্রীর ঐ অসুখের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল। রোজার কাছে মামদোবাজি। আমি বুঝি না কিছু? আর কী লম্বাই-চওড়াই বুলি!

—যাক, ঠিকানা যখন রাখিসনি, তখন চন্দ্রভান আবার হারিয়ে গেল। একবার

হেদোয় গিয়ে খবর নেব বরং। হাজার হোক, আমরা একই প্রফেশানের মানুষ। দেখি যদি ওকে কিছু সাহায্য করতে পারি।

আমি ওকে বারে বারে বারণ করলাম ; কিন্তু বটুক মনে হল কথাটা কানে তুলল না। সে কতকগুলো মালপত্র গুছিয়ে তুলছিল। দেখি, বটুক অনেক জিনিসপত্র কিনেছে। ক্রিস্টমাস প্রেজেন্টস্! ফুল, কেক, মায় একটা ক্রিস্টমাস ট্রি।

আমি ঠাট্টা করে বলি,—হগমার্কেটে দোকান দিয়ে তুই যে একেবারে সাহেব হয়ে গেছিস দেখছি! মায় ক্রিস্টমাস ট্রি? অ্যাঁ?

বটুক দড়ি দিয়ে কি একটা প্যাকেট বাঁধছিল। মুখ তুলে বললে,—এসব সুলেখার জন্যে। ও ধর্মে হিন্দু, কিন্তু মনেপ্রাণে ক্রিশ্চিয়ান। একজন ফাদার ওর জীবনে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। তখন ওর বয়স বছর পনের। ও নাকি তাঁর কাছে খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষা পর্যন্ত নিতে গিয়েছিল। তিনি ওকে দীক্ষিত করেননি—অপ্রাপ্তবয়স্কা বলে বোধহয়। সুলেখার কাছে শিব বা কালীর চেয়ে যীসাস্ অথবা মেরীর কদর বেশি! দেখ্ না, ওর জন্য কি প্রেজেন্ট নিয়ে যাচ্ছি!

ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটি তৈলচিত্র বটুক নিজে এঁকেছে।

বলি, —বটুক, সেদিন তুই তোর স্ত্রীর প্রসঙ্গে কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলি। আজ বলবি?

—আজ নয় ভাই। আজ একটু তাড়া আছে। শীগগির করে বাড়ি ফিরতে হবে।

—তোর স্ত্রীর দেশ কোথায়? বাপের বাড়িতে কে আছেন?

—ওর বাপ-মা কেউ নেই। বাড়ি ছিল মেদিনীপুরে। বন্যায় এক রাত্রে বাপ মা ভাই সবাই ভেসে যায়। ও আশ্রয় পেয়েছিল দূর-সম্পর্কের এক মামার কাছে। লোকটা চামার। ওর আসল নাম চিত্রলেখা—কিন্তু কি জানি কেন আমাকে ও নামে ডাকতে বারণ করে। আমি ওকে ডাকি সুলেখা বলে। কিন্তু এখন সে মহাভারত শোনাতে পারব না ভাই।

বাইরে এসে বলে,—এ কি রে? তোর গাড়ি? কিনেছিস? বাঃ! তাহলে যোগেশ মিত্তির রোড পর্যন্ত পৌঁছে দে না ভাই! এতগুলো মালপত্তর নিয়ে—

ভাবলাম সেই ভাল। ওর বাড়িতে গিয়েই সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করে আসি। সুলেখা ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ি একদিন এসেছিল। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে।

ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখি সুলেখা এলাহি আয়োজন করেছে। বেলুন আর কাগজের শিকল দিয়ে বাইরের ঘরটা সাজিয়েছে। ক্রিস্টমাস ট্রি-টা যেখানে থাকবে সে জায়গাটা সাফা করে রেখেছে। আমাকে দেখেই বললে,—ডাক্তারবাবু! আসুন আসুন। কাল আপনাকে হাঁড়িকাবাব খাওয়াব। কাল রাত্রে। মিসেসকেও নিয়ে আসবেন।

বললাম আমার অবস্থার কথা। বাড়ি ভরতি আত্মীয়-স্বজন। আমার স্ত্রীর পক্ষে এখন আসা সম্ভবপর হবে না। দোসরা মাঘ নিমন্ত্রণও করলাম।

বটুক আমাকে জনান্তিকে বললে,—গগ্যাকে আজ নিমন্ত্রণ করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বউ রাজী হচ্ছে না। তুই একটু বলে দেখ্ না!

আমি বলি,—বটুক, এটা অন্যায় বলছিস। আনন্দটা ওঁর। এখানে কেন মিছিমিছি অশান্তি টেনে আনবি?

সুলেখা ছিল পাশের ঘরেই। কথাটা তার কানে যায়। ওর ঘর থেকেই বলে, —বলুন তো ডাক্তারবাবু! তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে হৈ-চৈ করতে চাও, কর না। আমি তো

আপত্তি করছি না। এখানে কেন?

বটুক বললে,—তাহলে কাল সকালে ওর জন্যে কিছু কেক আর মিষ্টি নিয়ে যাব। সে বেচারি বরানগরের বস্তীতে বড়দিনের দিন হয়তো পেটে কিল মেরে পড়ে থাকবে।

সুলেখা এ-ঘরে এসে বলে,—যাও না, যত ইচ্ছে কেক খাইয়ে এস। আমার কি?

একটুখানি বসে গেলাম। ক্রিস্টমাস ট্রি-টা সাজাতে সাহায্য করলাম। সুলেখা যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। ত্রিশ বছরের রাশভারী মহিলা যেন সে নয়, যেন আজ আবার সে তার কৈশোরে ফিরে গেছে। দিব্যি হুকুম চালাচ্ছে আমাকেও,—দেখুন তো ডাক্তারবাবু, লাইনটা সোজা হল কিনা?

বটুক বলে,—আমি তো বলছি, সোজা হয়েছে!

—তোমার লাইনজ্ঞান নেই!

হা হা করে হেসে ওঠে বটুক। সে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আর্টিস্ট। তার লাইনজ্ঞান নেই।

বিদায় নিয়ে উঠে পড়তে হল। দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিল সুলেখা। আগামীকাল সন্ধ্যায় আসার কথা আবার মনে করিয়ে দিল।

পরদিন সন্ধ্যায় নয়, দ্বিপ্রহরেই যেতে হয়েছিল ওদের বাড়ি। সে আর এক কাণ্ড।

পরদিন সকালে—এই বেলা দশটা নাগাদ হন্তদন্ত হয়ে বটুক এসে হাজির। চুল উস্‌কো-খুস্‌কো। মুখ শুকনো। গলার টাইটা আলগা, কোটের বোতাম উল্টো ঘরে লাগানো।

—কী হয়েছে রে? এমনভাবে ছুটে এসেছিস?

—দীপু, শীগগির আয়। সর্বনাশ হয়েছে! গগ্যা খুন হয়েছে!

—খুন হয়েছে! কী বলছিস পাগলের মত?

বটুক বললে, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই সে বরানগরে গিয়েছিল। বড়দিনের জন্য গগ্যাকে কিছু কমলালেবু, কেক আর মিষ্টি দিয়ে আসতে সেখানে গিয়ে সে যা দেখে এসেছে তা অকল্পনীয়।

বস্তীতে ওর খাটিয়ায় গগন শুয়েছিল চিৎ হয়ে। তার মাথায় প্রকাণ্ড একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আওডিন আর ডেটলের গন্ধে ঘরটা ম-ম করছে। হাট করে খোলা আছে দরজা। ঘরে আর কেউ নেই। ওর খাটিয়ার নিচে মাটিতে শালপাতা ঢাকা দেওয়া এক গ্লাস জল। পাশের ঘরে যে হিন্দুস্থানী লোকটা সপরিবারে থাকে তার কাছে পাওয়া গেছে কতকগুলো অসংলগ্ন সংবাদ। গগন দু'দিন ঐভাবেই পড়ে আছে—অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায়! মাঝে মাঝে তার জ্ঞান হয়েছে বটে, তবে সে কিছু খায়নি। লোকজন দেখলেই মারতে উঠছে। বটুক জিজ্ঞাসা করেছিল,—এমন করে মাথা ফাটল কেন?

হিন্দুস্থানী লোকটা ভাল। যতটা জানা ছিল তার, শুনিয়ে দেয় বটুককে। এ বস্তীর অধিকাংশই বেহারী। চটকলে কাজ করে। তার ভিতর এই উটকো বাঙালিবাবুকে কেউই বড় একটা সুনজরে দেখত না। বাঙালিবাবু কোন কাজ কাম করে না। কারও সাথে মেশে না। সন্ধ্যে থেকে পড়ে পড়ে দারু খায়। তা দারু আর কে না খায়? সেজন্যে কিছু নয়। আসল কথা হল, বাঙালিবাবুর নজরটা খারাপ। ওদের বস্তীর জীবন কারখানার সিটি দিয়ে বাঁধা। প্রহর নয়, সিফ্‌ট দিয়ে বাঁধা ওদের জীবনযাত্রা। সকালে কারখানার প্রথম ভোঁ পড়লেই বস্তীতে আর জোয়ান মানুষ থাকে না। তখন সেটা প্রমীলারাজ্য। থাকে কিছু পঙ্গু, বৃদ্ধ, শিশু আর ঔরৎ-লোক। এই বাঙালিবাবু সেই শান্তির রাজ্যে মূর্তিমান

বিঘ্নের মত এসে অবতীর্ণ হয়েছে তার রঙ-তুলি-কাগজ-পেনসিল নিয়ে। যখন-তখন যেখানে-সেখানে আঁকবার সরঞ্জাম নিয়ে বসে যায়। দু-একবার বস্তীর জোয়ানরা এসে শাসিয়েছিল। বাঙালিবাবু ভ্রূক্ষেপ করেনি। অবস্থা একদিন চরমে উঠল দুপুর বেলা। রাস্তার ধারে একটি মাত্র কর্পোরেশনের কল ওদের পানীয় জলের উৎস। জল নিতে আসে সারা বস্তীর লোক। লাইন পড়ে যায়—মানুষের নয়, পাত্রের। ঘড়া, কলসী, বালতি, ক্যানেস্তারা টিন। মেয়েরা সার দিয়ে অপেক্ষা করে। ওরা ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছে বাঙালিবাবু একটা চৌকোমতন পিঁড়িতে মেয়েদের ছবি আঁকে। কথাটা কানাকানি হতেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে পড়ল ভিখন, রঙলাল আর রামাবতার। ওরা জোর করে উঠিয়ে দিল বাঙালিবাবুকে। বললে, এমন বে-সরমের কাজ যদি আবার তাকে করতে দেখা যায়, তবে তারা শেষ করে ফেলবে ওকে। এরপর ক'দিন আর বাঙালিবাবুকে দেখা যায়নি। সে বোধহয় দূরে কোথাও ছবি আঁকতে যেত। তারপর এই তো সেদিন, তিন নম্বর শেডের রঙলাল সপ্তাহান্তের টাকাটা ভাঁটিখানায় নিঃশেষ করে ফিরে আসতেই ওদের মরদ-ঔরতে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল। এমন তো নিত্য হয়ে থাকে। কে আর তাতে কান দেয়? সেদিন কিন্তু রঙলাল দারু পান করে টং হয়ে ছিল—আচ্ছা করে ধর্মপত্নীকে চেলাকাঠ পেটা করে তাকে ঘরের বার করে দেয় এবং অর্গলবদ্ধ ঘরে নেশাগ্রস্ত মানুষটা দিব্যি শুয়ে পড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত ওর বউ রুদ্ধ-দ্বারের কাছে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে আর মিনতি করে। রঙলাল সে-সব জানে না—সে তখন নেশার ঘোরে অচৈতন্য। ওর বউ অবশেষে বাইরের দাওয়াতেই গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ে। তার ঘুম ভাঙে ভোররাতে। উঠে দেখে, তার দাওয়া থেকে হাত দশেক দূরে বাঙালিবাবু বসে আছে, আর রঙ-তুলি দিয়ে তার ছবি আঁকছে। অসংবৃত বেসবাস সামলে রঙলালের বউ মড়াকান্না জুড়ে দেয়—বাঙালিবাবু তার ইজ্জত নষ্ট করেছে. ততক্ষণে রঙলালের নেশা ছুটে গেছে। দ্বার খুলেই সে দেখে বাঙালিবাবু দ্রুতহাতে তখনও এঁকে চলেছে তার ডব্‌কা-বউয়ের যৌবনপুষ্ট দেহের ছবি। রঙলাল আর স্থির থাকতে পারেনি। ছুটে এসে প্রচণ্ড একটা চড় মেরে বসে বাঙালিবাবুকে। বউয়ের ইজ্জত নিয়ে কথা! না হয় বিয়ে করা বউ নাই হল—ওর ঘরেরই তো সে! তারই বিবি! একটা কথা শুধু রঙলাল খেয়াল করেনি—সেটা এই যে, ঐ বাঙালিবাবুর দেহে ছিল মত্তহস্তীর বল। চড় খেয়েও তসবিরওয়ালাবাবু কিছু বলেনি। গুটিয়ে তুলছিল তার আঁকার সরঞ্জাম। আর ঐ সুযোগে রঙলাল এক লাথি মেরে ছবিটাকে ফাঁসিয়ে দেয়। অমনি ঐ বাঙালিবাবু রঙলালকে দু'হাতে মাথার উপর তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ছাইগাদায়। একে বউয়ের ইজ্জত গিয়েছে, তায় সকাল বেলাতেই আঁস্তাকুড়ে পড়েছে সে—রঙলাল দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারায়। তার সবচেয়ে রাগ হয়েছিল বাঙালিবাবু তাকে ছুঁড়ে ফেলায় তার বউ খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠেছিল বলে। রঙলাল লোকজন ডেকে আনে। ততক্ষণে বাঙালিবাবু তার ডেরায় চলে গেছে। ওরা পাঁচ-সাতজনে লাঠি নিয়ে এসে সেখানে চড়াও হয়। বাঙালিবাবু তার ভিতর তিন-চারজনকে ঘায়েল করেছে বটে, কিন্তু নিজেও সে ধরাশায়ী হয়। রঙলাল ভূপতিত মানুষটার মাথায় বসিয়ে দেয় মোক্ষম এক ডাণ্ডার বাড়ি!

পরে অবশ্য বস্তীর মাতব্বরেরা সব কয়টি আহতকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। থানা-পুলিস পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়ায়নি। কারণ কোন পক্ষই থানায় যায়নি। আহতদের ওরা নিজ নিজ ছাপড়ায় পৌঁছে দিয়ে এসেছে। বস্তীর আইন অনুসারে এখানেই মাতব্বরদের দায়িত্ব খালাস।

এই হচ্ছে গগ্যার মাথাফাটার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

আমি আর বটুক যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে গগন। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে. থার্মোমিটার সঙ্গেই ছিল। জ্বরতাপ দেখলাম ; একশ তিন। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। ঘুমের মধ্যে ভুল বকছে।

পাশের ঘরে লোকটি বললে,—ওক্‌রাকে লে যাইহ্ বাবু, ইহাঁ রহনেসে মর যাই।

বটুক বললে,—তিনদিন ধরে একটা মানুষ পাশের ঘরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে, তোমরা দেখ না কেন?

লোকটি হতাশার ভঙ্গি করে বলে,—ক্যা কিয়া যায়? বহ্ না খাতে, না পিতে। ভরদিন বে-হোঁস! ঔর হোঁস হোনেসে হামলোগকে মার ডালনে চাতা।

বললাম,—বটুক, একে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

—কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে ও কি বেঁচে উঠবে? ও তো নার্সদেরও মারধোর করতে চাইবে!

আমি বলি,—তা ঠিক। আঘাতটা কতদূর গভীর না বুঝে কিছুই বলতে পারছি না। তাছাড়া শক্ থেকে জ্বর হয়েছে। মাথার আঘাত তো—ব্রেনটা না অ্যাফেক্‌টেড হয়। সেক্ষেত্রে ওষুধের চেয়ে নার্সিংটাই এখন বড় কথা। ওর জীবনীশক্তি প্রচুর—একটু যত্ন পেলে ও নিশ্চিত বেঁচে উঠত।

বটুক আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বলে,—আমরা কি ওকে এভাবে মরতে দিতে পারি দীপু?

আমি ইতস্ততঃ করে বলি,—আমার বাড়িতে বিয়ের হাঙ্গামা না থাকলে আমি ওকে আমার বাড়িতেই নিয়ে যেতাম। ও ঠিক বেঁচে উঠত। এখানে এ অবস্থায়—

বটুক তখনও আমার হাতটা ছাড়েনি। বললে,—কিন্তু আমার বাড়িতে তো বিয়ের হাঙ্গামা নেই। আমি ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই। আমার তো দুখানা ঘর ; ও বাইরের ঘরে থাকবে। তোর গাড়িতেই ওকে নিয়ে যাই।

—কিন্তু বটুক, গগ্যাকে তোর বউ কি চোখে দেখে তা তো জানিস—

—কী পাগলের মত বকছিস! লোকটা মরতে বসেছে—

আমি বাধা দিয়ে বলি,—তা হোক। তুমি বরং আগে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার কথা বলে নাও। তোমার অন্য বন্ধু হলে আমি এ-কথা বলতাম না ; কিন্তু গগ্যার ক্ষেত্রে—

ও দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে,—লেখাকে তুই জানিস না! ওর মন শিশুর চেয়ে কোমল। একটা মানুষ মরে যাচ্ছে শুনলে...আজ বড়দিনের দিন...

—তা হোক। আমি বলছি—তুই একবার কথাবার্তা বলে আয়। আমি না হয় অপেক্ষা করছি।

বটুক চুপ করে খানিকক্ষণ কী ভাবলে। তারপর বলে,—তুই ঠিকই বলেছিস রে। বউকে না জিজ্ঞেস করে গগ্যাকে হুট করে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তবে তোকেও আসতে হবে...মানে ডাক্তার হিসাবে তোর অভিমতটাই জোরদার হবে তো!

—দুজনে গেলে এখানে কে থাকবে? রোগীর কাছে?

পাশের ঘরের হিন্দুস্থানী লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল পিছনেই। আমাদের কথাবার্তা সে কিছু কিছু বুঝতে পেরেছে। তার দেহাতী ভাষায় বললে,—যান বাবুমশাইরা, ব্যবস্থা করে এসে নিয়ে যান। ততক্ষণ আমরাই দেখ্ ভাল্ করব।

বটুক কয়েকটা কমলালেবু প্রথমবারেই নিয়ে এসেছিল।

একটু জলও গরম করা গেল। বটুক একটা ফিডিং কাপ কিনে নিয়ে এল বরানগরের বাজার থেকে। একটু একটু করে আধো ঘুমের মধ্যে গগনকে খানিকটা ফলের রস খাইয়ে দিলাম। এখন করণীয় কিছু নেই। রোগী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। ঘুমই ওষুধ। আমরা ওকে প্রতিবেশীর জিম্মায় রেখে আবার রওনা হলাম বরানগর থেকে ভবানীপুর।

আমিই চালাচ্ছি গাড়ি। বটুক বসে আছে আমার পাশে। হঠাৎ বললে,—লেখার হাতে ও ঠিক বেঁচে উঠবে, দেখে নিস। জানি তো লেখাকে। শী'স এ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল! আমার অসুখের সময়—

বাধা দিয়ে বলি,—বটুক, তোর স্ত্রী চোদ্দ বছর আগে একবার মা হতে বসেছিল, অথচ এ দীর্ঘদিনে আর সন্তান হয়নি। ব্যাপারটা কি, আজ বলবি? না, নেহাৎ কৌতূহলের জন্য এমন অশোভন প্রশ্নটা বারে বারে করছি না। ডাক্তার হিসাবেই জানতে চাইছি। কেন এতদিনে সে মা হয়নি?

বটুক অনেকক্ষণ জবাব দিল না। জানালার বাইরে অপসৃয়মান রাস্তার দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে চুপ করে। তারপর তেমনিভাবেই ওধারে চেয়ে বলে,—সুলেখা মা হতে পারেনি, কারণ আমি নিশ্চয়ই বাপ হওয়ার উপযুক্ত নই! দোষটা আমারই, ওর নয়!

—তার মানে? চোদ্দ বছর আগে বিয়ের আগেই কি—

—সুলেখা আমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়। তার বিয়েই হয়নি!

এবার আমার নীরব হবার পালা।

এতক্ষণে আমার দিকে ফিরে বলে,—বেচারি কোন্ সাহসে তোর মত বামুনকে রেঁধে খাওয়াবে বল্? বিয়ের আগেই মা হয়েছে, আর মা হবার পরেও বিয়ে হয়নি।

—তা হোক ; কিন্তু ওর গর্ভে যে সন্তান এসেছিল, তার বাপ তাহলে—

—সে রাস্কেলটা যে কে, তা আজও আমি জানি না।

—তোর সঙ্গে ওর কোথায় দেখা হয়? লেখাপড়া জানা মেয়ে?

—আগেই বলেছি ও অর্ফান। মানুষ হচ্ছিল দূর-সম্পর্কের এক মামার কাছে। লোকটা কোন এক কোলিয়ারিতে কাজ করত। ভাগ্নীকে সে আশ্রয় দিয়েছিল বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল সাংঘাতিক। চাকরিতে উন্নতির জন্য ও লেখাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করত। সে এক বীভৎস ব্যাপার। বিস্তারিত আমি জানতেও চাইনি, লেখাও নিজে থেকে বলেনি। কোলিয়ারিতে ছিলেন এক ক্রিশ্চিয়ান ফাদার। তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত লেখা—তিন ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। অবাঞ্ছিত সন্তান আর নিজেকে মুক্তি দিতে একদিন লেখা বাড়ি ছেড়ে পালায়। ওখান থেকে দামোদর তিন মাইল। সিধে তিন মাইল হেঁটে চলে এসেছিল সে। আমি ওর সাক্ষাৎ পাই দামোদরের এক ঘাটে। ঘাটে নয়, আঘাটায়।

বটুক পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য সিগারেট কেস বার করে। একটা সিগারেট ধরায়। আমাকেও বার করে দেয় একটা। বলে,—তোর চেয়ে বড় বন্ধু আমার নেই। এসব কথা কখনও কাউকে বলিনি। বলা যায় না ; কিন্তু তোকে বলব।

আমি বললাম,—শুধু বন্ধু বলে নয়, বটুক। আমার ধারণা, সুলেখা ভুগছে একটা মানসিক ব্যাধিতে। সেদিন বলেছিলাম, ছেলেপুলে না হলে ওর ফিটের ব্যারাম সারবে না। আজ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আরও জটিল। তাই শুনতে চাইছি। মনে হয়, ও একটা মানসিক অবদমনে ভুগছে। তুই সব কথা খুলে বল্ আমাকে—

সংক্ষেপেই বলেছিল বটুক। সব কথা সে বলেনি। সঙ্কোচে অথবা অন্য কোন কারণে হবে হয়তো। বটুকের সঙ্গে দেশের সম্পর্ক চুকে গেছে। ওর বাবা এখনও জীবিত। সুলেখার ব্যাপারে তিনি ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। বটুক একটি খ্রীষ্টান মেয়ে বিয়ে করেছে এইটুকুই জানেন তিনি। বিয়ে যে বটুক করেনি,—মেয়েটি খ্রীষ্টান নয়, তা তিনি জানেন না। সুলেখার সাক্ষাৎ সে পেয়েছিল নদীর ধারে। বটুক একদিন একখানা ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকছিল নির্জন এক আঘাটায়। নদীবক্ষে সূর্যাস্তের দৃশ্য। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটি মহিলা ঘড়ায় করে জল নিয়ে যেতে এসেছেন। এখানে কোন ঘাট নেই। দামোদরের পার তিন-চার ফুট খাড়া উঠে গেছে। সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। এই অবেলায় অমন আঘাটায় মেয়েটি কেন জল নিতে এসেছে বটুক বুঝে উঠতে পারেনি। মেয়েটি ঘড়ায় একটি দড়ি বেঁধে যখন নামিয়ে দিল তখনও সে চুপ করে ছিল। ভেবেছিল, ঐভাবেই সে দু-তিন হাত নিচু খাড়া পাড় থেকে জল ভরতে চায় বুঝি। কিন্তু দড়ির অপর প্রান্ত যখন সে নিজের মাজায় বাঁধতে শুরু করে তখন বিদ্যুৎ চমকের মতো ওর মনে হল, মেয়েটি আত্মহত্যা করতে এসেছে! ও চিৎকার করে ওঠে,—ও কী করছেন আপনি? মেয়েটি তখন পাড়ে দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্যে কাকে যেন নমস্কার করছিল। ওর চিৎকার তার কানে যায়। মেয়েটি ঘুরে ওকে দেখতে পায় এবং তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। বটুকেশ্বর ছোট্ট মানুষ। দৈহিক ক্ষমতা তার সীমিত। কিন্তু সে বরিশালের বাঙাল! মেঘনায় সাঁতার শিখেছে সে। তৎক্ষণাৎ সেও ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। এরপর আর তার ভাল মনে নেই।...একটা নরম নারীদেহ...অজগর সাপের মত দুটি বাহুর কঠিন বেষ্টনী...ফুসফুসে প্রচণ্ড যন্ত্রণা...মৃত্যুভয়! আর কিছু মনে নেই তার। সাঁতারে সে ওস্তাদ—কিন্তু ঐ দীর্ঘদেহী যুবতী মৃত্যুযন্ত্রণায় ওকে এমন নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছিল যে, ক্ষুদ্রকায় বটুক নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। নিমজ্জমান শুধু ওরা দুজনই তো নয়, ঐ সঙ্গে ছিল জলভরা ঘড়ার একটা জগদ্দল পাহাড়! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল বটুক দামোদরের গভীরে।

জ্ঞান ফিরে আসে মিশনারী হাসপাতালে। নিতান্ত ঘটনাচক্রে বলতে হবে, অথবা বাপ-দাদার আশীর্বাদও বলতে পার—ঐ সময় একজন খেজুরগাছ ঝোড়াই করতে নদীতীরের একটা খেজুর গাছে উঠেছিল। বটুকের চিৎকার শুনে সে সচকিত হয়ে এদিকে তাকায়। পরবর্তী ঘটনা সে দেখেছিল গাছের উপর থেকেই। দুর্জয় সাহসী লোকটা। খেজুরগাছ-কাটা ধারালো কাস্তেখানা মাজায় গুঁজে সে অকুতোভয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দামোদরে। জলভরা ঘড়াটা সে প্রথমেই কেটে বাদ দেয়, আর সংজ্ঞাহীন দুজনকে টেনে তোলে ডাঙায়।

ব্যাখ্যা করতে কারও দেরি হয়নি। ব্যর্থ-প্রেমিক দুজন। যুগলে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। ডাক্তারবাবু পুলিস-কেস করেননি। নিতান্ত দুর্ঘটনা বলে খাতায় লিখে প্রেমিক-যুগলকে বিদায় দিয়েছিলেন।

এর পরে অনিবার্য একটি রোমান্টিক অধ্যায় নিশ্চয় ছিল সন্দেহাতীতভাবে। যুগল-প্রেমিক হিসাবে যারা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে এল, সেই অপরিচিত ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কীভাবে মন জানাজানি হল, সেকথা বটুক আমাকে বলেনি। শুধু বলেছিল, —অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের অভিশাপ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই মেয়েটি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। বটুক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঐ অজাত শিশুর পিতৃত্বের দায় নিতে রাজী হয়। মেয়েটি আত্মহত্যার চেষ্টা আর করেনি। ওর ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সৌভাগ্য কি

দুর্ভাগ্য বলতে পারে না বটুক—শিশুটি বাঁচেনি।

উপসংহারে বটুক বলল,—এমন নাটকীয় ঘটনা না ঘটলে আমার মত চেহারার মানুষের ঘরে ওর মত মেয়ে হয়তো কোনদিনই আসত না। না রে?

আমি ধমক দিই,—কেন তুই নিজের সম্বন্ধে এইসব কথা ভাবিস?

ম্লান হেসে ও বলে,—মিথ্যে সান্ত্বনা কেন দিচ্ছিস? আমি কি জানি না—ও আমার বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা? বিউটি অ্যাণ্ড দি বীস্ট!

—পাগলা কোথাকার! মানুষের চেহারাটাই কি সব? সুলেখা তো তোকে খুব ভালবাসে। এখন বিয়ে করলেই পারিস?

বটুক বোকার হাসি হেসে বললে,—বউ রাজী হয় না।

যোগেশ মিত্তির রোডে ওর বাসায় এসে যখন পৌঁছলাম তখন ঠিক দুপুর। সুলেখা দরজা খুলে দিল। আমাকে দেখতে পেয়ে ঘোমটা তুলে দিল মাথায়। আমাকে সে প্রত্যাশা করেনি, বলে,—কী ডাক্তারবাবু, চাখতে এসেছেন নাকি? হাঁড়ি-কাবাব এখনও নামেনি।

আমি কী জবাব দেব ভেবে পাই না। ক্রিস্টমাস ট্রিটা সাজানো হয়েছে. সাজগোছ সব শেষ। কোণায় টেবিলের উপর দাঁড় করানো রয়েছে তৈলচিত্রটি। ক্রুশবিদ্ধ যীশু। সুলেখা বললে,—আপনার বন্ধুর ক্রিস্টমাস প্রেজেন্ট। অপূর্ব হয়েছে ছবিটা, তাই না?

আমি জবাব দেবার আগেই বটুক বলে ওঠে,—লেখা, তোমার কাছে একটা ভিক্ষা আছে।

সুলেখা ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে মোহিনী হাসি হাসল। আমার মনে হল—কালো হলেও সুলেখা সত্যিই সুন্দরী। দ্রৌপদীও তো কালো ছিলেন—অজন্তাগুহার যাবতীয় নারীরত্নও তো ঘোর রঙে আঁকা! কৃষ্ণা-অপ্সরা, কৃষ্ণা-কুমারী, মাদ্রী, সীবলী, সুমনা এমন কি রাহুল-জননী! মুচকি হেসে সুলেখা বললে,—অত ভনিতা করতে হবে না—চা না কফি বলে ফেল!

বটুক আমতা আমতা করে বলে,—না, ঠাট্টা নয়, ইয়ে হয়েছে...আমার একটি বন্ধু মরণাপন্ন অসুস্থ...তাকে...মানে এখানে নিয়ে আসতে চাই।

—এখানে? এখানে কেমন করে—

—কেন, এখানে তো দুখানা ঘর আছে। ও এই স্টুডিও ঘরে থাকবে। বেচারির কেউ নেই। গুণ্ডায় ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে—এখনও জ্ঞান হয়নি।

—ও! তা সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

এবার জবাব দিতে বটুক ইতস্ততঃ করে। করুণভাবে আমার দিকে তাকায়। সুলেখা হঠাৎ কি যেন বুঝতে পারে। বলে,—ব্যাপার কি বল তো? বন্ধুটি কে? তোমার গগ্যা নয় তো?

—গগ্যাই। সে মরণাপন্ন অসুস্থ। পড়ে আছে বরানগরের একটা বস্তীতে। কেউ দেখবার নেই। এখানে তাকে না নিয়ে এলে সে বাঁচবে না।

সুলেখা হঠাৎ পাষাণে পরিণত হয়ে গেল। একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করল সে ঃ

—না!

—লক্ষ্মীটি লেখা, তুমি অমত কর না। যে অবস্থায় তাকে রেখে এসেছি তাতে এই গদির খাটে আমি ঘুমোতে পারব না।

—বেশ তো, তুমি গিয়ে সেই বস্তীতেই থাক। যতদিন না তোমার বন্ধু ভাল হয়।

আমি আপত্তি করব না। এখানে আমি একাই চালিয়ে নেব।

সুলেখার স্বরে অহেতুক কাঠিন্য।

—তা হলে ও নির্ঘাৎ মরে যাবে, লেখা।

বটুক পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে নেয়। এই মাঘের শীতেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। একবার আমার দিকে তাকায়। এ বিপদে আমি তাকে কিভাবে সাহায্য করব বুঝে উঠতে পারি না। বটুক আবার শুরু করে, —তুমি তো জান লেখা, গগ্যা একজন মস্ত আর্টিস্ট—

—না, জানি না। আর জানলেই বা কি? আমার কি? আমি তোমার বন্ধুকে ঘৃণা করি।

এরপর স্পষ্টই উত্তেজিত হয়ে ওঠে বটুক। এক পা এগিয়ে যায় তার স্ত্রীর দিকে। মিনতিমাখা কণ্ঠে বলে,—আমি তো তোমার কাছে কখনও কিছু চাইনি লেখা। আমি ভিক্ষা চাইছি। অমনভাবে তুমি বল না। আমি জানি, ওটা তোমার মনের কথা নয়। তুমি দেবী, করুণার অবতার। একটা মানুষ ঐভাবে মরে যাবে আর তোমার করুণা হবে না, এ আমি ভাবতেই পারি না। ...তুমি রাজী হয়ে যাও, ওকে আমি নিয়ে আসি। তোমার খাটুনি কিছুই বাড়বে না। যা করবার তা আমিই করব। তুমি এ-ঘরে এস না বরং...

—ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেই হয়?

—হাসপাতাল? সেখানে ওকে কে দেখবে বল? দীপু বলছে, ওষুধের চেয়ে নার্সিংই এক্ষেত্রে বড় কথা। সরকারী হাসপাতালে কে ওকে যত্ন নিয়ে নার্সিং করবে বল?

সুলেখা আমাদের দিকে পিছন ফিরে চৌকির উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রঙের টিউবগুলো গুছিয়ে তুলছিল। বেশ বোঝা যায় ওর হাতটা কাঁপছে। এতটা বিচলিত হল কেন সে? আমাদের দিকে পিছন ফিরেই ও বললে,—আর যদি উল্টোটা হত? তোমার মাথা যদি গুণ্ডায় ফাটিয়ে দিত তাহলে তোমার ঐ বন্ধু কি কুটোগাছটা নেড়ে সাহায্য করত?

—তাতে কি এসে যায়? আমি তো ওর মত হতভাগা নই। আমার কিছু হলে তুমি দেখবে। তাছাড়া ওর সঙ্গে আমার তুলনা? আমি একজন সামান্য নক্সানবিশ, আর ও হল জাত-আর্টিস্ট!

বটুক যেন পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছে ওকে। চমকে ঘুরে দাঁড়ায়। ওর চোখে সেদিন কী দেখেছিলাম? অপরিসীম ঘৃণা! কিন্তু কার উপর? গগ্যা, বটুক, না তার নিজের উপর? দাঁতে দাঁত চেপে সুলেখা বললে,—ঐজন্যেই তোমার কিছু হল না। তুমি দিনরাত নিজেকে ছোট ভাব!

বটুক কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিল সে-কথা। বললে,—আমি কী ভাবি, তাতে কিছু এসে যায় না সুলেখা ; কথাটা নির্জলা সত্য। গগ্যার মত ছবি আমি সাতজন্মেও আঁকতে পারব না।

সুলেখা জবাব দিল না। নিরুদ্ধ আক্রোশে সে ফুঁসতে থাকে। যেন বটুক নিজেকে ছোট করছে না, যেন সুলেখার আঁকা ছবিকেই সে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছে। সুলেখা যীশুখ্রীষ্টের ছবিখানার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। ছবির নিচে একটা ধূপকাঠি জ্বলছিল। সেটাকে একটু দূরে সরিয়ে দিল, যেন জ্বলন্ত কাঠিটা ছবিতে না লাগে। তারপর স্বাভাবিক স্বরেই বললে,—তাই বুঝি তোমার বন্ধুর ছবি প্রদর্শনীতে সিলেকশান পায় না, আর তুমি প্রাইজ পাও?

—হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও। আমি আঁকি তোমাদের জন্যে, আর গগ্যা আঁকে আমাদের মত

আর্টিস্টের জন্যে।

সুলেখা রাগ করে না। হেসে বলে, অরিজিনাল কিছু বল। ওটা ধার করা কথা। শরৎচন্দ্র বলেছেন সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে।

ব্যাপারটা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। এতক্ষণ আমি কোন কথা বলিনি। বলি, —তুমি ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলছ বটুক। গগ্যাকে এখানে কেন নিয়ে আসতে চাইছ তা নিজের মনকেই আগে জিজ্ঞাসা করে দেখ। সে তোমার বন্ধু বলে, না জাত আর্টিস্ট বলে?

বটুক আমার দিকে ফিরে বলে, —দুটোই সত্যি দীপু। গগ্যা যদি আজ ঐ অবস্থায় ওখানে মারা যায়, আমি সমস্ত জীবনভর নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। ...আর আমি তো চোদ্দ বছর ধরে লেখাকে জানি। ও রাগের মাথায় এসব কথা বলছে। ও মোটেই এত নিষ্ঠুর নয়।

সুলেখা এবার স্পষ্ট গলায় বললে,—বেশ, তোমার বন্ধুকে নিয়ে এস। কিন্তু একটা কথা। আমাকে বিদায় দাও।

—তার মানে? তুমি কোথায় যাবে?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার বন্ধু যে ক'দিন এ বাড়িতে থাকবে সে ক'দিন আমি অন্য কোথাও থাকব। তিনি তাঁর বস্তীতে ফিরে গেলে আমিও ফিরে আসব।

বটুক হতাশার ভঙ্গি করে। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছে ছোট্ট মানুষটা। সুলেখা যে এমন একটা চাল চালতে পারে এটা সে আশঙ্কাই করেনি। আমার দিকে ফিরে বললে,—এর পর আর কথা চলে না। অগত্যা আমি নিরুপায় দীপু। মরুক, গগ্যা ঐখানেই মরুক। বন্ধুর খাতিরে বউকে তো আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।—আবার সুলেখার দিকে ফিরে বলে,—এই তো তোমার শেষ কথা?

সুলেখা দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে,—বাড়ি তোমার, শেষ কথা বলার আমি কে?

হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে বটুক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। হাত দুটি জোড় করে একেবারে থিয়েটারি ঢঙে। দৃশ্যটা রীতিমত মেলোড্রামাটিক। বটুকের ফোলা ফোলা গাল আর কুতকুতে চোখে মিনতি মাখানো। আমার মনে হল—ও বুঝি কোন পৌরাণিক যাত্রার আসরে বিদূষকের অভিনয় করছে! বললে,—ওহ্! লেখা...লেখা...আমি যে তোমাকে দেবী বলে পূজা করতাম!

সুলেখার ভূতে জেগেছে কুঞ্চন। এবার আর রাগ বা অভিমান নয়, বিরক্তি। বললে,—ভুল করতে! আমি নিতান্ত মানুষ। রক্ত-মাংসের মানুষ।

আমার দিকে ফিরে বললে,—একটু বসুন, চা করে আনি।

বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সে। মনে হল ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেল। মাথার আঁচলটা কখন উত্তেজনার মুহূর্তে খসে পড়েছিল। এবার সেটা তুলে দেয়। ধীর গতিতে ভিতরের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কিন্তু না, নাটকটা তখনও শেষ হয়নি। বটুক আবার বলে ওঠে,—ও! রক্তমাংসের মানুষ! তা যে লোকটা মরতে বসেছে সেও তো রক্তমাংসের মানুষ! তার কথা এ-ভাবে উপেক্ষা করছ কি করে?

আবার দাঁড়িয়ে পড়ে সুলেখা। ঠিক দ্বারের কাছে। আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, —নিতান্ত জীবনধারণের তাগিদে। কে বলতে পারে, হয়তো তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে গেলে আমারই মৃত্যু হবে!

কথাটা অসংলগ্ন। যুক্তিহীন। অন্ততঃ আমার মনে হল, সুলেখা নেহাৎ কথার পিঠে

কথা বলার তাগিদে এঁড়ে-তর্ক করছে। গগ্যা এখানে এলে, একটা ঘর আটকে রাখলে সুলেখার অসুবিধার চূড়ান্ত হবে—কিন্তু সে অসুবিধাটাকে এ-ভাবে আকাশচুম্বী করে তোলাটা নেহাৎই বাড়াবাড়ি। কথাটা বলে সেও অপ্রস্তুত হয়। শুধু আমি আর বটুক নয়, সে নিজেও তার ঐ অসংলগ্ন কথাটার অর্থ খুঁজে পায় না। আবার প্রস্থানের জন্য পা বাড়ায়।

এবারও বটুক ফস্ করে বলে বসে,—তবু ঐটাই তো রক্তমাংসের মানুষের শেষ কথা নয়। নিজের মৃত্যুকে তুচ্ছ করেও মানুষে তো নিমজ্জমান বিপন্নকে বাঁচাবার জন্য জলে ঝাঁপ দেয়? না কি, এমন কোন ঘটনা ঘটতে পারে বলে বিশ্বাসই হয় না তোমার?

সুলেখা তার কথা শেষ করে পিছন ফিরেছিল। এ-কথায় তার প্রতিক্রিয়া কী হল তা আমি দেখতে পাইনি। সে কোন জবাব দিল না। এগিয়েও গেল না। হাত বাড়িয়ে চৌকাঠটা ধরল। তারপর মনে হল যেন টলছে। পরমুহূর্তেই সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল সুলেখা।

মিনিট দশেক পরে ওর জ্ঞান ফিরে এল। আমরা ধরাধরি করে ওকে খাটে শুইয়ে দিয়েছিলাম। মাথায় মুখে জলের ঝাপটা দিয়েছিলাম। সুলেখার এমন মাঝে মাঝে ফিট হয়। জ্ঞান ফিরে এলে সে গায়ের কাপড় ঠিক করে নেয়। আমি ধীরে ধীরে উঠে যাই। বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। দেখতে না পেলেও শুনতে পাচ্ছিলাম ওদের কথা, টুকরো টুকরো কথার ছিটে। সুলেখা কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার অশ্রুআর্দ্র গুমরানির মাঝে মাঝে বটুকেশ্বরের অসংলগ্ন কয়েকটা আদরের ডাক।

খানিক পরে বটুক আমাকে ডাকতে এল। বললে, ওর স্ত্রী রাজী হয়েছে, সম্মতি দিয়েছে।

আমি ঘরে ফিরে এলাম। আমাকে দেখে সুলেখা উঠে বসতে যায়। আমি বারণ করি। একটু গরম দুধ খাইয়ে দিলে ভাল হয়। বটুক রান্নাঘর থেকে দুধটা গরম করে আনতে গেল। সুলেখা শুয়ে আছে। আমি একটু দূরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। ও বললে,—একটা সীন ক্রিয়েট করলাম!

সান্ত্বনা দিয়ে বলি,—এ আপনার একটা অসুখ সুলেখা দেবী। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

ভিতরের দরজার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে সুলেখা নিম্নকণ্ঠে আমাকে বললে,—ও বুঝতে পারছে না। আপনি ওকে বারণ করুন ডাক্তারবাবু। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—একটা প্রকাণ্ড সর্বনাশ হতে চলেছে!...কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাদের ঐ বন্ধুটাকে ভীষণ ঘৃণা করি। ...আমি ওকে সহ্য করতে পারব না। আপনার বন্ধু যদি কোন কুষ্ঠ রোগীকে এখানে এনে তুলত, বিশ্বাস করুন, আমি আপত্তি করতাম না। কিন্তু...কিন্তু ঐ লোকটা...ব্রুট!

আমি বলি,—আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো কিছু হতে পারে না। আপনার যদি সত্যিই এত তীব্র অনিচ্ছা থাকে তবে সে-কথা বলুন।

—আমি তো বলছি। ও শুনছে না যে।

দুধের বাটি নিয়ে বটুক ফিরে এল। সুলেখাকে খাইয়ে দিল দুধটা।

বললাম,—বটুক, গগ্যাকে এখানে আনা বোধহয় ঠিক হবে না।

বটুক খিঁচিয়ে ওঠে,—তোকে আবার নতুন করে পোঁ ধরতে হবে না। বউ তো রাজী হয়েছে। আবার এখন কেন কেঁচে-গণ্ডুষ করছিস?

—না, উনি মন থেকে সায় দেননি!

—ও! ওর মনের খবর তুই আমার চেয়ে বেশি জানিস?

আমি সুলেখার দিকে তাকাই। তার ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। তারপর হঠাৎ সে বলে বসে,—আজ ক্রিস্টমাস। তোমার কাছে আমি ভিক্ষা চাইছি। আমার এত বড় সর্বনাশ তুমি কর না। আমি মিনতি করছি।

বটুক প্রথমটা থতমত খেয়ে যায়। একবার সুলেখার, একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর বোকার মত হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই বলে, —ও হো! তাই তো! কথাটা আমার খেয়ালই ছিল না। আজ ক্রিস্টমাস! তাই নয়? আজ কেউ কিছু চাইলে তাকে নিরাশ করতে নেই।

ধীরে ধীরে বটুক উঠে গেল ঘরের ও-প্রান্তে। উঁচু টুলের উপর যীশুখ্রীষ্টের যে ছবিখানা ছিল—যেখানা সে আজ উপহার দিয়েছে সুলেখাকে, সেই ছবিখানার উপর একটা তোয়ালে চাপা দিয়ে দিল। আমার দিকে ফিরে বললে,—বাড়ি যা দীপু। রাত্রে আসিস। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, আজ ক্রিস্টমাস। রাত্রে চুটিয়ে পোলাও-মাংস দিয়ে বড়দিন করতে হবে।

আমার দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও সুলেখার মুখ থেকে সরে যায়নি। আমি এক দৃষ্টিতে দেখছিলাম তাকে। অপমানে, অভিমানে তার মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললে,—ছবিটা ঢেকে দিলে যে?

জুতোজোড়া খুলছিল বটুক। যেন কিছুই হয়নি ; বললে,—ছবিটা ঠিকমত আঁকতে পারিনি। যীসাসের ডান হাতের তালুতে ভুলে এক ফোঁটা লাল রঙ পড়ে গেছে। কাল ওটা মুছে দেব।

সামান্য কথা। হয়তো সত্যিই এক ফোঁটা বাড়তি রঙ পড়েছিল ছবিটায়। কিন্তু না, ওর ভিতর একটা গূঢ় অর্থ আছে। কী একটা নিবিড় ব্যঞ্জনা। সুলেখার মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে সে নিজেকে সংযত করল। তারপর বললে,—আমায় ক্ষমা কর। যাও, নিয়ে এস তোমার বন্ধুকে। আমি আর বাধা দেব না।

বটুক এবার নির্লিপ্তের মত বললে,—কী দরকার? থাক না।

সুলেখাই এবার দৃঢ়স্বরে বললে,—না! এতবড় কথাটা যখন তুমি বললে, তখন আর কোন কথা নেই। আমার সব আঘাত সইবে। যাও, নিয়ে এস গগনবাবুকে।

এবার খুশিয়াল হয়ে ওঠে বটুক। আমার উপস্থিতির কথা ভুলে সুলেখার গালটা টিপে দিতে যায়। সুলেখা হাতের ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে বলে,—অসভ্যতা কর না।

আমি পালিয়ে আসি।

পথে নেমে বলি,—ব্যাপারটা কি রে বটুক?

—ওটাই ছিল আমার ট্রাম্প-কার্ড! ব্যাপারটা কী, তা আমি জানি না। লেখার একটা অবসেশান আছে—যীসারের হাতের ঐ পেরেকের দাগটায়। একবার পেন্সিল কাটতে গিয়ে আমার হাতের তালুতে কেটে যায়। সেদিন তাই দেখে ফিট হয়ে গিয়েছিল সুলেখা।

মাথামুণ্ডু সেদিন কিছুই বুঝতে পারিনি। চিত্রলেখার কৈশোরের কথা তখন আমি জানতাম না।

বড়দিনের আনন্দটা কিন্তু সেদিন করা গেল না। রান্না করার সুযোগই পেল না

সুলেখা। গগনকে নিয়ে আসতে গিয়েই হল মুশকিল। নড়াচড়ায় ওর অবস্থা খারাপের দিকে গেল। সারারাত পালা করে জেগে থাকতে হল ওদের স্বামী-স্ত্রীকে। আমিও অনেক রাত পর্যন্ত বসেছিলাম। রাত বারোটা নাগাদ্ বিপদের সম্ভাবনাটা কাটল। কোনরকমে কিছু মিষ্টি আর পাঁউরুটি-কেক খাইয়ে ওরা নিমন্ত্রণের মর্যাদা রক্ষা করল।

এরপর ভাইঝির বিয়েতে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বটুক প্রতিদিন এসে খবর দিয়ে যেত। ওষুধ আর পথ্যের ব্যবস্থা জেনে যেত। গগনকে ওরা আশ্রয় দিয়েছিল বাইরে স্টুডিও ঘরে। প্রথম দিন-তিনেক সম্পূর্ণ আচ্ছন্নের মত পড়ে ছিল সে। তারপর ওর পুরো জ্ঞান ফিরে এল। জ্বরটা ত্যাগ হল ; কিন্তু ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ল গগন। বটুক দিবারাত্র ওর সেবা করে। দোকান বন্ধ। আর আশ্চর্য মানুষ ঐ সুলেখা! কে বলবে এই রোগীটাকে বাড়িতে আনায় তার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। দক্ষ নার্সের মত সে সব কিছু করে যায় নিরলস নিষ্ঠায়। মুখে কথা নেই। ওষুধ খাওয়ায়, পথ্য খাওয়ায়, গা স্পঞ্জ করিয়ে দেয় গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে, বেডসোর যাতে না হয় তাই ওর লোমশ বুকে-পিঠে পাউডার মাখিয়ে দেয়। এমন কি ইউরিনাল-পট, বেডপ্যান পর্যন্ত সাফা করে। বটুক একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল তার ব্যবহারে। আমি মাঝে মাঝে ওদের ওখানে গিয়ে দু-দণ্ড বসতাম। রোগীর দায়িত্ব আমার—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মানুষ হিসাবে গগ্যাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারিনি। শান্তি দেবীর প্রতি তার ব্যবহারটা আমি ভুলতে পারিনি। কিন্তু রোগীর জাত নেই। তাই ডাক্তার হিসাবে যেটুকু করার করে আসি।

আরও দিন-সাতেক কাটল। এখন বটুক বাধ্য হয়ে দোকান খুলেছে। বিকেলবেলা আগের মত সে বেরিয়ে যায়। সুলেখা এখন একা নয়। সে কাজকর্ম করে আর রোগীর দেখাশোনা করে। রাতে আর রোগীর ঘরে কাউকে জেগে বসে থাকতে হয় না। গগ্যার পুরো জ্ঞান আছে ; কিন্তু একটি কথাও সে বলে না। না বটুকের সঙ্গে, না তার স্ত্রীর সঙ্গে, না আমার সঙ্গে। কৃতজ্ঞতা বলে একটা শব্দ যে অভিধানে আছে, গগ্যা বোধকরি সেটা জানে না। একবারও বটুককে বলে না দুটো কৃতজ্ঞতার কথা।

—কি রে, আজ কেমন আছিস?

গগ্যা ওপাশ ফিরে শোয়। যেন সে বটুকের ঘরে অন্তরীণ এক বন্দী। যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ধরে রাখা হয়েছে। এমন কি বটুক পর্যন্ত মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ওঠে।

—ও কথা বলে না কেন? ও কি রাগ করেছে ওকে নিয়ে আসায়? ও কি বুঝতে পারে না, আমরা ওকে না নিয়ে এলে ও মরে যেত?

সুলেখাই বরং বলে,—গগনবাবু অসুস্থ। ওঁর ব্যবহার এখন স্বাভাবিক নয়।

গগ্যা কথা না বললেও সুলেখা বুঝতে পারে, কখন তার কি চাই। ওর চোখে আলোটা লাগছে, তাই আড়াল করে দেয়। ওর বালিশটা সরে গেছে—ঠিক করে দেয়। ওর জলতেষ্টা পেয়েছে—ফিডিং-কাপটা বাড়িয়ে ধরে। গগ্যা খুশি হয় কিনা বোঝা যায় না। তার কণ্ঠস্বরে তো নয়ই, এমন কি চোখের তারাতেও কোন কৃতজ্ঞতার আভাস নেই।

একদিন বটুক আমাকে জনান্তিকে বলল,—আশ্চর্য! ওরা দুজন ঘন্টার পর ঘন্টা মুখোমুখি বসে থাকে। কেউ কোন কথা বলে না।

একদিন দৃশ্যটা আমারও নজরে পড়ল। গগ্যা চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। আমি আর বটুক ভিতরের বারান্দায় বসে কথা বলছিলাম। ঘরের ভিতরটা আমি দেখতে পাচ্ছি। সুলেখা বসে একটা সার্টে বোতাম লাগাচ্ছিল। আমার হঠাৎ খেয়াল হল, এটা গগ্যার সেই

রক্তমাখা সার্টটা। কাচা হয়েছে—কিন্তু রক্তের দাগটা ঠিকমত ওঠেনি। লক্ষ্য করে দেখি, গগ্যা একদৃষ্টে সুলেখার দিকে তাকিয়ে আছে। সুলেখার গায়ে যেন সে দৃষ্টিটা বিঁধল। সে চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে। দুজনে দুজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কেউ কথা বলে না। সুলেখার চোখের ভাষা আমি বুঝতে পারিনি। মনে হল কেমন যেন আতঙ্ক মেশানো। পরমুহূর্তেই গগ্যা কড়িকাঠ গুনতে শুরু করে ; কিন্তু সুলেখার দৃষ্টি তখনও রোগীর দিকে। এখন তার দৃষ্টিতে ভয় নয়—কি যেন একটা মিশে গেছে।

কিছুদিন পরেই গগ্যা উঠে বসল, কিন্তু সে আমাদের সেই চিরপরিচিত দানব-গগ্যা নয়। নিতান্তই একটা কঙ্কাল। একমুখ দাড়ি, একমাথা চুল—একটা হাড়-জিরজিরে শীর্ণকায় মানুষ। এখন সে দু-একটা কথা বলে—কী তার চাই, কী অসুবিধা হচ্ছে, জানায়। বিছানা থেকে নেমে নিজেই বাথরুমে যায়। কখনও বটুকের হাত ধরে, কখনও সুলেখার কাঁধে ভর দিয়ে।

এরপর বেশ কিছু দিন আমি ওদের খোঁজ-খবর আর নিইনি। বটুকও আর আসে না। ওষুধ বন্ধ হয়েছে। মাথার ঘাটা শুকিয়ে গেছে। ড্রেসিং-এর দরকার হয় না। এখন পথ্যই একমাত্র ওষুধ। বটুক ফল নিয়ে আসে, মাংস-ডিম নিয়ে আসে। গগ্যা দিন দিন তার স্বাস্থ্য ফিরে পায়। আমি নিজের প্র্যাকটিসে ফিরে আসি। ওদের খবর আর রাখিনি।

মাসখানেক পরে চৌরঙ্গী দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল মনোহরদাস তড়াগের কাছে একটা লোক বসে ছবি আঁকছে—ঠিক বটুকের মত দেখতে। হ্যাঁ, বটুকই তো। গাড়ি থামিয়ে আমি নেমে আসি। বটুক ইদানিং আর ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকে না। এতদিন পরে হঠাৎ নৈসর্গিক চিত্র আঁকতে বসেছে কেন জানবার কৌতূহল হল।

—কি রে বটুক? আবার ল্যাণ্ডস্কেপ শুরু করলি নাকি?

আমাকে দেখতে পেয়ে ও চমকে ওঠে। ম্লান হাসে। বোকার হাসি। আমতা আমতা করে বলে,—হ্যাঁ,—আবার কিছুদিন ধরে আউট-ডোর ধরেছি।

—গগ্যা ফিরে গেছে বরানগরে?

—না ; ও আমার বাসাতেই আছে।

কেমন যেন খটকা লাগল।

—একেবারে ভাল হয়ে যায়নি সে? কী করে আজকাল?

—হ্যাঁ, ভাল হয়ে গেছে। ও আমার স্টুডিওতে আঁকে তো। তাই আমি আবার আউট-ডোর ধরেছি।

—সে আবার কি রে?

বটুকের মুখ-চোখ কেমন যেন লাল হয়ে ওঠে। বলে,—দোষটা আমারই। ভেবেছিলাম দুজনে একই সঙ্গে কাজ করব আমার স্টুডিওতে। গগ্যার এখন এমন ক্ষমতা নেই যে বরানগরে ফিরে যায়। অথচ সারাদিন সে করেই বা কি! তাই ভেবেছিলাম, দুজনে একসঙ্গে ছবি আঁকলে ভালই হবে। গগনেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ যেমন পাশাপাশি বসে আঁকেন। ওর জন্যে ক্যানভাস, তুলি সব এনে দিলাম। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর।

—তার মানে? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—ঘরে অন্য লোক থাকলে গগ্যা আঁকতে পারে না!

আমি চাপা গর্জন করে উঠি,—চুলোয় যাক গগ্যা! বাড়িটা কার? ঘাড় ধরে বার করে দিতে পারিসনি এতদিনেও?

হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি বটুকের দু চোখ জলে ভরে উঠেছে। কী ব্যাপার?

বটুক মাথাটা নীচু করে কোনক্রমে বললে,—ও আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে!

আমি আকাশ থেকে পড়ি। বটুক বলে কী? তার বাড়ি থেকে তাকে বার করে দিয়েছে মানে? ওর কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলি,—তুই মানুষ, না কি রে? তোর বউ কি বলে?

—ও কিছুই বলে না। ওকে বলেছিলাম, তাতে বললে, আমি তো ওকে এখানে আনিনি। তুমি পার তো তাড়াও!

আমি বলি,—উঠে আয় আমার গাড়িতে। আপদ কি করে বিদায় করতে হয়, চল্ তোকে দেখিয়ে দিই!

ও আমার হাত দুটি ধরে বললে,—প্লীজ দীপু! তুই এর ভিতর নাক গলাস না। ও আমিই ম্যানেজ করে নেব।

বেশ বুঝতে পারি, ও আমার কাছ থেকে কিছু লুকোতে চাইছে।

সেদিন যেটা বুঝতে পারিনি ; সেটা বোঝা গেল আরও দিন সাতেক পরে। সকালবেলা ডাক্তারখানায় বসে আছি, একটি লোক এসে বললে, মুচিপাড়া থানার ও. সি. তাকে পাঠিয়েছেন। কী ব্যাপার? ব্যাপার আর কিছুই নয়, গতকাল রাত থেকে হাজতে একটি লোক আটক আছে। নাম বটুকেশ্বর দেবনাথ। সে নাকি ঠিকানা বলছে না। শেষ পর্যন্ত আমার নাম বলেছে।

তখনই গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম মুচিপাড়া থানায়। বটুক কাল রাত থেকে থানার হাজতে পড়ে আছে? কী করেছে সে? ও. সি.র সঙ্গে দেখা করতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন,—পোশাক-পরিচ্ছদ দেখেই বুঝতে পেরেছি ভদ্রঘরের ছেলে। কিন্তু কী করব বলুন?

ঘটনা যা শোনা গেল, তা হচ্ছে এই ঃ

কাল রাতে বটুককে একটি রিক্‌শায় চাপিয়ে থানায় নিয়ে এসেছে একজন মদের লাইসেন্সড্ ভেণ্ডার। সন্ধ্যারাত্রি থেকে সে দোকানে বসে মদ্যপান করেছে। দোকান বন্ধ হবার সময় সে সম্পূর্ণ বে-এক্তিয়ার। পকেট তালাস করে দেখা গেছে, তার পকেটে একটি পয়সা নেই। ঘড়ি-আংটি খুলে নিলে অবশ্য মদের দামের দশগুণ আদায় হত ; কিন্তু দোকানদার ভদ্রলোক সে চেষ্টা করেননি। ওকে থানায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন। সঙ্গে তাঁর মদের একটি বিলও আছে। দারোগাবাবু কাহিনী শেষ করে বলেন,—দেবনাথবাবু কি রেগুলার ড্রিঙ্কার?

আমি বলি,—ও আমার স্কুলের বন্ধু। ত্রিশ বছর ধরে জানি। ওকে একদিনও মদ খেতে দেখিনি। খেলে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।

দারোগাবাবু বলেন,—আপনি ওঁর মদের দামটা মিটিয়ে ওঁকে খালাস করে নিয়ে যেতে চান? ভদ্রলোকের ছেলে বলে বুঝতে পারায় আমি এখনও কেসটা ডায়েরি করিনি।

আমি তৎক্ষণাৎ মদের বিল মিটিয়ে বটুককে উদ্ধার করলাম। মাত্র সাতদিন আগে যে-বটুককে মনোহরদাস তড়াগে ছবি আঁকতে দেখেছি, এ যে সেই লোক কে বলবে?

আমাকে দেখে ও হাউমাউ করে কেঁদে একটা সীন করল থানার ভিতরেই। এতক্ষণে তার নেশা ছুটে গেছে। এ মাতালের কান্না নয়। গাড়িতে তুলে বলি,—খালি পকেটে মদ

খেতে এসেছিলি কেন?

ও রুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছতে মুছতে বললে,—খালি পকেটে আসিনি। মানিব্যাগটা কেউ মেরে দিয়েছে!

—কত ছিল তাতে?

—তা জানি না। কিন্তু কোথায় যাচ্ছিস?

—কোথায় আবার? তোর বাড়িতে? যোগেশ মিত্র রোডে।

বটুক এমনভাবে আমার হাত চেপে ধরেছে যে আর একটু হলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেত। পথের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলি,—কী ব্যাপার?

—ওখানে আমি যাব না।

—তবে কোন্ চুলোয় যাবি?

বটুক একটু ভেবে নিয়ে বলে,—বরানগরে চল্।

—বরানগর? গগ্যার ওখানে? গগ্যা কি তাহলে ফিরে গেছে?

বটুক বললে,—কোথাও গিয়ে বসে তোকে সব বলি।

একগাদা রুগী বসিয়ে রেখে এসেছি। খোশগল্প করার সময় আমার নেই। কিন্তু বটুকের অবস্থা দেখে করুণা হল। প্রচণ্ড একটা সাইক্লোন যেন বয়ে গেছে এ ক'দিনে। ওর ব্যাপারটা জানা দরকার। বটুকের অবশ্য চরিত্রগত একটা ঝোঁক আছে—মেলোড্রামাতে বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করার। সেই ফর্মূলা অনুসারে যথারীতি মনের দুঃখে সে মদ খেয়েছে। তবে ঐ—একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মানিব্যাগটা কখন খোয়া গেছে টের পায়নি। তাই এক রাত হাজতবাস।

গাড়িটাকে রাস্তার একপাশে রেখে একটা পার্কে ঢুকি। বেঞ্চির উপর লোকজন; আমরা ফাঁকা দেখে ঘাসের উপর এসে বসলাম। বলি,—এবার বল্, কী হয়েছে?

বটুক ঘাসের শিষ ছিঁড়তে ছিঁড়তে মুখ নিচু করে জবাব দিল,—বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে!

ঐ কটা কথা বলতেই ওর গলা বুজে এল। সুলেখাকে তো চিনি! যা একরোখা মেয়ে! গগ্যাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে আসায় তার ঘোরতর আপত্তি ছিল। বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা সে প্রথম দিনেই বলেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বটুকের পীড়াপীড়িতে ঐ জংলী মানুষটাকে বরদাস্ত করতে রাজী হয়েছিল। আমার মনে হল, সুলেখা নিশ্চয় বটুককে বলেছে এবার তার বন্ধুকে বিদায় দিতে; আর নপুংসক বটুক সে সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। তাই বোধকরি সুলেখা সহ্যের সীমা পার হওয়ায় বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। গেলেই বা কতদূর যাবে? গগ্যাকে এবার তার স্ব-স্থানে পাঠিয়ে দিলে নিশ্চয় সুলেখা ফিরে আসবে। বটুকের টোবা গাল বেয়ে দু ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। আমি হাসতে পারলাম না অমন হাস্যকর দৃশ্যটা দেখে; বলতে পারলাম না—দুঃখ করিস না বটুক, অভাগার ঘোড়া মরে, আর ভাগ্যবানের বউ মরে! বরং বললাম,—আরে বন্ধু, কাঁদছিস কেন? ও ফিরে আসবে। রাগের মাথায় অমন সবাই বলে—রইল তোমার ঘরদোর, আমি চললাম।

বটুক মুখটা তোলে না। মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে অস্ফুটে বলে,—তুই বুঝতে পারছিস না। বউ ওকে ভালবাসে—ঐ গগ্যাকে।

—কী!—প্রথমটা ভীষণ চমকে উঠেছিলাম; কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেই নিজের উপর রাগ করি। এতটা চমকে ওঠার কি আছে? এ যে নিতান্ত অসম্ভব! ও পাগলটা বলছে

বলেই বিশ্বাস করতে হবে? বলি,—তোর খোঁয়াড় কি এত বেলাতেও ভাঙেনি রে বটুক? এখনও নেশার ঘোরে আছিস? গগ্যাকে হিংসে করতে তোর লজ্জা হচ্ছে না? তুই নিজে চোখে দেখিসনি—গগ্যাকে কী ভীষণভাবে ঘৃণা করে তোর বউ!

বটুক বাঁ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে বললে,—তুই বুঝছিস না।

—না, আমার বুঝে কাজ নেই। কাল রাতে তো পাঁট পাঁট মদ গিলেছিলি, সলিড খাবার সঙ্গে কিছু খেয়েছিলি?

এতক্ষণে ও মুখ তুলে তাকায়। বলে,—শুধু কাল রাতে নয়, দিনেও কিছু খায়নি।

—তবে চল্, দ্বারিকের দোকানে চল্। খালি পেটে অমন উদ্ভট চিন্তা হয়। মনে হয়, ঘরের বউ বুঝি বাইরের লোকের সঙ্গে প্রেম করছে। সকালবেলা গরমাগরম হিঙের কচুরি ভাজে। আর আলুরদম। ভাল করে খেয়ে নে—দুঃস্বপ্ন ছুটে যাবে। তারপর তোকে যোগেশ মিত্তির রোডে পৌঁছে দিয়ে তবে আমার ছুটি।

—বললাম যে, ওখানে আমি যেতে পারব না। ওরা ওখানে আছে। আমি ও-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

—তাই বল্! তার মানে তোর বউ গৃহত্যাগ করেনি ; তুই নিজেই তাকে ত্যাগ করে চলে এসেছিস!

—দীপু, প্লীজ ওভাবে বলিস না।

আমি বলি,—বেশ, আর ওভাবে বলব না। নে, ওঠ্, চল্, তোকে কিছু খাইয়ে আনি—

—আমার ক্ষিদে পায়নি। বস্, তোকে সবটা আগে বলি।

ধমক দিয়ে উঠি,—কাল সারাদিন কিছু খাসনি, ক্ষিদে পায়নি কি রকম?

—প্লীজ দীপু, আগে আমার সব কথা শোন্। মনটা হালকা না করলে আমি কিছু খেতে পারব না।

অগত্যা আবার বসে পড়ি। হয়তো ঠিক কথাই বলছে বটুক। মনটা খালি না হলে পেটটা সে ভরাতে পারবে না।

—কাল সকালবেলা আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি।—আমি গগ্যাকে বললাম—তোর শরীর তো একেবারে ভাল হয়ে গেছে। এবার তুই নিজের ডেরায় যা—

আমি বলি,—এ-কথা অনেক আগেই বলা উচিত ছিল তোর। তারপর?

—গগ্যা হেসে উঠল। ওর হাসি তো জানিস—গা জ্বালা করে। অবজ্ঞার হাসি। বললে,—সে তখনই চলে যাবে। ও নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়। তুই তো জানিস, ইতিমধ্যে বরাগনগর থেকে আমি ওর জিনিসপত্র কিছু নিয়ে এসেছিলাম। ও একটা পোঁটলা বাঁধে। লেখাকে বলে একটা দড়ি নিয়ে আসতে।

বটুক হঠাৎ থেমে পড়ে। একটু দম নেয়। ওর চোখে জল এসে যাচ্ছিল বোধহয়। অনেক কষ্টে সেটাকে ঠেকিয়ে রাখে। মুখটা নিচু করে আবার শুরু করে,—বউ একটা দড়ি এনে দিল। গগ্যা আপন মনে পোঁটলা বাঁধতে থাকে আর গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি। গগ্যা খাটের নিচে থেকে তার জুতোজোড়া বার করে যখন পায়ে দিচ্ছে তখন হঠাৎ ফস্ করে বউ বলে ওঠে—আমি ওর সঙ্গে যাচ্ছি। আমি এখানে আর থাকব না। আমি কথা বলতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটল না। গগ্যার কোন ভাবান্তর নেই। সে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছিল, আর গুনগুন করে গান গাইছিল—

বটুক আবার চুপ করে। কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছে নেয়। চোখ দুটোও। এতক্ষণে

আমার মনে হল ব্যাপারটা সত্যিই অত্যন্ত বিশ্রী মোড় নিয়েছে। বটুকের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু সব কথা না বলেও তার পরিত্রাণ নেই। বুকটা হাল্‌কা করতে হবে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ভাঙা ভাঙা কথায় ও ঘটনাটা বিবৃত করে ঃ

বটুক তার স্ত্রীকে বোঝাতে যায়, বাধা দিতে চায়, এমন ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত থেকে বিরত করতে চায় ; কিন্তু সুলেখা যেন পাষাণ দিয়ে গড়া। কোন কথাই তার কানে যায় না। বটুক তার ভালবাসার দোহাই পাড়ে, চোদ্দ বছরের সহবাসের কথা বলে, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে সে কেমন করে ওর হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে কথা মনে করিয়ে দেয়। সুলেখার কোন ভাবান্তর নেই। দামোদরের জলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা কীভাবে পরস্পরকে অবলম্বন করে ডুবতে বসেছিল সে-কথা শুনেও অবিচল থাকে সুলেখা। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ডান হাতের তালুতে জমে-ওঠা রক্তের বিন্দুটাও ব্যর্থ হয়ে যায়। বটুক শেষে বলে,—গগ্যার ঘরদোর বলে কিছু নেই। ও বস্তীতে থাকে। সেখানে তোমার মত মেয়ে থাকতে পারবে না। এ তুমি কী বলছ লেখা?

এতক্ষণে সুলেখা জবাব দেয়,—খাল কেটে তুমিই তো এ কুমীর এনেছিলে একদিন?

বটুক মরিয়া হয়ে তখন গগ্যার দিকে ফিরে বলে,—তুই ওকে বারণ কর্ গগ্যা!

গগ্যা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। জুতো পরা হয়ে গিয়েছিল তার। উঠে দাঁড়ায়। বলে,—আমি ওকে আসতে বলিনি। আমি ওকে বাধাও দেব না।

—কিন্তু তোর ঐ বস্তীতে গিয়ে লেখা বাস করবে কি করে? এখানে ও কীভাবে আছে আর ওখানে কীভাবে থাকতে হবে! তুই তো অন্তত সেকথা বুঝবি!

গগ্যা বললে,—আমার কাছে এটা কেমন করে আশা করছিস মটকু? আমি নিশ্চিন্ত আরামের আশ্রয় ছেড়ে নিজেই তো একদিন ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম—

—তুই আর্টিস্ট। তোর কথা আলাদা। ও কিসের আকর্ষণে—

—ঝাঁট দে—সেকথা ও বলবে। আমি নয়। পোঁটলাটা তুলে নেয় হাতে।

সুলেখা একবস্ত্রেই বেরিয়ে আসে। গগ্যার পাশে এসে দাঁড়ায়। বটুক আর নিজেকে সামলাতে পারে না। দুরন্ত ক্রোধে সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়ে গগনের উপর। দু হাতে কিল-চড়-ঘুষি চালাতে থাকে। গগন প্রথমটা হকচকিত হয়ে যায়। এ আক্রমণের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে সে নিজেকে সামলে নেয়। অসুখে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে বটে, তবু বটুকের তুলনায় সে দুর্বলতা কিছুই নয়। পরমুহূর্তেই ছোট্ট মানুষটা মেজের উপর উল্টে পড়ে যায়। গগ্যা তার দিকে ফিরে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে,—মট্‌কু কোথাকার!

বটুক উঠে বসে। প্রথমটা কিছুই দেখতে পায় না। চোখ থেকে তার চশমাটা ছিটকে কোথায় পড়ে গেছে। ও খুঁজে পায় না। সুলেখা নিঃশব্দে সেটা কুড়িয়ে এনে ওর হাতে দেয়। একটি কথাও বলে না। চটিজোড়া পায়ে দেয়।

সুলেখা দৃঢ়স্বরে বলে,—আর ন্যাকামি কর না। উঠে দাঁড়াও। আমাকে যেতে দাও।

—ন্যাকামি!—বটুক উঠে দাঁড়ায়। বলে,—গগ্যার একটি পয়সা নেই। সে তোমাকে কি খাওয়াবে? তোমরা দুজনেই যে না খেয়ে মরবে—

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

বটুক দৃঢ়ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,—না! আমাকেই ভাবতে হবে। তুমি সে বস্তীর ঘরখানা দেখনি। সেখানে চারদিকে শুধু ময়লা আর কাদা। মোদোমাতালের আড্ডা। তুমি কিছুতেই সেখানে থাকতে পারবে না।

—সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না। গগ্যা যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি। বেশ, কোথাও তোমাদের যেতে হবে না। সুলেখা, তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হওনি। হয়তো আমার মত বাঁদরকে ভালও বাসতে পারনি কোনদিন। আমি কিন্তু তোমাকে চোদ্দ বছর ধরে স্ত্রীর মর্যাদাই দিয়ে এসেছি। তুমি মানো আর না মানো, আমার যা কিছু আছে তার আধখানা তোমার। বেশ, গগ্যাকে ছেড়ে তুমি যদি না থাকতে পার, তবে তোমরা দুজনেই থাক এখানে। যেতে হয় আমিই চলে যাচ্ছি।

এবার গগ্যা বললে,—তার মানে?

—তার মানে সুলেখা মানুক আর না মানুক সে আমার স্ত্রী। ঐ বস্তীতে তাকে আমি থাকতেও দেব না। তোমরা দুজনেই এখানে থাক, আমি চলে যাচ্ছি। কাল এসে আমার জামা-কাপড় নিয়ে যাব। আমিই থাকব বরানগরের বস্তীতে।

এবার আর গগ্যা কথা খুঁজে পায় না। সুলেখাও নির্বাক।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এসেছিল বটুক। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরেছে তা মনে নেই। সন্ধ্যেবেলা ঢুকেছিল একটা মদের দোকানে। তারপর তার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন নিজেকে আবিষ্কার করে মুচিপাড়া থানার হাজতে।

বটুককে পৌঁছে দিয়ে এলাম বরানগরের সেই বস্তীতে। গগ্যার খাটিয়ায় বসল সে আমার মুখোমুখি। আসবার পথে কিছু খাবারও কিনে এনেছিলাম। বটুক খেল আমার সামনে বসে। রাস্তার কলে তখনও জল ছিল। মুখটা ধুয়ে এল সেখানে গিয়ে।

বললাম,—এবার আমি যাই?

—যাবি? তা যা। হ্যাঁ, তুই আর কতক্ষণ থাকবি এখানে!

—তুই সারাদিন কি করবি?

—ছবি আঁকব। বোধহয় এবার আমার ছবি উৎরোবে—

খাটিয়ার নিচে গগ্যার ফেলে-যাওয়া রঙ-তুলিগুলো সে টেনে টেনে বার করছিল। হঠাৎ মুখ তুলে বলে,—আচ্ছা তুই-ই বল্ দীপু, এখানে এসে সুলেখার মত মেয়ে থাকতে পারে? তাকে কি এখানে আসতে দিতে পারি?

আমি বলি,—সে তোমার স্ত্রী। তুমি বুঝবে।

—তুই হলে কী করতিস?

—আমি সোজা তাকে খোলা দরজা দেখিয়ে দিতাম। জেনে বুঝে কেউ যদি আগুনে হাত দেয় তাহলে হাত তার পুড়বেই।

বটুক বললে,—হ্যাঁ, তুই তো ও-কথা বলবিই!

—কেন?

কুতকুতে চোখ দুটো আমার দিকে তুলে বটুক বললে,—তুই তো আর সুলেখাকে ভালবাসিসনি!

—তা বটে! কিন্তু তুই কি এখনও তাকে ভালবাসিস?

—নিশ্চয়! আগের চেয়ে বেশি! লেখা তো আর সজ্ঞানে নেই, সে এখন মোহগ্রস্ত—হিপ্‌নোটাইসড্! এ আর কদিন? গগ্যা দুদিন পরেই ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে—পড়া-শেষ বইয়ের মত।

কৌতূহল হল। বললাম,—তখন কি আবার তুই ছুঁড়ে দেওয়া বইখানা তুলে ঘরে নিতে চাস?

—সুলেখা যদি কোনদিন ফিরে আসে আমি তাকে আবার ডেকে নেব। জানি সে তখন আমাকে নতুন করে ভালবাসতে পারবে না। আর সে-কথা কি? ও হয়তো কোনদিনই আমাকে ভালবাসেনি। আমার মত বাঁদরকে আর কে ভালবাসবে বল্? একটা ছেলেও যদি দিতে পারতাম তার কোলে! তা হোক! আমি তো তাকে ভালবেসেছিলাম! আমার প্রেমকে তো সে স্বীকার করে নিয়েছিল, বাধা দেয়নি। সেই-ই যথেষ্ট।

আমি আর বিরক্তি চেপে রাখতে পারলাম না। আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—তোর মত ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সের মানুষ জীবনে দুটি দেখিনি!

—ইনফিরিয়র টু হোয়াট? টু লাভ! তুই জীবনে কখনও ভালবাসিসনি দীপু! তাই জানিস না। প্রেমের বাজরে 'ভ্যানিটি'র স্থান নেই। আত্মসচেতন মানুষ ভালবাসতে জানে না।

এ আলোচনা আমার ভাল লাগছিল না। কথা ঘোরাবার জন্য বলি,—তুই কি একেবারেই কিছু সন্দেহ করিসনি?

বটুক একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। কী যেন ভাবতে থাকে। জবাব দেয় না।

আমি বলি,—এ সব কথা যদি তোর ভাল না লাগে তবে থাক।

—না না। আমি বলতেই চাই। বললেই মনটা হাল্‌কা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি টের পেয়েছিলাম। বোধহয় লেখা তার মনকে বুঝতে পারার আগে আমি তার মন বুঝতে পেরেছিলাম।

—তাহলে তখনই গগ্যাকে বিদায় করিসনি কেন?

—আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে হয়েছিল এ অসম্ভব। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। লেখা ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। এ আমি কেমন করে বিশ্বাস করব, বল্? আমার মনে হল অহেতুক ঈর্ষার ভুল দেখছি আমি। ব্যাপারটা কি জানিস, আজ চোদ্দ বছর ধরেই এ কাণ্ডটা ঘটছে। সুলেখাকে আমি সব সময় সন্দেহের চোখে দেখতাম। আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে ও হেসে কথা বললে আমার বুকটা ধড়াস করে উঠত। তোর মনে আছে দীপু—তুই প্রথম দিন বলেছিলি 'পূজারিণী' ছবিতে আমি কল্পনার আশ্রয় না নিলেই ভাল করতাম? তখনও আমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। কারণ আমি দেখেছিলাম, ঐ কথা শুনে লেখা রাঙিয়ে উঠেছিল। আমি তোকেও ঈর্ষা করতাম। তাই যখন দেখলাম, লেখা ঐ বর্বর জানোয়ারটাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখছে, তখন মনে হল এবারও দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে আমার। আমি ভুল দেখছি। কিন্তু এবার ভুল হয়নি আমার।

আমি বলি,—আচ্ছা, লোকে যে বলে ভাল করলে ভাল হয়, সে সব একেবারে বাজে কথা, নয়? তুই তো গগ্যার ভাল করতেই চেয়েছিলি। ক্রিসমাসের দিনে একটি ভাল কাজ করেছিলি। তার ফল কি হল?

বটুক বললে,—ওসব বাজে কথা। ভাল করলে ভাল হয়, আর মন্দ করলে মন্দ! তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও ক্যান্সারে ভুগে ভুগে মারা যান?

একটু হাসি মিলিয়ে বলি,—তার মানে, তোর এ গল্পের 'মরাল' হচ্ছে—দুনিয়ায় কারো ভাল করতে নেই? কেমন—না?

ছোট্ট মানুষটা তার ছোট ছোট চোখ দুটো আমার দিকে মেলে বললে,—ভুল করলি দীপু। ওটা এ গল্পের 'মরাল' নয়। এ গল্পের 'মরাল' হচ্ছে—তা সত্ত্বেও ভাল কাজ করাই মনুষ্যত্ব।

—তার ফল খারাপ হতে পারে জেনেও?

—হ্যাঁ, তাই। ফলটা তোর হাতে নয়, কাজটা তোর। পাকা ঘুঁটি যেমন কেঁচে আসে সেভাবে আজ যদি আবার আমি সেই 'ক্রিসমাস ডে'-তে পৌঁছাই তাহলে জেনে-বুঝে আবার ঐ একই ভুল আমি করব। মুমূর্ষু গগ্যাকে আবার নিয়ে আসব আমার বাসায়।

আমি জবাব দিতে পারিনি। বটুক ছেলেটা জীবনে কিছুই করতে পারেনি, কিছুই করতে পারবে না। সব দিক থেকেই সে বিদূষক! সে বউকে ধরে রাখতে পারে না, নিজেকে সে বাঁদর বলে, যেখানে-সেখানে ছোট ছেলের মত ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। একটা বাফুন! কিন্তু এমন কথা এমন সুরে কটা মানুষ বলতে পারে?

আবার কথা ঘোরাবার জন্য বলি,—সুলেখার মত মেয়ে এমন বদলে যাবে এটা এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

বটুক বললে,—কিন্তু এটাই তো জগতের নিয়ম দীপু। তোর ভুল কোথায় হচ্ছে জানিস? তুই উপন্যাস পড়া বিদ্যে দিয়ে জগতের বিচার করতে চাইছিস। ভাবছিস এ দুনিয়ার মানুষ সব বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্র। যে নায়ক সে উদার মহৎ সাহসী ধীরোদাত্ত ; যে খলনায়ক সে কুটিল কুচক্রী ভীরু। কিন্তু সত্যিকারের জগৎ এমন বাঁধা ফর্মূলায় চলে না। এই আমার কথাই ধর না। একদিন বরিশালে যখন লাঠিচার্জ হচ্ছে তখন একজন নিমজ্জমান মানুষকে বাঁচাবার সাহস আমার হয়নি। অথচ তাঁকে চিনতাম, ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম। তখন আমার কিশোর বয়স, মানুষের যখন ভয়-ডর বলে কিছু থাকে না। কিন্তু ওটাই তো আমার শেষ কথা নয়! সেই আমিই আবার একদিন দামোদরের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম আর একজনকে বাঁচাতে—যাকে আমি চিনি না, জানি না! এতবড় কন্ট্রাডিকশানটা যদি আমার জীবনে সত্য হতে পারে তাহলে সুলেখার বেলাতেই বা তা হবে না কেন?

বলি,—তুই কিছুদিন বরং বাইরে থেকে ঘুরে আয়! এ বস্তীর জীবন তুই নিজেও সহ্য করতে পারবি না।

বটুক বললো—না না, আমাকে এখন কলকাতাতেই থাকতে হবে। ভবানীপুরের বাড়িওয়ালাকে আমার ঠিকানাটা জানিয়ে রাখতে হবে। মাসান্তে ভাড়া না দিলে ওদের উচ্ছেদ করবে—

—সে তো বাইরে থেকে মনি-অর্ডার করেও পাঠাতে পারিস!

—তুই বুঝছিস না। যে-কোন দিন গগ্যা ওকে ফেলে পালাতে পারে। আমাকে হাতের কাছেই থাকতে হবে।

এরপর আবার বেশ কিছুদিন ওদের খবর পাই না। ররাহ-নগরের বস্তীতে আমি খোঁজ নিতে যাইনি। যোগেশ মিত্র রোডেও যাইনি। হগমার্কেটে একদিন বিকেলের দিকে কি একটা কাজে গিয়েছিলাম। বটুকের দোকান বন্ধ ছিল। পাশের দোকানদার জানিয়ে-ছিল—আজ দীর্ঘদিন বটুক দোকানে আসছে না। ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল ঠিকই, কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি। পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে ক'দিন ঐ বস্তীতে ছিল তার ভিতর বটুক

কোন ছবি আঁকেনি। বোধহয় মন বসাতে পারেনি। আর সে ওখানে রাতটুকুই থাকত শুধু। সকালবেলা উঠে চলে যেত ভবানীপুরে। নিজের বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা চায়ের দোকানে বসে থাকত সারাদিন। গগন বাড়ি থেকে আদৌ বার হত না। দৈনিক বাজারটা পর্যন্ত করত সুলেখা। দু-একবার বটুক তার পিছনে পিছনে ঘুরেছে। সুলেখা তাকে যেন চিনতেই পারেনি। আজকের কলকাতা শহর নয়। সে আমলে বাড়ির মেয়েরা জগুবাবুর বাজারে থলি-হাতে বাজার করতে আসার কথা কল্পনাই করতে পারত না। তাই ঐ বাঙালি মেয়েটাকে সকলেই চিনে ফেলেছিল। পথের মাঝখানে ওর সঙ্গে কথা বলতে সাহস পেত না বটুক। তবু একদিন সুযোগ বুঝে বাড়ির সামনেই বটুক সুলেখার হাত চেপে ধরেছিল। তাকে ক্ষমা করতে বলেছিল। সুলেখা শুধু হাতটা ছাড়িয়েই নেয়নি, বটুককে একটি চড়ও বসিয়ে দিয়েছিল। কোন কথা বলেনি সে।

এ সব কথা আমি জানতে পেরেছিলাম অনেক পরে। সুলেখার মৃত্যুর পরে। চিরকাল যেভাবে বিনিয়ে-বিনিয়ে গল্প করত বটুক সেইভাবেই শুনিয়েছিল আমাকে। দু চোখের জলে ভাসতে ভাসতে, শ্মশানঘাটে বসে। আমাদের চোখের সামনেই জ্বলছিল চিতাটা। ভবানীপুর অঞ্চলে কয়েকজন শ্মশানযাত্রীও ছিল। তারা বসেছিল একটু দূরে। ওখান থেকেই হতাশ-প্রেমিক বটুককে লক্ষ্য করছিল তারা। বটুকেশ্বরের কীর্তিকাহিনীর কথা জানতে বাকি ছিল না কারও।

ব্যাপারটা নিয়ে আমি পরে অনেক চিন্তা করেছি। কেন সুলেখা এমন কাণ্ডটা করল! গগ্যার প্রতি তার তীব্র ঘৃণা সত্ত্বেও কেমন করে সে তার কাছে ধরা দিল ; আর বটুকের প্রতি তার মমতা, তার ভালবাসা কিভাবে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গেল! বোধহয় ভুল বুঝেছিলাম আমরা, সুলেখা গগ্যাকে ঘৃণা কোনদিনই করেনি, করেছে ভয়। আর সেই আতঙ্কের উৎসমুখে ছিল সে নিজেই। অর্থাৎ সুলেখা গগ্যাকে ভয় করেনি, করেছে নিজেকে। আমরা তার মুখ ফিরিয়ে থাকাটা শুধু দেখেছি—কিন্তু সুলেখার অবচেতন মন জানত, কেন সে অমন প্রবলভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে চায়। চুম্বক যেমন জানে সমধর্মী চুম্বকের দিক থেকে ছিটকে সরে আসতে হবে তাকে—কারণ ঐ চুম্বকখণ্ডের বিপরীত

মেরুর আকর্ষণকে সে ভয় করে। গগ্যা যেমন তার নিশ্চিন্ত-নির্ভর পুরনো পল্টনের বাসা ছেড়ে অজানার আকর্ষণে একদিন ছুটে বেরিয়ে এসেছিল, সুলেখার অন্তরাত্মাও তেমনি কেন্দ্রাতীগ বেগে সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল। সুলেখা জানত, তার অতৃপ্ত কামনা-বাসনা—যা মিটিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল না বটুকের—একমাত্র তৃপ্ত হতে পারে ঐ লোমশ দানবটার কাছে। ঠিক সচেতনভাবে হয়তো জানত না ; কিন্তু সে এ সত্যটা প্রতি রোমকুপ দিয়ে অনুভব করেছিল নিজের অজান্তেই। তাই ঐ চুম্বককণ্ডের বিপরীত মেরুটাকে তার ভয়। তাই ও বারে বারে মুখ সরিয়ে নিয়েছে। গগনকে ভবানীপুরের বাসায় নিয়ে আসার প্রস্তাবে সে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু বটুক শোনেনি। গগ্যাকে বটুক ভয় পায়নি—বোকাটা শুধু সুলেখার বিকর্ষণী মনোভাবেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল। তারপর কখন কী ভাবে চুম্বকখণ্ডটা পাশ ফিরেছে জানা নেই। দক্ষ নার্সের মত নিরলস নিষ্ঠায় কাজ করে গেছে সুলেখা। ওর মুখের কাছে ধরেছে ফিডিং-কাপ, বাঁ হাতে হয়তো ওর মাথাটা চেপে ধরেছে বুকে। ওর লোমশ হাত-পা স্পঞ্জ করিয়ে দিয়েছে। জামা-কাপড় পালটে দিয়েছে। আঁচড়ে দিয়েছে ভিজে চুল, মুছিয়ে দিয়েছে দাড়ি। হয়তো সুলেখা নিজেও টের পায়নি, কখন সঙ্গোপনে ঐ চুম্বকখণ্ডের পাশ পরিবর্তন হল। কিন্তু তখন আর তার পালাবার পথ ছিল না। তখন সে নিরুপায়। সুলেখা তখন কামিনী নয়, কামনা!

সুলেখার মৃত্যুর কথাটা বলি।

তখনও ভাল করে সকাল হয়নি। আমি ঘুমোচ্ছিলাম। আমাকে ডেকে তোলা হল। নিচে কে ডাকছে। জরুরী ডাক। ডাক্তার মানুষের এসব বিড়ম্বনা নিত্য-কর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ভাবলাম আমার রুগীদের মধ্যে নিশ্চয় কারও নাভিশ্বাস উঠেছে। চটিটা পায়ে দিয়ে নিচে নেমে এসে দেখি, বটুক। বললে,—দীপু, সর্বনাশ হয়েছে! ও আত্মহত্যা করেছে!

তারপরে আরও কতকগুলো শব্দ ও বলে গেল। ওর ঠোঁট দুটিই নড়ছিল—কথা কিছু বার হয়নি। নিতান্ত একটা বোবা ভাঁড়ের মত সে হাত-পা নেড়ে কি একটা বোঝাতে চাইছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না। আমার হঠাৎ ভীষণ রাগ হল। ওর কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলি,—কী বলছিস আঁও আঁও করে? কী হয়েছে ঠিক করে বল! কে আত্মহত্যা করেছে?—যদিও আমি বুঝতে পেরেছিলাম কার কথা বলছে সে।

ও ধপ্ করে বসে পড়ে একখানা চেয়ারে। আমার বাহুল্য প্রশ্নটার জবাব সে দিল না। বললে,—কাল রাত্রে। গগ্যা কাল সকালেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে!

—কিভাবে আত্মহত্যা করেছে?

—বিষ খেয়ে!

—কতক্ষণ আগে মারা গেছে?

—না, মারা যায়নি, এখনও বেঁচে আছে!

—তাহলে পাগলের মত কী বকছিস এতক্ষণ? কোথায় আছে সে? ভবানীপুরে?

—না, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে।

—একটু বস্। আমি জামা-জুতো পরে আসি। ওখানকার সব ডাক্তারই আমার চেনা। দাঁড়া, গাড়িটা বার করি।

আমি জামা-জুতো পরে নিতে নিতেই বটুক দু-চারটে অসংলগ্ন কথা বলে গেল। যা থেকে মোটামুটি বুঝতে পারি—খবরটা প্রথম টের পায় দ্বিতলবাসী ভাড়াটে। কাল সকালে নাকি গগ্যা আর সুলেখা ঝগড়া করে। তারপর গগ্যা তার জামাকাপড় বেঁধে

নিয়ে কোথায় চলে যায়। সুলেখা রাতে একাই ছিল বাড়িতে। সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে। মাঝরাতে একটা গোঙানির শব্দ শুনে ওঁরা প্রতিবেশীদের ডেকে তোলেন। বটুক দরজা ভেঙে ফেলতে চায়—

—তুই ওখানে অত রাত্রে কোথা থেকে এলি?

—ঝগড়াটা কাল সকালে যখন হয় তখন আমি ঐ চায়ের দোকানেই ছিলাম। গগ্যা চলে গেল তা আমি দেখেছি। তারপর আমি গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ি···সুলেখা খুলে দেয়···আমাকে দেখে···থাক সে-কথা! মোট কথা আমি আর বরানগরে ফিরে যাইনি। ঐ চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চেই রাত্রিটা···

দরজা ভেঙে ওঁরা দেখতে পান যন্ত্রণায় সুলেখা কাতরাচ্ছে! খাটের উপর থেকে আধখানা দেহ ঝুলে পড়েছে তার। সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল সুলেখার। ওঁরা পাশের বাড়ি থেকে একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলেন। তখনই অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়া হল। সুলেখা বিষ খেয়েছিল। জিভটা তার বিশ্রীভাবে পুড়ে গেছে। কিন্তু তখনও সে কথা বলতে পারছিল।

—তোকে কিছু বললে?

বটুক মুখটা নিচু করে। তারপর আবার আমার মুখের দিকে তাকায়। বলে,—ও আমাকে চলে যেতে বললে! ডাক্তারবাবু আমাকে ওর সামনে থেকে সরে যেতে বললেন।···আমি বাইরের ঘরে সরে এলাম। অ্যাম্বুলেন্স যখন এল, তখন আমাকে ওরা রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকতে বলল। আমি রান্নাঘরে চলে গেলাম···

ইতিমধ্যে আমি তৈরী হয়ে নিয়েছি। প্রতিবেশীদের তাড়া খেয়ে বটুক কখন কোথায় লুকিয়ে ছিল শোনার ধৈর্য ছিল না আমার। বলি,—চল্, হাসপাতালে চল্।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের একটি কেবিনে সুলেখাকে রাখা হয়েছে। ওখানকার ডাক্তার-নার্স অনেকেই আমাকে চেনে। রোগীকে দেখতে কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু বটুককে ওরা কেবিনে যেতে দিল না। নার্স বললে,—ডাক্তারবাবুর বারণ আছে। ওঁকে দেখলেই উনি উত্তেজিত হয়ে উঠবেন।

বটুক ওয়ার্ড অ্যাটেণ্ডেন্টের টুলে বসল। বললে,—তুই বরং দেখে আয়। জিজ্ঞাসা করিস, গগ্যাকে দেখতে চায় কিনা। সে হতভাগা কোথায় তা অবশ্য জানি না ; কিন্তু লেখা যদি চায়...

আমরা এগিয়ে যাই। সুলেখার জ্ঞান ছিল। কথা বলছিল না। মুখটা পুড়ে গেছে। আমাকে দেখে চিনতে পারল। চোখ দুটি বন্ধ করল। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলি, —খুব কষ্ট হচ্ছে?

সুলেখা জবাব দিল না। ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আবার বলি,—বটুক এসেছে। বাইরে বসে আছে। তাকে ডাকব?

—না, না, না! আমাকে শান্তিতে মরতে দিন!

বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। নার্স বললে,—অক্সালিক অ্যাসিড। বাঁচবে না নিশ্চয়। তবে দু-তিন দিন বেঁচে থাকবেন বোধহয়। ডাক্তারবাবু বিকেলে আসবেন। পুরো ব্যাপারটা তখন এলে জানা যাবে।

জিজ্ঞাসা করলাম,—ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ কেন?

সিস্টার বললে,—কি জানি! ওঁর ডান হাতের তালুতে বিরাট একটা ফোস্কা পড়েছে। পুড়ে গেছে। কেমন করে জানি না। সে একটা মিস্ট্রি!

বলি,—অজ্ঞান হয়ে যাবার পর ওর হাতটা জ্বলন্ত কোন কিছুর উপর পড়েছে নিশ্চয়!

—না! যাঁরা ওঁকে রেসকিউ করেন তাঁরা বলেন, তেমন কোন জ্বলন্ত জিনিস ছিল না ওঁর হাতের কাছে-পিঠে! অজ্ঞানও উনি হননি!

এ রহস্যের সমাধান হয়নি। ও কি গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল? তাহলে সারা গায়ে আর কোথাও তো আগুন লাগেনি? শুধু হাতটা পুড়ল কেমন করে? যেন মনে হয়—সে হাতের তালুতে একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে মুঠা করেছিল ; অথবা প্রদীপের শিখায় পুরো এক মিনিট ধরে রেখেছিল হাতখানা। কেন? সুলেখা তার জবাবদিহি করে যায়নি।

কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতেই বটুক বললে, —ঘরে আর কে ছিল?

—আর কে থাকবে?

—তবে 'আমাকে শান্তিতে মরতে দিন' বলল কে?

সিস্টার বললে,—উনিই বলেছেন। ওঁর ভোকাল কর্ডটা জ্বলে গেছে কিনা, তাই স্বরটা আপনি চিনতে পারেননি!

বটুক শুধু বললে,—ও!

তৃতীয় দিনে সুলেখা মারা গেল। গগন কোথায় আমরা জানতাম না। তাকে খবর দেওয়ার উপায় ছিল না। খবর পেলেও সে আসত কিনা সন্দেহ। বটুকের স্ত্রীর পরিচয়ে হিন্দু মতেই ওর সৎকার হল। বটুকই মুখাগ্নি করল।

চিতায় জল ঢেলে দিয়ে বললাম,—চল্, আমার বাড়িতে চল্।

বটুক রাজী হল না। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সদর দরজার চাবিটা বার করে সে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বললে,—না, আমি বাড়ি যাব।

—আমি আসব তোর সঙ্গে?

—না, আমি একাই যেতে চাই। একটু একলা থাকতে চাই।

যোগেশ মিত্র রোডের মুখে ওকে নামিয়ে দিয়ে আমি ফিরে এলাম।

দিন-সাতেক পরে বটুক এসে আমার সঙ্গে একদিন সন্ধ্যায় দেখা করল। এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে সে। শ্মশান-বৈরাগ্যেই বোধহয়, মনের সাম্য ফিরে পেয়েছে। কথা বলল পরিষ্কারভাবে, অসংলগ্ন কাটা কাটা ভাষায় নয়। বললে, এতদিনে কলকাতার বাস তুলে দিয়ে সে দেশে ফিরে যাবে বলে স্থির করেছে। ওর বাবা এখনও জীবিত। তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। ও আশা করছে বাপ-মা ওকে ক্ষমা করবেন। দোকান সে বিক্রি করে দিয়েছে। ওর ছবি আর ফার্নিচার একটি নিলামওয়ালার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাকে বরিশালের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে বলেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম,—ছবিগুলো দিলি কেন?

—ছবি আঁকা ছেড়ে দিলাম যে! বাবার মহাজনী কারবার দেখব এবার থেকে।

অর্থাৎ আমার তিন আর্টিস্ট বন্ধুর একজনের মৃত্যু হল। চন্দ্রভান, গগ্যা আর বটুকেশ্বর—আমার তিন সহপাঠী বন্ধুই ছবি আঁকতে চেয়েছিল। চন্দ্রভান আর গগ্যা এখন কোথায় কি করছে জানি না ; কিন্তু আর্ট স্কুলের পাস করা বন্ধুটি এতদিনে খসে পড়ল এ প্রতিযোগিতা থেকে।

বটুক কাগজে-মোড়া একখানা ছবি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে,—এখানা তোর জন্যে এনেছি। এটা দেখলে আমার কথা মনে পড়বে।

ক্রুশবিদ্ধ যীশু! যেখানা বড়দিনে সে সুলেখাকে উপহার দিয়েছিল।

আমি বলি,—তোর নিলামদারের নাম-ঠিকানা বল্। আরও একখানা ছবি কিনতে হবে আমাকে—

—কোন্‌খানা? পূজারিণী?

—না। সেই 'ডাচেস-অফ-আলভার' পোজে আঁকা ছবিখানা। সেই বেনারসী পরে শুয়ে থাকা ছবিটা। যেটা প্রাইজ পেয়েছিল।

বটুক মুখটা নিচু করে আস্তে আস্তে বললে,—সেখানা নেই। নষ্ট করে ফেলেছি।

—নষ্ট করে ফেলেছিস? বলিস কি রে! কেন?

বটুক জবাব দিল না। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মনে হল সে কিছু একটা কথা বলতে চায় ; কিন্তু মনস্থির করে উঠতে পারছে না। তারপর সে বোকার মত হেসে উঠল।

—কি হল, হাসছিস যে?

—তুই রাগ করবি না বল্?

—রাগ করব কেন? কি করেছিস তুই?

—কাল গগ্যার ওখানে গিয়েছিলাম। ওর বরানগরের বস্তীতে।

শেষ বিদায় জানাতে এসেছে বটুক। না হলে আমি ওকে উঠতে বলতাম। এত কাণ্ডের পরেও বটুক যে বন্ধুকৃত্য করতে গগ্যার ওখানে যেতে পারে এ আমার সহ্য হচ্ছিল না। আমার দৃষ্টিতে কিছু একটা ছিল। তাই বটুক বললে,—তুই তো আগেই বলেছিস, আত্মসম্মানজ্ঞান বলে আমার কিছু নেই। তাহলে আজ আবার নতুন করে চটছিস কেন?

সেই চিরন্তন বিদূষক!

—গগ্যার কাছে কেন গিয়েছিলি? বিদায় জানাতে?

—না, ওর আঁকা একখানা ছবি ফেরত দিতে।

—ওর?

—হ্যাঁ। শোন তাহলে বলি।

বটুক অতঃপর একটা বিচিত্র কাহিনী শুনিয়েছিল আমাকে ঃ

শ্মশান থেকে ফেরার পথে সেদিন আমি যখন যোগেশ মিত্র রোডের মোড়ে বটুককে নামিয়ে দিয়ে গেলাম তখন বাড়ির দিকে যেতে ওর পা সরছিল না। কত দিনের কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার উপরের দিকে তাকায়। দ্বিতলে আলোগুলো নেবানো। দ্বিতলের ভাড়াটে নিশ্চয় কোথাও বেরিয়েছেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল তার—না হলে প্রতিবেশীর সান্ত্বনায় উত্যক্ত হতে হত ওকে। নিঃশব্দে তালা খুলে ঘরে ঢোকে। বাইরের ঘরে ঢোকে। বাতিটা জ্বালে না। যেন নিজের বাড়িতেই চুরি করতে ঢুকেছে—প্রতিবেশীরা যেন টের না পায়! দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়। ঘরে প্রতিটি আসবাবের অবস্থান তার মুখস্থ। রাস্তায় আবছা আলোয় অল্প অল্প নজর চলছে। বটুক ওর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে। এ-ঘরে পাশের বাড়ির থেকে আলো বেশ আসছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু। যেখানে যা ছিল সব আছে। বিশৃঙ্খলার আভাসমাত্র নেই। শুধু বিছানার চাদর এলোমেলো। কিন্তু ও কি? ওদের জোড়া খাটে তো দু-জোড়া বালিশ নেই! আলোটা জ্বেলে দেয় সে এবার। না। ওদের ডবল বেডের খাটে শুধু একটাই বালিশ! বটুক ছুটে এসে এবার বাইরের ঘরের আলোটা জ্বালে। কী আশ্চর্য! বাইরের ঘরের খাটে একটা বিছানা পাতা। বটুক বসে পড়ে খাটের প্রান্তে। কেন

এমন হল? ওরা কি ঝগড়া করেছিল? শেষ দিকে ওরা কি আলাদা বিছানায় শুতো? না কি বরাবর সুলেখা ও-ঘরে একলা শুয়েছে? সেটা অবিশ্বাস্য—তবু জলে-ডোবা মানুষ যেভাবে ভাসমান খড়কুটোর দিকে হাত বাড়ায় তেমনিভাবে বটুকের মনে হল—গগ্যা কোনদিনই ওর খাটে এসে শোয়নি। সুলেখা ঐ বর্বরটাকে ঢুকতেই দেয়নি ওদের শোবার ঘরে। আপন মনে হেসে ওঠে বটুক। খুশিয়াল হয়ে ওঠে।

আলনায় সুলেখার শাড়ি-সায়া-জ্যাকেট। জুতোর র‍্যাকে তার জুতো আর চটি। বটুক রান্নাঘরে গিয়ে একবার উঁকি মারল—বাসনপত্র সব সাজানো আছে। ঝি আসত বিকেল বেলায়। তাহলে সে-রাত্রে লেখা কিছুই খায়নি। না হলে এঁটো বাসনটা থাকত। রান্নাও হয়নি সেদিন। উনানে ছাই নেই। তার মানে শেষ দিনটা শুধু মনের সঙ্গে লড়াই করেছে সুলেখা। রান্না-খাওয়ার কথা মনেই আসেনি তার। আর কেমন করে তা আসবে? মৃত্যু যাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে তার কি রাঁধার কথা মনে থাকে?

হঠাৎ বটুকের নজরে পড়ল টেবিলের উপর একটা মোমবাতি খাড়া করে বসানো রয়েছে। মোম গলে গলে পড়েছে। ওদের বাড়িতে বিজলি বাতি আছে। শেষ দিন কি আলো ফিওজ করেছিল? না হলে মোমবাতি জ্বেলেছিল কেন সুলেখা? ঝুঁকে পড়ে দেখল মোমবাতির সলতেটা মোমের মধ্যে ঢুকে গেছে, সেটা থেঁতলে গেছে—যেন জ্বলন্ত অবস্থায় সেটা কেউ উপর থেকে চাপড় মেরে নিবিয়ে দিয়েছে। এ রহস্যের কোন কিনারা করতে পারল না বটুক।

আশ্চর্য, সবই আছে—কিন্তু সব কিছুই আজ নিরর্থক।

হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বটুক,—লেখা! লেখা!

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। দ্বিতলের বাসিন্দা বোধহয় ফিরলেন। চট করে বাতিটা নিবিয়ে দিল বটুক। ওঁরা উঠে গেলেন। বটুক আবার চলে আসে বাইরের ঘরে। এখন এ-ঘর ওর! কেউ বাধা দেবার নেই! কেউ এসে বলবে না—আর কত বেলা করবে, এবার ওঠ! স্নান করগে যাও! কেউ এসে ওর হাত থেকে তুলি কেড়ে নিয়ে ধমকাবে না—রাত কত হল খেয়াল আছে! চোখের মাথাটা না খেলেই নয়! —চোদ্দ বছর পর আজ সে একা!

ওপাশে থাক দিয়ে রাখা আছে ওর আঁকা ছবি। যীশুখ্রীষ্টের ছবির তলায় পোড়া ধূপকাঠি আর ছাই। হঠাৎ বটুকের নজর পড়ল ঘরের ও-প্রান্তে একটা বড় ক্যানভাসের দিকে। ছবিটা দেওয়ালে ঠেসান দেওয়া ; দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। বড় সাইজের ক্যানভাস। এতবড় ছবি কোনটা? ওর মনে পড়ে না। সে উঠে এসে ছবিটা তুলে বসিয়ে দেয় চৌকির প্রান্তে। একটু দূরে সরে গিয়ে তাকিয়ে দেখে।

তৎক্ষণাৎ বটুকের মাথার মধ্যে টলে উঠল। সুলেখা যেমন টলতে টলতে পড়ে যেত ফিট হবার সময় তেমনি করেই ও বসে পড়ে একটা চেয়ারে। একটা আর্ত চিৎকার তার কণ্ঠনালী বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসতে চায়—কিন্তু স্বর ফোটে না তার মুখে। ওর হাত-পা যেন অসাড় হয়ে যায়।

ওর থেকে হাত চারেক দূরে খাটের উপর খাড়া করে রাখা আছে একটা ক্যানভাস। এইমাত্র যেটা সে নিজেই বসিয়েছে। ছবিটা বটুকের আঁকা নয়। ছবিটা এ বাড়িতে ছিল না। ছবিটা একটা ন্যুড! যে পোজে সুলেখার ছবি এঁকে সে প্রাইজ পেয়েছিল অবিকল সেই ভঙ্গিমায় মেয়েটি শুয়ে আছে। শুধু কল্কাপাড় বেনারসী শাড়িখানা অন্তর্হিত! 'ডাচেস অফ আলভা' নয়—'লেখা, দি ন্যুড'!

হঠাৎ হিংস্র শ্বাপদের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। লেখা নেই, গগ্যা নেই, কিন্তু ঐ ছবিখানা আছে! ওর সমস্ত আক্রোশ ফেটে পড়ল ঐ ছবিখানার উপর। ঐ ক্যানভাসখানা ফালা ফালা করে ছিঁড়ে না ফেলা পর্যন্ত ওর অন্তরাত্মা শান্ত হবে না। ও হাত বাড়িয়ে ধারালো একটা কিছু খুঁজতে থাকে। ঐ নগ্নিকার নরম বুকের মাঝখানে ওকে এখনই বসিয়ে দিতে হবে তীক্ষ্ণ একটা শলাকা! সেই হবে ওর চরম প্রতিশোধ! বটুকের হাতে ঠেকল একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি। উন্মত্ত ঘাতকের মত সেখানা নিয়ে সে এগিয়ে এল—

দৃশ্যটার বর্ণনা করছিল বটুক আমার টেবিলের অপর প্রান্তে বসে। উত্তেজনায় সে থরথর করে কাঁপছিল। যেন সে-রাত্রে ঘটনাটা সে আবার সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করছে। যেন সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তার ব্যভিচারিণী স্ত্রীর নির্লজ্জ উলঙ্গ দেহটা। হঠাৎ সে আমার টেবিল থেকে তুলে নিল একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি। মুষ্টিবদ্ধ হাতটা ওঠালো—ঠিক যে ভঙ্গিতে বোধকরি সে সে-রাত্রে ঐ ছবিটার বুকে ছুরি বসিয়েছিল। তারপর ওর হাতটা আলগা হয়ে গেল। আমার টেবিলের উপর ঝন্‌ঝন্ করে ঝরে পড়ল ছুরিটা।

বিদূষক বটুকের অভিনয় নিখুঁত। আমি বলি,—তারপর?

—আমার হাতটা সেদিন অবশ হয়ে গেল দীপু। লেখার বুকের মাঝখানে ঐ তীক্ষ্ণ অস্ত্রটা বিঁধিয়ে দেবার জন্য আমি মুষ্টিবদ্ধ হাতটা তুললাম। আর ঠিক তখনই আমার নজরে পড়ল—

—কী?

—ছবিখানা!

—ছবিখানা? মানে?

—ইট ওয়াজ এ গ্রেট পীস্ অফ আর্ট!

দু হাতে মুখ ঢেকে বটুক বলে উঠল,—পারলাম না রে দীপু, কিছুতেই পারলাম না। সেই রাত্রেই চূড়ান্তভাবে হেরে গেলাম আমি গগ্যার কাছে। প্রতিশোধ নেওয়া হল না আমার। ন্যুড স্ট্যাডি তো কতই দেখেছি—কিন্তু একটা চরিত্রকে ছবির মাধ্যমে এমনভাবে প্রাণ পেয়ে উঠতে আমি কখনও দেখিনি। লেখা মরেনি। তার মৃত্যু নেই। ঐ ছবিখানার মধ্যে সে বেঁচে আছে। লেখাকে আমি নতুন করে চিনতে পারলাম। যে কথা গগ্যা মুখ ফুটে বলেনি, যে কথা লেখা স্বীকার করে যায়নি—ঐ ক্যানভাসটা আমাকে তাই জানিয়ে দিল। ওর রতিক্লান্ত অর্ধস্তিমিত চোখের তারা, ওর বাণীহীন ওষ্ঠাধর, ওর অনাবৃত যৌবনপুষ্ট দেহের প্রতিটি আনন্দঘন লোমকূপ যেন চিৎকার করে বলে উঠল—গগ্যার কাছে ও এমন কিছু পেয়েছে, যার স্বাদ সে বত্রিশ বছরেও জানত না! আমি আর্টিস্ট! আমার কাছে এ ছবি মৃত্যুঞ্জয়ী। এ আমি নষ্ট করতে পারি না!—কিন্তু আর্টিস্ট হলেও আমি তো মানুষ। কদাকার কুৎসিত হলেও আমি তো প্রেমিক। জানি না, কেন এ ছবিটা গগ্যা ফেলে রেখে গেছে ; কিন্তু ওটাকে যেমন নষ্ট করতে পারি না তেমনি ওটাকে সহ্যও করতে পারব না। কাকে দেব? ও ছবি যে আমার স্ত্রীর লাজবস্ত্র হরণ করেছে। তোকেও দিতে পারি না।

আমি বলি,—তাই বুঝি সেই ছবিখানা গগ্যাকে দিয়ে এলি?

—একমাত্র তাকে দেওয়া ছাড়া আর আমার কি উপায় ছিল বল্?

—গগ্যা কি বলল?

—বললে 'তুই এতদিনে একটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করতে যাচ্ছিস মট্‌কু। মহাজনী

কারবারে তোর পসার হবে!'

বটুক নির্বিকারভাবে বলেছিল কথাটা। কিন্তু আমার গালে সে যেন ঠাস্ করে একটা চড় মারল। গগ্যা তার দৈত্যের মত দেহটা নিয়ে যদি সেই মুহূর্তে আমার সামনে উপস্থিত হত তাহলে বটুকের হস্তচ্যুত ঐ পেন্সিল-কাটা ছুরিটা আমি বোধকরি আমূল বসিয়ে দিতাম তার চোখের মধ্যে! যে চোখ দিয়ে সে দেখেছিল—'লেখা, দি ন্যুড'!

বটুকের নিলামদারের কাছ থেকে 'পূজারিণী' ছবিখানা আমি নিলামে ডেকে কিনেছিলাম। তার পঁচিশ বছরের শিল্প-সাধনা কোন এক রবিবারে নিলামদারের মাধ্যমে মানুষের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। 'পূজারিণী'খানা কিনেছিলাম একশ' ষাট টাকায়। বড় দু-একটি ক্যানভাস আড়াইশ' টাকা পর্যন্ত দরে বিক্রি হয়। অভিমান করে রঙ-তুলি ছুঁড়ে ফেলে দিল বটুক, লেগে থাকলে আরও নাম করত সে।

বটুকের চিত্রসম্ভারের মধ্যে একখানার তলায় স্বাক্ষর ছিল 'জি. পি.'। সেটা বরানগরের সেই বস্তীর অয়েল কালারখানা। সেই নিচে সবুজ বাচ্চা, উপরে চিল, আর মাঝখানে মড়া-বেড়ালের ছানা! নিলামদার সেখানাও বটুকেশ্বর দেবনাথের আঁকা ছবি বলে দিব্যি চালিয়ে দিল। বিষয়বস্তুটা কী, তাই নিয়ে অনেক শিল্পরসিক নিজেদের মধ্যে গবেষণা করছিলেন। নিলামদার প্রারম্ভিক দর ধরেছে পঁচিশ টাকা। গগ্যার হাতে-আঁকা ছবি আমার কাছে একখানিও ছিল না। হাজার হোক সে আমার বাল্যবন্ধু!

বললাম,—খাঁ সাহেব, এ-ছবির নিচে জি. পি. সই কেন? বটুকেশ্বরবাবুর আর কোন ছবিতে তো এমন সই দেখিনি!

কথাটা খরিদ্দারদের অনেকের কানে যায়। সবাই সইটা লক্ষ্য করে দেখে। নিলামদার ভদ্রলোক আমার এ মন্তব্যে কিছুটা বিরক্ত হন। কিন্তু খরিদ্দার হচ্ছেন মা লক্ষ্মী, তার উপর রাগ করতে নেই। বলেন,—আজ্ঞে না স্যার, ওটা 'পি' নয়, 'ডি'। একটু কায়দা করে লেখা। আর্টিস্টিক স্টাইলে। ডি-এর বাঁকা লাইনটা খাড়া-লাইনের তিন পোয়া অংশে এসে লেগেছে। বটুকবাবুর ডাকনাম ছিল 'গোপাল'। তাই সই আছে জি. ডি.—গোপাল দেবনাথ। এটা নতুন ঢঙে এঁকেছেন বলে নতুন নামে এটাকে অভিষিক্ত করেছেন।

ওর কৈফিয়তে খরিদ্দারদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে। ছবিটা জাল—এমন একটা কথা উঠে পড়ে। একে তো স্বাক্ষরে গণ্ডগোল, তায় এটা বটুকেশ্বরের স্টাইলের সঙ্গে মিলছে না, এবং বিষয়বস্তুটা যে কী তাই ভাল বোঝা যাচ্ছে না। এ ছবির ডাক হল না। নিলামদার দাম কমিয়ে ধরলেন। তাও কেউ ডাকে না। শেষে আমি বলি যে,—খাঁ সাহেব, দশটা টাকা দিতে পারি। দেবে?

খাঁ-সাহেব রাজী হয়ে গেল। সেও বোধকরি বুঝতে পেরেছিল ছবিটা সাচ্চা নয়। জাল।

প্রায় বছর দুয়েক পরের কথা।

এ দু বছরের ভিতর আমার জীবনে গগন বা চন্দ্রভান কোন ছায়াপাত করেনি। ওদের খবরই জানতাম না। বরিশাল থেকে মাঝে মাঝে বটুকের চিঠি আসত। পাটোয়ারি ব্যবসা তার ভালই চলছে। একদিন আমার সঙ্গে ডাক্তারখানায় দেখা করতে এলেন এক ভদ্রলোক। বলিষ্ঠ সুগঠিত শরীর। যুবাপুরুষ। বলেন,—আমায় চিনতে পারলেন না দীপুদা? আমি সূরয!

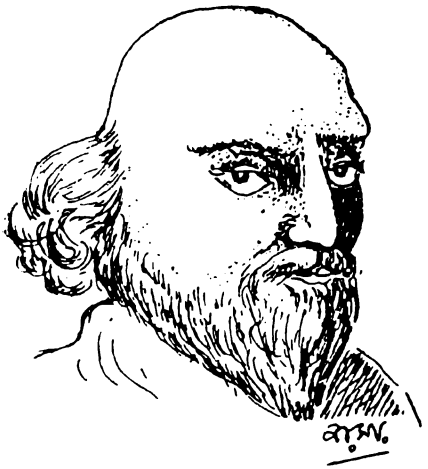

—আরে তাই তো? কত বড় হয়ে গেছ সূরয! কী খবর? কী করছ, কোথায় আছ?

সূরযভান তার সব খবর জানায়। দিল্লীতে কমিসেরিয়েটে চাকরি করে। প্রথম কলকাতাতেই চাকরিতে ঢুকেছিল। যে বছর মোহনবাগান শীল্ড পেল, সে বছরই ভারতের রাজধানী চলে গেল দিল্লীতে। সূরযও ঐ সময় দিল্লী চলে যায় বদলি হয়ে। সে আজ বছর পনের আগের কথা। ইতিমধ্যে প্রথম যুদ্ধ এসেছে এবং গেছে। সূরযের বয়স এখন বছর তেত্রিশ। বিবাহ করেনি। একাই আছে দিল্লীতে। পৈতৃক সম্পত্তি সে পায়নি। সে একা নয়, ওরা দু ভাই বঞ্চিত হয়েছিল পৈতৃক সম্পত্তি থেকে। কাকা একটি উইল বার করে তাঁর নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। উইলটা জাল কি সাচ্চা যাচাই করবার মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল না সূরযভানের। আর তার দাদা তো আগে থেকেই নেপথ্যে সরে গেছে। ফলে সূরয কোন দাবী করেনি ; নীরবে মেনে নিয়েছে দুর্ভাগ্যকে। দুঃখ নেই তার। নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে আবার।

জিজ্ঞাসা করি,—তোমার দাদা কোথায়?

—কলকাতাতেই আছে। সেই দাদার ব্যাপারেই এসেছি আপনার কাছে। দাদা আমার কাছে দিল্লীতে গিয়ে থাকতে চায় না। তাছাড়া—মানে, সে অনেক কথা। মোট কথা দাদা বরাবরই কলকাতাতেই আছে। একাই। আমিই মাসে মাসে তাকে খরচ পাঠাই। ও আপন মনে ছবি এঁকে যায় শুধু। দাদার ছবি এখনও লোক নেয়নি।

আবার প্রশ্ন করি, তোমার দাদা একা থাকে মানে? তোমার বউদি কোথায়?

—বৌদি দাদার কাছে থাকে না। দাদাকে ছেড়ে চলে গেছে।

একটু ইতস্ততঃ করে বলি,—তোমার বৌদিকে নিয়ে চন্দ্রভান বছর দুই আগে আমার কাছে এসেছিল,—তখন তাঁর সন্তান-সম্ভাবনা ছিল। বাচ্চাটা—

—হ্যাঁ, জানি। দাদা বলেছে। একটি মেয়ে হয়েছিল তাঁর।

—সুস্থ সবল?

—হ্যাঁ।

—ও! তারপর?

সূরযভান একটা সঙ্কোচকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে,—আপনাকে বরং খোলাখুলি সব কথা বলি। ডাক্তারের কাছে কোন কিছু গোপন করা ঠিক নয়। দাদা ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করেনি ; একসঙ্গে ওরা থাকত। মেয়েটি খুব ভাল ঘরের নয়। সে যাই হোক, সে দাদাকে ছেড়ে চলে গেছে। দাদা শ্যামবাজারের ওদিকে একাই থাকে। নিজে হাতে রান্না করে খায়। আপনার কাছে যে জন্য এসেছি তা এবার বলি। আজ মাস দুয়েক হল দাদার একটু মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এমনি ভালই থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে সে কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করে বসে। হঠাৎ ভীষণ উত্তেজনা অনুভব করে। তখন ও এমন সব কাজ করে বসে যার কোন মানে হয় না। ও নিজেই পরে অনুতপ্ত হয়। নিজের কাছে নিজেই কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারে না। গত এক বছরে এমন বার-তিনেক হয়েছে। প্রথমটা আমাকে সে কিছু জানায়নি। গোপন করতে চেয়েছিল ; কিন্তু এবার সে ভয় পেয়ে আমাকে জানায়। আমি ছুটি নিয়ে চলে এসেছি। আপনি একবার দাদাকে পরীক্ষা করে দেখবেন?

কি জবাব দেব বুঝে উঠতে পারি না। রতিজ রোগ থেকে মস্তিষ্ক-বিকৃতি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এসব কথা কি সূরযকে বলা উচিত? আবার গোপন করাও ঠিক নয় ; বস্তুত সেই তো এখন রোগীর গার্জেন। শেষে বলি,—সূরয, তোমার দাদার সঙ্গে বছর দুই আগে আমার একটা মনোমালিন্য ঘটেছিল—

—জানি, দাদা সব কথা বলেছে আমাকে। তাই তো সে আজ আমার সঙ্গে এল না।

—তুমি এক কাজ কর। আমি একজন ডাক্তারকে একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি প্রথমে তাঁকে দিয়ে চন্দ্রভানকে দেখাও। তারপর আমাকে রিপোর্টটা দেখিও। আমি পরবর্তী ব্যবস্থা করব।...আচ্ছা সূরয, একটা কথা বল তো! তোমাদের-বংশে কারও উপদংশ অথবা প্রমেহ অসুখ ছিল বলে শুনেছ?

—না। একথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

—মস্তিষ্ক-বিকৃতির কারণ হিসাবে বংশানুক্রমিক ইতিহাসটাও তো বিবেচনা করতে হয়।

সূরয দিন তিনেক পরে আমার নির্বাচিত ডাক্তারের রিপোর্ট নিয়ে এল। চন্দ্রভান কোন দৈহিক অসুখে ভুগছে না। তার ওজন কম, রক্তচাপ অস্বাভাবিক, অন্যান্য উপসর্গ নেই ; আর সবচেয়ে বড় কথা, যে অসুখের কথা আমি আশঙ্কা করেছিলাম সে অসুখ তার নেই, কখনও হয়নি।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

চন্দ্রভান কিন্তু কিছুতেই আমার কাছে আসতে রাজী হল না। অগত্যা সূরযকে সঙ্গে নিয়ে আমিই তার বাসায় গিয়েছিলাম। অভিমান করার হক্ আছে বইকি চন্দ্রভানের! অপমানটা তো সেদিন আমি কম করিনি!

শ্যামবাজার অঞ্চলে একটা এঁদোস্য-এঁদো কানা গলি। দুজন লোক পাশাপাশি চলতে পারে না। আগু-পিছু হাঁটতে হয়। তারই ভিতর একটা খোলার চালের ঘর। দু-অংশে ভাগ করা। ও-অংশে কতকগুলি মেহনতী মানুষের বাস। দিনের বেলায় কেউ ঠেলা চালায়, কেউ রিক্শা। কেউ বা ঝাঁকা নিয়ে চলে যায় শ্যামবাজার অথবা হাতিবাগানের বাজারে মোট বইতে। অপর অংশে বাস করে শিল্পী ভিন্সেন্ট ভান গর্গ। একটা চৌকি, খানকয় এনামেল আর অ্যালুমিনিয়ামের বাসন। একটা স্টোভ আর ইন্দুমাধব মল্লিক

মশায়ের নব-আবিষ্কৃত একটা অদ্ভুত যন্ত্র। ওতে নাকি একসঙ্গে ভাত-ডাল-আলুসেদ্ধ রান্না হয়ে যায়। আর আছে তার আঁকবার নানান সরঞ্জাম। রঙ, তুলি, ক্যানভাস। সে গৃহস্থালীর সঙ্গে তুলনা করা চলে একমাত্র বরানগরে দেখা গগ্যার ঘরখানার।

চন্দ্রভান কিন্তু আমাকে আদর করে বসালো। আমি প্রথমেই বললাম,—কিরে, রাগ করে আছিস নাকি?

ও পুরাতন প্রসঙ্গটাকে আমলই দিল না। বললে,—আয় আয়, বস!

চৌকির উপর তেলচিটে মাদুরটা পেতে দেয়।

চন্দ্রভানের চিকিৎসার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম আমি।

বন্ধুকৃত্য ছাড়া আরও দুটি কারণ ছিল সে সিদ্ধান্তের পিছনে। প্রথমত, কেমন একটা অপরাধ-বোধে অনুশোচনা জেগেছিল আমার। দু বছর আগে ওভাবে যদি আমি তাকে তাড়িয়ে না দিতাম, তাহলে হয়তো চন্দ্রভান এ রোগে পড়ত না। সকলের কাছ থেকে ক্রমাগত অপমান, আঘাত আর প্রত্যাখ্যান পেতে পেতে ও বোধহয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বসেছে। দু বছর আগে সে অনেক আশা নিয়ে তার পুরনো বন্ধুর কাছে এসেছিল একটু সহানুভূতির আশায়। সেখানে আবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে বসে থাকতে পারে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে আমি হয়তো ওর মানসিক ব্যাধির অন্যতম কারণ। দ্বিতীয়ত, আমার দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসাবে। ডক্টর মিসেস্ স্মিথ-এর রিপোর্টটার কথা আমি ভুলতে পারিনি। যার স্ত্রীর যৌনব্যাধি অমন শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল সে কেমন করে এমন সুস্থ সবল থাকল দৈহিক নিরিখে?

মনোবিজ্ঞানের চর্চা তখনও ভারতবর্ষে খুব ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি। গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের গবেষণাপ্রসূত জ্ঞান তখনও আমরা জানতাম না। কিছু কিছু আধুনিক বিলাতী ম্যাগাজিনে সাইকো-অ্যানালিসিসের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে জানা ছিল। দু-একজন চিকিৎসক এ নিয়ে পড়াশুনা করছেন, গবেষণা করছেন—কিন্তু তাঁদের সাহায্য পাওয়ার মত আর্থিক সামর্থ্য ছিল না আমার বন্ধুর। ও যে একজন মস্তবড় শিল্পী এমন ধারণা আমার আদৌ ছিল না, তবে ও যে আমার বন্ধু এ তো অস্বীকার করতে পারি না! তাই নিজেই যেটুকু সম্ভব তা করব বলে স্থির করি। মনের অসুখের বিষয়ে বই এনে পড়তে শুরু করলাম। একজন অস্ট্রিয়ান বৈজ্ঞানিকের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বই পেয়ে গেলাম লাইব্রেরীতে। বইটি সবেমাত্র ইংরাজিতে অনুবাদ করা হয়েছে। তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতির মূল কাঠামো এবং কয়েকটি কেস-হিস্ট্রিও লেখা আছে। বৈজ্ঞানিকের বয়স পঁয়ষট্টি, নাম দেখলাম সিগমুণ্ড ফ্রয়েড—চিকিৎসা-পদ্ধতির নাম সাইকো-অ্যানালিসিস। রাত জেগে পড়ে ফেললাম বইটা। স্থির করলাম, চন্দ্রভানই এ পদ্ধতিতে আমার প্রথম রোগী হবে। ফ্রয়েড নামধেয় ডাক্তার-সাহেব বলেছেন, মানসিক ব্যাধির মূল মানুষের অবচেতন মনে বাসা বাঁধে। কোন একটা গোপন কামনা তার অন্তস্তল কুরে কুরে খায়। রোগী যদি তার অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা অকপটে কোন বন্ধুর কাছে অথবা ডাক্তারের কাছে খুলে বলতে পারে তাহলে অনেক সময় তার রোগের নিরাময় হয়। সেকথা ফ্রয়েড-সাহেবকে বলতে হবে কেন? এ তো আমরাও জানি। মনের ভার নামিয়ে দেওয়ার একমাত্র উপায় কাউকে সব কথা খোলাখুলি বলে ফেলা। এ-ক্ষেত্রে সুবিধা এই—যে ডাক্তার সেই হচ্ছে ওর বাল্যবন্ধু। সুতরাং ও নিশ্চয় নিঃসঙ্কোচে সব কথা বলতে পারবে। আমাকে শুধু ধৈর্য

ধরে শুনতে হবে, ওকে উৎসাহিত করতে হবে, আগ্রহ দেখাতে হবে, সহানুভূতি জানাতে হবে।

সূরযভান আমার কাছে দাদাকে বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে ছুটির শেষে তার কর্মস্থলে ফিরে গেল। মাসান্তে সে মনি-অর্ডার করে দাদার সংসার-খরচ পাঠায়। চিকিৎসার যাবতীয় খরচ সে যোগাবে বলে প্রতিশ্রুত হল।

চন্দ্রভানের সঙ্গে নূতন করে বন্ধুত্ব হল। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সে আমার কাছে আসত। তার অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে যেত। তার গৃহত্যাগের কথা, বাওয়ালীতে আগমন, সেখানে ঊর্মিলা শারদাঁর প্রতি তার আকর্ষণ, তার ধর্মান্তর গ্রহণ। তারপর ধর্মপ্রচারক হিসাবে তার জোড়-জাঙ্গাল কোলিয়ারিতে আবির্ভাব, গীর্জার সংস্কার। যোসেফ মুর্মু—এককড়ি সরখেল—পাঁচু হালদারের দল জীবন্ত হয়ে উঠল আমার কাছে। ফাদার মার্লো, ব্রাদার দাভিদ অথবা নাথানিয়াল সাহেবদের আমি চোখ বুজলেই দেখতে পেতাম। তারপর সে এল পাঁচু হালদারের বোন-ঝির প্রসঙ্গে। এবার আর আমার নির্বাক শ্রোতা হয়ে থাকা সম্ভবপর হল না। বলি,—চিত্রলেখা! কেমন দেখতে মেয়েটা? তার বাপ-মা কোথায় গেল?

চন্দ্রভান জানায়, মেদিনীপুরে বন্যায় এক রাত্রে কিভাবে চিত্রলেখার বাপ-মা-ভাই ভেসে গিয়েছিল। চিত্রলেখার একটা নিখুঁত আলেখ্য আঁকল সে কথার জাল বুনে। একহারা লম্বা ছিপছিপে শ্যামলা মেয়ে, চোখ দুটি উজ্জ্বল, চিবুকটা নিখুঁত। আমি চিনতে পারলাম তাকে। বুঝতে পারি চন্দ্রভান ভুল বলছে—দামোদরের জলে ডুবে মরেনি ওর সেই চিত্রলেখা, মরেছে অক্সালিক অ্যাসিড খেয়ে। আমি নিজে হাতে তাকে পুড়িয়েছি কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে। সেকথা জানে না চন্দ্রভান। সেকথা আমিও জানাই না। কী লাভ ওকে নতুন করে আঘাত দিয়ে?

চন্দ্রভান বলে,—ঐ জোড়-জাঙ্গাল ছেড়ে আসার সময়েই আমার প্রথমবার অ্যাটাক হয়।

—অ্যাটাক হয়! কিসের অ্যাটাক?

—পাগলামির। একটা খণ্ডমুহূর্তে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি কী করছি তা আমি জানতাম না। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল আমার ডান হাতখানা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাকে শাস্তি দিতে হবে। কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম হাতটাকে। এই দেখ—সে প্রায়শ্চিত্ত আমার আজীবনের সঙ্গী হয়ে আছে।

ডান হাতখানা আলোর সামনে মেলে ধরে সে। হাতের তালুতে প্রকাণ্ড একটা পোড়া দাগ। বিধাতা ওর হাতে আয়ু-রেখা, ভাগ্য-রেখা, যশ-রেখা কী লিখেছিলেন তা আর কোনদিন পড়া যাবে না। বিধাতার দেওয়া সে হস্তরেখার সমস্ত চিহ্ন চন্দ্রভান পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। বিধাতাকে সে মানে না। বিধাতার দেওয়া হস্তরেখার নির্দেশও সে মানবে না। সে আপন দুর্ভাগ্য আপনি গড়ে তুলেছে অতঃপর। বললে,—মোমবাতির শিখায় আধ-মিনিট হাতখানা কেমন করে ধরে রেখেছিলাম আজও ভেবে পাই না! কিন্তু যতদূর মনে আছে আমি তখন একতিলও কাঁপিনি, যন্ত্রণায় একটি আর্তনাদও করিনি! আমি ঐ এক মিনিট ধরে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম!

এবার যে আমার পাগল হওয়ার পালা! ওর সে পাগলামির বর্ণনা শুনে মুহূর্তে আমার চোখের উপর থেকে একটা পর্দা সরে গেল। বহুদিনের একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বটুক বলেছিল বটে—যীশুখ্রীষ্টের ডান হাতের তালুতে পেরেকের দাগটার

বিষয়ে সুলেখার মনে একটা 'অবসেশান' ছিল। বটুকের ডান হাতের তালুতে একবার সামান্য একটু কেটে যাওয়ায় ফিট হয়ে গিয়েছিল সুলেখা। মনে পড়ল শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের সেই নার্সটির কথা—সুলেখার মূর্ছিত দেহের কাছে কোন প্রদীপ জ্বলছিল না। তবু তার হাতে একটা ফোস্কা হয়েছিল। চিত্রলেখা কি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে চন্দ্রভানের যন্ত্রণার অনুভূতিটাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল?

জোড়-জাঙ্গাল কলিয়ারি ছেড়ে আসার পরের ইতিহাসটা এবার সে বলতে শুরু করে।

সূরযভান তখন কলকাতার একটি মেসে থাকে। মাত্র উনিশ-কুড়ি বছর বয়স তখন তার। সবে চাকরিতে ঢুকেছে ম্যাট্রিক পাস করে। মেসে দাদাকে এনে তুলতে পারল না। বাধা ছিল। চন্দ্রভান খ্রীষ্টান, মেসবাবুরা সবাই হিন্দু। বাধ্য হয়ে চন্দ্রভান একটি ঘর ভাড়া নিল। প্রতিদিন অফিস ছুটির পর সূরয এসে দাদার খবরদারি করত। ক্রমে ওর হাতের ঘা সারল। চন্দ্রভান লেগে থাকল তার ছবি আঁকার সঙ্কল্পে। সূরয ছবির কিছুই বোঝে না ; কিন্তু ওর দৃঢ় ধারণা দাদার ছবি একদিন না একদিন সমাদর পাবেই। এর কিছুদিন পর সূরয বদলি হয়ে গেল দিল্লীতে। একা পড়ে গেল চন্দ্রভান। দিনরাত সে ছবি এঁকে বেড়ায়। ঘরে-বাইরে। দুজনের সঙ্গে তার পত্রালাপ চলত। চিঠি যেত দিল্লী-মুখো আর আসানসোল-মুখো। জবাব আসত সূরযের কাছ থেকে, আসত দেবনারায়ণবাবুর কাছ থেকে। সূরয অন্ধ বিশ্বাসে ওকে উৎসাহ যোগাতো, আর দেবনারায়ণবাবু ওকে যে আশীর্বাদ করতেন তার পিছনে থাকত দক্ষ শিল্পীর ধ্যান-ধারণা।

ল্যাণ্ড স্কেপ আর স্টিল-লাইফ আঁকার দিকে ঝোঁক। মানুষজনের কিছু কিছু স্কেচ করেছে, পেনসিলে বা ক্রেয়নে। পোর্ট্রেট আঁকবার সুযোগ কই? কে ওর জন্য ধৈর্য ধরে সময় নষ্ট করবে? জোড়-জাঙ্গালের মালকাটারা তবু ওর খেয়াল চরিতার্থ করবার সুযোগ দিত। হাজার হোক সে ওদের ফাদারদা। কলকাতা শহর সে হিসাবে নিতান্ত উদাসীন। কাজের চাকায় বাঁধা এর লক্ষ-বাসিন্দা।

এই সময় আরও একটা ধারণা অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে শিল্পীর মনে। তার মনে হত যে জগৎটা সে দেখতে পাচ্ছে সেটা সত্য নয়। এ যেন প্রেক্ষাগৃহের সামনে প্রলম্বিত একটা প্রকাণ্ড যবনিকা। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের চিত্র-বিচিত্র করা ঐ পর্দাটা টাঙানো আছে চোখের সামনে, কারণ দর্শকদের কে যেন আড়াল করে রাখতে চায় ভিতরের গোপন আয়োজন থেকে। ঐ পর্দাটা যখন উঠে যাবে তখন শুরু হবে আসল অভিনয়। ভিন্সেন্ট তার ক্যানভাসে পথ-ঘাট, গাছ-পালা আঁকে কিন্তু তার মন ভরে না ; তার মনে হয়—এহ বাহ্য। ঐ পথ যেন কী একটা কথা বলতে চায়, ঐ গাছ যেন তার প্রাণের কথা শোনাতে চায়—ঐ বর্ষণোন্মুখ মেঘ, ঐ সান্ধ্য আকাশের অন্তরবিচ্ছটার যেন আরও কিছু বক্তব্য আছে—কিন্তু তারা সে কথা বলতে পারছে না। ওর ক্যানভাসে সেই গোপন কথা ফুটে উঠছে না। দৃশ্যমান জগতের অন্তরের নিবিড় বাণী যদি তার ক্যানভাস মূর্ত না হয়ে ওঠে তবে আর কী ছবি আঁকল সে? সেটা তো ফটোগ্রাফ!

আর সৃষ্টির সবচেয়ে বড় রহস্য—মানুষ! তার সামনে যে আবার ডবল পর্দা! সে কথা বলে মনের ভাব ব্যক্ত করতে নয়, গোপন করতে! সে হাসে—কান্না লুকোতে! সে কাঁদে—ধরা পড়ে যাবার ভয়! তার উপর সে চড়িয়েছে আবরণ। শুধু মন নয়, দেহের উপরেও টেনে দিয়েছে পর্দা! ভিন্সেন্ট ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছে—কিন্তু বাইবেল-বর্ণিত ঈশ্বর ও-ভুল করেননি। তিনি আদিম আদম আর ঈভকে অনাবৃত রেখেছিলেন। তাই

রেনেসাঁসযুগের শিল্প-ঋষির দল টেনে খুলে ফেলেছিলেন ঐ নির্মোক!

চন্দ্রভান স্থির করল—তাকে ন্যুড স্টাডি করতে হবে।

কিন্তু কে সিটিং দেবে? কে বসবে ঐ নিলর্জ্জ ভঙ্গিতে?

রঙ-তুলি-ক্যানভাস নিয়ে চন্দ্রভান অবশেষে অবতীর্ণ হল রূপোপজীবিনীদের পাড়ায়।

দুঃসাহস বলতে হবে! কিন্তু দুঃসাহসে ভিন্সেন্ট কোনদিনই বা পিছ-পাও হয়েছে? সে নীতি মানে না, ধর্ম মানে না, ঈশ্বর মানে না। মানে বিবেক। সেই বিবেকের নির্দেশে সে এসে হাজির হল দেহের তীর্থে!

পাৎলুন আর হাফসার্ট পরা অদ্ভুতদর্শন মানুষটাকে দেখে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল ওরা। সরু গলি। আধো-আলো আধো-অন্ধকার। ডিমের ডালনা না কাঁকড়ার তরকারি কিসের একটা উৎকট রসুন-মিশ্রিত গন্ধের সঙ্গে মিশেছে বেলফুলের সৌরভ। খোলা দরজার ওপাশে একটা জোরালো বাতি—তারই এক প্রস্থ আলো আছাড় খেয়ে পড়েছে গলি-পথটায়। নেপথ্যে হারমনিয়াম তবলা সহযোগে ভেসে আসছে আবহ-গজল। দেওয়াল-সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে সাত-আটটি মেয়ে। মাথায় বেলফুলের মালা, চোখে কাজল—চড়া রঙের রুজ মেখেছে গালে। কপালে কাঁচ পোকার টিপ। সদর দ্বারের কাছে ঐ খোঁচাখোঁচা দাড়িওয়ালা বিচিত্র জীবটাকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ওরা এ-ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে হাসতে হাসতে। কে একজন বলে,—কি গো ভাল্ মানুষের পো? ভির্মি যাবে নাকি?

পিছন থেকে বর্ষীয়সী একজন স্থূলকায়া রমণী ওদের ধমক দিয়ে ওঠে,—কী ছেনালি করিস তোরা? আসতে দে না ওরে! পথ আটকে আছিস কেন?

সামনের মুখরা মেয়েটি বলে ওঠে,—ওমা, কি যে বল মাসি? পথ আটকাবো কোন্ দুঃখে গো? কারে নজরে ধরল তা তো ও বলবে? না কি ও তোমার কাছেই যেতে চায়?

আবার খিল্ খিল্ হাসি।

ভিন্সেন্ট অপ্রস্তুত হয়নি মোটেই। ইতিমধ্যে তার নজর পড়েছিল আর একদিকে। ভীড়ের পিছনে দেওয়াল-সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। মধ্যবয়স্কা। উৎকট প্রসাধন করেছে সে। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। কিন্তু মেয়েটি মাতৃত্বের ভারে আনত! ভিন্সেন্ট তৎক্ষণাৎ মনস্থির করে ফেলে। জীবন রহস্যের মর্ম উদ্‌ঘাটনে সে অভিযাত্রী—আর জীবন-রহস্যের মূল তো সৃষ্টি-তত্ত্বে! এই পঙ্কিল দুনিয়ার পঙ্কিলতম অন্ধকারে পিতৃ-পরিচয়হীন যে শিশু আবির্ভাবের জন্য প্রহর গুনছে—আঁকতে হয় তারই মায়ের ছবি আঁকবে ভিন্সেন্ট! ঐ অনাগত শিশুর সম্মুখেও মাতৃজঠরের আবরণ—কিন্তু নিরাবরণ জননীতত্ত্বের ছবিই বা কে কবে এঁকেছে? ভিন্সেন্ট মনে মনে তার চিত্র-অভিজ্ঞতার পাতা উল্টে যায়। প্রাচ্য বা প্রতীচ্য—কে কবে নিরাবরণা মাতৃত্বের ছবি এঁকেছে? ন্যুড স্টাডি হাজার বছর ধরে করেছে শিল্পীদল ; কিন্তু সেখানে বিষয়বস্তু—নারী, জননী নয়! কেন? শিল্পীর চক্ষে কি এতাবৎকাল স্ফীতোদর জননীর চিত্রটা সুন্দর মনে হয়নি? সত্য কি সুন্দর নয়? সৃষ্টিই কি সত্য নয়? সুন্দর নয়? মুহূর্তমধ্যে মনস্থির করে ভিন্সেন্ট ; ভীড় ডিঙিয়ে ঐ মেয়েটিকে প্রশ্ন করে,—তোমার ঘর কোন্‌টা?

—ওমা আমি কোথায় যাব! তা হ্যাঁগা ভাল্ মানুষের পো! ওর মুখখানাই শুধু দেখলে তুমি—কোঁচড়ে যে মুড়ির মোয়ার পুঁটুলি বেঁধেছে সেটা নজর হল নি?

—তুই চুপ যা দেখি চামেলি! ধমকে ওঠে বর্ষীয়সী বাড়ি-উলি। এগিয়ে এসে সে

ভিন্সেন্টের হাতখানা ধরে, বলে,—তুমি ভিতরে এস বাছা ; নইলে অরা তোমারে ছিঁড়ে খাবে!

ভিন্সেন্টকে বাড়ি-উলি মাসি হাত ধরে ভিতরে নিয়ে যায়। তাকে বসিয়ে দেয় একটা ঘরে। এটা বোধহয় মাসির নিজস্ব ঘর। বলে,—কিছু মনে কর না ভাই। নতুন যারা আসে তাদের নিয়ে ওরা এমনি মশ্‌করা করে। কিন্তু তাও বলি ভাই—তুমি ঠিক বুদ্ধির পরিচয় দাওনি।

তারপর মুখটা কানের কাছে এনে বলে,—বুঝতে পারনি তুমি? ওর বাচ্চা হবে!

—তাহলে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

—কোথায় যাবে বল ভাই? ঐ তো এক অন্ধকূপ কুটুরি! সাঁঝের বেলা একটু নিঃশ্বাস নিতে দাঁড়ায় ওখানে! ও কি এখন লোক বসাতে পারে?

ভিন্সেন্ট কি একটা কথা বলতে যায় ; কিন্তু তার আগেই দ্বারের কাছে এসে কে ডাকে,—মাসি!

—কি রে?

মাসি দ্বারের কাছে সরে আসে। আগন্তুক সেই আসন্নজননী মেয়েটি। সে নিম্নস্বরে কি বললে তা শোনা গেল না ; কিন্তু মাসির আপত্তিটা শোনা গেল। মাসি কিছুতেই রাজী হতে চায় না। শেষ পর্যন্ত সে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে। ভিন্সেন্টকে বলে,—কি জানি বাপু! ও আবাগিরও দেখি তোমারে মনে ধরেছে। তা বেশ। তিন ট্যাকা লাগবে বাপু। দু-ট্যাকা অর, এক ট্যাকা আমার! প্রথম দিন, কম করেই ধরলাম। আর শোনো—

মুখটা কানের কাছে এনে ভিন্সেন্টকে একটু সাবধান করে দেয়। দু-একটা উপদেশ দেয়। ভিন্সেন্টের খরগোশের মত খাড়া কান দুটো লাল হয়ে ওঠে।

ছোট্ট ঘর। সেখানে ঘর জোড়া চৌকি। পরিষ্কার বিছানা পাতা তাতে। নরম গদি। দুটি বালিশ। দেওয়ালে কালীঘাটের একটি পট। অন্নপূর্ণা ভিক্ষা দিচ্ছেন ভোলানাথকে। কুলুঙ্গিতে একটি লক্ষ্মীর পট। কাল বৃহস্পতিবার গেছে। ফুলের মালাটা পটের উপর এখনও শুকিয়ে যায়নি। দেওয়ালে টাঙানো একটা হাত-আয়না। কোণায় একটা হাতলহীন চেয়ার। ভিন্সেন্ট চেয়ারে গিয়ে বসল। মেয়েটিও ঢুকেছে ঘরে।

ভিন্সেন্ট তখনও মুখ তুলে মেয়েটিকে ভাল করে দেখেনি। কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে সে রঙ-তুলি-ক্যানভাস বার করতে থাকে। ঘরে আলো বড় কম। বললে,—একটা ভাল লণ্ঠন আনতে পার?

মেয়েটি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল এবং একটা লণ্ঠন এনে নামিয়ে রাখে মেঝেতে। ভিন্সেন্ট সেটা ঠিক করে বসিয়ে দিল। মেয়েটি দরজাটায় খিল এঁটে চুপচাপ গিয়ে বসল খাটের উপর। এবার মুখ তুলে ভিন্সেন্ট দেখে মেয়েটি ওকে অবাক দৃষ্টিতে দেখছে! চোখাচোখি হতেই চম্‌কে ওঠে ভিন্সেন্ট। ঐ রূপোপজীবিনীকে সে আগে কখনও দেখেছে? চেনা চেনা লাগছে কেন ওকে? না! মেয়েটি তার পূর্ব-পরিচিত হতেই পারে না। এ পাড়ায় সে কখনও আসেনি। কত বয়স হবে ওর। উত্তীর্ণ-যৌবনা বলা যায় না তাকে। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। মুখে বসন্তের দাগ। মাথায় বেলফুল জড়ানো খোঁপা। গায়ে সস্তা ব্রোকেডের জ্যাকেট। পরনে হলুদ রঙের তাঁতের শাড়ি। দু-হাতে দুটি গিল্টি-করা বালা, কানে পিতলের ঝুমকো দুল।

ভিন্সেন্ট হঠাৎ বলে বসে,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কতক্ষণ থাকতে দেবে আমাকে?

মেয়েটি মুখ নিচু করে বলে, আপনার যতক্ষণ ইচ্ছে। ভাল লাগ্‌লি তামাম রাত!

—ও আচ্ছা! তবে তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। শোন আমি তোমাকে কোন কষ্ট দেব না। তুমি খাটে শুয়ে থাকবে, আমি তোমার একখানা ছবি আঁকব শুধু। যে ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকতে তোমার অসুবিধে হবে না সেভাবে শুয়ে পড়।

মেয়েটি বোধহয় ওর কথাগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সে ডাগর চোখ মেলে শুধু তাকিয়েই থাকে।

কী আশ্চর্য! ওকে এত চেনা-চেনা লাগছে কেন? ঐ রকম মুখ সে কোথায় দেখেছে? বত্তিচেল্লি-পেরুজিনো-করেজ্‌জো? না হোলবাইন-ব্রখেল-ফ্র্যাঞ্জ হ্যালস? না কি আরও পরের যুগের দেলাক্রোয়ে-মানে-এদ্‌গার-দেগা-রেনোয়াঁ? কোন এক দিকপাল শিল্পী নিশ্চয় ঐ রকম একখানা মুখের ছবি এঁকেছিলেন—সেই ছবি-দেখার স্মৃতিটাই ওকে এই বিভ্রমের মধ্যে ফেলছে—মনে হচ্ছে ওকে আগেও দেখেছি।

—ছবি আঁকবেন? অস্ফুটে প্রশ্ন করে মেয়েটি।

বেশ্যাপল্লীতেও ভদ্রতার এই রীতি নাকি? দেহদানের পূর্ব-মুহূর্তেও অপরিচিত পুরুষকে 'আপনি' সম্বোধন!

—হ্যাঁ। শুয়ে পড় তুমি। ছবিই আঁকব তোমার।

তারপর ইতস্তত করে বলে,—ভেবেছিলাম ন্যুড-স্টাডি করব ; কিন্তু থাক, তোমার অসুবিধা হবে।

—কি করবেন?

—ও কিছু নয়, থাক।

—শুব?

—হ্যাঁ, তাই তো বলছি তখন থেকে।

—জামা-কাপড় খুলবনি?

—খুলবে? বেশ, তাই কর।

চেয়ারটা অন্যদিকে সরিয়ে ভিন্সেন্ট দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। উপায় নেই। এতটুকু ঘরে স্থানান্তরে সে যাবে কোথায়? কোন ভদ্রমহিলা বেশ পরিবর্তন করতে চাইলে যেটুকু শালীনতা বজায় রাখতে হয় সেটুকু রাখতেই বেচারির কপালে ঘাম ফুটে ওঠে।

দীর্ঘ তিন ঘন্টা ধরে পোর্ট্রেটখানা আঁকল ভিন্সেন্ট। মেয়েটি ওর দিকে ফিরেই শুয়েছিল। হাতখানা আলো আড়াল করতে রেখেছিল চোখের উপর। ভিন্সেন্ট ছবি আঁকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। ঘন্টা তিনেক পরে ও বললে অনেক কষ্ট দিলাম তোমাকে। এবার জামা-কাপড় পরে নাও। আমার ছবি শেষ হয়ে গেছে।

আবার পিছন ফিরে বসে। মেয়েটি তার পরিধেয় বস্ত্রটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলে,—ই-চাক্‌সায় আপনি এই পেরথম আসিছেন, লয়?

ভিন্সেন্ট জবাব দেয় না। পকেট থেকে তিনটি টাকা বার করে সে রাখে খাটের উপর। বলে,—এবার যাই আমি?

মেয়েটি চট করে উঠে দাঁড়ায়। ভিন্সেন্টের হাতখানা চেপে ধরে। গুঁজে দেয় টাকা তিনটে। সে নেবে না ওর দান। ভিন্সেন্ট চম্‌কে ওঠে। এতক্ষণ স্পর্শ বাঁচিয়ে চলছিল সে। হাতখানা চেপে ধরায় বিব্রত বোধ করে। হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে ; কিন্তু মেয়েটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে রাখে তাকে। বলে,—হাই বাবা গ! তুমি আমারে চিনতে

লারলেক ফাদারদা?

অবাক বিস্ময়ে এবার তাকিয়ে থাকে ভিন্সেন্ট। বিস্মৃতির যবনিকা উঠে যায় তার চোখের উপর থেকে। কী আশ্চর্য! একে চিনতে পারেনি সে? বলে,—তুই? বাতাসী?

বারবনিতারও তা হলে লজ্জা থাকে? দু হাতে মুখ ঢেকে বাতাসী বলে, হাই!

—তুই এখানে কেমন করে এলি? মুখে ওসব কি দাগ? বসন্ত হয়েছিল তোর? এ কী চেহারা করেছিস?

বাতাসী ওকে ছাড়ে না। অনেক, অনেক কথা জমে আছে ওর পেটে। ভিন্সেন্ট জোড়-জাঙাল কোলিয়ারি ছেড়ে আসার পর কত কথা! দূরন্ত মারীরোগে মরতে বসেছিল সে। কিন্তু যম তাকে নিল না—ফিরিয়ে দিল। মরল মুর্মুর মেয়েটা। মুখে বিশ্রী দাগ, চুল উঠে গেছে। বাতাসী উঠে বসল অসুখ থেকে—কিন্তু জোড়-জাঙালে তার মন বসল না। নানুক চলে গেছে। যোসেফের মেয়েটাও থাকল না। শুনল তাদের ফাদারদাও কোথায় চলে গেছে। আর চ্যাতরা দিদিমণি? সেও ডুবে মরেছে। দামোদর খেয়েছে তার বাপকে, মাকে, ভাইকে। সেই দামোদরই জুড়িয়েছে চ্যাতরা দিদিমণির জ্বালা। তারপর অনেক ঘাট ঘুরে বাতাসী এসে পড়েছে এখানে। মাসি তাকে ঠাঁই দিয়েছে। তার উপার্জনের এক-তৃতীয়াংশ চুক্তিতে তাকে খেতে দেয়, পরতে দেয়, থাকতে দেয়। কত মানুষ দেখেছে বাতাসী—কত বিচিত্র মানুষ! গরীব গুর্বো, হঠাৎ বড়লোক, বাবু মশাইরা—বাঙালি-বিহারী-মাড়োয়ারী, মায় কাবুলিওয়ালা! বহুভোগ্যা বাতাসী আজও বেঁচে আছে। বসন্তের দাগ? ও-সব ওরা দেখে না। ওরা যা চায় তার সম্বল আজও নিঃস্ব হয়ে যায়নি বাতাসীর। যেদিন তা ফুরাবে? সেদিন ভিক্ষে করতে বসবে।

সে-রাত্রে ভিন্সেন্ট আর বাড়ি ফেরেনি। সারা রাত ছিল ওখানে।

তার পর থেকে সে প্রায়ই যেত ওখানে। বাতাসীর কাছে। ওর ভাল লাগত বাতাসীকে। অন্তত কথা বলার লোক তো পেল এতদিনে। মাঝে মাঝে খরচ করতে হত—না হলে মাসির রসনা মুখর হয়ে উঠবে। ভিন্সেন্ট বাতাসীর অনেক ছবি আঁকল। কিন্তু শুধু ছবি এঁকে ওর তৃপ্তি নেই। নতুন চিন্তা ঢুকেছে তার মাথায়। এভাবে বাতাসীকে সে মরতে দেবে না।

বাতাসী রাজী হয়ে গেল। মাসির সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে একদিন বের হয়ে এল ঐ নরককুণ্ড থেকে। এসে উঠল ভিন্সেন্টের এক-কামরার ঘরে। নূতন পরীক্ষায় মেতেছে ভিন্সেন্ট। মাসান্তে সে যে কটা টাকা পায়, সমঝে চললে তা থেকে দুজনে আধ-পেঠা খেয়ে বাঁচতে পারে। তারপর যদি দু-একখানা ছবি বেচতে পারে তখন আর তাকে পায় কে? সংসারধর্ম তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। বাতাসীই তার সহধর্মিণী। বাতাসী তাকে বুঝেছে। তাকে স্নেহের চোখে, শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে। বাতাসী রান্না করতে পারে, ঘরদোর গুছিয়ে রাখতে জানে। ওর এক-কামরার গৃহস্থালী নূতন রূপ নিল। প্রতিবেশীরা সব সাড়ে-বত্রিশ ভাজা। রিকসা-আলা ঠেলাওয়ালা ভাজিওয়ালা। তারা নাক গলাতে এল না। বাতাসী হল এ গৃহের ঘরণী। সমস্ত কথা খোলাখুলি লিখে জানালো সূরযকে। সে যখন চিঠির জবাব দিল তখন এ-প্রসঙ্গের উচ্চ্যবাচ্য পর্যন্ত করল না।

বাতাসীর মাসির পরামর্শ ছিল বাচ্চাটাকে পৃথিবীর মুখ দেখতে না দেওয়া ; কিন্তু ভিন্সেন্ট কিছুতেই রাজী হল না। পাখি-পড়া করে সে বাতাসীকে বোঝালো। শেষে বাতাসী রাজী হল ডাক্তারের কাছে যেতে। ঐ সময়েই সে দীপু-ডাক্তারের কাছে আসে। কিন্তু ওর বাল্যবন্ধুও ওকে দরজা থেকে হাঁকিয়ে দিল। তা দিক—জাগতিক বিধান কারও

নীতিবাক্যে থেমে থাকে না। যথাসময়ে বাতাসীর একটি কন্যা-সন্তান হয়েছিল। ভিন্সেন্টের সে কী আনন্দ। কে মেয়ের বাপ তা বাতাসী জানে না। কিন্তু পিতৃপরিচয়হীন অনেক মহাপুরুষই তো অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন দুনিয়ায়। ভিন্সেন্টই বেশি মাতাল মেয়েকে নিয়ে।

একেবারে নির্ভেজাল আনন্দ কিছু নেই এ দুনিয়ায়। দেবনারায়ণবাবু ওর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। তিনি কি কারণে কলকাতায় এসেছিলেন। ঠিকানা খুঁজে ভিন্সেন্টের বাসায় এসে মর্মাহত হয়েছিলেন। ভিন্সেন্ট মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেনি। স্বীকার করেছিল, বাতাসী তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়। দেবনারায়ণবাবু তৎক্ষণাৎ চলে গিয়েছিলেন। ত্যাগ করেছিলেন শিষ্যকে।

সূরযভান কিন্তু ওকে ত্যাগ করেনি। প্রতি মাসে দাদাকে মনিঅর্ডার করে গেছে। জানতে চেয়েছে সে নূতন কি আঁকল। সকল আঘাত সইতে প্রস্তুত ছিল ভিন্সেন্ট। বাতাসীকে সে বিবাহ করতে চেয়েছিল। রাজী হয়নি বাতাসী। বলে—কী বুলছিস রে তুই? বেবুশ্যের কি বিয়া হয়?

কে বোঝাবে ওকে? ভিন্সেন্ট অনেক কথা বলেছে। সমাজতত্ত্বের কথা, দেশ-বিদেশের নরনারীর সম্পর্কের কথা, দেশাচার ভেদে বিবাহের নিয়মাবলী কেমনভাবে বদলায় ; কিন্তু বাতাসী ওসব কথায় কর্ণপাত করে না। বলে,—তু কি পাগল হয়ে গেলি ফাদারদা? চ্যাতরা দিদিমণি তুরে কেনে বিয়া করতে লারলেক, সি কথাটো বুঝা মোরে।

বিচিত্র যুক্তি বাতাসীর। চ্যাতরা দিদিমণি লেখাপড়াজানা ভদ্র ঘরের মেয়ে। এমন অশুচি অবস্থায় বিবাহ যদি বিধিসম্মত হত তা হলে কেন চ্যাতরা দামোদরে ডুবে মরতে যাবে? ফাদারদা তো তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। চ্যাতরা দিদিমণি যে ফাদারদাকে ভালবেসেছিল এটুকুও কি বোঝেনি বাতাসী? তাহলে? বাধা তো ঐখানে। ফাদারদা আর চ্যাতরা দিদিমণির মাঝখানে সেদিন মূর্তিমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল লম্পট নাথানিয়েল। এই যদি সত্য হয়, তাহলে এবার? ঐ ফাদারদা আর বাতাসীর মাঝখানে আছে কয়েকশ' মূর্তিমান বাধা—বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতের। বাঙালি-বিহারী-মারোয়াড়ী-পাঞ্জাবী, মায় কাবুলিওয়ালা। না, না, ছি ছি!

ঈশ্বর না মানো, না-ই মানলে—একটা কিছু মানতে হবেই। তাকে ভাগ্যই বল, নিয়তিই বল, আর যাই বল। না হলে চন্দ্রভানের পিছনে অতন্দ্রভাবে কে এমন করে লেগে আছে? সে যা কিছুতে হাত দেয় তাই ছাই হয়ে যায়। সারা জীবনে কোথাও সে সফল হতে পারল না। বাতাসীকে নিয়ে এই অদ্ভুত পরীক্ষাতেও শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল তাকে। কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! বাতাসী এখানে টিকতে পারল না। ভিন্সেন্টের অভাবের সংসার—নুন আনতে পান্তা ফুরায় ; কিন্তু বাতাসী কিছু রূপার চামচ-মুখে জন্মায়নি। অভাব কাকে বলে বাতাসী তা ভাল মতই জানে। সেজন্য তো নয়। তাহলে কেন? বোধহয় অমিতাচারেই বাতাসী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল—সাত্ত্বিক জীবন-যাত্রা সহ্য হল না তার।

প্রথম প্রথম এ-পাড়ায় এসে বাতাসী আদপেই বাড়ির বার হতে চাইত না। নেহাৎ পথে নামতে হলে এক-গলা ঘোমটা দিত। তার জীবনে যে অসংখ্য পুরুষ এসেছে তাদের কাছ থেকে ও আত্মগোপন করতে চাইত। পথে-ঘাটে কেউ যেন না হঠাৎ বলে বসে,—আরে, বাতাসী যে!

কিন্তু শেষদিকে সে বেপরোয়া হয়ে পড়ল। ভিন্সেন্ট বেরিয়ে গেলে মেয়ে কোলে

নিয়ে সেও কোথায় বেরিয়ে যেত। ভিন্সেন্ট টের পেত, প্রশ্ন করত—কিন্তু বাতাসী কোথায় যায় তা বলে না। একদিন ভিন্সেন্ট বলে বসল,—তুমি কি মদের নেশায় বাড়ির বাইরে যাও বাতাসী? তার প্রয়োজন কি? তুমি বাড়িতে বসেই খেও!

—ঈ বাবা গ! কী বলছিস্ তু? মদ আমি খাই না গ!

ডাহা মিথ্যে কথা। জোড়-জাঙালেও বাতাসী হাঁড়িয়া খেত, বেশ্যাপল্লীতেও নিশ্চয় খেয়েছে। অথচ এখন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন মদ কাকে বলে সে জানেই না!

বাতাসী যে কোথায় যায় তা টের পাওয়া গেল অচিরেই। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে ভিন্সেন্ট দেখে বাড়িউলি বসে আছে তার ঘরে। বাতাসী স্টোভে খাবার করছে। সুজির মোহনভোগ। বাতাসী পয়সা পেল কোথায়? না কি মাসিই সুজি আর চিনি কিনে দিয়েছে? ভিন্সেন্টের মুখটা কালো হয়ে ওঠে। বাতাসী যদি তার ঐ জীবনকে একেবারে না মুছে ফেলতে পারে তবে কোনদিনই তার পরীক্ষা সাফল্যলাভ করবে না।

—এস জামাই। বস। আহা, সারাদিনমানে মুখখানা যে রাঙা হয়ে গেছে গো!

ভিন্সেন্ট জবাব দেয় না। খুকিকে কোলে তুলে নিয়ে পার্কের দিকে চলে যায়।

এই নিয়েই বিবাদ। ভিন্সেন্টের স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও মাসি এ বাড়িতে ঘন-ঘন আসতে শুরু করল। শেষে সে অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসা আরম্ভ করে। কখনও ময়না, কখনও চাঁপা, কখনও পদ্ম। ভিন্সেন্ট ওদের চেনে। সে মনে মনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা ভদ্রপল্লী। বাতাসীর বিষয়ে কেউ কৌতূহলী হয়নি। তার সাজ-পোশাক সে পাল্‌টে ফেলেছিল এ পাড়ায় এসে ; কিন্তু ওদের যে দেখলেই চেনা যায়!

ভিন্সেন্ট বাতাসীকে বললে,—তুমি কি চাও স্পষ্ট করে বল তো? আমি কিন্তু বেঁধে রাখিনি তোমাকে। এখানে যদি ভাল না লাগে তুমি সোজাসুজি ও পাড়ায় চলে যাও। এ রকম দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলতে পারবে না।

—কী করলাম আমি? হাই বাবা গ! ধমকাইছ কেনে?

—তোমাকে বারণ করেছি তবু তুমি ওদের এখানে কেন নিয়ে আসছ?

—উরা আমারে এত বছর খাওয়াইলেক, দেখ-ভাল করলেক, সিটি কি ভুলি যাব?

—হ্যাঁ, ভুলে যাবে। ওরা খেতে দিয়েছে, পরতে দিয়েছে—তুমিও গতরে খেটে শোধ দিয়েছ। সে সব চুকে-বুকে গেছে। আর ভুলতে যদি না পার তো স্পষ্টাস্পষ্টি সেখানে চলে যাও। এ অধ্যায়টা ভুলে যেও।

—আমারে তাড়াই দিছিস ফাদারদা?

হঠাৎ চমকে ওঠে ভিন্সেন্ট ওর সম্বোধনে। তাই তো! ও এখনও বাতাসীর ফাদারদা। দেড় বছর সে বাতাসীর সঙ্গে ঘর করছে—তবু সে আজও আছে তার সম্মানের উচ্চ আসনে। এক ঘরে দুজনে রাত কাটায়। বাতাসীর একাধিক ন্যুড স্টাডি এঁকেছে সে—তবু বাতাসীর চোখে আজও ভিন্সেন্ট—ফাদারদা! ফাদার অথবা দাদা!

—কথা বলছিস না কেনে রে, তাড়ায়ে দিছিস?

—তাড়িয়ে আমি দিচ্ছি না, তুই আমাকে ছেড়ে যাচ্ছিস বাতাসী?

এবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে প্রায়-প্রৌঢ় বাতাসী। ভিন্সেন্ট কি বুঝবে বাতাসীর যন্ত্রণা? আপনভোলা উদাসীন মানুষটার সংসারের কোন খোঁজ রাখে? সব কিছু বাতাসীর হাতে তুলে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। এতদিন ধরে সে মেতে আছে তার রঙ-তুলি নিয়ে। সারাটা দিনভর বাইরে বাইরে ছবি এঁকে বেড়ায়, ঘরে ফিরলে মেয়েকে নিয়ে পড়ে। এক বছরের মেয়েটার সঙ্গে তখন তার কত গল্প, কত আলাপ! কিন্তু

বাতাসী? তাকে এই হালভাঙা পালছেঁড়া নৌকোটাকে বেয়ে নিয়ে যেতে হয় এক মাস-পয়লার ঘাট থেকে পরের মাসের মাস-পয়লায়। সূরযভানের মাসিক বরাদ্দ আছে অপরিবর্তিত। অথচ সংসারে মানুষ এক থেকে দুই হল, তারপর দুই থেকে আড়াই। কিন্তু বাঁধা-বরাদ্দ অপরিবর্তিত। একদিকে এই অবস্থা, অপরদিকে বাড়িউলি মাসির ক্রমাগত প্রলোভন! আকৈশোর যে-জীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে আছে সেই জীবনের ডাক শুনতে পেত—চামেলি, চাঁপা, ময়নাদের কণ্ঠে! মনকে শক্ত করত বাতাসী—না, সে ঐ জীবনে আর ফিরে যাবে না। কিন্তু মন কি কারও পোষা পাখী? আর পাখীও তো শিকল কেটে পালায়? ভিন্সেন্টের চোখ এড়িয়ে দু-পাঁচ টাকা রোজগার শুরু করতে বাধ্য হল বাতাসী। না হলে তিনজনকেই উপোস করে থাকতে হত! এমন সরল আত্মভোলা মানুষটা—সে ভেবে দেখল না, কিভাবে সংসারটা চলছে!

আকৈশোর পুরুষের সোহাগ পেয়েছে বাতাসী—কিন্তু সত্যিকারের স্নেহ ভালবাসা কাকে বলে তা জানত না। সে অভিজ্ঞতাটাই কি কম? একটা আত্মভোলা মানুষের জন্য ঘুম-ঘুম চোখে ভাত আগলে বসে থাকার যে আনন্দ সেটা সে কবে পেয়েছে? নিজের পাতের মাছখানা হাতসাফাই করে ওর পাতে চালান করে দিয়ে, নিজের ভাতের থালা ওর পাতে ঢেলে দিয়ে উপবাসে থাকার যে কষ্ট, সে আনন্দ সে কবে পেয়েছে? এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব জীবনমাধুর্য! এটাকেও বাতাসী ছাড়তে চায়নি। তাই এতদিন দু-নৌকোয় পা দিয়ে সে চলেছিল কোনক্রমে। আজ ধরা পড়ে গেল নাকি?

ভিন্সেন্ট তাগাদা দেয়,—কই, জবাব দিলি নে যে? আমি তোকে তাড়িয়ে দিচ্ছি, না তুই আমাকে ছেড়ে যাচ্ছিস?

—আমি কেনে যাব? টুক বাইরে না গেলি চলবে কেম্‌নে, বল কেনে?

—কেন? সংসার তো চলছে। উপোস তো করতে হচ্ছে না কাউকে। সেদিন তো সুজি করলি ; ভাতের পাতে আজকাল তো মাছও দিচ্ছিস?

বাতাসী অশ্রুসিক্ত মুখটা তুলে বলে,—তুরে কেম্‌নে বুঝাই ফাদারদা? কী বুলব তুকে?

বিদ্যুদ্‌স্পৃষ্টের মত চমকে ওঠে ভিন্সেন্ট। তাই তো! বাতাসী আসার আগে তার সংসার চলতে চাইত না। মাসের বিশ তারিখের পর তাকে একবেলা আহার বন্ধ করতে হত। মাসের শেষ, তিন-চারটে দিন ঐ একবেলাও সে অর্ধাহারে থাকত। পরের মাসে ডাকের গণ্ডগোলে মনি-অর্ডার আসতে দেরি হলে মাস-পয়লার প্রথম কদিন উপবাসেও থাকতে হয়েছে। কিন্তু কই, গত এক বছর ধরে এমন অবস্থা তো একবারও হয়নি! অথচ সংসারে মানুষ বেড়েছে। তার একটিমাত্র অর্থই হয়। বাতাসী উপার্জন করছে! তাই মাঝে-মাঝে বাড়িউলি-মাসি আসে এখানে! তাই মাঝে মাঝে বাতাসী কোথায় যেন চলে যায়! একটা তীব্র আত্মগ্লানিতে ওর সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে। সে অশক্ত, অসহায়, উপার্জনহীন! তাই বাতাসী—

ভিন্সেন্ট বসে পড়ে চৌকির প্রান্তে। ক্লান্তভাবে বলে,—কতদিন এভাবে দেহ বেচে আমাকে খাওয়াচ্ছিস বাতাসী?

—ঈ বাবা গ! আমি কেনে খাওয়াব তুকে? ভগবান খাওয়ায়—

—চুপ কর! ভগবান নেই!

—ঈ কথাটো তু বুললি ফাদারদা! তু?

—হ্যাঁ, বললাম। শোন! ও-ভাবে তোকে রোজগার করতে হবে না। দরকার হয়

আমরা তিনজনেই উপোস করব। বুঝলি?

বাতাসী তর্ক করে না। ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। মেনে নেয়। এবার ভিন্সেন্ট সজাগ হয়েছে। সে টের পায় বাতাসী তার পথ পরিবর্তন করেনি। এখন আর লুকোছাপার প্রয়োজন বোধ করে না। চক্ষুলজ্জাটা ঘুচে গেছে। সন্ধ্যাবেলা ভিন্সেন্ট ঘরে ফিরে এলে মেয়েকে তার কাছে বসিয়ে দিয়ে বলে,—অ্যারে টুক রাখ দিকিন ফাদারদা। আমি টুক ঘুর‍্যা আসি।

তার শাড়ি জ্যাকেটের পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে রাত গভীরে। ভিন্সেন্টের হৃৎপিণ্ডটা কে যেন পিষতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত সে বাধ্য হয়ে বিদায় দিল বাতাসীকে। প্রায় দু বছর ঘর করার পর। হ্যাঁ, তাড়িয়েই দিল। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ভেসে গেল বাতাসী—ফিরে গেল তার অভ্যস্ত জীবনে। রূপোপজীবিনীর উপার্জনে জীবনধারণের গ্লানি সহ্য করতে পারল না ভিন্সেন্ট। ছবি তার কেউ কেনে না। বহু চেষ্টা সে করেছে। দোকানে দিয়েছে, বাড়ি বাড়ি ফেরি করেছে, হেদোর ধারে ছবি টাঙিয়ে অপেক্ষা করছে—কেউ ফিরে তাকায়নি। দু-পাঁচ টাকা দিয়েও কেউ একখানা ছবিও নেয়নি। আর্ট-এক্‌জিবিশানের কর্মকর্তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে—লাভ হয়নি। একবারও তার কোন ছবি নির্বাচিত হয়নি। কিন্তু অন্য কোন জীবিকার কথা তার মনে আসেনি। সূরয তাকে চাকরির সন্ধান দিয়েছিল—ও সেখানে চেষ্টাই করেনি। পাশেই আছে এক চানাচুরওয়ালা। মাঝে সে অসুস্থ হয়ে দেশে চলে যায়। ভিন্সেন্টকে বলেছিল ঝাঁকাটা নিয়ে সে ফেরি করতে পারে। ভিন্সেন্ট রাজী হয়নি। আত্মসম্মানে লেগেছে বলে নয়—তার দৃঢ় বিশ্বাস সে ও-সব কাজ করার জন্য পৃথিবীতে আসেনি। সে শিল্পী, সে আর্টিস্ট। আজ পৃথিবী তাকে যতই অসম্মান করুক, একদিন কড়া-ক্রান্তিতে সব শোধ দিতে হবে। আজকের এই উপেক্ষিত, অবহেলিত, অনাহার-ক্লিষ্ট ভিন্সেন্ট হয়তো সেদিন থাকবে না—কিন্তু এ একেবারে ধ্রুব সত্য যে, পৃথিবীকে একদিন নতমস্তকে সলজ্জে স্বীকার করতে হবে—পৃথিবীরই ভুল হয়েছিল, ভিন্সেন্ট ভান গর্গকে সে চিনতে পারেনি। বলতে হবে—ভিন্সেন্ট যা সৃষ্টি করে গেছে তা মহত্তম শিল্প! কিন্তু সে কবে? কোন্ অনাগত প্রভাতে?

বাতাসী চলে গেল। আবার নিঃসঙ্গ জীবন। আবার ইক্-মিক্-কুকার! আবার একা!

মাঝে মাঝে পুরনো কথা মনে হয়। ঊর্মিলা এ জীবন সহ্য করতে পারত না। ঊর্মিলা তার জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়ায়নি, ভালই করেছে। কিন্তু চিত্রলেখা? সে কি ভিন্সেন্টের সঙ্গে এ দুঃখীর জীবন ভাগ করে নিতে পারত না? হয়তো একটু মানসিক শান্তি পেলে, একটু দৈহিক আরাম পেলে ও এতটা ব্যর্থ হত না। বাতাসী ওকে ভাতের থালা, কাচা কাপড় আর পাতা বিছানা জুগিয়েছে—দু বছর শান্তিতে রেখেছে। তাতেই অনেকটা তৃপ্তি পেয়েছে ভিন্সেন্ট। কিন্তু চিত্রলেখা তাকে আরও কিছু বেশি দিতে পারত। চিত্রলেখার বাবা ছিলেন স্কুল-মাস্টার—সে লেখাপড়া জানা মেয়ে। সে উৎসাহ দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে হয়তো ওকে গড়ে তুলতে পারত সার্থক শিল্পীরূপে। বাতাসী শিল্পীর মডেল হতে পারে, জীবনসঙ্গিনী হতে পারে না—সে উপাদানে বাতাসীকে গড়েননি সৃষ্টিকর্তা। চিত্রলেখা হয়তো পারত। চিত্রলেখা কখনও এভাবে তাকে ফেলে পালাত না। বাতাসীর মত নেমকহারামের মত।

নেকহারাম? কিন্তু বাতাসী কি সত্যিই অকৃতজ্ঞ? কেন সে পারল না এই নতুন জীবনকে স্বীকার করে নিতে? নিদারুণ দারিদ্র্যই কি তার একমাত্র কারণ? ভিন্সেন্ট যদি

দু-চারখানা ছবি বিক্রি করতে পারত—তাহলে কি বাতাসী উপেক্ষা করতে পারত বাড়িউলি-মাসির আকর্ষণ? হয়তো না। উচ্ছৃঙ্খলতা তার রক্তের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। আকৈশোর সে পুরুষমানুষের সংস্পর্শে এসেছে—প্রায় বিশ বছরের অভ্যাস। রাতারাতি তা কি ত্যাগ করা যায়? আর তাছাড়া—?

হ্যাঁ, আরও একটি নিদারুণ হেতু অনস্বীকার্য! ভিন্সেন্ট বাতাসীকে উদ্ধার করেছে, আশ্রয় দিয়েছে। প্রতি মাসে মনি-অর্ডারের টাকা ওর হাতে ফেলে দিয়েছে, হিসাব চায়নি। এক ঘরে রাত্রিবাস করেছে, এক শয্যায় শুয়েছে, অসংখ্য ছবি এঁকেছে। কিন্তু—তবু একটা প্রকাণ্ড 'কিন্তু' রয়ে গেছে। বাতাসীর নারীত্বকে সে স্বীকার করে নেয়নি। বাতাসীর চোখে ভিন্সেন্ট এক আত্মভোলা আর্টিস্ট! এক বিচিত্র জীব! পুরুষমানুষ নয়! বাতাসীর চোখে সে—ফাদারদা!

হয়তো এটাই সহ্য হল না উত্তীর্ণ-যৌবনা মেয়েটির। এতে সে অভ্যস্ত নয়। সে হেরে গেছে। নত মস্তকে যে ফিরে গেল সে বাতাসী নয়—অবমানিতা নারীত্ব!

প্রায় মাসখানেক ধরে চন্দ্রভান তার অতীত জীবনের কাহিনী শোনালো আমাকে। তিল তিল করে মনের ভার লাঘব করল। আমি ওকে হাওয়া-বদল করার পরামর্শ দিলাম। কলকাতার ঐ অন্ধগলির কুঠুরি ঘরে সে মনমরা হয়ে আছে ; ও-পাড়ায় তার পরিচিত প্রতিবেশী এমন কেউ নেই যার সঙ্গে বসে ও দুটো মনের কথা বলতে পারে। নূতন পরিবেশে নূতন পরিচয় হতে পারে। আমার একজন পয়সাওয়ালা ক্লায়েন্টের এক-খানি বাড়ি ছিল রাঁচিতে। সখ করে বানানো বাড়ি—শীতকালে বা পূজার সময় মাঝে-মধ্যে কর্তারা বেড়াতে যান। তাছাড়া তালাবন্ধই পড়ে থাকে বাড়িটা মালির হেপাজতে। ভাড়া দেওয়া হয় না। ভদ্রলোক আমাকে বহুবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর বাড়িতে কিছুদিন গিয়ে বেড়িয়ে আসার জন্য। ডাক্তারী ছেড়ে একবারও আমার যাওয়া হয়নি। সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে গেল। তাছাড়া রাঁচিতে আমার এক বন্ধু আছেন, ডক্টর ডেভিডসন—আমার সহপাঠী ; বিলাতী খেতাব নিয়ে এসে রাঁচিতে বসেছেন। ডক্টর ডেভিডসন মনস্তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ওখানে একটা উন্মাদাশ্রম তৈরী হচ্ছে। ডেভিডসন তার পরিচালক। এঁদের দুজনের সঙ্গে ব্যবস্থা করলাম। বস্তুত ভিন্সেন্টের অসুখের জন্য আমি নিজেকে পরোক্ষভাবে দায়ী করেছিলাম। ভিন্সেন্ট রোগমুক্ত না হলে আমার মনটা শান্ত হবে না। ওর ইতিহাস শুনে সহানুভূতিও জেগেছিল। ভিন্সেন্ট এ প্রস্তাবে রাজী হল। রাঁচির প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম। বিহার প্রদেশের শীতকালীন রাজধানী। ভিন্সেন্ট বললে, এবার সে ল্যাণ্ডস্কেপ ধরবে। রঙ-তুলি-ক্যানভাস তাকে কিনে দিলাম এবং একদিন রাঁচির গাড়িতে তাকে তুলে দিয়ে এলাম।

রাঁচি পৌঁছে ভিন্সেন্ট চিঠি দিল। জায়গাটা তার পছন্দ হয়েছে। বাড়িটাও। মালি সরযূপ্রসাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে। মালির বউদি ওকে দুবলো দুটি রেঁধে দেয়। একেবারে ঝাড়া হাত-পা হয়ে ভিন্সেন্ট দিবারাত্র ছবি এঁকে বেড়াচ্ছে। শীত শেষ। রাঁচি বেশ ফাঁকা ফাঁকা। চেঞ্জারদের ভীড় নেই। দু-চারজন প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সবাই অবাঙালী, স্থানীয় লোক। ডক্টর ডেভিডসনের সঙ্গেও দেখা করে এসেছে। অমায়িক ভদ্রলোক। ওকে পরীক্ষা করেছেন, দেখেছেন, বলেছেন মনের আনন্দে ছবি এঁকে যান। শরীর খারাপ বোধ হলেই খবর দেবেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ভিন্সেন্ট লম্বা লম্বা চিঠি লিখত। কখনও খামের ভিতর দু-একটা স্কেচ। আমি ওর উৎসাহটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাঝে মাঝে পোস্টকার্ডে জবাব দিতাম। সূরযের চিঠিও সে নিয়মিত পায়,

টাকাও আসে যথারীতি।

ভিন্সেন্ট প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে যায় তার রঙ-তুলি-ক্যানভাস নিয়ে। কোন কোনদিন দুপুরে ফেরে না। সন্ধ্যায় এসে মধ্যাহ্ন আহার করে। প্রতিবেশীরা দু-দিনেই চিনে ফেলল এই তসবিরওয়ালা বাবুকে। ওদের বাড়ির মালি সরযূপ্রসাদের দাদাও থাকে এই বাড়ির চৌহদ্দিতে। এ-বাড়ির আউট-হাউসে। রঘুবীরপ্রসাদ সরকারী চাকুরে। স্থানীয় পোস্ট-অফিসের ডাক-পিয়ন। ওরা জাতে কাহার। লিখাপড়ি শিখে ডাক-পিয়নের কাজ পেয়েছে। দু ভাই এ বাড়ি পাহারা দেয়। রঘুবীর নিজেই ভিন্সেন্টের সঙ্গে আলাপ করে গেল মনি-অর্ডার দিতে এসে। তারপর কারণে-অকারণে অনেকবার এসেছে। এমনকি ওকে ধরে নিয়ে গেছে নিজের খাপরা-টালির ছাপরায়। চারপাই বার করে বসতে দিয়েছে। রঘুবীরের স্ত্রী একগলা ঘোমটা দিয়ে কখনও এগিয়ে দিয়েছে মোষের দুধের চা, কখনও ঘরে করা লেট্টি। মোটা মোটা রুলি-পরা দুটি হাত সর্বদাই কর্মরত। এই মেয়েটিই ওর রান্না করে দেয়। ওদের সকলের কাছেই ভিন্সেন্ট একটা বিস্ময়। রঘুবীর, তার স্ত্রী, ছেলে ভগলু ও ভাই সরযূপ্রসাদ অবাক হয়ে দেখত তসবিরবাবুর কাণ্ডকারখানা। আজব মানুষ। সবচেয়ে উৎসাহ ভগলুর। বছর তের-চোদ্দ বয়স। প্রাণ-চঞ্চল কিশোর। দিবারাত্র তসবিরবাবুর সঙ্গে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াত। ভিন্সেন্ট যখন রঘুবীরের একখানি তৈলচিত্র আঁকার প্রস্তাব করল তখন রঘুর মুখখানা দেখবার মত। সযত্ন বিন্যস্ত দাড়ি দু ফাঁক করে গালপাট্টার আকারে সাজালো। গায়ে চড়ালো সরকারী কোট, পিতলের তকমা আঁটা সরকারী নীল পগ্‌গ চড়াল মাথায়। ছবিখানা দেখে ওরা মুগ্ধ হয়ে গেল। হুবহু রঘুবীর! তাই দেখে ভগলুও বায়না ধরল। সেও তসবির আঁকাবে। ভিন্সেন্টও পিছ-পা নয়—আঁকল তাও।

মাস দুয়েক বেশ সুখেই ছিল। আপনমনে ছবি এঁকে বেড়িয়েছে। ইতিমধ্যে একবারও তার মানসিক উত্তেজনা বা অবসাদ কিছু হয়নি। ডেভিডসনের সঙ্গে দেখা করায় তিনি বলেছিলেন—যতদিন কোন অসুবিধা না হচ্ছে ততদিন ও-কথা মনে রাখবেন না, আমার সঙ্গে দেখা করতেও আসবেন না। আপনার বাড়ির চাকরকে বলে রাখবেন, প্রয়োজন বুঝলেই যেন আমাকে খবর দেয়। এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেই আপনার মনে পড়ে যাবে অসুস্থতার কথা। সেটা আপনি ভুলে থাকুন, এটাই আমি চাই।

ভিন্সেন্ট মেনে নিয়েছে সে আদেশ। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ঐ উন্মাদ-আশ্রমটা সে দেখতে চায়নি। ওখানে কারা থাকে, কেমনভাবে থাকে তা দেখার জন্য কৌতূহল ছিল—ভয়ও ছিল। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মত সে-সব কথা সে ভুলে থাকতে চেয়েছে।

বেশ চলছিল, হঠাৎ ভিন্সেন্ট লিখল এক বিচিত্র সংবাদ। লিখেছে—গগনকে মনে আছে নিশ্চয়? গগন পাল। ম্যাট্রিক ফেল করে সেই তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তুই শুনলে অবাক হয়ে যাবি, সেও সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে ছবি আঁকা ধরেছে। ঠিক আমারই মতন। তার অবস্থা নাকি আমার চেয়েও খারাপ। আমার তবু সূরয আছে। তার কেউ নেই। বর্তমানে কপর্দকশূন্য। নিতান্ত ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে সূরযের দেখা হয়ে যায় একদিন ট্রেনে। বিনা টিকিটে যাচ্ছিল বলে ওকে রেলপুলিসে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। সূরয চিনতে পেরে ওকে উদ্ধার করেছে। গগন দিল্লীতে আছে।

খবরটা পেয়ে আমি বিচলিত বোধ করি। গগনের ইতিহাসটা ভিন্সেন্টকে বলা হয়নি। ইচ্ছা করেই বলিনি। স্থির করলাম সূরযভানকে চিঠি লিখে সাবধান করে দিতে হবে। কিন্তু তার আগেই এল ভিন্সেন্টের দ্বিতীয় পত্র। সূরয নাকি তার দাদাকে লিখেছে সে

গগনকে টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দেবে। গগনও আপাতত রাঁচিতে এসে থাকবে। আমার বন্ধুর নিশ্চয় এতে আপত্তি হবে না। ওরা দুজনে মিলে এবার ছবি আঁকবে। সূরযের ইতিমধ্যে পদোন্নতি হয়েছে—সে ওর মাসোহারাটাও বাড়িয়ে দিতে রাজী।

আমার বন্ধুর আপত্তি হওয়ার কথা নয়। আপত্তি ছিল আমার নিজেরই। গগন আর ভিন্সেন্ট দুটোই পাগল—শেষে দু বন্ধু না খুনোখুনি করে বসে! কী জবাব দেব স্থির করে ওঠার আগেই এল ভিন্সেন্টের তৃতীয় পত্র—গগন আগামী বুধবারে আসছে। আমার বন্ধুর যে আপত্তি নেই—আমার নীরবতা থেকেই সেটা ওরা অনুমান করেছে।

ওদের রাঁচি-বাসের জীবনকথা পরে বিস্তারিত শোনার অবকাশ হয়েছিল।

ভিন্সেন্ট মালিকে বলে,—সরযূ, আমার এক বন্ধু পরশু আসবেন, বুঝেছ। সেও ছবি আঁকে। খুব সুন্দর ছবি আঁকে। এবার থেকে আমারা দুজনে মিলে ছবি আঁকব।

—আপ্‌সে ভি আচ্ছা ক্যা? সরযূপ্রসাদ একটা তুলনামূলক প্রশ্ন করে বসে।

ভিন্সেন্ট জবাবে বলে,—তা আমি জানি না। তোমরা দেখে বল, কে ভাল আঁকে।

একদিন ওর ছবি আঁকা বন্ধ রইল। জনে জনে সে শুনিয়ে এল গগন পালের আসন্ন আগমন-বার্তা। রঘুবীর, ভগলু, এক্কাওয়ালা মকবুল আলি, চায়ের দোকানদার ভীমাকে। প্রতিবেশীরাও ওর মত অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে কখন এসে পড়ে দু-নম্বর তসবিরবাবু।

অবশেষে গগন এসে উপস্থিত হল। সে তো আগমন নয়, সে যে আবির্ভাব! ভিন্সেন্ট মালিকে দিয়ে ও-ঘর থেকে একটা চৌকি এ-ঘরে আনিয়ে রেখেছিল। মালির হেপাজতে বিছানা বালিশ চাদর সবই আছে. পরিপাটি করে ভিন্সেন্ট একটি বিছানা পেতে রাখল। বাগান থেকে ফুল তুলে এনে কাঁসার গ্লাসে সাজিয়ে রাখল গগনের বিছানার পাশে। নিজের ছবিগুলি টাঙিয়ে রাখল ঘরের চারদিকের দেওয়ালে। সিঙারণ নদীর সাঁকো, জোড়-জাঙালের গির্জা, আলুর ভোজ, বাতাসীর ন্যুড-স্টাডি, রঘুবীরপ্রসাদের সাম্প্রতিক আঁকা পোর্ট্রেট। বন্ধু-বরণের সব আয়োজন সেরে স্টেশনে গেল বন্ধুকে আনতে।

স্টেশন প্লাটফর্মে দুই শিল্পী-বন্ধুর মিলনদৃশ্যটা মনে রাখবার মত। ভিন্সেন্ট ওকে মাথায় তুলে নিয়ে নাচতে বাকি রাখল। গগনের তোরঙ্গ, আর প্যাকিংকেসে বাঁধা ছবির বাণ্ডিল কুলির মাথায় দিয়ে প্লাটফর্মের বাইরে এল। টাঙায় করে বন্ধুকে নিয়ে এল বাসায়।

গগন কিন্তু ভিন্সেন্টের ব্যবস্থাপনায় খুশি হল না। বললে,—অতগুলো ঘর তালা বন্ধ রেখে এমন গুঁতোগুঁতি করে থাকার কী দরকার বাওয়া? শুধু-মুধু আত্মাকে কষ্ট দেওয়া!

ভিন্সেন্ট বলে,—দুজনে একঘরে থাকলে গল্পগুজব করা যাবে—

বাধা দিয়ে গগন বলে,—ঝাঁট দে ওসব ছেঁদো কথা! তামাম রাত তোর বক্‌বকানি কে শুনবে? মেয়েছেলে না হলে একঘরে কারও সঙ্গে শুতে পারি না আমি!

বোঝা গেল গগন ফাঁকা থাকতেই ভালবাসে! কিন্তু একটু মর্মাহত হয় ভিন্সেন্ট; কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে,—এক হিসাবে কথাটা অবশ্য ঠিক। এ-ঘরের দেওয়াল তো আমার ছবিতেই ভরে গেছে। তোর ছবি টাঙানোর জন্য আরও ওয়ালস্পেস চাই।

গগন বলে,—সেজন্য নয়। আমি দেওয়ালে আদৌ ছবি টাঙাব না। আসলে একটু নিরালা না হলে আমি ঠিক জুত পাই না।

অগত্যা মালী আর ভিন্সেন্ট ধরাধরি করে বিছানাটা ও-ঘরে নিয়ে যায়।

গগন যে ওর আঁকা ছবিগুলো দেখতে মোটেই কৌতূহলী হয়নি এটা নজর এড়ায়নি ভিন্সেন্টের। কিন্তু এ নিয়ে সে কিছু বলে না। রাতে খেতে বসে গগন বললে,—রাঁধে কে? তুই?

—না, মালিক বউদি।

—কই, তাকে তো দেখলাম না?

—আছে কোথাও। তুই নতুন লোক বলে লজ্জা পাচ্ছে হয় তো!

—ও বাবা ! লজ্জাবতী লতা নাকি? তোর ঘরে একটা ন্যুড-স্টাডি দেখলাম। সেটা কি ঐ মালির বৌদির?

—দূর! তোর মাথা খারাপ! অমন ছবি কি কারও বউ কখনও আঁকাতে পারে?

—পারে না বুঝি? তবে কার?

—ও অন্য একটা মেয়ে। নাম বাতাসী।

—সাঁওতাল মেয়ে?

—হ্যাঁ। ওর কথা বলব তোকে।

ভিন্সেন্টের হাতের কাজের দিকে কৌতূহল না থাকলেও তার অতীত জীবনের বিষয়ে খুব আগ্রহ দেখালো গগন। ভিন্সেন্ট স্কুল ছাড়ার পর তার জীবনের সমস্ত ঘটনা বলে যায়। গগন ধৈর্য ধরে শোনে। কাহিনী শেষ হতে হো-হো করে হেসে ওঠে সে।

—কি হল রে? অমন করে হাসছিস কেন?

গগন হাত দুটি জোড় করে বলে,—ফাদার চন্দ্রভান! তুমি হয় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি, নয় হিজড়ে, আর নয় ফাদারদা, নয়-ফাদার বৌঠান! কোন্‌টা তুমি?

ভিন্সেন্ট হাসতে হাসতে বলে,—এ কথার মানে?

—শালা, তোর জীবনে তিন-তিনটে ডবকা ছুঁড়ি এল। আর আজ ছত্রিশ বছর বয়েসেও তুই ভার্জিন! তুই শালা নমস্য ব্যক্তি। পায়ের ধুলো দাও বৌঠান!

সত্যিই ওর পায়ের ধুলো নিতে যায়। ভিন্সেন্ট হাসতে থাকে।

কিন্তু এই রসিকতাই ওর কাল হল!

ওরা দুজনেই শিল্পী ; একই পথের পথিক। কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আশ্‌মান-জমিন ফারাক। যে-কোন বিষয়বস্তু নিয়েই ওরা আলোচনা শুরু করুক, শেষ-মেশ এসে থামে চিত্রশিল্পে। আর তখনই হয় মতান্তর। মতান্তর থেকে মনান্তর। রীতিমত বচসা শুরু হয়ে যায়। আর মজা হচ্ছে এই, গগন তখনই নৈর্ব্যক্তিক আর্ট-বিচার থেকে নেমে আসে ভিন্সেন্টের ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গে। ঠাট্টা-তামাসা শুরু করে দেয়। ওকে ক্ষেপায়। ভিন্সেন্ট যখন আগুন হয়ে আস্তিন গোটায় গগন হেসে ওঠে। বলে,—থাক বৌঠান! আমি হার মানছি!

উত্তেজনায় ভিন্সেন্টের মুখটা থমথম করে। ভ্রূ দুটি কুঁচকে ওঠে। বলে,—বৌঠান মানে?

—তুমি তো পুরুষমানুষ নও বাবা চন্দ্রভান! ঊর্মিলাকে তুমি কাব্যে উপোসী করে রাখলে, চ্যাতরা দিদিমণি মাঝরাতে তোমার ঘরে জ্বালা জুড়াতে এল, তুমি তাকে বাসিমুখে তাড়িয়ে দিলে ; মায় বাতাসী পাক্কা দু বছর তোমার বিছানায়—

—তুই পাষণ্ড! তোর মুখ অত্যন্ত অশ্লীল!

গগন হাসতে হাসতে বলে, —হ্যাঁ বৌঠান! আমার মুখটাই অশ্লীল—কিন্তু ছবিগুলো তোমার মত অশ্লীল নয়!

—আমার ছবি অশ্লীল! কোন্ ছবি?

—সবগুলোই। 'আলুর ভোজ' একখানা অশ্লীল ছবি! মানুষগুলো বাঁদরের মত—গোগ্রাসে খাচ্ছে বেবুনের মত। ও কি একটা আঁকবার মত বিষয়বস্তু? সর্ডিড অ্যাণ্ড ভালগার!

—তুই কিছুই বুঝিস না! তোকে দেখানোই ভুল হয়েছে আমার—

গগন সে-কথায় কর্ণপাত না করে একনাগাড়ে বলে যায়,—বাতাসীর ন্যুড-স্টাডি আর একখানা অশ্লীল ছবি! জয়ঢাকের মত অতবড় পেট যার, তার ন্যুড-স্টাডি ভদ্দরলোকে আঁকে—

—তোর মাথায় গোবর পোরা! ও ছবির মর্ম তুই কি বুঝবি? তুই একটা ক্যাডাভেরাস!

—দেখ্ চন্দ্রভান! গালাগাল দিয়ে লাভ নেই! সত্যি করে বল্ তো, তুই কোন্ প্রেরণায় ঐ ছবিখানা এঁকেছিলি? ঐ ন্যুডখানা?

—সে তুই বুঝবি না। ফিমেল-ফিগার বলতে তোদের ধারণা সেই কালিদাসের 'মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা'। রিয়ালিস্‌ম্‌কে তোরা সহ্য করতে পারিস না। মাতৃত্বের ভারে স্ত্রীলোকের জীবনে এমন পর্যায় আসে যখন 'মধ্যে ক্ষামা' থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর নয় ; আর সেটাই তার জীবনের সার্থকতা! সেই মাতৃত্বের পরিপূর্ণ নগ্ন স্বরূপ কেউ কখনও আঁকতে সাহস পায়নি! আমি এঁকেছি! এ ছবির সৌন্দর্য দেখবার অন্য চোখ চাই—

গগন বলে,—আমরা দৈনিক যা আহার করি, তার একটা বিরাট অংশ দেহকে ত্যাগ করতে হয়। সেটাও জীবনের একটা আবশ্যিক পর্যায়। যেহেতু সেটা সত্য, তাই সে-দৃশ্যও আর্টের বিষয়বস্তু হবে বোধকরি, তোর ধারণায়?

—না, হবে না! কেন হবে না, তা বুঝতে হলে আর্ট কি তাই জানতে হবে। ধর একগুচ্ছ আঙুর—

—ধরব না। একগুচ্ছ আঙুর কেউ ধরতে বললে আমি সেটা মুখে পুরব প্রথমেই।

—জানি! সেজন্যই বলি তুই শিল্পী নস—তুই পাষণ্ড!

—আমিও জানি। তুই ঐ আঙুরগুচ্ছের স্বাদ জিহ্বায় নিতে সাহস পাবি না। দূর থেকে সেটার স্টিল-লাইফ স্টাডি করবি। কিন্তু কিছুই হবে না। আঙুরের স্বাদ যে পায়নি, সে কোনদিন আঙুরের ঢলঢল তরলিত আভা—যাকে বলে আঙুরের লাবণ্যযোজনা তা আঁকতে পারবে না!

—আমি মানি না! চট্‌কে থেঁতো না করলে আঙুরগুচ্ছের ছবি আঁকা যায় না, এ কোন কাজের কথাই নয়!

—তোমার কাছে আঙুর ফল টকই থেকে যাবে বৌঠান। ও তোর ছবিতে ফুটবে না।

আবার বৌঠান! এই ডাকটাই ভিন্সেন্টের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

ভিন্সেন্টের ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে গেল। মন দিতে পারে না। দিবারাত্র শুধু তর্কই করে চলে। গগনকে কোনও দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে না। গগন তার প্যাকিং-কেস খোলেনি। তার আঁকা ছবি দেখায়নি ভিন্সেন্টকে। বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধ বারে বারে উপেক্ষা করে বলেছে—তার ছবি সে কাউকে দেখাবে না। গগনের ছবি বুঝবার মত মানুষ নাকি এখনও এ দুনিয়ায় জন্মায়নি। তার ছবি দেখানো হবে পঞ্চাশ বছর পরে। ততদিনে মানুষ ক্রমোন্নতি করে শিল্পীর সমতলে আসতে শিখবে! ভিন্সেন্ট রাগে ফুঁসতে

গগন যে ওর আঁকা ছবিগুলো দেখতে মোটেই কৌতূহলী হয়নি এটা নজর এড়ায়নি ভিন্সেন্টের। কিন্তু এ নিয়ে সে কিছু বলে না। রাতে খেতে বসে গগন বললে,—রাঁধে কে? তুই?

—না, মালিক বউদি।

—কই, তাকে তো দেখলাম না?

—আছে কোথাও। তুই নতুন লোক বলে লজ্জা পাচ্ছে হয় তো!

—ও বাবা ! লজ্জাবতী লতা নাকি? তোর ঘরে একটা ন্যুড-স্টাডি দেখলাম। সেটা কি ঐ মালির বৌদির?

—দূর! তোর মাথা খারাপ! অমন ছবি কি কারও বউ কখনও আঁকাতে পারে?

—পারে না বুঝি? তবে কার?

—ও অন্য একটা মেয়ে। নাম বাতাসী।

—সাঁওতাল মেয়ে?

—হ্যাঁ। ওর কথা বলব তোকে।

ভিন্সেন্টের হাতের কাজের দিকে কৌতূহল না থাকলেও তার অতীত জীবনের বিষয়ে খুব আগ্রহ দেখালো গগন। ভিন্সেন্ট স্কুল ছাড়ার পর তার জীবনের সমস্ত ঘটনা বলে যায়। গগন ধৈর্য ধরে শোনে। কাহিনী শেষ হতে হো-হো করে হেসে ওঠে সে।

—কি হল রে? অমন করে হাসছিস কেন?

গগন হাত দুটি জোড় করে বলে,—ফাদার চন্দ্রভান! তুমি হয় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি, নয় হিজড়ে, আর নয় ফাদারদা, নয় ফাদার বৌঠান! কোন্‌টা তুমি?

ভিন্সেন্ট হাসতে হাসতে বলে,—এ কথার মানে?

—শালা, তোর জীবনে তিন-তিনটে ডবকা ছুঁড়ি এল। আর আজ ছত্রিশ বছর বয়েসেও তুই ভার্জিন! তুই শালা নমস্য ব্যক্তি। পায়ের ধুলো দাও বৌঠান!

সত্যিই ওর পায়ের ধুলো নিতে যায়। ভিন্সেন্ট হাসতে থাকে।

কিন্তু এই রসিকতাই ওর কাল হল!

ওরা দুজনেই শিল্পী ; একই পথের পথিক। কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আশ্‌মান-জমিন ফারাক। যে-কোন বিষয়বস্তু নিয়েই ওরা আলোচনা শুরু করুক, শেষ-মেশ এসে থামে চিত্রশিল্পে। আর তখনই হয় মতান্তর। মতান্তর থেকে মনান্তর। রীতিমত বচসা শুরু হয়ে যায়। আর মজা হচ্ছে এই, গগন তখনই নৈর্ব্যক্তিক আর্ট-বিচার থেকে নেমে আসে ভিন্সেন্টের ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গে। ঠাট্টা-তামাসা শুরু করে দেয়। ওকে ক্ষেপায়। ভিন্সেন্ট যখন আগুন হয়ে আস্তিন গোটায় গগন হেসে ওঠে। বলে,—থাক বৌঠান! আমি হার মানছি!

উত্তেজনায় ভিন্সেন্টের মুখটা থমথম করে। ভ্রূ দুটি কুঁচকে ওঠে। বলে,—বৌঠান মানে?

—তুমি তো পুরুষমানুষ নও বাবা চন্দ্রভান! ঊর্মিলাকে তুমি কাব্যে উপোসী করে রাখলে, চ্যাতরা দিদিমণি মাঝরাতে তোমার ঘরে জ্বালা জুড়াতে এল, তুমি তাকে বাসিমুখে তাড়িয়ে দিলে ; মায় বাতাসী পাক্কা দু বছর তোমার বিছানায়—

—তুই পাষণ্ড! তোর মুখ অত্যন্ত অশ্লীল!

গগন হাসতে হাসতে বলে, —হ্যাঁ বৌঠান! আমার মুখটাই অশ্লীল—কিন্তু ছবিগুলো তোমার মত অশ্লীল নয়!

—আমার ছবি অশ্লীল! কোন্ ছবি?

—সবগুলোই। 'আলুর ভোজ' একখানা অশ্লীল ছবি! মানুষগুলো বাঁদরের মত—গোগ্রাসে খাচ্ছে বেবুনের মত। ও কি একটা আঁকবার মত বিষয়বস্তু? সর্ডিড অ্যাণ্ড ভালগার!

—তুই কিছুই বুঝিস না! তোকে দেখানোই ভুল হয়েছে আমার—

গগন সে-কথায় কর্ণপাত না করে একনাগাড়ে বলে যায়,—বাতাসীর ন্যুড-স্টাডি আর একখানা অশ্লীল ছবি! জয়ঢাকের মত অতবড় পেট যার, তার ন্যুড-স্টাডি ভদ্দরলোকে আঁকে—

—তোর মাথায় গোবর পোরা! ও ছবির মর্ম তুই কি বুঝবি? তুই একটা ক্যাডাভেরাস!

—দেখ্ চন্দ্রভান! গালাগাল দিয়ে লাভ নেই! সত্যি করে বল্ তো, তুই কোন্ প্রেরণায় ঐ ছবিখানা এঁকেছিলি? ঐ ন্যুডখানা?

—সে তুই বুঝবি না। ফিমেল-ফিগার বলতে তোদের ধারণা সেই কালিদাসের 'মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা'। রিয়ালিস্‌ম্‌কে তোরা সহ্য করতে পারিস না। মাতৃত্বের ভারে স্ত্রীলোকের জীবনে এমন পর্যায় আসে যখন 'মধ্যে ক্ষামা' থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর নয় ; আর সেটাই তার জীবনের সার্থকতা! সেই মাতৃত্বের পরিপূর্ণ নগ্ন স্বরূপ কেউ কখনও আঁকতে সাহস পায়নি! আমি এঁকেছি! এ ছবির সৌন্দর্য দেখবার অন্য চোখ চাই—

গগন বলে,—আমরা দৈনিক যা আহার করি, তার একটা বিরাট অংশ দেহকে ত্যাগ করতে হয়। সেটাও জীবনের একটা আবশ্যিক পর্যায়। যেহেতু সেটা সত্য, তাই সে-দৃশ্যও আর্টের বিষয়বস্তু হবে বোধকরি, তোর ধারণায়?

—না, হবে না! কেন হবে না, তা বুঝতে হলে আর্ট কি তাই জানতে হবে। ধর একগুচ্ছ আঙুর—

—ধরব না। একগুচ্ছ আঙুর কেউ ধরতে বললে আমি সেটা মুখে পুরব প্রথমেই।

—জানি! সেজন্যই বলি তুই শিল্পী নস—তুই পাষণ্ড!

—আমিও জানি। তুই ঐ আঙুরগুচ্ছের স্বাদ জিহ্বায় নিতে সাহস পাবি না। দূর থেকে সেটার স্টিল-লাইফ স্টাডি করবি। কিন্তু কিছুই হবে না। আঙুরের স্বাদ যে পায়নি, সে কোনদিন আঙুরের ঢলঢল তরলিত আভা—যাকে বলে আঙুরের লাবণ্যযোজনা তা আঁকতে পারবে না!

—আমি মানি না! চট্‌কে থেঁতো না করলে আঙুরগুচ্ছের ছবি আঁকা যায় না, এ কোন কাজের কথাই নয়!

—তোমার কাছে আঙুর ফল টকই থেকে যাবে বৌঠান। ও তোর ছবিতে ফুটবে না।

আবার বৌঠান! এই ডাকটাই ভিন্সেন্টের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

ভিন্সেন্টের ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে গেল। মন দিতে পারে না। দিবারাত্র শুধু তর্কই করে চলে। গগনকে কোনও দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে না। গগন তার প্যাকিং-কেস খোলেনি। তার আঁকা ছবি দেখায়নি ভিন্সেন্টকে। বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধ বারে বারে উপেক্ষা করে বলেছে—তার ছবি সে কাউকে দেখাবে না। গগনের ছবি বুঝবার মত মানুষ নাকি এখনও এ দুনিয়ায় জন্মায়নি। তার ছবি দেখানো হবে পঞ্চাশ বছর পরে। ততদিনে মানুষ ক্রমোন্নতি করে শিল্পীর সমতলে আসতে শিখবে! ভিন্সেন্ট রাগে ফুঁসতে

থাকে। গগনের ছবি দেখে কোন সমালোচনা করবার অধিকারই পেল না ভিন্সেন্ট। তাছাড়া নিজের অতীত জীবন সম্বন্ধেও গগন অদ্ভুতভাবে নীরব। এতদিন কোথায় ছিল, কি করেছে কিছুই সে বন্ধুকে জানায়নি। সেদিক থেকে পাল্টা আক্রমণের সুযোগ ভিন্সেন্ট পেল না!

মোটকথা ভিন্সেন্টের স্বপ্ন সার্থক হল না। দু বন্ধু একসঙ্গে ছবি আঁকতে বসল না একদিনও। তারা একসঙ্গে বেড়ায়, ঘোরে, খায়-দায় আর দিবারাত্র তর্ক করে।

শেষে একদিন ঘটনাচক্রে গগন একটু মুখ খুলল। অতীত জীবনের কিছুটা আভাস দিয়ে ফেলল অসতর্কভাবে। কাহিনীটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল চন্দ্রভান। ঘটনাটা ঘটল একটা চায়ের দোকানে। দু বন্ধু সন্ধ্যার দিকে রোজই বেড়াতে যায়। সেদিনও গিয়েছিল স্টেশনের দিকে। হঠাৎ কি খেয়াল হল দুজনে ঢুকল একটা চায়ের দোকানে। দু পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিয়ে জমিয়ে বসল কাঠের বেঞ্চিতে এবং তৎক্ষণাৎ অসমাপ্ত তর্কের বিষয়বস্তুতে ডুবে গেল। ভিন্সেন্ট বলে,—রিয়ালিস্‌ম্‌ বলতে তুই যা বুঝছিস আমি তা বুঝছি না। রিয়ালিস্‌ম্‌ শিল্পীর সামনে একটা জগদ্দল পাহাড় নয়! রিয়ালিস্‌ম্‌ মানে এ নয় যে, দুনিয়ার বাস্তবে যা আছে বা যা দেখছি তাই এঁকে যাওয়া। অনেক সময় এমন হয় যে, যা দেখছি তা অস্বাভাবিক, মানে আমার আর্টের বিষয়বস্তুর পক্ষে সেটা অবাস্তব, অবাঞ্ছনীয়! শিল্পীর অধিকার আছে সেটা অস্বীকার করার! বদলে দেবার!

—যেমন? একটা উদাহরণ দে?

—ধর তুই একটা সুন্দর সূর্যোদয়ের ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকছিস। তোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে অরুণোদয়ে পৃথিবী কেমন করে অন্ধকারের বুক থেকে জেগে উঠছে তাই ফুটিয়ে তোলা। তোর রঙ আর রেখা রামকেলী অথবা ভৈরোঁয় বাঁধা। এখন বাস্তবে তোর চোখে পড়ল সামনে দিয়ে চারজন শববাহী একটা মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যেহেতু ঐ খণ্ডদৃশ্যটা তোর বিষয়বস্তুর সঙ্গে একসুরে বাঁধা নয়—তুই অনায়াসে ঐ মৃতদেহবাহীদের অস্বীকার করতে পারিস। শিল্পী হিসাবে তোর অধিকার আছে ওটাকে উপেক্ষা করে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকার।

গগন দৃঢ় প্রতিবাদ করে। বলে,—ঝাঁট দে ওসব ছেঁদো কথা! তাহলে ওটাকে 'ল্যাণ্ডস্কেপ' বলা যাবে না আদৌ! তোরা মনে করিস চিত্রের জগৎ বুঝি সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর ফর্মূলায় বাঁধা! সকালবেলা দরবারী-কানাড়া অচল, মধ্যরাত্রে ভৈরোঁ ধরলে ওস্তাদকে পিটিয়ে ছাতু করতে হবে! এ দুনিয়াটা অমন মনু-সংহিতার বিধান মেনে চলে না। এখানে ঊষালগ্নেও মানুষ মরে—সেটা বাস্তব! আর ঐ বাস্তবকে অস্বীকার করা মানে তুই একটা কল্পিত ইউটোপিয়ায় উটপাখির মত মুখ লুকোতে চাইছিস!

—তুই আমার কথাটা বুঝতে পারছিস না। দুনিয়া যে মিশ্ররাগিণীতে বাঁধা এ তো আমি অস্বীকার করছি না ; কিন্তু আর্টিস্ট হিসাবে আমি তো একটা কিছু বলতে চাই। যা বলতে চাই তার সঙ্গে সুর না মিললে আমি বাস্তবকে অতিক্রম করতে পারব না কেন? ধর আমার 'আলুর ভোজ'! সেদিন তুই বললি—মালকাটার দল বেবুনের মত গোগ্রাসে খাচ্ছে! ওদের প্রচণ্ড ক্ষুধার দৃশ্যই আমি আঁকতে চেয়েছি—তাই ওদের বাস্তবতাকে আমি অস্বীকার করিনি ; কিন্তু আমার ছবির সুরের সঙ্গে যদি বাস্তব না মেলে—তাহলে আলবৎ আমি কল্পনার আশ্রয় নেব। আমার কল্পনাই সে ক্ষেত্রে হবে বাস্তব!

—আর একটা উদাহরণ দে!

—ধর ঐ ক্যালেণ্ডারের ছবিটা! শিল্পী বাস্তবতাকে অস্বীকার করে ওটাতে কল্পনার

আশ্রয় নিয়েছেন। যা দেখেছেন তাই যদি আঁকতেন তাহলে মেয়েটির কপালে সিঁদুরের টিপ থাকার কথা নয়। ও সদ্যঃস্নাতা। মেয়েটি ভিজে কাপড় ছাড়েনি, ফলে স্নানের পরে ও প্রসাধন করেনি। তাহলে ওর কপালে সিঁদুরের টিপ থাকতে পারে না। তবু শিল্পী টিপটা এঁকেছেন, এবং সেটা তথাকথিতভাবে অবাস্তব হলেও সার্থক। কারণ, শিল্পীর কল্পনায় অবগাহন-স্নানান্তে ঐ পূজারিণীর মালিন্যটুকুই ধুয়ে গেছে, মাঙ্গলিক চিহ্নটুকু ধুয়ে যায়নি!

গগন নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে দেখতে থাকে দোকানের ও-প্রান্তে টাঙানো একখানা ক্যালেণ্ডার। অনেকদিন পরে ছবিটা দেখল আবার। বটুকেশ্বর দেবনাথের 'পূজারিণী' যে ক্যালেণ্ডাররূপে রাঁচির অখ্যাত চায়ের দোকানে স্থান পেতে পারে এটা তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। গগন ঐ সদ্যঃস্নাতা বিকশিত-যৌবনার মূর্তির ভিতর সুলেখাকে খোঁজবার চেষ্টা করে। মুখখানা বটুক অন্যরকম করে এঁকেছিল—তাই সুলেখাকে চেনা যাচ্ছে না।

—কি হল? কথা বলছিস না যে?—ভিন্সেন্ট তাগাদা দেয়।

গগন বলে,—ছবিটা কার আঁকা জানিস?

—না। তুই জানিস?

—হ্যাঁ। ওটা বটুকেশ্বরের আঁকা। ছবিটা বটুকের বউয়ের।

এবার ভিন্সেন্ট এগিয়ে যায়। ছবিটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখে। ফিরে এসে বেঞ্চিতে বসে বলে,—একটু ফটোগ্রাফিক হয়েছে, তা হোক। মেয়েটির চরিত্রটা ঠিকমত ফুটিয়েছে বটুক।

গগন ব্যঙ্গভরা একচিল্‌তে হাসে। বলে,—মেয়েটির চরিত্রের কোন্ দিক?

—ছবিটা দেখলেই মনে হয় মেয়েটির মন নরম, সে সুখী, সে খাঁটি হিন্দুর মেয়ে, পূজা-আর্চা ভালবাসে।

গগন বলে,—তবেই দেখ! আমি যা বলতে চাইছি তাই প্রতিপন্ন হল! এখানে শিল্পী তাঁর পূর্বনির্ধারিত একটি ফর্মূলায় মেয়েটিকে বেঁধে ফেলেছেন। মেয়েটির আসল চরিত্র মোটেই উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি—নিজের কল্পনার বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে ওর চরিত্রটাকেই বিকৃত করে দিয়েছেন। আমার মতে তাই এ ছবি—অশ্লীল!

—আর একটু বুঝিয়ে বলবি?

—বলব। ঐ মেয়েটি, মানে বটুকের বউয়ের মন আদৌ নরম নয়, সে মোটেই সুখী ছিল না, হিন্দুর দেবদেবীতে তার তিলমাত্র বিশ্বাস ছিল না। অতৃপ্ত কামনা-বাসনা নিয়ে সে নিজের অন্তর্জ্বালায় গুম্‌রে মরছিল। কিন্তু যেহেতু শিল্পী একটি 'ভজন' গাইতে বসেছেন তাই সেই বাস্তবতাকে উনি অস্বীকার করেছেন—উঠপাখির মত বালিতে মুখ লুকিয়েছেন!

বাধা দিয়ে ভিন্সেন্ট বলে,—তুই এত কথা কি করে জানলি?

—যেহেতু ঐ বৌটির সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন রাত্রিবাস করেছি।

ভিন্সেন্ট স্তম্ভিত।

—বিশ্বাস হল না? তাহলে বলি শোন—

গগন তারপর বটুক-সুলেখার উপাখ্যান শোনাতে থাকে।

আদ্যন্ত কাহিনীটা শুনে ভিন্সেন্ট বললে,—তুই একটা স্কাউন্ড্রেল। পাষণ্ড!

গগন হে-হে হাসি হাসে।

ফেরার পথে ভিন্সেন্ট একটা কথাও বলে না। তার মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা

যন্ত্রণাবোধ হচ্ছে। বটুকেশ্বরকে সে স্কুলজীবনের পর আর দেখেনি ; তার স্ত্রী সুলেখা দেবনাথকে সে চেনে না—তবু গগন যে-ভাবে ওর বন্ধুর সুখের সংসারটা ছারখার করে দিয়ে এল তাতে গগনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখাই এখন কঠিন হয়ে পড়বে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এসব কথা দীপু তো ঘুণাক্ষরেও বলেনি! গগন বা বটুকের কথাও উঠেছে কথা প্রসঙ্গে—দীপু এড়িয়ে গেছে। কেন?

গগন পাশে পাশে চলছিল। বললে, তুই আমার ওপর রাগ করেছিস না রে?

ভিন্সেন্ট জবাব দেয় না।

গগন আবার হেসে ওঠে। বলে, আরে ঝাঁট দে! ঘাবড়াচ্ছিস কেন? তোর তো আর বউ নেই? ঊর্মিলা-চ্যাতরা-বাতাসীরা কেউ এখানে থাকলে না হয়—

—প্লীজ গগন! চুপ কর!

গগনকে যেন আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সত্যিই যদি ভিন্সেন্ট এখানে সস্ত্রীক বসবাস করত তাহলে কি গগন তার সংসারেও আগুন ধরিয়ে দিত? ঊর্মিলা কিংবা চিত্রলেখা—

মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে ওঠে ওর।

এর পর দুদিন ভিন্সেন্ট আর গগনের সঙ্গে বেড়াতে যায়নি। অনেকিদন পরে রঙ-তুলি বার করে সে আঁকতে বার হল। স্থির করল, গগনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটা কমিয়ে দিতে হবে। গগন একলা থাকতে ভালবাসে। তাই থাকুক। গগনও আপত্তি করল না। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে সেও ছবি আঁকতে বসল।

ভিন্সেন্ট বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে একদিন আঁকতে বসেছে। সামনে ঢালু উপত্যকা। ও-পাশে নীলচে-সবুজ পাহাড়ের রেখা। একটা সপ্তপর্ণী গাছের ছায়ায় সে ঈজেলটাকে বসিয়ে একমনে আঁকছে। পাশ দিয়ে রাঙা মাটির একটা রাস্তা চলে গেছে সাক্‌চির দিকে। তাতে সারি সারি গো-গাড়ি চলেছে। তৈল-তৃষিত গো-যান চক্রের আর্তনাদ আর কয়েকটি ঘুঘুর ঝিমন্ত কূজন ছাড়া চরাচর স্তব্ধ। হঠাৎ একটি হুড-খোলা মোটরগাড়ি ওর থেকে কিছুটা দূরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। ভিন্সেন্টের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে গেল সে-শব্দে। ঘাড় ঘুরিয়ে ও দেখে একটি মেমসাহেব বসে আছেন গাড়িতে। তিনিই চালাচ্ছিলেন। তাঁর পাশে একজন সাহেব। পিছনের আসনে দুটি বাচ্চা। সাহেব নেমে আসেন গাড়ি থেকে। বলেন,—হ্যালো মিস্টার গর্গ! কেমন আছেন? কী আঁকছেন দেখি?

এগিয়ে আসেন তিনি।

ভিন্সেন্ট প্রত্যভিবাদন করতে ভুলে যায়। সে স্তব্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল মেমসাহেবটিকে। টক্‌টকে ফর্সা রঙ—মেমসাহেবদের যেমন হয়। মাথায় নীল রঙের টুপি, ফিতে দিয়ে চিবুকের সঙ্গে আটকানো। সোনালী চুলের গুচ্ছ কপালের উপর জটলা করছে। দু চোখে কৌতুক উপছে পড়ছে। বয়স প্রায় ভিন্সেন্টের মতই। তবু চিনতে অসুবিধা হল না তার।

—মিসেস ডেভিডসন! আমার স্ত্রী! আপনার সঙ্গে আলাপ হয়নি। ইনি মিস্টার ভিন্সেন্ট ভান গর্গ!

মিসেস ডেভিডসন গাড়ি থেকে নেমে এসে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন,—ডিলাইটেড টু মিট য়ু মিস্টার গর্গ! কিন্তু আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

ভিন্সেন্ট তখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। ঊর্মিলা কি সত্যিই ওকে চিনতে পারছে না, না কি এও ওর একটা চাল? কিন্তু কী সুন্দর দেখতে হয়েছে ঊর্মিলাকে! কোথায় সেই

কিশোরী ঊর্মিলা, আর কোথায় এই পূর্ণযৌবনা মিসেস ডেভিডসন!

—আপনি কি বাওয়ালী গ্রামে ফাদার শারদাঁর কাছে কখনও এসেছিলেন? ঠিক ঐ রকম বড় বড় খরগোশের মত কান—

ডক্টর ডেভিডসন একটু অপ্রস্তুত। সদ্য-পরিচিত কোন ভদ্রলোকের দৈহিক বিকৃতি নিয়ে তাঁর স্ত্রী যে এমন অশালীন উক্তি করে বসতে পারেন, এটা যেন ধারণা ছিল না তাঁর।

ভিন্সেন্ট মুহূর্তে মনস্থির করে। প্রগল্‌ভা ঊর্মিলা ওকে নিয়ে রসিকতা করছে! ভুল করেছিল ভিন্সেন্ট, এটা সে স্বীকার করছে। ঐ মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন করে সে ভুল করেছিল। কিন্তু তার ভালবাসায় তো কোন খাদ ছিল না। উপেক্ষ্য সহ্য হয়, কিন্তু তার সঙ্গে অপমানের কৌতুক যোগ করার কি প্রয়োজন? গম্ভীর হয়ে বলে,—আপনি বোধহয় অন্য কারও সঙ্গে আমায় ভুল করেছেন। বাওয়ালী গ্রামের ফাদার শারদাঁকে আমি চিনি না।

—ফাদার শারদাঁ না হলেও অন্তত রেভ. হেনরি চার্ডিনকে নিশ্চয় চেনেন?

ভিন্সেন্ট এবার ঊর্মিলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ডক্টর ডেভিডসনকে বলে,—এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?

—ছুটির দিনে পিকনিক করতে বেরিয়েছি। কোন নির্জন জায়গায় বসে দুপুরটা কাটাব। সঙ্গে গ্রামাফোন আছে, খাবার আছে।

মিসেস ডেভিডসন বলেন,—আপনিও আসুন না মিস্টার গর্গ! ছবি আঁকা তো রোজই আছে। আজ পিকনিক করে যান বরং। আপনাকে দেখে আমার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

ডক্টর বলেন,—আসবেন? মন্দ মজা হয় না তাহলে—

ভিন্সেন্ট দোটানার মধ্যে পড়ে যায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না ঊর্মিলা ওকে নিয়ে মজা করতেই এ প্রস্তাবটা করছে। সে শুধু ভিন্সেন্টকে নিয়ে কৌতুক করতে চায়, খেলা করতে চায়। কিন্তু ভিন্সেন্ট? দীর্ঘদিন পরে ঊর্মিলাকে দেখে ওর কী ভাল যে লাগছে! ওকে এখনই দৃষ্টির আড়ালে সরে যেতে দিতে মন সরে না। বলে,—পুরানো কথা মানে?

মিসেস ডেভিডসন তাঁর স্বামীর দিকে ফিরে বলেন, তোমাকে বলেছি কিনা ঠিক মনে নেই। বাওয়ালীতে আমি একবার 'কাললাভে' পড়েছিলাম। ছেলেটিকে দেখতে অনেকটা আপনার মত মিস্টার গর্গ। অন্তত তার কান দুটো!

ডক্টর ডেভিডসন হো-হো করে হেসে ওঠেন। বলেন,—তুমি এসব কথা আমাকে কোনও দিনই বলনি! কিন্তু এভাবে মিস্টার গর্গকে বিব্রত করা কি তোমার ঠিক হচ্ছে?

—আপনি কি বিব্রত বোধ করেছেন মিস্টার গর্গ?

ভিন্সেন্ট মাথা নেড়ে বলে,—মোটেই না! আমার বরং হিংসে হচ্ছে! আমি নিজেই কেন সেই ছেলেটি হলাম না!

ডক্টর আবার দিলখোলা হাসি হাসেন। বলেন,—ঠিক মুখের মত জবাব হয়েছে!

ঊর্মিলাও হাসতে হাসতে বলে,—তা হলেই বা কী লাভ হ'ত? আপনিও নিশ্চয় তার মত পালিয়ে যেতেন!

—তোমার 'বুল-কাফ' কি তোমার গুঁতো খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন নাকি?—প্রশ্ন করেন ডক্টর।

—হ্যাঁ! প্রণয় উপহার দেবার ভয়ে!

ভিন্সেন্ট গম্ভীর হয়ে বলে,—কী উপহার চেয়েছিলেন আপনি?

—বিশেষ কিছু নয়! তার খরগোশের মত কান দুটো!

অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন ডেভিডসন,—ও য়ু নটি গার্ল!

ভিন্সেন্টের কর্ণমূল লাল হয়ে ওঠে। সে জবাব দিতে পারে না!

ডক্টর ডেভিডসনের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করল শেষ পর্যন্ত। সে পিকনিক যেতে রাজী হল না। ছবিটা আজই শেষ করতে হবে তাকে। মিসেস ডেভিডসন ওকে বারে বারে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। বললেন,—আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি, মিস্টার গর্গ! কিন্তু আপনাকে দেখলে আমার সেই হারানো-প্রেমের আনন্দ ফিরে পাব। আসবেন কিন্তু!

ভিন্সেন্ট বললে,—নেহাৎ যদি না যেতে পারি আমার প্রেসেন্ট আপনাকে পাঠিয়ে দেব!

—প্রেসেন্ট? ছবি?

—না! আমার কান দুটো! সে দুটোর উপরেই তো আপনার লোভ!

হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন সস্ত্রীক ডক্টর ডেভিডসন।

ভিন্সেন্ট ওঁদের সঙ্গে বনভোজনের আনন্দ ভাগ করে নিতে পারেনি। নিরলস নিষ্ঠায় সে সারাদিন ধরে 'ল্যাণ্ডস্পেকখানা' শেষ করল। তারপর সন্ধ্যাবেলা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখে সারা দিনমান সে পণ্ডশ্রম করেছে। রাঁচির নিসর্গ চিত্র মোটেই আঁকেনি। নিজের অজান্তে সে এঁকে গেছে—কী, তা সে নিজেই জানে না। কিছুটা লাল, কিছুটা সবুজ, কিছুটা কালোর প্রলেপ। সম্পূর্ণ বির্মূত চিত্র! তার অর্থ বোধকরি স্বয়ং শিল্পীরও বোধের অতীত। যেন শিল্পীর অবদমিত অবচেতন মনের কতকগুলো রক্তের মত জমাট উলঙ্গ বাসনা-কামনা তুলির মুখে বেরিয়ে এসে ক্যানভাসটাকে কলঙ্কিত করেছে। হালকা তুলির স্পর্শ নয়, সে যেন স্যাবল্-হেয়ার ব্রাশটাকে শংকর মাছের চাবুকের মত ব্যবহার করেছে সারাদিন। ক্যানভাসের পিঠ সেই চাবুকের আপ্সানিতেই চিত্রের উপর ফুটে উঠেছে রক্তের মত রাঙা রেখা! যা বলতে চেয়েছে, যা আঁকতে চেয়েছে তা বলা হয়নি, আঁকা হয়নি। বরং যা বলতে চায় না, লুকাতে চায় তাই বলে বসে আছে!

ক্যানভাসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রিক্তহাতে ফিরে এসেছিল ভিন্সেন্ট।

সমস্ত রাত ওর ঘুম হল না। যন্ত্রণায় বিছানায় সে শুধু এপাশ-ওপাশ করল।

পরদিন সমস্ত দিন সে স্বেচ্ছাবন্দীর মত পড়ে রইল ঘরে। গগন ওর খবর নিল না। সে যে পাশের ঘরে আছে তা বোঝা যায় খুট্ খুট্ শব্দে। দিনভর কিছু খায়ওনি। বাড়া ভাত পড়ে আছে টেবিলের উপর। জানালা দিয়ে চড়ুই পাখি এসে খুঁটেছে, ছিটিয়েছে। ভিন্সেন্টের মাথার মধ্যে আবার সেই যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছে।

সে-রাত্রে একটা ঘুম এসেছিল ওর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বাঁশীর শব্দে। পাশের ঘরে গগন একলা বসে আড়-বাঁশী বাজাচ্ছে। ফিন্‌কি দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে বাইরে। স্তব্ধ রাত্রে সেই বাঁশীর মীড়-গমক যেন কোন অতীন্দ্রিয় লোকে যাত্রা করেছে। অপার্থিব কোন সুরলোকের একটা অব্যক্ত মূর্ছনা যেন পাথরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ছে ক্রমাগত। ভিন্সেন্টের মনে হল—এমন সুরজাল যে সৃষ্টি করতে পারে সে কেমন করে বন্ধুর ঘর ভাঙে?

এর দুদিন পরের কথা। সমস্ত দিন বাইরে বাইরে ছবি এঁকে ক্লান্ত দেহে ভিন্সেন্ট ফিরে আসছিল তার ডেরায়। গগনের সঙ্গে এখনও তার সন্ধি হয়নি। দুজনে দু ঘরে থাকে আপন মনে। ভিন্সেন্ট আউটডোর ধরেছে—সারাদিনই বাইরে থাকে, ফিরে আসে

সন্ধ্যায়। আর গগন সারাদিন তার রুদ্ধদ্বার কক্ষে কী আঁকে তা সে-ই জানে, বাড়ির বাইরে যায় সন্ধ্যায়। ফিরে আসে গভীর রাত্রে টলতে টলতে। সেদিন সমস্ত দিন ছবি এঁকে ভিন্সেন্ট ফিরে আসছিল হঠাৎ গেটের কাছে তাকে রুখল ভগলু, রঘুবীরের ছেলে। তার বিচিত্র দেহাতী ভাষায় প্রশ্ন করে,—মেম-সাবকা সাথ ভেট ভেল কা?

—কৌন সা মেম-সাব?—প্রশ্ন করে ভিন্সেন্ট।

জবাবে জানতে পারে তার সঙ্গে সাক্ষাতের মানসে আজ নিয়ে তিনদিন এক মেমসাহেব গাড়ি নিয়ে আসছেন। কোনদিন সকালে, কোনদিন বিকালে। একদিনও দেখা হয়নি। ভিন্সেন্ট আশ্চর্য হয়ে যায়। ভারি অদ্ভুত তো! এমন খবরটা ইতিপূর্বে কেউ তাকে জানায়নি! না গগন, না মালি!

ঘরে ফিরে এসে মালিকে ডেকে পাঠায়। লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে মালি সরযূপ্রসাদ বার হয়ে আসে তার খোলার চালের আউট-হাউস থেকে।

—হ্যাঁরে! আমার সঙ্গে এক মেমসাহেব দেখা করতে এসেছিল?

—জী হাঁ। বহ্ তো হর রোজ আতি হ্যায়।

—কই, আমাকে বলিসনি তো?

—হামি কি বলবে? ম্যয় নে সোচা কি বহ্ তসবির-বালা বাবু নে আপকো কহা থা!

সরযূর দোষ নেই। সে কেমন করে জানবে মেমসাহেব কার সন্ধানে আসে! সে স্বতঃই আন্দাজ করেছিল এক বাবু দোসরা বাবুকে যা জানাবার তা জানাবে। হঠাৎ বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে ওঠে। গগন এ-খবরটা লুকোচ্ছে কেন? ঊর্মিলা নিশ্চয়ই বলেছে সে ভিন্সেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল! একটু সন্ধান নিতে আরও সব অদ্ভুত খবর বার হয়ে পড়ে। মিসেস ডেভিডসন প্রতিদিনই আসেন এবং অনেকক্ষণ বসে যান। দু-নম্বর তসবিরবাবুর সঙ্গে গল্পগুজব করেন। গতকাল নাকি ও বাবু মেমসাহেবের বাচ্চার একখানা তসবির এঁকেছে! মেমসাহেব অনেকক্ষণ ছিলেন এখানে। পেনসিলের ছবি আঁকিয়ে নিয়ে গেছেন।

ভিন্সেন্ট উন্মাদের মত পায়চারি করতে থাকে। আজ সে এর ফয়সালা করবে। সে বটুকেশ্বর নয়। সবকিছু নির্বিবাদে সয়ে যাবার মত মানুষ ভিন্সেন্ট ভান গর্গ নয়। প্রয়োজন হলে সে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে গগনকে। বন্ধু বলে রেয়াৎ করবে না। আজ আসুক গগন! যত রাত্রিই হোক ও জেগে অপেক্ষা করবে।

অদ্ভুত যোগাযোগ! সে রাত্রে গগন ফিরল না। সমস্ত রাত বারান্দায় পায়চারি করে গেল চন্দ্রভান। প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল। শেষকালে পুব দিকের আকাশ ফর্সা হয়ে এল, কিন্তু গগনের পাত্তা নেই। আলো ফুটতেই সে বেরিয়ে পড়ল।

হনহন করে রাস্তা পার হয়ে ডক্টর ডেভিডসনের বাসায় এসে যখন পৌঁছল তখনও ভাল করে সকাল হয়নি। বাড়ির দরোয়ান একটু অবাক হল এত সকালে ভিসিটার্স আসতে দেখে। জানালো, সাহেব মেমসাহেব দুজনের কেউ নেই। গাড়ি নিয়ে হাজারিবাগ গেছেন গতকাল। সন্ধ্যায় ফিরবেন।

—গাড়িতে আর কে কে আছে?

—বাচ্চারা আছে। আর লম্বা মত এক বাবু আছে। তসবিরবালা বাবু।

—তসবিরবালা বাবু? তুমি কেমন করে জানলে?

—ও তো মেমসাহেবের তসবির বানাচ্ছে!

আবার হনহন করে ফিরে এল বাসায়। গগন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চায়!

ঊর্মিলার সঙ্গে সে ভাব জমিয়েছে। ভিন্সেন্টকে ইচ্ছা করেই কিছু বলেনি। কে জানে ঊর্মিলা তাকে কতখানি বলেছে। এর একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ভিন্সেন্ট সুস্থ হতে পারবে না। এখনি তাকে এর শোধ নিতে হবে। আবার সে আপন মনে বিড়বিড় করে বললে,—তুমি ভুল করছ গগন ; আমি বটুকেশ্বর দেবনাথ নই। ঊর্মিলার ওপর কোন বাঁদরামি আমি সহ্য করব না।

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত সে পায়চারি করছে বারান্দায়, আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে চাইছে—কখন ফিরে আসে গগন।

মনে পড়ে গেল গগন রাঁচিতে আসার আগে তাকে প্রশ্ন করেছিল ওদের মধ্যে কে বেশি ভাল ছবি আঁকে। কে বড় আর্টিস্ট—ভিন্সেন্ট ভান গর্গ, না পল গগ্যা। সে সমস্যার সেদিন মীমাংসা হয়নি। আজ গগন ওর জীবনের প্রথম প্রেমকে ছিনিয়ে নিয়ে দুনিয়ার কাছে প্রমাণ রাখবে সে-ই বড়। কিন্তু কেমন ছবি আঁকে গগন? তার আঁকা একখানা ছবিও সে ভিন্সেন্টকে দেখতে দেয়নি।

—দুত্তোর, নিকুচি করেছে।

ভিন্সেন্ট লাফিয়ে ওঠে। কয়লা ভাঙার জন্য একটা লোহার ডাণ্ডা ছিল ; সেটা নিয়ে দমাদ্দম বাড়ি মারতে থাকে গগনের ঘরের তালাটায়। অচিরেই ওর সেই প্রচণ্ড ক্রোধের সম্মুখে হার স্বীকার করল ছোট্ট তালাটা। ঘরে ঢুকল ভিন্সেন্ট। সমস্ত ঘর অগোছালো। রঙ, তুলি, ক্যানভাস ছড়ানো। ও-পাশে থাক দিয়ে রাখা আছে গগনের আঁকা ছবি। ভিন্সেন্ট হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তুলে নেয় সবচেয়ে বড় ক্যানভাসটা। বসিয়ে দেয় খাটের উপর। তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে তাকিয়ে দেখে।

তৎক্ষণাৎ ভিন্সেন্টের মাথার মধ্যে টলে উঠল। একটা আর্ত চিৎকার তার কণ্ঠনালী বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসতে চায়—কিন্তু স্বর ফোটে না তার মুখে। ওর হাত-পা অসাড় হয়ে যায়।

ওর থেকে হাত চারেক দূরে খাটের উপর খাড়া করে রাখা আছে একটা ক্যানভাস। এইমাত্র সেটা সে নিজেই বসিয়েছে। ছবিটা সেই পূজারিণী মেয়েটির। কিন্তু সে কি তবে সেদিন দেবীমন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছিল না? মদনমন্দিরে পূজা দেবার জন্যই যৌবন বিকশিত করে সদ্যঃস্নাতার বেশে দাঁড়িয়ে ছিল? তাই কি বটুকেশ্বরের স্ত্রী নির্লজ্জ ভঙ্গিতে—কিন্তু বটুকের স্ত্রী কোথায়? ও যে, ও যে—হ্যাঁ, কোন ভুল নেই। চিত্রলেখা! নাথানিয়েল নয়, বটুকেশ্বর নয়—গগন পাল তার শ্লীলতা হানি করেছে।

হঠাৎ হিংস্র শ্বাপদের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। চিত্রলেখা নেই, গগন পাল নেই, কিন্তু ঐ ছবিখানা আছে। ওর সমস্ত আক্রোশ ফেটে পড়ল ঐ ছবিখানার উপর। এতক্ষণে একটা আর্ত জান্তব চিৎকার বার হয়ে এল ওর কণ্ঠনালী বিদীর্ণ করে। ভিন্সেন্ট লাফ দিয়ে পড়ল ক্যানভাসটার উপর। দু'হাতের নখ বসিয়ে দিল ঐ নগ্নিকার নরম বুকের মাঝখানে। তারপর সে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলল ছবিখানা। দুমড়ে মুচড়ে টেনে টেনে খুলে ফেলল ফ্রেমের কাঠগুলো। পেরেকে হাত কেটে গেল। রক্ত ঝরল ; কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই ভিন্সেন্টের। ওর চিৎকারে ইতিমধ্যে দ্বারের কাছে কারা যেন ছুটে এসেছে। সে-সব দেখতে পেল না ভিন্সেন্ট। বদ্ধ উন্মাদের মত সে তখন ক্যানভাসটা কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলছে। মুখ দিয়ে গাঁজলা বার হচ্ছে। তারপর সংজ্ঞা হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। জ্ঞান যখন হল, তখন দেখে সে শুয়ে আছে খাটের উপর। ভগলু আর সরযূপ্রসাদ বসে আছে পায়ের কাছে। স্থানীয় একজন ডাক্তারবাবুও আছেন। আর তাঁর

পিছনে দীর্ঘকায় গগনের মাথাটা জেগে আছে।

—গেট আউট! য়ু স্কাউন্ড্রেল!—চিৎকার করে ওঠে ভিন্সেন্ট।

ডাক্তারবাবুর ইঙ্গিত পেয়ে মুহূর্তে গগন বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

ক্রমশ ভিন্সেন্ট সুস্থ হয়ে উঠল। ডক্টর ডেভিডসন এসে ওকে পরীক্ষা করলেন। ইনজেকশান দিয়ে গেলেন। শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ভিন্সেন্ট।

ডাক্তার বলে গিয়েছিলেন ক্রাইসিস্‌টা পার হয়ে গেছে। পুরো দেড়দিন ঘুমবে রোগী। তারপর সে স্বাভাবিক হয়ে জেগে উঠবে। ডাক্তারের ভবিষ্যৎদ্বাণী কিছুটা ফলেছিল। পুরো ছত্রিশ ঘন্টা ঘুমলো ভিন্সেন্ট। বাকি ভবিষ্যৎদ্বাণীটা ফলে থাকলে বলতে হবে সুস্থ মস্তিষ্কেই সে খুন করতে চেয়েছিল গগন পালকে।

শেষরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল গগনের। খোলা জানালা দিয়ে চতুদর্শী চাঁদের আলোয় ঘরটা আলোয় আলো। গগন দেখতে পেল তার বিছানার অদূরে দাঁড়িয়ে আছে ভিন্সেন্ট। পা টিপে টিপে সে এগিয়ে আসছে ওর খাটের দিকে। ভিন্সেন্টের ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ ; তার চোখে খুনীর দৃষ্টি। তার হাতে একখানা খোলা ক্ষুর। ক্রপ-কোম্পানির যে ক্ষুর দিয়ে গগন রোজ দাড়ি কামায়।

চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠে গগন। দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ফেলে ভিন্সেন্টের ডান হাতখানা। গগনটা একটা অসুর—ভিন্সেন্টের তুলনায়। তবু আজ যেন ভিন্সেন্টের গায়ে মত্তহস্তীর বল। দুজনে জড়াজড়ি করে পড়ে মেঝের উপর। ভিন্সেন্টের হাত থেকে ক্ষুরটা ছাড়িয়ে নিতে যায় গগন—ফলে তার নিজের হাতটাই মারাত্মকভাবে কেটে যায়। উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত গগন ওকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালায়।

ভিন্সেন্ট উঠে বসে। ক্ষুরে রক্তের দাগ। গগনের রক্ত।

হঠাৎ আবার নজরে পড়ে গতকাল যেখানে চিত্রলেখার ছবিখানা বসানো ছিল ঠিক সেইখানে আজ বসানো আছে আর একটি চৈলচিত্র। ঊর্মিলা ডেভিডসন। সমস্ত শরীর নয়, আবক্ষ চিত্র। পোর্ট্রেট। ছবিটা ভাল কি খারাপ সার্থক কি ব্যর্থ তা লক্ষ্যই হল না ভিন্সেন্টের। সে একনজরে দেখে নিয়েছে লাবণ্যময়ী মেয়েটির বুকের তলায় স্বাক্ষর রেখেছে ওর সহপাঠী গগন পাল। এবার আর ছবিখানা নষ্ট করল না ভিন্সেন্ট। সেটা তুলে নিল হাতে। চোখটা ঝাপ্‌সা হয়ে এল।

ছবিটাকে উদ্দেশ করে সে ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরে। বলে,—ঊর্মিলা, এই দেখ চিত্রলেখার প্রণয়চিহ্ন সারাজীবন আমি বয়ে বেড়াচ্ছি—তবু সে আমাকে ছেড়ে ঐ গগ্যার কাছে গেছে! তুমি যা প্রণয়চিহ্ন চেয়েছ তাও আমি তোমাকে দেব। বাকি জীবন সে-চিহ্নও বয়ে বেড়াব—কিন্তু কথা দাও, তুমি চিত্রলেখার মত বিশ্বাসঘাতকতা করবে না? বল! কথা দাও!

তারপর ও অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসে।

এক পোঁচে নিজের ডান কানটা কেটে ফেলে ক্ষুর দিয়ে।

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে! চোখ ফেটে বেরিয়ে আসে জল। তবু নির্বিকার ভিন্সেন্ট। কাটা কানটা দিয়ে ঢাকা দেয় ঊর্মিলার ছবির দক্ষিণ স্তনের উপর গগন পালের ঐ স্বাক্ষরটা। হাত দিয়ে কানের ক্ষতচিহ্নটা চেপে ধরে। রক্ত বন্ধ হয় না। ধারাস্রোতে রক্ত ঝরছে। ঝরুক। ভিন্সেন্ট ঐ ছবিটার সঙ্গে কাটা কানটা দিয়ে একটা প্যাকেট জড়ায়। তারপর গগনের বিছানার চাদরটা তুলে নেয় ; নিজের ক্ষতচিহ্নটার উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড পাগড়ি বাঁধে। বেরিয়ে আসে বাইরে।

ভগলু যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। তাকে ডাকল। বললে,—এই প্যাকেটটা ডাক্তার সাহেবের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়। বলবি মেমসাহেবকে আমি দিয়েছি।

ভগলু বোধ করি রক্তের দাগটা লক্ষ্য করেনি। সে প্যাকেটটা নিয়ে চলে যায়। টলতে টলতে ফিরে আসে ভিন্সেন্ট। ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যায় দোরগোড়ায়।

গগন পরদিনই রাঁচি ছেড়ে পালায়। সুলেখা আর চিত্রলেখা যে অভিন্ন ঊর্মিলা আর মিসেস ডেভিডসন যে একই ব্যক্তি এসব তথ্য গগন আদৌ জানত কিনা জানি না—কিন্তু এটুকু সে জানত ভিন্সেন্ট সুযোগ পেলেই তাকে খুন করবে!

গগনের খবর পেয়েছিলাম পরে। সে নাকি কলকাতায় ফিরে আসে। খিদিরপুরের ডক-অঞ্চলে থাকত। শেষ পর্যন্ত কোন সারেঙের ব্যবস্থাপনায় একটি বিদেশী জাহাজে খালাসী হয়ে কোন্ সুদূরে পাড়ি জমায়। গগন আর ভারতবর্ষে ফিরে আসেনি।

কিন্তু ভিন্সেন্ট? তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ডক্টর ডেভিডসন। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে আমি এবং দিল্লী থেকে সূরযভান রাঁচি এসে হাজির।

ভিন্সেন্টের যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন চোখ মেলে প্রথমেই সে দেখতে পেল ডক্টর ডেভিডসনকে। তখন সন্ধ্যা হব-হব।

—হ্যালো! ডাকল ভিন্সেন্ট।

—হ্যালো! ফিরে দাঁড়ালেন ডক্টর ডেভিডসন।

—আমি কি আপনার বাড়িতে আছি?

—বাড়িতে নয়, হাসপাতালে।

—ও!

বোধহয় মনে পড়ে গেল ভিন্সেন্টের। নিজের অজ্ঞাতেই হাতটা চলে গেল কানের দিকে। ডাক্তার ওর হাতটা ধরে ফেলেন। বলেন,—ওখানে হাত দেবেন না।

—ও হ্যাঁ! আমার মনে পড়ে গেছে...ওটা নেই! না?

—না থাকে ক্ষতি নেই। বাঁধাকপির পাতার মত ঐ কানটা দিয়ে তো মানুষ শোনে না। আপনার শুনতে কোন অসুবিধা হবে না। দু-চার দিনেই ঘা শুকিয়ে যাবে।

—আমার বন্ধু, গগন পাল! সে কোথায়?

—তিনি চলে গেছেন। তাঁর মালপত্র নিয়ে চলে গেছেন।

—মিসেস ডেভিডসন? তিনি কোথায়?

—আপনি বেশি কথা বলবেন না এখন। চুপ করে শুয়ে থাকুন। অনেকটা রক্ত পড়েছে তো! আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

ভিন্সেন্ট অস্ফুটে বলে,—আপনি খুব ভাল লোক ডাক্তার সাহেব!

ঘুমবার চেষ্টা করে। ঘুম আর আসে না। ডাক্তারবাবু চুপ করে বসেছিলেন একটু দূরে, একখানা চেয়ারে। ভিন্সেন্ট লক্ষ্য করে দেখে ঘরে তার খাট আর ঐ চেয়ারখানা ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। এটা নিশ্চয় হাসপাতালের কেবিন। কিন্তু কেবিনে সাধারণত যে-সব জিনিস থাকে তা তো নেই! আবার বলে,—এটা কি হাসপাতালের কেবিন?

—হ্যাঁ।

—ঘরটা এত ফাঁকা কেন?

—আমি ঘর থেকে সব কিছু সরিয়ে দিয়েছি. আপনাকে বাঁচাতে।

—কার কাছ থেকে?

—আপনার নিজের কাছ থেকে।

—ও!

—আপনি একটু ঘুমবার চেষ্টা করুন।

এবার সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে ভিন্সেন্ট।

পরদিন সকালে যখন ওর ঘুম ভাঙল দেখে ডাক্তারবাবুর সেই চেয়ারখানায় বসে আছে সূরযভান। তার মুখটা ম্লান, ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। চোখ দুটো টকটকে লাল।

—সূরয! ডাকল চন্দ্রভান।

সূরয চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। দাদার হাতখানা টেনে নিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

—আশ্চর্য সূরয! যখনই তোর জন্য প্রাণ কাঁদে চোখ মেলে দেখি তুই এসেছিস! সেই জোড়-জাঙালের কথা মনে আছে সূরয?

সূরযভান মাথাটা নাড়ে। কথা বলতে পারে না।

—তুই কেমন করে খবর পেলি রে?

—গগ্যাদা টেলিগ্রাফ করেছিল।

—গগ্যার ভারি অন্যায়। মিছিমিছি তোর অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। আমি তো ভালই হয়ে গেছি।

দুজনেই কিছুটা চুপচাপ। তারপর সূরয বলে,—ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ও কিছু নয়। দু-চার দিনের মধ্যেই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। এবার আমি তোমাকে দিল্লী নিয়ে যাব দাদা। এভাবে একা একা তোমার থাকা চলবে না।

—বেশ তো। না হয় দিল্লীতে গিয়েই থাকব। তোর কাছে থাকলেই আমি ভাল থাকব।

একটু ইতস্তত করে সূরয বলে,—একটা খবর আছে দাদা!

—খবর! ভাল, না খারাপ?

—তোমার ভালই লাগবে নিশ্চয়!

—কী রে?

—আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি!

ভিন্সেন্ট কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। হঠাৎ তার খেয়াল হয়,—কী আশ্চর্য! এমন একটা আনন্দের কথায় সে চুপচাপ আছে! খুশিয়াল হয়ে বলে, —বাঃ বাঃ! খুব ভাল কথা! মেয়ে দেখেছিস? কেমন মেয়ে?

—দেখেছি বইকি! আমাদের প্রতিবেশী। ওরাও আমাদের স্বজাত। কনৌজী ব্রাহ্মণ। ওর বাবা দিল্লীতে ব্যবসা করেন। মেয়েটি লেখাপড়াও শিখেছে। হিন্দি আর ইংরাজি। —তারপর একটু হেসে বলে,—বাংলা জানে না কিন্তু।

—তাতে কি? ও তুই শিখিয়ে নিবি।

সূরযের ছুটি পাওনা ছিল না। বাধ্য হয়ে পরদিন তাকে ফিরে যেতে হল। যাবার আগে বললে,—তুমি গিয়ে না দাঁড়ালে তো বিয়ে হবে না! কবে যেতে পারবে বল?

—ডাক্তার সাহেব ছেড়ে দিলেই যেতে পারি।

ডাক্তারবাবু বললেন দিন পনের পরেই ভিন্সেন্ট ট্রেনে চাপতে পারবে। আর দুদিন

পরেই ভিন্সেন্ট চলা-ফেরা করতে শুরু করল। হাসপাতালের বারান্দায় ; ক্রমে বাগানে।

সেদিন বাগানে ধীরে ধীরে পায়চারি করছিল, ডাক্তারবাবু ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন,—আজ কেমন আছেন?

—সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছি মনে হচ্ছে। ব্যাণ্ডেজটা কবে খুলছেন?

—পরশুর পর দিন। আপনি এখন ইচ্ছে করলে একটু একটু ছবি আঁকতে পারেন।

ভিন্সেন্ট হাসতে হাসতে বলে,—ছবিও আমি পরশুর পর দিন শুরু করব, কারণ, এবার প্রথমেই আঁকব একটা সেল্‌ফ পোর্ট্রেট। কানকাট্টা সেপাই!

ডাক্তার সাহেব কাছে ঘনিয়ে এসে বললেন,—বলুন তো মিস্টার গর্গ হঠাৎ কেন অমন কাণ্ডটা করলেন?

ভিন্সেন্ট অনেকক্ষণ কোন জবাব দিল না।

ডাক্তার সাহেব পুনরায় বললেন,—সেদিন আমার স্ত্রী আপনার কান নিয়ে ঠাট্টা করেছিল বলে?

—না না না! আপনার স্ত্রীর কোন দোষ নেই। আমি জানি না, কেন অমন কাণ্ডটা হঠাৎ করে বসলাম! তিনি কোথায়? তাঁর কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

—সে ঘটনার পরদিনই চলে গেছে। ওর মনে হয়েছে সেদিন বড় চড়া সুরে ঐ রসিকতা করেছিল সে। দিনকতকের জন্যে সে ঘুরে আসতে গেছে।

—ও! না, তাঁর দোষ নেই! এ নিছকই একটা পাগলামি!

ডক্টর ডেভিডসনের কাছে ভিন্সেন্ট স্বীকার করতে পারেনি। করেছিল আমার কাছে। আমি দিনসাতেক পরে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন ও অনেকটা সুস্থ। হাসপাতাল থেকে তখনও ছাড়া পায়নি। আমার কাছে একেবারে ভেঙে পড়ল চন্দ্রভান। বললে,—আমি এখন কি করব দীপু? আমি নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছি!

—দূর, পাগল হলে এমন স্বাভাবিকভাবে কেউ কথা বলতে পারে?

—কিন্তু প্রতি তিনমাস অন্তর একটা বিশেষ তিথিতে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, এটা তো ঠিক!

ভিন্সেন্ট হিসাব কষে দেখেছে ওর মানসিক বিকলতা একটা ছন্দ মেনে আসছে। গত চার-পাঁচ বারের আক্রমণের মাঝখানে প্রতিবারেই তিন মাসের ব্যবধান। পঁচাশি থেকে পঁচানব্বই দিনের একটা কালের ব্যাপ্তি। প্রতিবারেই পূর্ণিমার কাছাকাছি তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। সবটা শুনে আমি বলি,—তাই যদি হবে এবার আমরা আগে থেকেই সাবধান হতে পারব। শুনলাম, এবার তুই দিল্লীতে সূরযের কাছে থাকবি?

মুখটা ম্লান হয়ে যায় ভিন্সেন্টের। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। বলে,—প্রথমে তাই ভেবেছিলাম রে ; কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলাম সে পথও বন্ধ হয়ে গেছে আমার। সূরয বিয়ে করতে যাচ্ছে। পাশের বাড়ি ওর শ্বশুরবাড়ি। ওরা কনৌজী ব্রাহ্মণ। আমাদের বাংলা দেশের মত নয়—ওরা নিশ্চয় খুব গোঁড়া ব্রাহ্মণ। আমি খ্রীষ্টান, কেমন করে থাকব সেখানে? তাছাড়া তিন মাস পরে পাগলামোর সময় যদি সূরযের বউকে—না না না, দীপু! সে কিছুতেই হতে পারে না!

—তাহলে কী করতে চাস তুই?

—আমি এখানেই থাকব। গরম কমে এসেছে। এখন চেঞ্জাররা আসবে। তোর সেই ক্লায়েন্ট ভদ্রলোক কি এবার শীতকালে রাঁচি আসবেন?

—না, এবার ওঁরা দক্ষিণ-ভারতে তীর্থে যাচ্ছেন। তুই যতদিন ইচ্ছে ও-বাড়িতে

থাকতে পারিস।

—আহ্, বাঁচালি!

বুকের থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল যেন ওর। নিরাশ্রয় আর্টিস্ট ভান গর্গের। বেচারির একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল ছোট ভাইয়ের ডেরা—সেখানে যেতে ও ভরসা পায় না। তাই হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে এসে ও কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এটাই ছিল চিন্তা। আমি প্রশ্ন করি,—হ্যাঁরে চন্দর, তুই গগ্যাকে সত্যিই খুন করতে গিয়েছিলি?

ও অনেকক্ষণ কোন জবাব দিল না। বোধকরি নিজের মনকেই ও প্রশ্নটা করল, আর তার জবাবের অপেক্ষায় চুপ করে বসে রইল। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—হ্যাঁ!

—তুই কি সুযোগ পেলে এখনও গগ্যাকে খুন করতে চাস?

—দূর! আমি তো এখন ভাল হয়ে গেছি! ও সময়...কেমন যেন...হঠাৎ...

কিভাবে কথাটা শেষ করবে বুঝে উঠতে পারে না। আমি পুনরায় বলি,—তা যেন হল। গগ্যার ওপর তোর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল। কিন্তু কানটা কি দোষ করল? হঠাৎ নিজের কানটা কেটে ফেললি কেন?

এবারও জবাব দিতে ওর দেরি হল। তারপর বললে,—ডক্টর ডেভিডসনকে বলিনি। কিন্তু তোকে বলব। লজ্জা পাওয়ার কথা আমার নয়, ওর। তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে...

ওর কথার মধ্যে বেশ অসঙ্গতি। জিজ্ঞাসা করি,—কার কথা বলছিস তুই?

—ঊর্মিলার! ঊর্মিলার শারদাঁ!

ভিন্সেন্ট কি এখনও স্বাভাবিক হয়নি? এ তো রীতিমত প্রলাপ! আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে তার সময় লাগে না। বলে,—আমি পাগলামি করছি না দীপু। ডক্টর ডেভিডসন বিয়ে করেছেন ফাদার শারদাঁর ভাইঝিকে। বিশ্বাস না হয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস।

সমস্ত কথাই খুলে বলেছিল ভিন্সেন্ট। কেন সে খুন করতে গিয়েছিল গগ্যাকে। বটুকেশ্বরের বউকে শুধু নয়, ভিন্সেন্টের মানসী প্রতিমাকেও ধূলায় টেনে নামিয়েছিল গগ্যা। তারপর বললে কেন হঠাৎ নিজের কানটা কেটে ফেলল। মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল ঠিকই—কিন্তু কার্যকারণসম্পর্ক একটা আছে ওর পাগলামির। সমস্তটা শুনে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। সব কথা ডক্টর ডেভিডসনকে খুলে বলা কি উচিত হবে? মিসেস ডেভিডসন নিঃসন্দেহে হৃদয়হীনতার প্রমাণ দিয়েছেন। ভিন্সেন্ট কেন যে তাঁকে চিনতে পারেনি, একথা তাঁর বোঝা উচিত ছিল। তা তো তিনি তলিয়ে দেখলেনই না, উপরন্তু ওর আহত স্থানে পুনরায় আঘাত করলেন। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ভিন্সেন্ট সেই উপেক্ষার, সেই অবমাননার একটা চরম প্রতিশোধ নিয়ে বসল। নিজের কান কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ! নিরতিশয় আত্মগ্লানিতে মিসেস ডেভিডসন স্থানত্যাগ করেছেন—নিজের কাছ থেকেই পালাতে চেয়েছেন তিনি। এসব কিছুই জানেন না তাঁর স্বামী। এ ব্যাপারে যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সেই ভিন্সেন্ট তার আত্ম-লাঞ্ছনার ইতিকথা গোপন করে গেছে ডাক্তার সাহেবের কাছে। ফলে আমি কেন তা প্রকাশ করে দিই? ডক্টর ডেভিডসনের কাছে তাঁর স্ত্রীকে অপদস্থ করি? অথচ সব কথা না জানলে ডাক্তার সাহেব ওর চিকিৎসাই বা করবেন কেমন করে?

মোট কথা অপ্রিয় সত্যটা আমাকে গোপন করেই যেতে হল। প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য ওকে জিজ্ঞাসা করি,—এখানে সারাদিন কি করিস? সময় কাটে কি করে?

—ডাক্তার সাহেব অনুমতি দিয়েছেন। আমি ছবি আঁকি বসে বসে।

—কই, কি আঁকছিস দেখি!

ভিন্সেন্ট একখানা ক্যানভাস এনে আমাকে দেখালো। ইতিমধ্যে ওর ঘরে আবার আসবাবপত্র এসেছে। ওর কেবিনটা দ্বিতলে। পিছন দিকে একটা বড় জানালা। ভিন্সেন্ট ঐ জানালার ধারে গিয়ে বসে। ভিতরের উঠোনটার একটা ছবি এঁকেছে। অদ্ভুত ছবিখানা! মানসিক রোগাক্রান্তদের কিছু শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন। অথচ ওদের সাহস করে বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় না। ফলে পাঁচিল-ঘেরা বন্দীশালায় ওরা গোল হয়ে পায়চারি করে। গোল হয়ে ঘুরতে থাকে। সকলের একই রকম পোশাক, একই রকম ভঙ্গি। যেন ঝরাফুলের একটা গোল মালা। তালে তালে পা ফেলে ওরা ক্রমাগত পাক খায়। অনেকগুলি ফিগার এঁকেছে ভিন্সেন্ট। ডানদিকের এক কোণে উন্মাদাগারের তিনজন রক্ষী।

এ ছবিখানা ভিন্সেন্ট ডক্টর ডেভিডসনকে উপহার দিয়েছিল।

মাসখানেক ভিন্সেন্টকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। ওখান থেকে ছাড়া পাওয়ার আগে মিসেস ঊর্মিলা ডেভিডসনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। বোধকরি না হলেই ভাল হত। মিসেস ডেভিডসন যে ফিরে এসেছেন তা ওর জানা ছিল না। সঙ্কোচে প্রশ্নটা সে কাউকে করতে পারেনি, ডক্টর ডেভিডসনকে তো নয়ই।

একদিন নার্স এসে জানালো ভিন্সেন্টকে বড়-সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন। হাসপাতাল থেকে অদূরে ডক্টর ডেভিডসনের কোয়ার্টার্স। সাহেব সেখানেই ছিলেন। বাগানটা পার হয়ে ওঁর ঘরে গিয়ে পৌঁছতেই ডাক্তার সাহেব ওকে আহ্বান করেন,—আসুন, আসুন মিস্টার ভান গর্গ! আপনার জন্য একটি সুসংবাদ আছে।

ভিন্সেন্ট মুখ তুলে দেখতে পায় ডাক-পিয়ন রঘু দাঁড়িয়ে আছে। বলে, —আপকো এক মনি-অর্ডার আসেছে। চালিশ-রূপেয়া।

মাসের মাঝখানে এমন মনি-অর্ডার পেতে অভ্যস্ত নয় ভিন্সেন্ট। কুপনটা পড়ে দেখে দিল্লী থেকে সূরয টাকাটা পাঠিয়েছে। মনি-অর্ডার কুপনে লিখেছে,—'তোমার একটি ছবি বিক্রি হয়েছে। চল্লিশ টাকায়। টাকাটা পাঠালাম।'

অদ্ভুত একটা আনন্দ পেল ভিন্সেন্ট। এই তার জীবনের প্রথম সাফল্য। দশ-পনের বছর ধরে সে একটি ফুলগাছের পরিচর্চা করে চলেছে। জল দিয়েছে, গোড়া খুঁড়ে দিয়েছে, সার দিয়েছে আর দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছে ফুলগাছে কুঁড়ি এল কিনা! আজ তার সেই চারা গাছে প্রথম ফুল ফুটল। এর পর শুরু হবে তার জয়যাত্রা। স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে ভিন্সেন্ট।

রঘুর কাছ থেকে টাকাটা হাত পেতে নিয়ে প্রথমেই তাকে এক টাকা বসশিশ দেয়। তারপর ডাক্তার সাহেবের দিকে একখানা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে বলে, মিষ্টি আনতে দিন, সবাই খাবে!

—একেবারে দশ টাকা? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন ডক্টর ডেভিডসন।

—পুরো টাকাটাই দিতাম। কিন্তু বাকি টাকায় কিছু রঙ আর ক্যানভাস কিনতে হবে। বলেন কি ডাক্তার সাহেব? আজ আমার কতবড় আনন্দের দিন জানেন! আজ প্রথম আমার ছবি বিক্রি হল!

—এর আগে কখনও হয়নি বুঝি?

—না, এই প্রথম।

প্রায় নাচতে নাচতে ভিন্সেন্ট ফিরে আসে তার কেবিনে। সামনে যাকে পায় খবরটা জানায়। কোবাল্ট ব্লু, সিপিয়া, আর ক্রোম-ইয়ালোর টিউবগুলো ফুরিয়েছে। ওগুলো আনাতে হবে। আর কিছু ক্যানভাস। প্রথমেই ধরবে একটা সেল্‌ফ-পোর্ট্রেট। আচ্ছা, কোন্ ছবিখানা বিক্রি হল? সূরযের কাছে দশ-পনেরখানা ছবি আছে। তার ভিতর কোনখানা? সূরযটা চিরকালই একটা ক্যাবলা। আসল কথাটাই জানাতে ভুলেছে। কোন্‌টা বিক্রি হল, কে কিনল তা তো লিখবি! অজ্ঞাত আর্টিস্টের একখানা ছবি নগদ চল্লিশ টাকায় হুট করে কেউ কেনে না। লোকটার নিশ্চয়ই সেটা বিশেষ কারণে ভাল লেগেছে। কী বলেছিল সে? ক্রেতার নামটা পর্যন্ত বলেনি। দিল্লীর কোন ছবির দোকানে সে কি ভিন্সেন্টের ছবিগুলো বিক্রয়ার্থে দিয়েছে? তখনই একটি চিঠি লিখতে বসল ভিন্সেন্ট। ব্যাপারটা জানতে হবে।

কুপনের লেখাটা পুনর্বার দেখবার জন্য সে পকেটে হাত দেয়। তারপর মনে পড়ে সে শুধু টাকাটাই নিয়ে এসেছে—কুপনটা পড়ে আছে ডাক্তার সাহেবের টেবিলে। তখনই উঠে পড়ে। আবার ফিরে যায় ডাক্তার সাহেবের খাস কামরায়। কুপনটা ফিরিয়ে আনতে।

ওঁর দ্বারের সামনে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কথোপকথন কানে আসে। ঊর্মিলা বলছিল,—সত্যি সত্যি ওর ছবি কেউ নগদ চল্লিশ টাকা দিয়ে কিনেছে? আমি তো দেখছি ওর অনেক ছবি—

বাধা দিয়ে ডাক্তার সাহেব বলেন,—ক্ষেপেছ? এটা বোধহয় ওর ভাইয়ের একটা কারসাজি। দাদার জন্যই সে-ই তো সব খরচপত্র করছে। এভাবে একটা চল্লিশ টাকার মনি-অর্ডার করে দাদাকে সান্ত্বনা দিতে চায়। সত্যি সত্যি বিক্রি হলে সে নিশ্চয় সব কথা লিখত। কোন্ ছবিটা বিক্রি হল, কে কিনল—

—সে-সব কথা বলেনি?

—অনর্গল কত আর মিথ্যে কথা লিখবে বল?

একটা তীক্ষ্ণ ছুঁচ কে যেন আমূল বিদ্ধ করে দিয়েছে ভান গর্গের মাথায়। ছি ছি ছি! এমন সহজ সরল কথাটা সে বুঝতে পারেনি! সত্যি সত্যি ছবি বিক্রি হলে সূরয লম্বা চিঠি লিখত না? দাদার মত সেও তো আজ পনের বছর ধরে এই দিনটির প্রতীক্ষা করে আছে! একটা নিদারুণ হাহাকারে ওর মনটা ভরে গেল। চোখ ফেটে জল বার হয়ে আসে। কী মূর্খ সে! ও থেকে আবার দশ টাকা সে সকলকে মিষ্টি খেতে দিল।

লজ্জা! কী অপরিসীম লজ্জা! কেবিনে ফিরে এসে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

ভিন্সেন্ট ভান গর্গের জীবদ্দশায় তার একখানি মাত্র ছবি বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু করুণাময় ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনায় সে-কথা সে জেনে যেতে পারেনি।

এর দিন তিনেক পরে। কেবিনে একা শুয়ে আছে ভিন্সেন্ট, মনে হল কে একখানা হাত রাখল তার কপালে। নার্স এভাবে মাঝে মাঝে ওর কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখত, তাই অভ্যস্ত স্পর্শে চোখ মেলে তাকায়। দেখে ওর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস ডেভিডসন। অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে। অপরাধীর মত।

ভিন্সেন্ট ম্লান হাসে। বলে,—কবে ফিরলেন?

ঊর্মিলা ওর শয্যাপার্শ্বে বসে পড়ে। বলে,—ঘরে আর কেউ নেই ভিন্সেন্ট।

ভিন্সেন্ট চারদিক তাকিয়ে দেখে। বিকেল হয়ে এসেছে। খোলা জানালা দিয়ে পড়ন্ত

রোদ এসে কেবিনের মেঝেতে চতুষ্কোণ একটা আলোর আলপনা এঁকেছে। ঊর্মিলা মেমসাহেবের পোশাকেই সেজেছে ; আজকাল সে শাড়ি পরে না বোধহয়। ভিন্সেন্ট তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ঊর্মিলার সেই চুলের গুচ্ছে অনেকখানি অংশ সাদা হয়ে গেছে। অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত পশ্চিমাকাশে যেভাবে সোনালী মেঘের কোনায় কোনায় এসে লাগে 'প্লাটিনাম ব্লণ্ড' সাদা মেঘের আস্তর। চোখের কোলেও বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে।

ভিন্সেন্ট বলে,—দেখুন তো কাণ্ড! পাগলামি করলাম আমি, আর পালিয়ে বেড়ালেন আপনি!

মিসেস ডেভিডসন একটু ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে। ভিন্সেন্টের হাতখানা তুলে নিয়ে অস্ফুটে পুনরুক্তি করেন,—তুমি আমার কথাটা শুনতে পাওনি, ঘরে আর কেউ নেই!

—শুনেছি। কিন্তু তাতে কি?

—তাহলে এখনও 'আপনি-আপনি' বলছ কেন ভিন্সেন্ট?

—তবে কি বলে ডাকব? ঊর্মিলা?

—না! পঁচিশ বছর আগেই তো একদিন আমার নামের 'লা'টা কোন গাঙে ডুবে গিয়েছিল।

ভিন্সেন্ট হাসতে হাসতে বলে,—কী বোকা ছিলাম আমি! তাই নয়!

ঊর্মিলা বলে,—এভাবে কেন শাস্তি দিলে নিজেকে? আমি ঠাট্টা করেছিলাম, সেটা বুঝলে না তুমি?

—ঈশপের গল্প পড়েছ ঊর্মি? তোমার কাছে যা ছিল ঠাট্টা আমার কাছে তাই সেদিন ছিল জীবনমরণের সমস্যা।

মাথাটা নিচু হয়ে গেল ঊর্মিলার। কোন জবাব যোগালো না মুখরা মেয়েটির মুখে। ভিন্সেন্টই পুনরায় বলে,—তোমার দোষ দিচ্ছি না, ভুল বুঝো না আমাকে। তুমি স্বভাবতই চপল ছিলে। সব কিছুতেই ঠাট্টা-রসিকতায় উড়িয়ে দিতে। তাছাড়া তুমি বারে বারে আমাকে সাবাধানও করেছ। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলে—আমি আকাশকুসুম রচনা করছি। জেনে-বুঝে আগুনে হাত দিয়েছিলাম আমি। আগুন তার স্বধর্ম অনুযায়ী কাজ করে গেছে। দোষ দেব কাকে? দোষ আমি কাউকে দিচ্ছি না।

নিজের ডান হাতের তালুটার দিকে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকে ভিন্সেন্ট।

—কী দেখছ হাতে?

হাতটা মেলে ধরে ঊর্মিলার সামনে। বলে,—জীবনে দুটি নারীকে ভালবেসেছিলাম। তাদের প্রণয়চিহ্ন নিত্যসাথী হয়ে রইল আজীবন! আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলেই তোমাদের দুজনের কথা মনে পড়বে।

—সেও কি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল?

—হ্যাঁ। কারণ সে তখনই বুঝেছিল—আমি পাগল, বদ্ধ উন্মাদ।

—তখনই কি তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে?

—না হলে স্বেচ্ছায় হাতটা এভাবে প্রদীপ-শিখার উপর কেউ ধরে রাখতে পারে?

ঊর্মিলা ধীরে ধীরে ওর হাতের তালুতে হাত বুলিয়ে দেয়।

—আর কোন নারী আসেনি তোমার জীবনে? বিবাহ হয়নি?

—এসেছিল। বাতাসী। সাঁওতাল মেয়ে। দু বছর ঘর করেছি তার সঙ্গে। কিন্তু যে

অর্থে তোমাদের দুজনকে ভালবেসেছিলাম সে অর্থে তাকে ভালবাসিনি।

—আমরা দুজনেই তাহলে ব্যর্থ করে দিয়েছি তোমার জীবন! আজ এ অবস্থায় আমার ক্ষমা চাওয়াটা প্রহসনের মত শোনাবে! না ভিন্সেন্ট?

হঠাৎ উঠে বসে উত্তেজিত শিল্পী। ঊর্মিলার হাতখানা জোরে চেপে ধরে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে,—কে বলেছে, আমার জীবন ব্যর্থ! করুণা করতে এসেছ ঊর্মিলা? দুটো মিঠে কথা বলে সান্ত্বনা দিতে এসেছ আমাকে? শুনে যাও—তোমাদের হাসি, তোমাদের ব্যঙ্গ, তোমাদের বিদ্রূপ আমাকে স্পর্শ করেনি! আমি যা দেখেছি, যা যা বুঝেছি, রঙে আর রেখায় তা বন্দী করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে গেলাম! আমার সে সৃষ্টির মূল্য একদিন কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করতে হবে পৃথিবীকে! আমার জীবন ব্যর্থ নয়!

ডক্টর ডেভিডসনের স্ত্রীর হাতটা আলগা হয়ে যায়। এ যে এখনও বদ্ধউন্মাদ!

ভিন্সেন্ট ওর আতঙ্ক-তাড়িত দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারে ঊর্মিলা কি ভাবছে। কিন্তু থামতে পারে না। সে পুনরায় বলে,—মিসেস ডেভিডসন! একটা কথা মনে রাখবেন। আজ থেকে একশো বছর পরে যদি আপনার নাম কেউ উচ্চারণ করে তবে তা করবে এজন্য নয় যে, আপনি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন, এজন্য নয় যে, আপনার বাড়ি-গাড়ি-সম্পত্তি ছিল, এজন্য নয় যে, আপনি প্রখ্যাত ডাক্তারের সহধর্মিণী ছিলেন, তারা আপনার নাম স্মরণ করবে, কারণ আপনি ছিলেন শিল্পী ভিন্সেন্ট ভান গর্গের প্রথম প্রেম!

ভিন্সেন্টের মুঠি আলগা হয়ে যায়। আবার শুয়ে পড়ে সে। চোখ দুটো বুজে যায় তার। মিসেস ডেভিডসন ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় ঐ বদ্ধউন্মাদের কেবিন থেকে।

মাসখানেক সে ছিল ঐ উন্মাদাশ্রমে। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে এসে উঠল আমার বন্ধুর বাড়িতে। সূরযের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও সে দিল্লীতে গেল না। সূরযও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে আসল সমস্যা কোথায়! সত্যিই দাদাকে এনে সে কোথায় রাখবে? তাছাড়া সাময়িক উত্তেজনায় সে যে-কোন মুহূর্তে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসতে পারে। মাসখানেকের মধ্যেই যে সূরযের বিবাহ হয়েছিল এ সংবাদ আমি কলকাতায় বসে পেলাম। সূরয নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছিল আমাকে।

সূরযের দাদা সেদিন সমস্তদিন একখানা ছবি এঁকেছিল!

নিজের কান নিজের হাতে কেটে ফেলার পর আরও তিন মাস বেঁচে ছিল ভিন্সেন্ট। তার প্রথম মাসটা কাটে হাসপাতালে। বাকি দু মাস আমার বন্ধুর বাড়িতে—ভগলু, রঘুবীর আর সরযূপ্রসাদের তত্ত্বাবধানে। ভিন্সেন্টের সারাটা জীবনই একটানা একটা ব্যর্থতার করুণ ইতিহাস। কোথাও সে দু'দণ্ড শান্তি পায়নি। এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে তরী ভিড়িয়েছে ; টিকতে পারেনি—আবার ভেসে পড়েছে। কিন্তু শেষের এই দু মাস নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেদনাদায়ক।

রাঁচি তখন আর মোটেই ফাঁকা নয়। পশ্চিমের বায়ুবিলাসী ডেংচিবাবুর দল ক্রমাগত আসছেন। ভিন্সেন্টের বাড়ির আশেপাশে যে-সব বাড়ি এতদিন তালাবন্ধ পড়ে ছিল একে একে তার দ্বার খোলা হল। কলরব-মুখরিত পুরুষ-নারী-শিশুর দলে ভরে গেল পাড়াটা। সকাল-বিকাল একঝাঁক প্রজাপতির মত তারা হাওয়া খেতে বার হয়। কখনও দল বেঁধে যায় হুড্রু, কখনও জোন্‌হা। এ তো আনন্দেরই কথা। কিন্তু কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ! দুর্ভাগা ভিন্সেন্টের বরাতে ঐ কৌতুকপ্রিয় কলরব-মুখরিত আগন্তুকরাই দেখা দিল নিষ্ঠুররূপে। ইতিমধ্যে পাগল আর্টিস্টের মুখরোচক ইতিকথা পাড়ায় কারও জানতে বাকি ছিল না। ওর নাম হল—কানকাট্টা!

ভিন্সেন্ট তার রঙ-তুলি-ক্যানভাস নিয়ে বার হয় আর দূর থেকে চেঞ্জারবাবুদের কৌতুকপ্রিয় ছেলের দল ফেউ লাগে। হাততালি দিয়ে ওরা ডাকে, —কানকাট্টা। এই কানকাট্টা।

ভিন্সেন্ট প্রথম প্রথম ভ্রূক্ষেপ করত না, মাথা নিচু করে দ্রুত-পায়ে পরিচিত পাড়ায় গণ্ডিটা অতিক্রম করে যেত। কিন্তু ও-পক্ষও নাছোড়বান্দা—তারাও পিছু পিছু চলতে থাকে পাড়া থেকে বে-পাড়ায়। ক্রমে সমস্ত শহর জেনে গেল কানকাট্টা সেপাইয়ের মজাদার ইতিহাস! সবাই হাসে, কৌতুকবোধ করে। কখনও বয়ঃজ্যেষ্ঠ কেউ হয়তো বালকদলকে হাসতে হাসতে ভর্ৎসনা করে।

ভিন্সেন্ট রাগ করছে না, পাগলামোর কোনও বহিঃপ্রকাশ দেখাচ্ছে না দেখে ছেলের দল হতাশ হয়। ওরা আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। দূর থেকে ঢিল মারে, ধুলো ছিটিয়ে দেয়—পিছন থেকে ধাক্কা মেরে ছুটে পালিয়ে যায়। নিরুপায় ভিন্সেন্ট ওদের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করে। ও যে পাগল নয় এটা প্রমাণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে—ভাব জমাতে চায়, ছবি এঁকে দিতে চায়, গল্প শোনাতে চায়। কিন্তু শিশু দৈত্যের দল তাতে খুশি হয় না। আশাভঙ্গে তারা আরও মরিয়া হয়ে ওঠে। রাঁচিতে এসে পাগল দেখার আনন্দকে ওরা ছাড়বে কেন? ভিন্সেন্ট যেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে—তার পাগলামিকে প্রচ্ছন্ন রেখে!

বাধ্য হয়ে আউট-ডোর পেইন্টিং বন্ধ করে দিল ভিন্সেন্ট। ঘরে বসেই আঁকতে শুরু করে। অবশ্য শীতকালেই আউট-ডোর ল্যাণ্ডস্কেপ জমে ভাল। কিন্তু উপায় কি? ওরা যে সত্যিই পাগল করে ছাড়বে তাকে!

তা ঘরের ভিতরেই কি শান্তিতে আঁকতে দেবে ছোঁড়াগুলো?

শিশুদলের মধ্যে কবিযশপ্রার্থী কেউ ইতিমধ্যে একটা ছড়া বেঁধে ফেলেছে। সাত-সকালে ওরা এসে হাজির হয় বাড়ির আশেপাশে। ক্রমাগত ছড়া কাটে ঃ

'কানকাট্টা কানকাট্টা ডান কানটা কই?
কোন্ পেত্নী গাছে তুলে কেড়েছে তোর মই?
কানটা নিয়ে ভাগল বুঝি!
বৃথাই তারে মরিস খুঁজি!
বাঁ কানটা দে না কেটে, খেতে দেব দই।

ভিন্সেন্ট বুঝতে পারে—এ শুধু শিশুর চাপল্য নয়, এর পিছনে পরিণত বয়সের ছাপ আছে। না হলে হঠাৎ পেত্নীর প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হত না। এই বালখিল্যদলের হাত থেকে কি করে নিস্তার পাওয়া যায়? সরযূপ্রসাদ, ভগলু অথবা রঘুবীর মাঝে মাঝে এসে ওদের তাড়িয়ে দেয়। ওরা ছুটে পালায়। আবার যেই ভগলুরা দূরে সরে যায় ওরা ঘনিয়ে আসে। হাততালি দিয়ে শুরু করে যৌথ-সঙ্গীত ঃ কানকাট্টা কানকাট্টা, ডান কানটা কই?

দিবারাত্র এই ছড়া শুনতে শুনতে ভিন্সেন্টের মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠত। ওর মনে পড়ে যেত জোড়-জাঙালের সেই যোসেফ মুর্মুর কথা। যোসেফ মৃত্যুকে অস্বীকার করেছিল, যোসেফ মরতে চায়নি ; তাই তার ভাগ্যবিধাতা তাকে এমন অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছিলেন যখন মৃত্যুই তার একমাত্র কাম্য ছিল। আজ ভিন্সেন্টের অবস্থাও সেই রকম। মস্তিষ্কবিকৃতির সম্ভাবনাকে সে ঠেকাতে চেয়েছিল, সে পাগল হতে চায়নি—আজ তার ভাগ্যবিধাতা তাকে এমন অবস্থায় পেড়ে ফেলেছেন তার মনে হচ্ছে ঐ বালখিল্যদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় সত্যি পাগল হয়ে যাওয়া।

তখন আর ওদের বিদ্রূপ তার গায়ে লাগবে না।

—'কানকাট্টা কানকাট্টা, ডান কানটা কই?

আর তো পারা যায় না! ভিন্সেন্ট দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়। দু হাতে কান চেপে ধরে বসে থাকে। এ কী বিড়ম্বনা! শিশুর দল কী অপরিসীম নিষ্ঠুরই না হতে পারে!

মাঝে মাঝে ওরা ছন্দ বদলায়। অন্য কোন শিশুকবি একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখে বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছে বোধহয়। সেদিন ওরা হাততালি দিয়ে নতুন সুরে শুরু করে ঃ

'গর্গমশাই গর্গমশাই করছ তুমি কি?
এই দেখ না আমি কেমন ছবি এঁকেছি!
বন্ধু ছিল, নাকটা তাহার কাটতে গিয়েছি ;
কচাৎ করে ভুলেই নিজের কানটা কেটেছি!'

হল না, কিছুই হল না। অথচ চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি ভিন্সেন্ট—নিষ্ঠায় তার কোন ফাঁকি ছিল না। জীবনে কী পেল সে? শুধুই উপেক্ষা, অবহেলা আর বিদ্রূপ! কিন্তু কেন? সে তো এমন প্রকাণ্ড কিছু দাবী করেনি! সে শুধু চেয়েছিল তার অন্তরের আকুতিকে রঙ আর রেখায় মূর্ত করতে। এই দুনিয়ার আলো-বাতাস, গাছপালা, ফুল-ফল-পাখি তার ভাল লেগেছিল—দুনিয়াদারী করতে গিয়ে যে হতভাগা-দলের মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে তাদের জন্য ও দু ফোঁটা চোখের জল ফেলতে চেয়েছিল ; অমর্ত্যলোকের বার্তা পেয়ে যখন তার অন্তর অনির্বচনীয় আনন্দে বিভোর হয়ে গিয়েছিল তখন সে সেই কথা জানাতে চেয়েছিল তার কাগজে আর ক্যানভাসে। তোমাদের তা ভাল লাগেনি। বেশ কথা। তোমরা তা তোমাদের ঘরে সাজিয়ে রেখ না। তার সৃষ্টিও না হয় স্রষ্টার সঙ্গে মুছে যাবে। কিন্তু কেন উপেক্ষার সঙ্গে অপমান যোগ করছ? কেন প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে বিদ্রূপের কষাঘাত চাপিয়ে দিচ্ছ? কী ক্ষতি আমি করেছি তোমাদের?

'—বাঁ কানটাও দে না কেটে খেতে দেব দই!'

দই খাওয়ার লোভে নয়, ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লোভে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় দ্বিতীয় কানটাও ওদের ছুঁড়ে দেয়! তাহলে কি থামবে ওরা? সত্যিই থামবে? পালিয়ে যাবে ওর ঘরের সামনে থেকে? যেমন করে পালিয়ে গিয়েছিলেন মিসেস ডেভিডসন?

'—কোন্ পেত্নী গাছে তুলে কেড়েছে তোর মই?'

সংযমের সব বাঁধন ভেঙে যায়। দুরন্ত ক্রোধে দরজা খুলে হঠাৎ বেরিয়ে আসে ভিন্সেন্ট। ওদের তাড়া করে ধরতে যায়। ওরাও ছুটে পালায়। চিৎকার করে ওঠে,—পাগলা ক্ষেপেছে রে!

ছুটতে ছুটতে চলে যায় ওর নাগালের বাইরে। সেখান থেকে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে। দ্বিগুণ উৎসাহে ওখান থেকে আবার ছড়া কাটে।

—'কানকাট্টা কানকাট্টা, ডান কানটা কই?'

রাগে অপমানে ভিন্সেন্ট থরথর করে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ একটা আধলা ইট এসে লাগে ওর মাথায়।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় ধুলোর উপর। দু হাতে মাথাটা চেপে ধরে। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে ভিন্সেন্ট। আরও কয়েকটা ঢিল এসে পড়ে—মাথায়, মুখে, পিঠে। ভিন্সেন্ট কী করছে জানে না। সে ধুলোর উপরেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। দু হাত ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে তুলে চিৎকার করে ওঠে,—হে ঈশ্বর! আমাকে সত্যিই পাগল করে দাও তুমি!

পরক্ষণেই ওর সম্বিৎ ফিরে আসে। এ কী করল সে! সে না নাস্তিক? সে না ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী? আজ মর্মান্তিক যন্ত্রণায় সব ভুল হয়ে গেল তার। না! ভিন্সেন্ট ভান গর্গ যোসেফ মুর্মু নয়! হার সে মানবে না! আবার উঠে দাঁড়ায়। টলতে টলতে ফিরে যায় তার ঘরের দিকে।

অমনি গুটিগুটি এগিয়ে আসে বালখিল্যের দল ঃ

'গর্গমশাই, গর্গমশাই করছ তুমি কি?
এই দেখ না আমি কেমন ছবি এঁকেছি!
বন্ধু ছিল নাকটা তাহার কাটতে গিয়েছি!
কচাৎ করে ভুলেই নিজের কানটা কেটেছি!

পরদিন ভিন্সেন্ট বসেছিল একখানা সেল্‌ফ-পোর্ট্রেট আঁকতে। আয়নায় নিজের মুখখানা দেখে আঁকবে। নিজের মুখটা দেখেই মনটা খিঁচড়ে যায়। ডান কানটা কাটা! কানকাটা সেপাই! ক্ষণিক উন্মাদনায় সে নিজেই নিজের কান কেটেছে। সে লজ্জার কথা দুনিয়া ভুলে যাবে দুদিন পরে—যেদিন মাটির তলায় ওরা শুইয়ে দেবে ব্যর্থ-আর্টিস্ট ভান গর্গকে। কিন্তু এ-কথা তো নিশ্চিত যে, একদিন পৃথিবী নতমস্তকে স্বীকার করবে তার সৃষ্টিকে। আজ সে যদি সেল্‌ফ-পোর্ট্রেট আঁকে তাহলে ওর লজ্জার ইতিহাসটাও শাশ্বত হয়ে থেকে যাবে পৃথিবীতে। সে ভুল ও করবে না। নিজের ছবি সে আর আঁকবে না। আচ্ছা, কতদিন বাঁচবে সে? তা কে বলতে পারে? মিকেলাঞ্জেলো বা তিশান নব্বই বছরের কাছাকাছি বেঁচে ছিলেন। ক্লোদ, গোইয়া, কোরো আশী বছরের চেয়েও বেশিদিন এঁকে গেছেন ছবি। প্রথম দরের শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সে মারা যান রাফাইল, মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। অর্থাৎ ভিন্সেন্টের বর্তমান বয়সে। কিন্তু এত কম বয়সে নিশ্চয় মারা যাবে না সে! মৃত্যুর পদধ্বনি এখনও শোনা যাচ্ছে না। অনেক দূরে সে দিন। দশ-বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ বছর! অনেক, অনেক ছবি আঁকতে হবে ইতিমধ্যে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের ছবির পাশে থরে থরে একদিন সাজানো হবে সে-সব ছবি। আচ্ছা, সেই পরিণত বয়সে ভিন্সেন্টকে কেমন দেখতে হবে? দাড়িওয়ালা লিওনার্দোর মত, না কি তোবড়ানো গাল মিকেলাঞ্জেলোর মত?

হঠাৎ ওর মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল। নিজের প্রতিকৃতি তো সব বড় জাতের আর্টিস্টই এঁকেছেন! লিওনার্দো, মিকেলাঞ্জেলো, তিশান, রেমবান্ট, মায় গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল পর্যন্ত সেল্‌ফ-পোর্ট্রেট এঁকেছেন দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখে। ভিন্সেন্ট নূতন কিছু করবে। মনের মুকুরে সে দেখবে অনাগত ভবিষ্যতে নিজের পরিণত রূপ! আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর পরে ওর অশীতিতম জন্মদিনে ওকে কেমন দেখতে হবে তাই ফুটিয়ে তুলবে রঙে আর রেখায়। ততদিনে সে নিশ্চয়ই স্বীকৃতি পাবে!

কল্পনায় ভিন্সেন্ট দেখতে থাকে ছবিটা। ভিন্সেন্টের অশীতিতম জন্মোৎসবে সমবেত হয়েছেন দেশের জ্ঞানীগুণী শিল্পীবৃন্দ। মাঝখানে একটা পিঠ-উঁচু ভিক্টোরিয়ান চেয়ারে বসে আছেন জ্ঞাননির্ধূতকল্মশ অশীতিপর ভান গর্গ ; তাঁর কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় থরে থরে শ্বেতপদ্মের মালা। একপাশে ভক্তের দল সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর পাশে কয়েকটি তরুণী এসেছে মাঙ্গলিকী নিয়ে। শঙ্খধ্বনি করছে, বরণ করছে, শ্রদ্ধার্ঘ্য নামিয়ে রাখছে। চিত্রের কেন্দ্রবিন্দু ঐ জ্ঞানবৃদ্ধ শিল্পী! না! ছবিটা সে তিন ধাপে আঁকবে। তিনতলা ছবি। অজন্তার সপ্তদশ বিহারে অন্তরালের বাঁ-দিকের প্রাচীরে যেমন আছে

বুদ্ধদেবের ত্রিতল চিত্র-সম্ভার। একতলায় সিংহাসনে আসীন বুদ্ধদেব। তাঁর দক্ষিণে রাজন্যবর্গ—বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ, আর বামে শিষ্যের দল—সারিপুত্র, মহা-মোগল্ল্যায়ন, আনন্দ প্রভৃতি। দ্বিতলে দেখা যায় বুদ্ধদেব ত্রি-ত্রিংশস্বর্গের সোপান বেয়ে মর্ত্যে নেমে আসছেন, আর ত্রিতলে সর্বোচ্চস্তরে অজন্তা-শিল্পী এঁকেছেন স্বর্গের দৃশ্য। সুরসুন্দরী এবং দেবগণের মাঝখানে সদ্ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন গৌতম বুদ্ধ।.... ঐ রকম ত্রিতল চিত্রের মাধ্যমে ভিন্সেন্ট ভান গর্গ রেখে যাবে এক শাশ্বত কীর্তি—তার অনাগত ভবিষ্যৎ-জীবনের এক আলেখ্য। সর্বনিম্ন স্তরে শিল্পীর অশীতিতম জন্মোৎসব, দ্বিতীয় স্তরে ভিন্সেন্টের মৃত্যু! মাঝের ছবিটার কম্পোজিশান হবে অজন্তার ঊনবিংশতিতম গুহায় মহাপরিনির্বাণ বাসরিলিকের মত। অনুগ্রাহী ভক্তের দল হাহাকার করছে! আর সর্বোচ্চস্তরে দেখা যাবে, স্বর্গে একদল দেবদূত মেঘের উপর থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখছেন মর্ত্যের দৃশ্য। তাঁরা অপেক্ষা করছেন নূতন আগন্তুক অতিথির! তাঁরা কারা?—ঐ লিওনার্দো, মিকেলাঞ্জেলো, তিশান, এল গ্রেকো, রেমব্রান্ট, রুবেন্স, ভেলাসকেথ, গোইয়া, মানে, মনে, দেগা...

ভিন্সেন্ট ছবি আঁকে আত্মহারা হয়ে। তৎক্ষণাৎ সে নিয়ে বসে রঙ-তুলি-ক্যানভাস। সর্বনিম্ন স্তরের ছবিখানা তখনই আঁকতে বসে। অশীতিপর বৃদ্ধ ভিন্সেন্ট ভান গর্গের সম্বর্ধনাসভার চিত্র। সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছেন শিল্পী, সকলের স্বীকৃতি পেয়েছেন, শ্রদ্ধা পেয়েছেন—বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে!

কিন্তু ওরা কি দেবে অনাগত ভবিষ্যতের সে রঙিন কল্পনায় মগ্ন হতে? ভবিষ্যতের সাফল্যকে পিছন থেকে টেনে ধরে বর্তমানের বিদ্রূপ ঃ

'কানকাট্টা কানকাট্টা ডান কানটা কই?
কোন্ পেত্নী গাছে তুলে কেড়েছে তোর মই?

একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় বারে বারে। বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাত দুটি জোড় করে বলে,—অন্তত একটা দিন আমাকে রেহাই দাও ভাই! আজ আমাকে একটা ছবি আঁকতে দাও! কাল এসে আমাকে খেপিও ; আমি কিছু বলব না!

ওরা হাততালি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে।

—পাগলা ছবি আঁকবে রে! গর্গমশাই করছ তুমি কি? এই দেখ না আমি কেমন ছবি এঁকেছি!

হতাশ হয়ে ফিরে আসে ভিন্সেন্ট। জানালাটা বন্ধ করে দেয়। যতটা এড়ানো যায় ঐ মর্মভেদী শব্দ! কিন্তু জানালা বন্ধ করলে আলোও কমে যায়। তবু উপায় নেই।

সমস্ত দিন ধরে ভিন্সেন্ট ছবি আঁকল। শেষ করল তার অশীতিতম জন্মদিনের চিত্র ! সমস্ত দিনই ওরা ছড়া কাটল তীক্ষ্ণ স্বরে, পালা করে। ভিন্সেন্ট স্বজ্ঞানে কিছু আঁকেনি। আচ্ছন্নের মত মন যা চেয়েছে তাই এঁকে গেছে। ডান হাতের উপর তার অধিকার হারিয়ে গেছে যেন।

সন্ধ্যাবেলায় ছেলের দল ক্লান্ত হয়ে ফিরে গেল। ভিন্সেন্টও ক্লান্ত হয়ে উঠে পড়ে। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। সমস্ত দিনমান যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। যেন আজই তার অশীতিতম জন্মোৎসব পালন করা হল। যেন সারাটা দিনমান ওর অন্ধ ভক্ত আর স্তাবকের দল বাইরের বাগানে ওর জয়ধ্বনি দিয়েছে। এখন উৎসব-শেষে শ্রান্তদেহে ও বিশ্রাম খুঁজছে।

লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে সরযূপ্রসাদ ঢুকল ঘরে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বাইরে।

হঠাৎ লণ্ঠনটা তুলে ধরে সরযূপ্রসাদ সদ্য-সমাপ্ত ছবিখানা দেখল। ওর মহোত্তম শিল্পের প্রথম দর্শক। ভিন্সেন্ট অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। সরযূ কী বলে শুনতে হবে। অনেকক্ষণ ছবিটা নিরীক্ষণ করে অবশেষে সরযূপ্রসাদ তার মতামত প্রকাশ করে,—ইয়ে বুড্ঢা রোতে কেঁও?

রোতে কেঁও? কাঁদছে? কে? সাফল্যের আনন্দে অশীতিপর বৃদ্ধ ভিন্সেন্ট ভান গর্গ কি কেঁদে ফেলেছেন? অসংখ্য ভক্ত আর স্তাবকের মাঝখানে সে অশীতিতম জন্মদিনে বৃদ্ধ ভান গর্গের চোখে আনন্দাশ্রু এঁকেছে নাকি? ভিন্সেন্ট জবাবে বলে, —দূর বোকা! কাঁদবে কেন? ও তো হাসছে! দ্যাখ না ভাল করে—

—আপ দেখিয়ে না?

আলোটা উঁচু করে ধরে সরযূপ্রসাদ।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভিন্সেন্ট। যেন ছবিটা এই প্রথম দেখছে সে! কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! এ কী এঁকেছে ভিন্সেন্ট! কোথায় তার ভক্ত স্তাবকের দল? সেই বরণমালা হাতে, শঙ্খ হাতে, চন্দনের বাটি হাতে মেয়ের দল কোথায় গেল? এ ছবি কে এঁকেছে?

ক্যানভাস জুড়ে একটি মাত্র বৃদ্ধের ছবি। হাতলহীন চেয়ারে বসে আছে দু হাতে মুখ ঢেকে। নিরতিশয় ব্যর্থতায়, অপমানে ভেঙে পড়েছে বৃদ্ধ। পরনে তার কয়েদীর পোশাক। কয়েদী? না। ওটা উন্মাদাগারের সেই বিচিত্র নিকার-বোকার! বৃদ্ধ উন্মাদ দু হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদছে। ঘরে আর কেউ নেই, কিছু নেই! শুধু ধিকিধিকি জ্বলছে ফায়ার-প্লেসে ফেলে-আসা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার তুষানল!

একটা আর্তনাদ বের হয়ে এল সাঁইত্রিশ বছর বয়সে ভিন্সেন্টের কণ্ঠনালী থেকে—অশীতিপর ভিন্সেন্টের দুর্দশা সে সইতে পারল না!

সমস্ত রাত ঘুম এল না ভিন্সেন্টের। পায়চারি করে ফিরল বারান্দায়। এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ? আজ সে সুস্থ সবল আছে, কিন্তু পূর্ণিমা আসতে আর মাত্র দিন সাতেক বাকি। তিন মাসের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। এবার মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে সে কি করবে? উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে যাবে রাস্তায়? আত্মহারা হয়ে কি খুন করে বসবে প্রতিবেশীর ঐ সাত বছরের বাচ্চাটাকে? বিচিত্র নয়! সাতদিন পরে সে হয়তো ওদের বিদ্রূপে উন্মাদ হয়ে ছুটে বেরিয়ে আসবে বাগানে। ঐ ফুটফুটে বাচ্চাটা হয়তো ছুটে পালাতে পারবে না,—হুমড়ি খেয়ে পড়বে লাল-কাঁকরের রাস্তার উপর। আর বদ্ধ উন্মাদ ভিন্সেন্ট ভান গর্গ ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মত ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে তার উপর। হয়তো দু'হাতে টিপে ধরবে ওর সরু কণ্ঠনালী, হয়তো উপড়ে নেবে ওর চোখ দুটো, হয়তো—আঃ!

—ঈশ্বর! এ কী করলে তুমি! আমি শিল্পী হতে চেয়েছিলাম! তুমি আমাকে নররাক্ষস করে তুলেছ!

না না! ঈশ্বর নেই! ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়ে লাভ নেই! সে একটা ব্যাধিতে ভুগছে। সাতদিন পরে নিজের উপর তার কোন অধিকার থাকবে না। সে কী করবে, কী বলবে সে জানে না। আজই বা তাই জানে নাকি? এই যে সারাটা দিনমান সে যে ছবিখানা এঁকেছে, তা কি স্ব-ইচ্ছায়? এখন তো সে উন্মাদ নয়, তবু তার ডান হাতখানা তো স্বেচ্ছাচারিতা করে গেছে, নির্বিচারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! সে আঁকতে চেয়েছিল তার পরিণত জীবনের সাফল্যের চিত্র—তার ব্যভিচারী হাত এঁকে বসল চরম ব্যর্থতার ছবি! শিল্পী যদি নিজের ইচ্ছানুসারে শিল্পসৃষ্টি করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে তবে তার বেঁচে

থাকার কী অর্থ? এর পর স্বেচ্ছাচারী ডান হাতখানা তার নির্দেশ অমান্য করে হয়তো এমন সব ছবি এঁকে যাবে—যা সে আঁকতে চায় না, যার বিষয়বস্তু তার অন্তরের নির্দেশে রূপায়িত নয়! লোকে বলবে, ভান গর্গের ভীমরতি হয়েছে—এত নিম্নস্তরের ছবি সে এঁকেছে? আলুর ভোজ, সিঙারণের সেতু, জোড়-জাঙাল গীর্জা, সূর্যমুখী, পোস্টম্যানের আলেখ্য, পাগলা-গারদের প্যারেডের দৃশ্য এঁকেছে যে হাত, সেই হাতই এমন অশ্লীল কদর্য ছবি আঁকতে পারে!

না, না, না! সে দুর্ঘটনা ঘটতে দেবে না ভিন্সেন্ট! কিছুতেই নয়!

—সূরয তুমি আমাকে ক্ষমা কর। বিশ্বাস কর, মরতে আমি চাইনি, মরতে আমি চাই না! কিন্তু আমার উপায় নেই। ডান হাত অন্যায় করলে তাকে আমি শাস্তি দিতে পারি—কিন্তু 'মন'কে আমি ধরব কোন্ প্রদীপ শিখায়? তাই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবার আগে আমি সজ্ঞানে নিজে হাতে টেনে দিতে বাধ্য হলাম এ-জীবনের যবনিকা! মিকেলাঞ্জেলো, তিশান, গোইয়ার মত পরিণত বয়সে শিল্পসৃষ্টি করার ভাগ্য নিয়ে আমি আসিনি। ক্ষতি কি তাতে? রাফাইল তো সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই অমর হয়ে আছেন। আমিও তাই থাকব।

বিদায় সূরয! বিদায় পৃথিবী!

যথানিয়মে সকালবেলা সেজেগুজে গরম জামা পরে বালখিল্যের দল এল পাগলাকে খেপাতে। কিন্তু ছড়া কাটার সুযোগ পেল না তারা। আজকের লুকো-চুরির খেলায় পাগলা তাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। প্রতিবেশীর সেই সাত বছরের ছেলেটা—যাকে বাঁচাতে ভিন্সেন্ট এই শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই প্রথম আবিষ্কার করল তার দেহটা। চিৎকার করে উঠল সে।

বারান্দার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে ভিন্সেন্ট। মাথাটা ঝুলছে বারান্দার ধার থেকে। আর ঝুলে পড়েছে তার বিশ্বাসঘাতক ডান হাতখানা। সেই হাতের একটা শিরা পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলছিল ভিন্সেন্ট। রক্তের ধারা নেমে এসেছে সান-বাঁধানো মেঝে থেকে সিঁড়িতে—বাগানের ফুলে-ভরা সূর্যমুখী ফুলের গাছগুলোর দিকে—বিসর্পিল রেখায়। ক্রমাগত রক্তক্ষরণে নিস্তেজ হয়ে সে লুটিয়ে পড়েছে মেঝের উপর। মাঘের শীতে তার শরীর হিম হয়ে পড়ে আছে!

তবু দুর্জয় তার প্রাণশক্তি! এর পরেও তিনদিন বেঁচে ছিল। খবর পেয়ে দিল্লী থেকে আবার ছুটে এসেছিল ওর ছোটভাই সূরযভান।

দেড়দিন পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভিন্সেন্ট দেখতে পেল তাকে। ম্লান হাসল ভিন্সেন্ট। অস্ফুটে বললে,—আশ্চর্য সূরয! যখনই তোর জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠেছে তখনই চোখ মেলে দেখি তুই বসে আছিস! সেই কান কাটার দিনটার কথা মনে আছে সূরয?

শেষ বারো ঘন্টা সূরয একাই বসে ছিল মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে।

শিশুদৈত্যের দল আর ছড়া কাটতে আসেনি। তারাও ওকে মুক্তি দিয়েছিল। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল ভিন্সেন্ট কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান ছিল তার। সূরযকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল ঃ দুঃখ করিস না রে! এই ভাল হল! এ ছাড়া পথ ছিল না!

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সূরয। প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়নি।

—আমার ছবিগুলো সব যত্ন করে রেখে দিস! বিশ্বাস রাখিস—যাবার আগে বলে গেলাম—একদিন না একদিন ওর দাম পৃথিবীকে কড়া-ক্রান্তি হিসাবে মিটিয়ে দিতে হবে!

সূরয ওর হাতখানা ধরে শুধু বলেছিল,—চুপ কর, দাদা!

—এখনই চুপ করব রে। শুধু একটা কথা কানে কানে বলে যাই। এ আমার অন্তিম ইচ্ছা। তোর ছেলে হলে তার নাম রাখিস ভিন্সেন্ট ভান গর্গ। আমি আবার ফিরে আসব ; তোর ছেলে হয়ে জন্মাব, নামটাও তাই রাখিস।

সূরয ওর হাতখানা ধরে শুধু বলেছিল,—চুপ কর, দাদা!

প্রদীপ নেববার আগে একবার শেষবারের মত দপ্ করে জ্বলে ওঠে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তেমনি হঠাৎ উঠে বসতে চেয়েছিল ভিন্সেন্ট। শূন্য দ্বারপথে সে কোন অপার্থিব মূর্তি দেখতে পেয়েছিল। বললে,—ঐ, ঐ ওরা এসেছে।

সূরয সচকিত হয়ে দ্বারের দিকে তাকায়। কেউ নেই সেখানে। ভিন্সেন্ট চিৎকার করে ওঠে,—কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?...শিবলোক, বৈকুণ্ঠ? ওসব আমি বিশ্বাস করি না। না, আমি যাব না!...এরা আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে থাকে তাতে তোমাদের কি?...হ্যাঁ হ্যাঁ, কতবার বলতে হবে?...আমি এই পৃথিবীতেই আবার জন্মাতে চাই! আবার এই নরক-যন্ত্রণা সইতে চাই সর্বাঙ্গ দিয়ে!...তাতে তোমাদের কি? ঐ সূরযের বৌয়ের কোলে ফিরে আসব আমি! যাব না! না,—আমি কিছুতেই যাব না তোমাদের সঙ্গে!

এই তার শেষ কথা।

যাব না, যাব না, বলতে বলতেই চলে গেল সে!

কাহিনী শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলে দ্বৈপায়নদাদু।

বুঝতে পারি, বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ। চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাঁচটা মুছতে মুছতে বলেন,—নরেন, তুমি কি ভান গর্গের জীবনী লিখবে, না উপন্যাস?

—না, জীবনী নয়, উপন্যাসই লেখবার ইচ্ছে আছে আমার। কেন বলুন তো?

—তাহলে এবার যে কথাটা বলছি সেটা তোমার বইতে লিখ না। ভিন্সেন্টের শেষ ইচ্ছাটাও করুণাময় পূরণ করেনি! ভিন্সেন্টের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে পারেনি সূরয। সে উন্মাদ হয়ে যায়। মাত্র ছ মাসের মধ্যে বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় সে মারা যায়। ওর সদ্য-বিবাহিত স্ত্রী তার চিতাভস্ম নিয়ে এসে ভিন্সেন্টের কবরের পাশে প্রোথিত করে। দুই ভাইয়ের সমাধিক্ষেত্রে একটি আইভিলতা রোপন করে দেয়। তাই বলছিলাম, ভিন্সেন্ট ভান গর্গের নামটা পর্যন্ত টিকে থাকতে দেননি ঈশ্বর।

আমি অবাক হয়ে বলি,—একথা আমার বইতে লিখতে বারণ করছেন কেন?

—কারণ তোমার পাঠক হয়তো বিশ্বাস করবেন না—ট্রুথ ইস্ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্শান ; ভাববেন ছ মাসের মধ্যে সূরযের উন্মাদ অবস্থায় মৃত্যুটা সাহিত্যের বিচারে করুণরসের একটা ওভারডোস! যদি জীবনী লিখতে তাহলে কোন কথা ছিল না—কারণ ভিন্সেন্ট ভান গর্গের ভাইয়ের এটাই হচ্ছে সত্য ইতিহাস।

—এরপর দীর্ঘ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ব্যবধান দিয়ে শুরু করি—

আমি দ্বৈপায়নদাদুকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম,—আপনার গল্প কি এখনও শেষ হয়নি?

—তুমি কি ভেবেছিলে, শেষ হয়ে গেল সব কথা?

—তাই তো ভেবেছিলাম। বটুকেশ্বর দেবনাথ বরিশালে ফিরে গেলেন, গগন পাল দেশত্যাগী হলেন আর ভান গর্গ উন্মাদ অবস্থায় আত্মহত্যা করলেন—এরপর আর বাকি থাকল কে?

—বাকি থাকল দ্বৈপায়ন লাহিড়ী। ভূষণ্ডী কাকের মত আশী বছর বয়সে সে আজও টিকে আছে।

আমি লজ্জা পাই।

দ্বৈপায়নদাদু কিন্তু থামলেন না, বলে চলেন,—শিল্পীর শেষ আছে, শিল্পের শেষ নেই। গল্প আমার শেষ হয়নি। বটুকেশ্বরের সঙ্গে তার শেষদিন পর্যন্ত আমার পত্রালাপ অব্যাহত ছিল। বরিশাল থেকে মাঝে মাঝে তার চিঠি পেতাম। তার পরিবারে ফিরে গিয়েছিল সে। বাপ-মা তাকে গ্রহণ করেছিলেন। সে আর বিবাহ করেনি কোনদিন। সুলেখাকে সে ভুলতে পারেনি সারাজীবন। মহাজনী কারবারে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিল। ছবি আর কখনও আঁকেনি সে। দেশ স্বাধীন হবার আগেই সে মারা যায়। বরিশালেই।

গগ্যার খবরও আর পাইনি। একটি বিদেশী জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়ে সে কোন্ সুদূরে পাড়ি জমায় এটুকু জেনেছিলাম। তারপর আর বিশ-ত্রিশ বছর তার খবর রাখিনি। তবু অদ্ভুতভাবে গগনের শেষ-জীবনের কাহিনীটা আমার গোচরে এল। অনেক—অনেক দিন পরে। সেটা বোধহয় উনিশশো তিপ্পান্ন সাল। হঠাৎ বিলাতি ডাকটিকিট দেওয়া একটা খাম এল আমার নামে। অভাবনীয় ব্যাপার! চিঠিখানা লিখেছেন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একজন মার্কিন ভদ্রলোক—প্রফেসর রবার্ট ম্যাক্‌গ্রেগরী। একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডীন অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিস'। সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। মার্কিন মুলুকের একজন বিশ্ববিশ্রুত কলারসিক—'আর্ট-কনৌসার'। লিখেছেন—"নিতান্ত ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছি আপনার সঙ্গে মিস্টার গগন পাল আর্টিস্টের পরিচয় ছিল। গগনবাবুর পুত্র, বর্তমানে ঢাকা-নিবাসী মিস্টার আর. জি. পাল অ্যাডভোকেট আমাকে জানিয়েছেন যে, আপনি তাঁর সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে অনুগ্রহ করে শিল্পীর বাল্যজীবন সম্বন্ধে আপনার যেটুকু জানা আছে তা আমাকে জানাবেন কি? তাঁর শিল্পকর্ম কোথায় দেখতে পাওয়া যেতে পারে তাও জানাবেন।

আপনার উত্তর পেলে কলকাতাস্থিত আমেরিকান কন্‌স্যুলেটকে আমি অনুরোধ করব আপনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে।"

আমি তো আকাশ থেকে পড়ি। গগন পালের বাল্যজীবন সম্বন্ধে ক্যালিফোর্নিয়ার শিল্প-বিশারদ আগ্রহী! গগ্যার খবর তিনি কোথায় পেলেন? গগ্যার ছেলের সন্ধানই বা তিনি জানলেন কেমন করে? বাবলু তাহলে অ্যাডভোকেট হয়েছে? সেই হাফ-প্যাডেল করা বাবলু! যাই হোক জবাবে আমি লিখলাম,—"গগন পাল আমার সতীর্থ ও বন্ধু। তার জীবনের অনেক কিছুই আমি জানি। উনিশশো চব্বিশ সালে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি। তারপর সে কোথায় আছে আমি জানি না। তার শিল্পকর্মও কোথায় আছে তা আমার অজ্ঞাত। তবে তার আঁকা একটি অয়েল-কালার আমার কাছে আছে। সেটা আমি নিলামে কিনেছিলাম।"

ম্যাক্‌গ্রেগরী পত্রপাঠ জবাব দিলেন,—"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনার বন্ধু জীবিত নেই। তাঁর ছবিখানি আপনি কোনক্রমেই হস্তান্তরিত করবেন না। ঘটনাচক্রে আগামী মাসে এখান থেকে ওঙ্কারভাট, বরভুদর যেতে হবে আমাকে। সেই সময় ভারতবর্ষে যাবারও চেষ্টা করব। সম্ভব হলে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

মাসছয়েক পরে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বছর পঞ্চাশ বয়স। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। ইতিপূর্বে আরও দুবার ভারতবর্ষে এসেছেন! অজন্তা-খাজুরাহো-সাঁচি-মহাবলিপুরম চষে বেড়িয়েছেন। সৌজন্য-বিনিময়ের পরে বলেন,—কই, নিয়ে আসুন আপনার বন্ধুর ছবিটা!

যখন আমি ছবিখানা দ্বিতলের ঘর থেকে নামিয়ে আনলাম তখন উনি সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত। আমি ছবিটা জানালার সিলের উপর রাখি ; ভদ্রলোক কয়েক পা পিছু হটে এলেন। একদৃষ্টে ছবিখানা দেখতে থাকেন। নির্বাক নিস্পন্দ। না টানলে একটা সিগারেট আদ্যন্ত পুড়তে কতক্ষণ লাগে? অতটা সময় ছবিখানা দেখেছিলেন। যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন আঙুলে আগুনের ছেঁকা লাগায়।

—য়ায়াম সরি! ইতিমধ্যে সিগারেটের লম্বা ছাই ঝরে পড়েছে মেঝের কার্পেটে। স্টাম্পটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে উনি দ্বিতীয় একটি সিগারেট ধরান। আমার দিকে ফিরে বলেন,—আপনি কি এই ছবিটা বিক্রি করতে সম্মত? আপনি চিঠিতে লিখেছিলেন এটি আপনি নিলামে কিনেছেন—এ কোন উপহার নয় ; তাই প্রশ্ন করছি।

—এ ছবি নিয়ে আপনি কি করবেন?

—কোন একটি সংগ্রহশালায় রাখব।

আমি বলি,—প্রফেসর ম্যাক্‌গ্রেগরী, আমার বন্ধু এ দেশে তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাননি। এ ছবিটি অতি অল্প দামে কিনেছিলাম আমি। আপনি যদি একে কোন বিখ্যাত সংগ্রহশালায় রাখতে চান আমি বাধা দেব না। আপনি এখানা নিয়ে যান।

—কত দাম দিতে হবে?

আমি হেসে বলি,—আমি ছবির কি বুঝি? আপনি আর্ট-কনৌসার। এ ছবির ন্যায্য দাম যা হওয়া উচিত তাই দেবেন।

কৌতুক উপচে পড়ে অধ্যাপকের চোখ দুটিতে। বলেন,—বর্তমানে আমি আর্ট-কনৌসার নই, সামান্য খরিদ্দার মাত্র। আপনি ছবিটি নিলামে কিনেছেন, তাই ন্যায্য দর না জানলেও ওর বাজার-দরটা আপনি জানেন!

শিল্পীরা আত্মভোলা হয়। শিল্প-বিশারদরা সে জাতের নয় তাহলে!

—তবে একটা কথা আপনাকে আগেই বলে রাখা উচিত। আমি আপনাকে ঠকিয়ে নিয়ে গেছি একথা যেন আমাকে শুনতে না হয়। তাই প্রথমেই বলে রাখছি—ছবিটি মূল্যবান। আপনি বুঝেসুঝে দর দিন ডক্টর লাহিড়ী।

আমি ফস্ করে বলে বসি,—পাঁচশ টাকা দামটা কি খুব বেশি হবে?

প্রফেসর আমার কথার জবাব দিলেন না। তিনি তৈরী হয়েই এসেছিলেন। হাতব্যাগ খুলে পঞ্চাশখানি একশো টাকার নোট টেবিলের উপর রেখে বলেন, এক হাজার ডলার এর মিনিমাম্ প্রাইস্!

আমি স্তম্ভিত!

একটি পোর্টেব্‌ল্ টেপ-রেকর্ডার আমার টেবিলের উপর রাখেন। মাউথ-পীসটা আমার মুখের সামনে বাড়িয়ে ধরে বলেন,—আর্টিস্ট গগন পাল সম্বন্ধে আপনি যা জানেন এবার বলে যান।

আমি বলি,—আগে আপনি বলুন গগন পালকে কেমন করে চিনলেন আপনি! কেনই বা ওর বিষয়ে এত উৎসাহ আপনার!

প্রফেসর ম্যাক্‌গ্রেগরী বলেন,—ডক্টর লাহিড়ী, আমিও আপনাকে একটি চমকপ্রদ কাহিনী শোনাব ; কিন্তু সেটা পরে। আমি চাই সেকথা না জেনে খোলা মনে আপনি আপনার বন্ধুর সম্বন্ধে যা জানেন তা বলে যান। তার শেষ জীবনের কথা জানা হয়ে গেলে তার জীবনের প্রথম অধ্যায়টা ঠিকমত বলতে পারবেন না আপনি।

অগত্যা গগন পাল সম্বন্ধে আমার স্মৃতির ঝাঁপি খুলে ধরলাম। স্কুলজীবনের নানান খুঁটিনাটি। পড়াশুনায় সে ভাল ছেলে ছিল না। ক্লাসে সে-ই ছিল বয়ঃজ্যেষ্ঠ। তারপর আমরা একসঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলাম। গগন এর আগেও দুবার ঐ পরীক্ষা দিয়েছিল, পাস করতে পারেনি। এবার পরীক্ষার পর আমরা ক বন্ধু কোম্পানির বাগানে কেমন করে সেই সন্ন্যাসী দর্শন করতে গিয়েছিলাম তাও বললাম। সন্ন্যাসী তুলসীদাসজীর একটি দোঁহা শুনিয়েছিলেন—'তেরা বনৎ বনৎ বনি যাই ; তেরা বিগড়ি বনৎ বনি যাই।' চন্দ্রভানকে বলেছিলেন,—যবন কাঁহাকা!

বাধা দিয়ে ম্যাক্‌গ্রেগরী বলেন,—দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার এই বন্ধু চন্দ্রভান গর্গ কি পরে খ্রীষ্টান হয়ে যান!

—হ্যাঁ। সেও পরবর্তী জীবনে চিত্রকর হতে চেয়েছিল। তার নাম হয়েছিল ভিন্সেন্ট ভান গর্গ। বেচারীর ছবি কোন সমাদর পায়নি।

প্রফেসর বললেন,—আপনি খবর রাখেন না ডক্টর লাহিড়ী। আপনার বন্ধু ভিন্সেন্ট ভান গর্গ অতি সম্প্রতি পশ্চিম-জগতে একজন স্বীকৃত মহাশিল্পী। আমার কাছে তাঁর এ পর্যন্ত উদ্ধার-পাওয়া আটচল্লিশখানি ছবির হিসাব আছে। সাতটি অরিজিনাল এ পর্যন্ত আমি নিজে দেখেছি। বাকিগুলি য়ুরোপে ও আমেরিকায় আছে—

আমি অবাক হয়ে বলি,—কী বলছেন আপনি! চন্দ্রভানের কোন্ ছবি আপনি দেখেছেন? তার ছবি য়ুরোপে আছে মানে? কেমন করে গেল সেখানে? নিশ্চয় আপনার ভুল হচ্ছে! সে আমার বন্ধু চন্দ্রভান নয়।

—আমি দেখেছি—আলুর ভোজ, সিঙারণের সেতু, সূর্যমুখী, ইলিশমাছের ঝুড়ি, একটি গীর্জা, খান দুই সেল্‌ফ-পোর্ট্রেট।

—কী আশ্চর্য! ওর এসব ছবি কোথায় আছে?

—পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত সংগ্রহশালায়। আম্‌স্টার্ডাম, জুরিখ, ওটের্লো, মস্কো, লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারী, প্যারীর লুভার সংলগ্ন ইম্প্রেশনিস্ট মিউজিয়ামে।

আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করতেও ভুলে যাই। অধ্যাপক বলেন,—আর্টিস্ট ভান গর্গের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আমি পড়েছি। লিখেছেন মিসেস ডেভিডসন ; তিনি ছিলেন ওঁর চিকিৎসকের স্ত্রী। লেখাটা আমেরিকান আর্ট-জার্নালে ছাপা হয়েছিল। অদ্ভুত জীবনী! ভদ্রলোক সমস্ত জীবন অর্থকষ্টে কাটিয়েছেন ; অথচ তাঁর যে-কোন একখানি ছবির আজ যা বাজার-দর তাতে সারাজীবন তিনি পায়ের উপর পা দিয়ে কাটাতে পারতেন।

আমি তখনও কথা বলতে পারছি না। মনে পড়ে যাচ্ছে কত কথা! বিশেষ করে ভিন্সেন্টের সেই উক্তিটি,—'তুমি কি আমাকে করুণা করতে এসেছ ঊর্মি? সহানুভূতি জানাতে এসেছ?

শুধু ধ্রুবানন্দ অগ্নিহোত্রী একাই নন, ভিন্সেন্টও ছিল ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। সে বলে গিয়েছিল —একদিন পৃথিবী নতমস্তকে স্বীকার করবে তার সৃষ্টিকে।

—তারপর বলুন?

আবার শুরু করি আমার কাহিনী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে গগনের সেই উদাত্ত-কণ্ঠের গান,—বাঙলার মাটি বাঙলার জল'। তারপর সে ফেল করল। গগ্যা মুছে গেল আমার জানা দুনিয়া থেকে। এরপর কী ভাবে ঢাকার পল্টন-বাজারে তার সন্ধান পাই, কী ভাবে সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ত্যাগ করে চলে আসে বরানগরের বস্তীতে, রঙলালের স্ত্রীর স্কেচ করার অপরাধে তার মাথা ফেটে যাওয়া—

তারপর আমি সঙ্কোচে থেমে যাই। বলি,—প্রফেসর, এরপর গগন পালের জীবনে এমন একটি অধ্যায়ের কথা আমি জানি যার সঙ্গে অন্যের জীবন যুক্ত। সেটা প্রকাশ করা বোধ হয় সঙ্গত হবে না!

যন্ত্রটা বন্ধ করে দিয়ে অধ্যাপক জানতে চান ব্যাপারটা কি। গগন তার বন্ধুর স্ত্রীকে 'ইলোপ' করেছিল শুনে উনি জানতে চান সেই মেয়েটি, তার স্বামী অথবা সন্তান কে কে বেঁচে আছে। কেউ নেই শুনে বললেন,—তাহলে আর সঙ্কোচ করবেন না। ইতিহাসকে অস্বীকার করবেন না।

যা জানি অকপটে সব বলে গেলাম।

অধ্যাপক বলেন,—এবার আমি কেমন করে ওর সন্ধান পেলাম শুনুন।

বাধা দিয়ে বলি,—না, এবার ইন্টারমিশন। একটু জলযোগ করে নিতে হবে।

প্রফেসর বলেন,—সে কি! আমি ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়েছি!

—তা হোক। এই হচ্ছে ভারতীয় শিষ্টাচার। আপনি কিছু না খেয়ে গেলে আমার স্ত্রী অত্যন্ত মর্মাহতা হবেন।

প্রফেসর শ্রাগ্ করেন। হেসে বলেন,—ওরিয়েন্টাল কালচার সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি আছে দেখছি!

আহারের অবকাশে বলি,—একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে দিন তো। ঐ ছবিখানা আপনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনলেন ; কিন্তু ওতে আছেটা কি? আমি যে ওটা দশ টাকায় নিলামে কিনেছিলাম!

প্রফেসর অনভ্যস্ত হাতে ফুল্‌কো লুচি ভাঙতে ভাঙতে বলেন,—এ একটি অনবদ্য ছবি! একেবারে নতুন স্টাইল। মৃত বেড়ালছানাটা হচ্ছে ঐ বস্তী-জীবনের অতীত! এভাবেই ঐ বস্তীর মানুষ যুগে যুগে মরেছে ; আর ওদের মৃতদেহ মিল-মালিকের দল

অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আঁস্তাকুড়ে। উপরের ঐ নিঃসঙ্গ চিলটা হচ্ছে বর্তমান—শিল্পী স্বয়ং। বার্ডস্ আই ভিয়ুতে তিনি ঐ অবক্ষয়ী বস্তী-জীবনকে দেখছেন। তিনি ঐ জীবনের ভাগীদার নন, আছেন অনেক অনেক উঁচুতে ; কিন্তু এ জীবনের সামগ্রিক অবক্ষয়ীরূপে গরুড়াবলোকনে প্রত্যক্ষ করছেন তিনি। শিল্পী হতাশ হননি। রক্তের মত জমাট কাদার দ-টাই এ বস্তীর শেষ কথা নয়—তিনি দেখেছেন ঐ নগ্ন শিশু ভোলানাথকেও! আবহমান কালের লজ্জা-ঘৃণা-ভয়ের নির্মোকও টান মেরে খুলে ফেলেছে—তাই ও উলঙ্গ। ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল, ও শিশু, —কিন্তু ওর মধ্যেই আছে বটগাছের বীজ! ওর প্রাণে তারুণ্যের সবুজাভা—ও নগ্ন-বিদ্রোহী। ঐ শিশু ভোলানাথই কালে হবে রুদ্র ভৈরব! ইটস্ এ মাস্টার পীস্! ল্যুভরে রাখার উপযুক্ত।

কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! কালোহ্যয়ং নিরবধি, বিপুলাচ পৃথ্বীঃ। উপেক্ষিত নগণ্য গেঁয়ো যোগী মদের ঝোঁকে যে-কথা বলেছিল বটুককে—যে-কথা আমরা পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম—তারই অনুরণন আজ ত্রিশ বছর পরে শুনলাম সাগরপারের এক আর্ট-কনৌসারের মুখে।

অধ্যাপক প্রশ্ন করেন,—এ ছবিটি কোথায় বসে শিল্পী এঁকেছিলেন ধারণা করতে পারেন?

—ধারণা কেন? জায়গাটা আমি চিনি। বরানগরের একটা কুলিবস্তী।

অধ্যাপক ম্যাক্‌গ্রেগরী তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েন। বলেন,—তাহলে আর দেরী নয়। চলুন, এখনই সেখান থেকে ঘুরে আসি।

—সে কি? আপনার গল্পটা যে শোনা হয়নি।

—সেটা ফিরে এসে বলব। সকালের আলোতে ঐ বস্তীর কয়েকটা ফটো নিতে চাই। বেলা বেড়ে গেলে এফেক্টটা থাকবে না।

অগত্যা পাগল অধ্যাপককে নিয়ে এলাম সেই বরানগরের বস্তীতে। বিশ-ত্রিশ বছর পরে এলাম সেখানে। আশপাশের অনেক কিছুই বদলে গেছে। নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। রাস্তা পাকা হয়েছে। উদ্বাস্তু কলোনি জেগে উঠছে এখানে-ওখানে। কিন্তু কী আশ্চর্য—ভারতবর্ষের সেই 'ট্রাডিশান' তবু সমানতালে চলেছে। বস্তীর জীবন আছে অপরিবর্তিত। রাস্তার উপর জমে আছে তেমনি ঘোলা জল, আঁস্তাকুড়ে উপচীয়মান আবর্জনার স্তূপ, পথের উপর বেওয়ারিশ উলঙ্গ শিশুর দল গাড়ির চাকার তলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ভাজিওয়ালার সেই চিনেবাদামগুলো এই ত্রিশ বছরেও ভাজা শেষ হয়নি ; রাস্তার কলে সেদিন যে যুবতী মেয়েটিকে স্নান করতে দেখেছিলাম এ পঁচিশ ত্রিশ বছরেও তার স্নান শেষ হয়নি, তার পীনোদ্ধত যৌবন একটুও টলেনি।

গগন পালের সেই তের নম্বর ছাপরাটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। এখন সেটা নাকি একটা তীর্থ।

সাহেব দেখে ওরা থতমত খেয়ে যায়। মেয়েরা গায়ের কাপড় সামলায়। বাচ্চাগুলো মায়ের পিছনে আড়াল খোঁজে। সাহেব অনেকগুলি ফটো নিলেন। আমার খুব খারাপ লাগছিল। স্বদেশের এই নিরতিশয় দারিদ্র্যের ছবি মার্কিন দেশের আইভরি ফিনিশ আর্ট-পেপারে ছাপা হবে। কিন্তু বাধাও দিতে পারলাম না।

অধ্যাপক ম্যাক্‌গ্রেগরীর কাছে শুনেছিলাম গগন পালের শেষ জীবনের ইতিকথা ঃ

বছর তিনেক আগের কথা। একজন চিত্র-ব্যবসায়ী ওঁকে খানকতক ছবি এনে দেখায়। বলে, এগুলি সে নামমাত্র মূল্যে কিনেছে একজন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান নাবিকের কাছে।

ছবিগুলো দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন ম্যাকগ্রেগরী। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন নাবিক সেগুলি সংগ্রহ করেছিল প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপে। চিত্রকরের নাম পল গগ্যা। সে তাহিতির লোক নয়, বিদেশী। ছবি আঁকত ঐ একান্ত দ্বীপে। অধ্যাপক ম্যাক্‌গ্রেগরী চিত্রকর সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছিলেন তার ভাষ্য দিয়ে ঐ ছবি কখানি ছাপালেন আমেরিকার একটি বিখ্যাত আর্ট-ম্যাগাজিনে। হৈ-হৈ পড়ে গেল তাতে। পত্র-পত্রিকায় চিঠিপত্র লেখালেখি শুরু হয়ে গেল। কে এই আর্টিস্ট? তাঁর আর কি ছবি আছে? যে কখানি ছবি সংগৃহীত হয়েছিল সেগুলি আশাতীত মূল্যে বিক্রয় হয়ে গেল। ম্যাক্‌গ্রেগরী সেবার দূর প্রাচ্যে আসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ইউরোপ ঘুরে না এসে উনি প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এলেন। উদ্দেশ্য ঐ তাহিতি দ্বীপের রাজধানী পাপীত্তিতে নেমে অজ্ঞাত চিত্রকরের সম্বন্ধে সন্ধান করা।

প্রথম দু-চারদিন কোন সংবাদ পান না। পল গগ্যা নামে কোন বিদেশীর খবর কেউ দিতে পারে না। শেষে একটি হোটেলের একজন বার-মেড বললে,—গগ্যা? সেই দৈত্যের মত লোকটা? একমুখ দাড়ি আর একমাথা চুল?

অধ্যাপক বলেন,—তা জানি না, কিন্তু লোকটা ছবি আঁকে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ছবি আঁকে আর বাঁশী বাজায়। তবে সে-ই হবে। সে তো এখানে থাকে না। বিয়ে করার পর সে মারকুয়েশাস দ্বীপে চলে গেছে।

—বিয়ে করেছে? এখানে? কাকে?

—য়ামায়াকে। সে ছিল আত্তাই-এর মেয়ে। আত্তাই এখনও বেঁচে আছে। সে জানে।

মায়ের সন্ধান পেলেন অধ্যাপক। হ্যাঁ, সে পল গগ্যাকে চেনে। বিদেশী। কোন্ দেশের মানুষ জানে না। একদিন জাহাজে চেপে এসেছিল। খালাসীর পোশাকে। জাহাজে সে নাকি ইঞ্জিন-ঘরে কয়লা ঢালত। জাহাজটা এ বন্দরে দিন তিনেক ছিল। লোকটা পালায়। সে নাকি প্রথম দর্শনেই এই দ্বীপের প্রেমে পড়ে যায়। জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাবার দিনে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। দৈত্যের মত প্রকাণ্ড জোয়ান। বছর পঞ্চাশ বয়স, কিন্তু খাটতে পারত ভূতের মত। লোকটা ছবি আঁকত আর বাঁশী বাজাত। দিনের বেলা ডকে কুলি-মজদুরের কাজ করত। গগ্যার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিল আত্তাই ঃ

গ্রেট তাহিতির পূর্ব-উপকূলে তখন আত্তাই-এর বাস। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় চেপে একজন বিদেশী তার কুটিরে এসে উপস্থিত। দৈত্যের মত প্রকাণ্ড চেহারা, একমাথা লম্বা লম্বা চুল, একমুখ দাড়ি, সর্বাঙ্গ ধূলায় ভরা। ঘোড়ার মুখে সাদা ফেনা। অনেকটা দৌড়ে এসেছে বোধহয়। দাড়িওয়ালা লোকটা বললে,—সুন্দরী, আজ রাতটা তোমার বাসায় থাকতে দেবে?

আত্তাই-এর বয়স তখন চল্লিশের উপর। সুন্দরী সম্বোধনে সে গলে গেল। বললে,—একটা রাত বই তো নয়। তা বেশ, থাক। তা তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?

লোকটা বললে,—আমি বিদেশী। জাহাজের খালাসী ছিলাম। তোমাদের দেশটা ভাল লেগে গেল। তাই এখানেই রয়ে গেছি।

—কি কর তুমি?

—ছবি আঁকি আর বাঁশী বাজাই।

আত্তাই অবাক হয়ে যায়। লোকটা তার ঘোড়ার পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে রাখে।

—তা এখন ঘোড়ায় চেপে কোথায় চলেছ?

লোকটা হাসতে হাসতে বলে,—রাজপুত্রেরা ঘোড়ায় চেপে কোথায় যায়?

রাজকন্যার সন্ধানে। অনেক বয়স হয়ে গেছে তো। তাই আমি বউ খুঁজতে বেরিয়েছি।

আত্তাই বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে। লোকটা নিঃসন্দেহে বিদেশী। চেহারাটাই তার প্রমাণ। তাছাড়া কথা বলছে ভাঙা ভাঙা তাহিতিতে। আহা বেচারি। এত বয়সেও বউ যোগাড় করতে পারেনি। বললে,—তা বউ খুঁজতে এত ঘুরে মরছ কেন? আমার একটা মেয়ে আছে। তাকেই বিয়ে কর না।

লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। খড়ের বিছানায় সে তার কম্বলটা বিছিয়ে শোবার উপক্রম করছিল। বললে,—তোমার মেয়ে? আমার বয়স কত জান? তুমি বিয়ে করতে রাজী হলে না হয় ভেবে দেখা যেত। তুমি সুন্দর দেখতে—

আত্তাই লজ্জা পেল না। বললে,—না গো, আমার মরদ আছে। তা আমার মেয়েও বেশ সুন্দরী।

—বটে বটে! কই, ডাক দেখি তোমার মেয়েকে!

আত্তাই তার মেয়েকে নিয়ে এল। বছর চোদ্দ বয়স। ডাগর দুটি চোখ মেলে সে অদ্ভুতদর্শন আগন্তুককে দেখতে থাকে। চোদ্দ বছর বয়স হলে কি হবে, মেয়েটি বাড়ন্ত গড়নের। বিষুব অঞ্চলের প্রখর রৌদ্রে চৌদ্দটি বসন্তেই কিশোরী মেয়েকে এনে দেয় নারীত্বের মহিমা। লোকটা আপনমনে নিজের ভাষায় কি যেন বললে। ভাষাটা অজানা। আত্তাই বলে,—কি বলছ?

—বলছি তোমার মেয়েটি খাসা। তোমার নাম কি গো মেয়ে?

—য়ামায়া।

লোকটা য়ামায়াকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখল। তাহিতি দ্বীপের যাবতীয় পলিনেশিয়ান মেয়ের মতই নাকটি চ্যাপ্টা, ঠোঁট পুরু, গভীর কালো দুটি ব্যঞ্জনাময় চোখে অবাক চাহনি। কটিদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত পিঙ্গল চুল, মসৃণ কোমল গাত্রচর্ম, সুশ্রোণী। ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ, যৌবনের যুগ্ম পূর্ণকুম্ভ প্রমাণ দেয় মেয়েটি কিশোরী নয়। বন্যমার্জারির মত ত্রস্তা।

লোকটা বললে,—আমাকে ভয় করছে?

মাথা নেড়ে মেয়েটি বলে,—না!

—আমাকে বিয়ে করবে?

য়ামায়া মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—আমাকে ফেলে পালাবে না তো?

—না!

লোকটা আত্তাইকে বললে,—কনে আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু ও কি এই বুড়ো বরকে বরাবর বরদাস্ত করতে পারবে? জোয়ান তাহিতির ছেলে ইশারায় ওকে ডাক দিলেই আমাকে ছেড়ে পালাবে।

আত্তাই বলে,—আমার মেয়ে তেমন নয় গো। আর তোমাকে ও সহ্য করতে পারবে কিনা সেটা আজ রাতেই পরখ করে দেখতে পার। যদি তোমার ওকে পছন্দ না হয়, অথবা ও তোমাকে সইতে না পারে তবে বিয়ে কর না।

লোকটা বোধহয় তাহিতিতে নতুন এসেছে। এমন সহজ হিসাবটা বুঝতে তার বেশ সময় লাগল। শেষমেষ সে রাজী হয়ে যায়। আত্তাই বলে,—তোমার নাম কি গো? কি বলে ডাকব?

—আমার নাম পল গগ্যা।

রাত্রে ওরা তিনজনে একসঙ্গে খেল। আত্তাই-এর মরদ কোথায় যেন গেছে। সে বেচারি পাশের ঘরে একাই শুতে গেল। য়ামায়া কাজকর্ম সেরে যখন শুতে এল লোকটা তখন বিছানা পেতে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। য়ামায়া অবাক হয়ে গেল সে বাঁশী শুনে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে লোকটা বললে, বউ তার পছন্দ হয়েছে। য়ামায়াও বললে, বর তার মনমতো হয়েছে। ব্যস! পরদিনই বউ নিয়ে লোকটা মারকুয়েশাস্ দ্বীপের দিকে চলে গেছে। তারপর আত্তাই আর জানে না।

মারকুয়েশাস্ একটি দ্বীপ নয়, দ্বীপাবলী ; কিন্তু প্রফেসর ম্যাক্‌গ্রেগরী অত সহজে হতাশ হবার পাত্র নন। একটি জেলে-ডিঙি ভাড়া করে তিনি চলে এলেন ঐ দ্বীপে। প্রফেসর প্রথমেই এসেছিলেন ডমেনিক দ্বীপে। এবার আর খোঁজ পেতে অত দেরী হল না। শুনলেন, ঐ দ্বীপের বৃহত্তম গ্রাম আটুয়ানাতে গগ্যা একটা পাতায় ছাওয়া কুটির তৈরী করে তার বউ নিয়ে বাস করত, কিন্তু বছর ছয়েকের মধ্যেই একবার প্রবল সাইক্লোনে ওর বাড়িটি ভেঙে যায়। ঐ সময় তার উপর পুলিসের অত্যাচার হয়। তিন মাসের জন্য জেল খাটতে হয় তাকে। অপরাধ—তাহিতির 'Le Sourire' নামে একটি স্থানীয় পত্রিকায় সে একটি প্রবন্ধ লিখেছিল ঔপনিবেশিক শাসকের দল স্থানীয় তাহিতি দ্বীপবাসীর উপর যে অত্যাচার করে তার প্রতিবাদ করে। জেল থেকে বেরিয়ে গগ্যা দেখে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ুতে তার বাড়ি ভেঙে গেছে, অথচ গাছতলায় অপেক্ষা করে বসে আছে তার বিয়ে-না-করা বউ য়ামায়া। গগ্যা নাকি ঐ অরণ্যচারিণীর হাত ধরে আরও গভীর অরণ্যে চলে যায়। কোথায়, তা কেউ জানে না।

চারিদিকে বিষুব-অঞ্চলের ঘন জঙ্গল। সমুদ্র-খাড়ি, পাহাড় আর অরণ্য—দূরে দূরে গ্রাম্য জনপদ। সেখানে যারা বাস করে তারা কেউ ইংরাজি জানে না। অধ্যাপক ম্যাক্‌গ্রেগরী এমন বিজন অরণ্যে কেমন করে খুঁজে বার করবেন সেই বিদেশীকে—যার নামটুকু মাত্র জানা আছে! সে কোন্ দেশের মানুষ তা পর্যন্ত জানা নেই। তবু তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিত মানুষ। দু-দিক থেকে অনুসন্ধান চালালেন। গগ্যার একটা দৈহিক বর্ণনা পাওয়া গেছে তার শাশুড়ীর কাছ থেকে—দৈত্যের মত প্রকাণ্ড শরীর, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, একবুক দাড়ি। প্রফেসর প্রথমেই বাজারে গিয়ে রঙ-তুলি-ক্যানভাসের খোঁজ করলেন। তাহিতিতে বসে কারও ছবি আঁকবার বাসনা হলে সে কোথায় তা সংগ্রহ করতে পারে? নিজেই বের হলেন তার খোঁজে। মাতালকে যদি খুঁজে বার করতে চাও—সব কটা শুঁড়িখানায় তালাস কর। এদিক থেকে সহজেই সন্ধান পাওয়া গেল। শহরে একটি মাত্র দোকান আছে যেখানে রঙ-তুলি পাওয়া যেতে পারে। দোকানদার স্বীকার করল—হ্যাঁ, পল গগ্যা নামে একজন বিদেশী লোক তার কাছ থেকে আঁকার সরঞ্জাম এককালে কিনত বটে। সাত-আট বছর আগে। লোকটার সঙ্গে তার আলাপও হয়েছিল। কী একটা প্রবন্ধ লেখার অপরাধে তার জেল হয়ে যায়। জেল থেকে বেরিয়ে সে কোথায় যেন চলে যায়। এর বেশি সে কিছু জানে না।

—লোকটাকে শেষ কবে দেখেছিলেন?

—ঐ যে বললাম, বছর সাত-আট আগে। সে যখন আটুয়ানা ছেড়ে চলে যায় লোকটা আমার দোকানে এসেছিল কিছু রঙ-তুলি কিনতে। আর কাগজ। ক্যানভাসও চেয়েছিল, তা আমার কাছে ছিল না। মনে আছে, লোকটা আমাকে বলেছিল—দাম নগদে দিতে পারছি না, খানকতক ছবি রেখে যাচ্ছি। তা আমি রাজী হয়ে যাই।

—কই কই, দেখি সেই ছবি?

—না, ছবিগুলি আমার কাছে নেই। লোকটা রঙের দাম যখন মিটিয়ে দিতে এল না তখন আমি সেগুলি বিক্রি করে দিয়েছিলাম—

—কাকে?

—কাকে তা কি আর মনে আছে?

প্রফেসর তাঁর অ্যাটাচি-কেস খুলে একটি মার্কিন আর্ট-ম্যাগাজিন বার করে বলেন,—দেখুন তো, এই ছবিগুলি কি?

দোকানদার অবাক হয়ে যায়। বলে,—কী আশ্চর্য! হ্যাঁ, এই ছবিগুলিই তো বটে!

ম্যাকগ্রেগরী বলেন,—আমি ঐ লোকটার সন্ধানে আমেরিকা থেকে এসেছি। আপনি কি আর কিছুই মনে করতে পারেন না তার সম্বন্ধে? আর কোন ক্লুর সন্ধান দিতে পারেন না?

দোকানদার ভদ্রলোক শিক্ষিত। দ্রুতগতিতে সে প্রবন্ধের পাতা উল্টে যায়। বলে,—আশ্চর্য! উনি যে এমন প্রতিভাধর শিল্পী তা আদৌ ভাবতে পারিনি আমি! আচ্ছা, দাঁড়ান।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলেন,—হ্যাঁ, তাঁর সম্বন্ধে আর একটি কথা আমার মনে পড়ছে।

—কী?

—যাবার দিনে উনি বলেছিলেন, মাস কয়েক পরে এসে খবর নিয়ে যাব ছবিগুলো বিক্রি হল কিনা।

—কিন্তু তা তিনি আসেননি?

—না আসেননি ; কিন্তু আমার মনে পড়ছে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—আপনি কি দূরে কোথাও চলে যাচ্ছেন। উনি জবাবে বলেন,—হ্যাঁ, আরও গভীর অরণ্যে। আর কিছু মনে পড়ছে না।

দ্বিতীয়ত উনি খোঁজ করলেন স্থানীয় ডাকঘরে। পোস্টমাস্টার মশাই নামটা শুনে বলেন,—না, পল গগ্যা নামের কোন লোক এ দ্বীপের ত্রিসীমানায় বাস করে না। অন্তত ঐ নামে কোন চিঠি তাঁর ডাকঘরে পনের-বিশ বছরের ভিতরে আসেনি। তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হওয়াতে বলেন,—দাঁড়ান প্রফেসার! কী নাম বললেন? পল গগ্যা? গগন পল নয় তো?

—কেন, গগন পল নামে কাউকে চেনেন?

পোস্টমাস্টার মশাই তাঁর বাক্স থেকে একটি জীর্ণ পোস্টকার্ড বার করে বলেন,—দেখুন তো এই লোক কিনা?

প্রফেসর গভীর মনোযোগ দিয়ে পোস্টকার্ডখানা লক্ষ্য করে দেখেন। পেনসিলে লেখা চিঠি—কিছুই পড়া যায় না। অন্ততঃ ভাষাটা যে ইংরাজি নয় এটুকু বোঝা যায়। অধ্যাপক ম্যাক্‌গ্রেগরী প্রাচ্য-শিল্পী-বিশারদ। সংস্কৃত ও পালি ভাষা জানেন, ব্রাহ্মী ও মাগধী হরফ চিনতে পারেন। তিনি এটুকু বুঝতে পারেন ভাষাটা ভারতীয়। সংস্কৃত অথবা পালির অপভ্রংশ—অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের নয়, আর্যাবর্তের ভাষা। ঠিকানাটা অবশ্য ইংরাজি ভাষায় লেখা। সেটা কালিতে লেখা এবং স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। পত্রলেখকের নাম গগন পাল, প্রাপকের নাম শান্তিরাণী পাল। ঠিকানা—পল্টন বাজার, ঢাকা, ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের অনেকগুলি ডাকঘরের ছাপের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে পোস্টকার্ডখানি আবার প্রেরকের কাছে ফেরত এসেছিল। ঠিকানা ভুল, প্রাপককে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তাহিতি ডাকঘরে পোস্টমাস্টার মশাই আবার এদিকে প্রেরককে খুঁজে পাননি। ফলে দীর্ঘদিন সেটি পড়ে আছে ঐ বাক্সে।

অধ্যাপক ম্যাক্‌গ্রেগরী অনেকক্ষণ সেই পোস্টকার্ডখানি হাতে নিয়ে নির্বাক বসে থাকেন। কে এই পল গগ্যা অথবা গগন পাল? কোন্ দেশের লোক? ভারতীয়? কী সম্পর্ক ছিল ঐ লোকটার অজ্ঞাত শান্তি পালের সঙ্গে? দুজনেরই উপাধি 'পাল'—ওরা স্বামী-স্ত্রীও হতে পারে। প্রফেসর জানতেন 'ঢাকা' একটি শহরের নাম। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী। সেটা ভারতবর্ষে নয়। সে খবরটা জানে না এই গগন পাল। হয়তো ভারতবর্ষে অথবা পাকিস্তানে সে কখনও যায়নি। 'ঢাকা' আগে ছিল ভারতবর্ষে, বর্তমানে পাকিস্তানে। এমনও হতে পারে ঐ লোকটা এই অরণ্যে বাস করতে করতে সংবাদই পায়নি যে, ভারতবর্ষ ইতিমধ্যে স্বাধীন হয়েছে। সে খবর রাখে না—'ঢাকা' বর্তমানে ভারতবর্ষে নয়। সে ক্ষেত্রে অবশ্য ধরে নিতে হবে গগন পাল আর শান্তি পাল স্বামী-স্ত্রী নয়। গগন পাল ভারতীয়ই নয়। কারণ লোকটা শিক্ষিত, সংবাদপত্রে ফরাসী ভাষায় প্রবন্ধ লিখবার মত ক্ষমতা তার আছে। এমন একজন শিক্ষিত মানুষ খবরই রাখবে না যে, তার মাতৃভূমি দুশো বছর পরাধীনতার পর স্বাধীন হয়ে গেছে? বিশেষ যদি তার স্ত্রী সেখানেই থাকে? গোয়েন্দা কাহিনীর মত কোন সমাধানই মনঃপুত হচ্ছিল না। আর আশ্চর্য বুদ্ধি ভারতীয় ডাকঘরের কর্মকর্তাদের! তাঁরা চিঠিখানি দূর তাহিতিতে প্রেরকের কাছে ফেরত না পাঠিয়ে পাশের বাড়ি ঢাকায় পাঠালে প্রাপক হয়তো সময়ে চিঠিখানি পেতেন। অন্ততঃ তখনও চিঠির পাঠোদ্ধার করা চলত।

মোট কথা লোকটা শিক্ষিত। ফ্রেঞ্চ জানত। 'Le Sourire' পত্রিকার প্রবন্ধটাই তার প্রমাণ। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে কলম ধরে জেল খেটেছিল শিল্পী মানুষটা। প্রবন্ধটা সংগ্রহ করে পড়লেন। বেশ জোরালো ভাষা। প্রবন্ধ লেখক ফ্রেঞ্চ ভাষাটা ভালই জানেন। আদালতে খোঁজ নিতে গিয়ে আবার কতগুলো অদ্ভুত সংবাদ পাওয়া গেল। আদালতের নথী বলছে, লোকটা নিজেকে নির্দোষ বলেছিল, এবং বলেছিল সে ফরাসী ভাষা আদৌ জানে না! তার তরফে কোন উকিল ছিল না, সে নিজেই সওয়াল করে। স্থানীয় বার অ্যাসোসিয়েশনের একজন নবীন উকিল—কামিল দমিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে আসামীর তরফে মামলা পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আসামী তাঁকে ওকালতনামা দিতে অস্বীকার করেন। বিচারে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে যায়।

অধ্যাপক অতঃপর কামিল দমিয়ে, অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করলেন।

কামিল দমিয়ে জাতে ফরাসী। উদারনৈতিক তরুণ উকিল। বললেন,—হ্যাঁ, পল গগ্যাকে আমি চিনতাম। সাত-আট বছর আগে। সত্যি কথা, তিনি ফরাসী জানেন না। তিনি কোন্ দেশের লোক তা জানা নেই। 'Le Sourire'তে প্রকাশিত প্রবন্ধটা গগ্যারই লেখা, তবে তিনি ইংরাজিতে লিখেছিলেন। অন্য কেউ সেটা অনুবাদ করে দেন। কে যে অনুবাদ করেন তা গগ্যা স্বীকার করেননি। গগ্যা ছিলেন ডাকাবুকো ধরনের—দুঃসাহসী লোক। আদালতে তিনি বলেছিলেন তিনি ফরাসী ভাষা জানেন না—সে-কথা বিচারক বিশ্বাসও করেছিলেন। কিন্তু গগ্যা বলেন প্রবন্ধের বক্তব্য তাঁরই, তিনি ইংরাজিতে ওটা লিখেছিলেন। কে অনুবাদ করেছেন এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে অস্বীকার করেন।

—অদ্ভুত লোক তো! বলেন ম্যাক্‌গ্রেগরী।

দমিয়ে বলেন,—অতি অদ্ভুত লোক। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমি যে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁর কেস হাতে নিতে চেয়েছিলাম এজন্য আমাকে

ধন্যবাদ জানান। আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনি কি এ দ্বীপের দেশীয় আন্দোলনে যোগ দিতে চান? জবাবে গগ্যা বলেছিলেন—না। আমি এই তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে গভীরতর অরণ্যে চলে যাচ্ছি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সেখানে কী করবেন আপনি? জবাবে উনি বলেছিলেন—ছবি আঁকব। বুঝলেন প্রফেসর, জিনিসটা আমার কাছে একেবারে উদ্ভট লেগেছিল—শিক্ষিত সভ্য একজন মানুষ এভাবে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে একটা পলিনেশিয়ান্ মেয়েকে নিয়ে অমন জঙ্গলে গিয়ে কেমন করে বাস করতে পারে আমি তো ভেবে পাইনি। ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম —How could you explain yourself? আপনি এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কি ব্যাখ্যা দেবেন? লোকটা জবাবে কি বললেন জানেন?

—কি?

—বললে, 'A man's work is the explanation of that man'—একটা মানুষের সৃষ্টিই তার অস্তিত্বের ব্যাখ্যা!

প্রফেসর মাথা নেড়ে বলেছিলেন,—এর চেয়ে খাঁটি কথা হয় না!

মোটকথা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি ম্যাক্‌গ্রেগরী—তবু শিল্পীর কোন সন্ধান পেলেন না। শিল্পীর সৃষ্টির মাধ্যমেও যে কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাবেন তারও সুযোগ হল না। গগন পালের হাতের কোন কাজ দেখতে পেলেন না কোথাও। বাধ্য হয়ে ব্যর্থমনোরথ ম্যাক্‌গ্রেগরী ফিরে এলেন মারকুয়েশাস্ দ্বীপ থেকে মূল দ্বীপে—তাহিতির রাজধানী পাপীতিতে।

নিতান্ত ঘটনাচক্রই বলতে হবে,—জাহাজ ছাড়ার দিন-ছয়েক আগে ওঁর সামান্য জ্বর হল। তাহিতিতে ম্যালেরিয়া আছে ; অধ্যাপক তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের শরণ নিলেন। ওঁর হোটেলের অনতিদূরে ডক্টর ওয়াটকিন্স-এর চেম্বারে গিয়ে হাজির হলেন এবং ঘরে ঢুকেই জ্বরের কথা ভুলে গেলেন।

—হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু, স্যার?

ডাক্তার ওয়াটকিন্স-এর আহ্বান কানে গেল না অধ্যাপক ম্যাক্‌গ্রেগরীর। প্রাচীরে বিলম্বিত একটি তৈলচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, —ডক্টর! এ ছবি আপনি কোথায় পেলেন? এ কার আঁকা?

—শিল্পীকে চিনবেন না। খ্যাতনামা কেউ নয়। আমার একজন পেসেন্ট ছিলেন।

—ছিলেন? এখন তিনি কোথায়? কি নাম ওঁর?

—ওঁর নাম পল গগ্যা। মারা গেছেন।

অধ্যাপক নির্নিমেষ নয়নে দেখছিলেন তৈলচিত্রটি। একটি নিসর্গ দৃশ্য। পশ্চাৎপটে কালো মেঘ আর পাহাড়। দু-একটি নারকেল গাছ, একটি কুঁড়ে ঘর। চওড়া একটা পথ এঁকেবেঁকে সরু হতে হতে পাহাড়ের কোলে হারিয়ে গেছে। টুপি-মাথায়, বাঁক-কাঁধে একজন স্থানীয় মালবাহী মেহনতি মানুষ দর্শকের দিকে পিছন ফিরে চলেছে ঐ অরণ্যমুখো। দর্শকের দিকে সে পিছন ফিরেছে ; তার একলা চলার পথে শুধু অরণ্য আর পর্বত—সামনে সূর্যকরোজ্জ্বল এক উপত্যকা। কাঁধের ভারে লোকটা নুয়ে পড়েছে!

—আপনার কি কোন অসুখ করেছে? ডক্টর ওয়াটকিন্স-এর প্রশ্ন।

—তা করেছে। জ্বর। কিন্তু সে-কথা পরে। আপনি ঐ চিত্রকর সম্বন্ধে যা জানেন তাই আগে বলুন। তাতেই হয়তো আমার জ্বর ছেড়ে যাবে।

অধ্যাপক তাঁর তাহিতি আগমনের কারণ অতঃপর জানান। ডক্টর ওয়াটকিন্স শুধু

কুইনাইন দিলেন না,—পল গগ্যার শেষ জীবনের একটি বিচিত্র কাহিনীর সুগার-কোটও দিলেন। অদ্ভুত সে কাহিনী ঃ

ডক্টর ওয়াটকিন্স পাপীতিতে প্র্যাকটিস করছেন আজ ত্রিশ বছর। একটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি আছে তাঁর। তাতেই রুগী দেখতে যান। বছর পাঁচেক আগে একবার মারকুয়েশাস্ দ্বীপ থেকে তাঁর ডাক এল। টারাভাও গ্রামের মোড়লনীর অসুখ। সমুদ্র পার হয়ে ঐ গ্রামে যেতে হয়। ওরা একটা এক-ঘোড়ায় টানা গাড়ির ব্যবস্থা করেছিল। নৌকো ছেড়ে সাত-আট মাইল ঘোড়ার গাড়িতে পাড়ি দিয়ে ডাক্তার সাহেব টারাভাও গ্রামে এসে পৌঁছলেন। ডাক্তার সাহেব ভাল কথক। টারাভাও গ্রামের বৃদ্ধা মোড়লনীর স্থূলকায় দেহ, তার প্রকাণ্ড খাটখানা, তার পাতায় ছাওয়া ঘর, চুরুট খাওয়ার নিখুঁত বর্ণনা দিলেন। রোগী দেখা শেষ হলে ওরা ডাক্তার সাহেবকে পাশের ঘরে নিয়ে এল। সেখানে তাঁর আহারের আয়োজন হয়েছে। সাহেব মানুষের জন্য একটা চারপায়া টেবিল আর টুলের ব্যবস্থাও ওরা করেছিল—না হলে ওরা সচরাচর মাটিতে বসেই খায়। কাঁচা মাছ, কাঁকড়া কাঁচকলা ভাজা, ঝলসানো মুরগী আর নারকেলের একটা তরকারী। এলাহী আয়োজন। ডাক্তার সাহেব আহার করতে করতেই লক্ষ্য করেন বছর সাতেকের একটা ছোট মেয়ে বারে বারে সে ঘরে ঢুকতে চাইছে, আর সকলে তাকে বারে বারে তাড়িয়ে দিচ্ছে। ছোট মেয়েটির মাজায় বাঁধা ন্যাকড়াটা শতছিন্ন এবং ধূলি-ধূসরিত। মাথার চুলগুলো জটা পাকানো। ও কি ভিখারীর মেয়ে? ভিক্ষা চাইছে? আহারান্তে গাড়িতে চড়বার সময়ও ডাক্তার সাহবের নজর পড়ল মেয়েটির দিকে। ডাগর চোখ মেলে সে তাকিয়ে আছে ওঁর দিকে। সবার ধমকে আর কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না। ডাক্তার সাহেব পকেট থেকে একটি মুদ্রা বার করে ওকে দিতে গেলেন, মেয়েটি নিল না। দু হাতে মুখ ঢেকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল।

—ও কার মেয়ে? কি চায়? জানতে চাইলেন উনি।

ভীড়ের মধ্যে কে যেন বলে,—ও হচ্ছে দাড়িওয়ালা পাহাড়িয়ার মেয়ে। ভিখারী নয়।

দাড়িওয়ালা পাহাড়িয়া? সে আবার কে? ওরা বুঝিয়ে বলে,—উই পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলের ভিতর বাস করে একজন দাড়িওয়ালা বিদেশী। আর থাকে তার বউ। মেয়েটি ওদেরই। ডাক্তার সাহেব গ্রামে এসেছেন শুনে ও তাঁকে ডাকতে এসেছে। ওর বাপ, ঐ বিদেশীটার কি অসুখ করেছে বলছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, ওদের ঐ কুঁড়েঘরে যেতে হলে পাকদণ্ডী পথ দিয়ে হাঁটাপথে যেতে হবে। গাড়ি যাবে না। তাও পাক্কা তিন মাইল। ডাক্তার সাহেব জানতে চান বিদেশীর পরিচয়, কোন্ দেশের লোক, কি নাম। ওরা বললে, তা ওরা জানে না। লোকটা কোন কাজকাম করে না। স্রেফ ছবি এঁকে দিন কাটায়। আর বাঁশী বাজায়। তবে খায় কি?—কি আবার খাবে? জঙ্গলের ফলমূল, নারকেল ; আর ওর বৌ য়ামায়া একপাল মুরগী পুষেছে। শহরে এসে ডিম, মুরগী বেচে যা পায় তাই খায়। গাঁয়ের লোকেরা ঐ বিদেশীর উপর চটা। লোকটা জেলখাটা দাগী আসামী। সেটা বড় অপরাধ নয়—পুলিসের হাতে পড়লে জেল তো খাটতেই হবে, সে-কথা নয়, কিন্তু লোকটা অমন ছন্নছাড়া কেন? না ধরে মাছ, না করে চাষ-বাস, না পারে নারকেল গাছে উঠতে, না যায় সাহেবের খামারে খাটতে।

ছোট মেয়েটা তখনও পিছন ফিরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ডাক্তার সাহেবের শুধু কৌতূহলই নয়, করুণাও হল। একটা বিদেশী অসুস্থ মানুষকে না-দেখে ফিরে যেতে তাঁর

মন সরল না। বলেন,—চল্ রে, আমি যাব তোর বাপকে দেখতে।

মেয়েটি তুরুক করে এদিকে ফেরে। খুশিতে ওর জলভরা দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে।

পাক্কা তিন মাইল চড়াই ঠেঙিয়ে ডাক্তার সাহেবের মেজাজ খিঁচড়ে গেল। দেহও ক্লান্ত। পাহাড়ের ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি পাতায়-ছাওয়া কুটির। পথের উপরেই বিদেশীর স্ত্রী—ঐ য়ামায়া দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা মুখকাটা ডাব। মেয়েটিকে বুদ্ধিমতী বলতে হবে। এতটা পথ চড়াই ভেঙে এসে ডাক্তার সাহেব যে প্রথমেই জল চাইবেন তা ঠিকই আন্দাজ করেছে সে।

ডাবটা নিঃশেষ করে ডক্টর ওয়াটকিন্স বলেন,—কোথায় তোর মরদ?

মেয়েটি তার ডান হাতটা বাড়িয়ে পাতায়-ছাওয়া কুটিরখানি দেখিয়ে দিল। দরজাটা খোলাই আছে। দাওয়ার উপর বছর দেড়েকের একটা উলঙ্গ শিশু খেলা করছে।

—কি হয়েছে রে তোর মরদের? কি করছে সে? ঘুমোচ্ছে?

—না, ও ছবি আঁকছে।

—ছবি আঁকছে! বলিস কি রে? তাহলে পাহাড়ের মাথায় আমাকে হাঁটিয়ে আনলি কেন? সে গাঁয়ে যেতে পারত না?

য়ামায়া এ-কথার জবাব দিল না। মুখ নিচু করে নখ খুঁটতে থাকে। বাচ্চাটাকে তুলে নিল কোলে। তারপর এগিয়ে যায় ঘরের দিকে। ঘরে ঢোকে না কিন্তু। দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত করল ওঁকে ভিতরে যেতে। ওর ব্যবহারে একটু অবাক হলেন ডাক্তার সাহেব। এগিয়ে এলেন তিনি ঘরের ভিতর। সেখানে একজন বিদেশী লোক মাটিতে বসে একখানা ছবি আঁকছে আপন মনে। রঙ-তুলি চারদিকে ছড়ানো। লোকটা কোন্ দেশের তা বোঝা যায় না। একমাথা রুক্ষ চুল, একমুখ দাড়ি—ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। পদশব্দে সে পিছনে ফিরে তাকায়। ডাক্তার সাহেবকে দেখে সে উঠে দাঁড়ায়। তার চোখে বিস্ময়ের চেয়ে বিরক্তিই বেশি। ওর ভ্রূতে জেগেছে একটা কুঞ্চন। হঠাৎ রুখে ওঠে জঙলি লোকটা। বলে,—কি চাই?

ডাক্তার সাহেব এক কথায় জবাব দিতে পারলেন না। বলতে পারলেন না—আমি কিছু চাই না, তোমার স্ত্রী আমাকে ডেকে এনেছে। অভিজ্ঞ ডাক্তার ওর মুখে শুধু বিরক্তির ব্যঞ্জনাই দেখেননি—দেখতে পেয়েছিলেন গভীরতর আর কিছু। গ্রহণের আগে সূর্যের উপর যেমন একটা ধূসর বর্ণের পেনাম্ব্রীয় ম্লান ছায়াপাত হয়, তেমনি ঐ দৈত্যের মত মানুষটার মুখে কোন্ অলক্ষ্য মহাকাল এক করাল ছায়াপাত করেছেন। ওঁর পা দুটি যেন মাটিতে প্রোথিত হয়ে গেল। মানুষটার অভদ্র ব্যবহারে রাগ করতে ভুলে গেলেন তিনি। নিরতিশয় বেদনা আর করুণায় তাঁর অন্তঃকরণ আপ্লুত হয়ে গেল। বললেন,—আপনার নাম কি? আপনি কোন্ দেশের লোক?

—সে খোঁজে আপনার কি প্রয়োজন? বডি-ওয়ারেন্ট আছে?

ডাক্তার সাহেব বললেন,—আপনি ভুল বুঝছেন!

—কিছু ভুল বুঝিনি। আমি তো দুনিয়াকে ছেড়ে এসেছি। তবু—

—আপনি অহেতুক রাগ করছেন। আমি পুলিসের লোক নই। আমার নাম ডক্টর ইভান ওয়াটকিন্স। আমি পাপীতিতে প্র্যাকটিস করি। টারাভাওয়ে রুগী দেখতে এসেছিলাম। আপনার স্ত্রী য়ামায়া আমাকে ডেকে এনেছে। আপনি নাকি অসুস্থ।

—য়ামায়া একটা গাড়োল। আমার কিছু হয়নি। একটু জ্বর মত হয়েছিল, আর গা হাত পায়ে ব্যথা আছে। ও কিছু নয়, দুদিনেই সেরে যাবে। ভাল কথা, আপনার ব্যাগে

কুইনিন আছে?

—আপনি আমার আগের প্রশ্নের জবাব দিন। আপনার পরিচয়?

—আমার নাম গগন পাল। আমি ভারতীয়। কুইনিন আছে আপনার ব্যাগে?

—আছে। কিন্তু আপনার ম্যালেরিয়া হয়নি। কুইনিন খেতে হবে না আপনাকে।

—ও!

—আপনি ঐ আয়নায় নিজের মুখটা একবার দেখুন দেখি—

—কেন?

ডাক্তার সাহেব জবাব দেন না। লোকটা একটু অবাক হয়ে যায়। তার দৃষ্টি চলে যায় ঘরের ও-প্রান্তে। সেখানে পড়ে ছিল কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো একটা সস্তা হাত-আয়না আর কাঁকুই। য়ামায়ার প্রসাধনের সরঞ্জাম হয়তো। বারকতক পর্যায়ক্রমে ডাক্তার সাহেব এবং ঐ আয়নাটার দিকে তাকিয়ে লোকটা সেদিকে এগিয়ে যায়। তুলে নেয় হাত-আয়নাটা। সরে আসে জানালার কাছে, আলোর দিকে। নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকে নিজ প্রতিবিম্বের দিকে।

—আয়নায় কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

জঙলি মানুষটা আজ দশ বছর চুল আঁচড়ায়নি, দাড়ি কামায়নি। কত যুগ-যুগান্তর পরে সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল তা তার মনেই পড়ে না। সত্যি কথা বলতে গেলে তাকে স্বীকার করতে হত—হ্যাঁ, আমার বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে।

—তা সে বলল না কিন্তু। বললে, কী আবার দেখব? নিজের মুখটাই দেখছি।

—কিছু নজরে পড়ছে না? একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন না? নাকটা ফোলা ফোলা, গাল দুটো লাল লাল—মুখখানা কেশর ফোলানো সিংহের মত মনে হচ্ছে না কি?

গগন জবাব দেয় না। একদৃষ্টে নিজ প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু যেন দিশেহারা।

—মিস্টার পাল, আমি দুঃখিত—আপনার একটা দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে!

—দুরারোগ্য ব্যাধি?...আমার?...কি হয়েছে আমার?

দুটি মাত্র অক্ষর। কিন্তু কথাটা আটকে গেল অভিজ্ঞ ডাক্তার সাহেবের মুখে।

ডক্টর ওয়াটকিন্স অধ্যাপক ম্যাক্‌গ্রেগরীকে বলেন,—প্রফেসর, ত্রিশ বছর প্র্যাকটিস করছি আমি। দুরারোগ্য ব্যাধি যেখানে ধরা পড়েছে আমার সন্ধানী দৃষ্টিতে সেখানে আমি অকপটে সে-কথা জানিয়ে দিতে দ্বিধা করিনি কখনও। এই আমার নিয়তি। লোকে বলে, আমি কর্কশভাষী। কি করব বলুন? কিন্তু এ জাতীয় মর্মান্তিক দুসংবাদ আমি সচরাচর রোগীকে বলি না ; বলি তার নিকট আত্মীয়কে। যেখানে নিকট আত্মীয় কেউ নেই, সেখানে বাধ্য হয়েই কথাটা রোগীকে বলতে হয়েছে। কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে তার অনিবার্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছি—যাতে হতভাগ্য মানুষটা সেটা সহ্য করার কিছু সময় পায়। কিন্তু এবার আমি ছিলাম নিতান্ত নিরুপায়।

জঙলি মানুষটা আয়নাখানা মাটিতে নামিয়ে রাখে। এগিয়ে আসে সামনে। দু হাত মাজায় রেখে ডাক্তার সাহেবের মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বলে,—বলুন! কী হয়েছে আমার?

এবার চুপ করে থাকা চলে না। দুটি মাত্র অক্ষরে মৃত্যুদণ্ডজ্ঞা ঘোষণা করলেন ডাক্তার ওয়াটকিন্স ঃ

—কুষ্ঠ!

আশ্চর্য লোকটার মনের জোর! এত বড় বজ্রাঘাত সে গ্রহণ করল অবিচলিত চিত্তে। কেঁপে উঠল না থরথর করে, বসে পড়ল না মেঝেতে ; মুখের একটি পেশীও কুঞ্চিত হল না। মিনিটখানেক নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে বললে,—য়ামায়া জানে?

—এ রোগ এ দ্বীপে এত ব্যাপক যে, ওর বুঝতে অসুবিধা হয়নি বোধহয়। না হলে আপনার সামান্য জ্বর দেখে সে এভাবে আমাকে ডেকে আনত না।

গগন পাল ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বারান্দায়। দেখে, দাওয়ায় ও-প্রান্তে বসে আছে য়ামায়া। দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর নগ্ন বুকে বাচ্চাটা লেপ্‌টে আছে। বড় মেয়েটা দূরের আমগাছের আড়ালে আত্মগোপন করেছে—তার চোখে আতঙ্ক। গগন হাত বাড়িয়ে বাঁশের খুঁটিটা ধরে। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে মুখ তুলে অস্ফুটে কি যেন স্বগতোক্তি করে। দুর্বোধ্য ভাষায়। তার মাতৃভাষায়। ডাক্তার ওয়াটকিন্স জানেন না—সে কী বলেছিল, কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল। অনুমান করতে পারেন না—সেটা খেদোক্তি, অভিশাপ, না প্রার্থনা!

...কী বলেছিল গগন? কাকে বলেছিল? তাহিতির রৌদ্র-করোজ্জ্বল নীল আকাশের দিকে মুখ তুলে কার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তার? পুরনো পল্টনের মেয়েদের স্কুলের কোন দিদিমিণি? তার ঝাঁকড়া-চুলো ফ্রক-পরা মেয়েটা, না কচি শালের চারার মত তার দাদাকে? অথবা হয়তো মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার মনে পড়ে গিয়েছিল আর একটি শ্যামাঙ্গী মেয়েকে—সুলেখা দেবনাথকে। ও কি দুনিয়াকে ডেকে বলেছিল—তোমরা দেখে যাও, তোমাদের সব অভিশাপ আমি মাথা পেতে নিয়েছি! ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়েছিল কি? অথবা হয়তো জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে সে তার অনবদ্য উদাসীনতায় ঝাঁট দিয়ে বিদায় করতে চেয়েছিল ডাক্তার ওয়াটকিন্স-এর ঐ ছেঁদো মৃত্যুদণ্ডাদেশ ; —বলেছিল, ঝাঁট দে!

ঘুরে দাঁড়ায়। দেখে অপরাধীর মত মাথা নিচু করে অপেক্ষা করছেন ডাক্তার সাহেব।

—ডক্টর! কতদিনের মেয়াদ আমার?

—তা কে বলতে পারে? কখনও কখনও দীর্ঘ বিশ বছরও এ-রোগের মানুষকে ভুগতে দেখেছি। দু-এক বছরের মধ্যে যার যন্ত্রণার অবসান হয় সে-ই তো ভাগ্যবান। মৃত্যুই এ-রোগে একমাত্র আশীর্বাদ!

গগন পাল ধীরে ধীরে ফিরে যায় তার কুটিরে। বেরিয়ে আসে পরক্ষণেই। হাতে তার সদ্য-সমাপ্ত একটি অয়েল-কালার। সেটা বাড়িয়ে ধরে আগন্তুকের দিকে বলে,—ডক্টর, ভিজিট দেবার ক্ষমতা য়ামায়ার নেই। তুমি এই ছবিটা নিয়ে যাও বরং।

ডাক্তার সাহেব বলেন,—ধন্যবাদ। ভিজিট তোমাকে দিতে হবে না।

হঠাৎ চটে গেল জঙলি লোকটা। গম্ভীর স্বরে বললে,—ডক্টর! আমার স্ত্রী গরীব। কিন্তু গরীবের আত্মসম্মানজ্ঞান থাকবে না, এমন কোন কথা নেই। এটা ধর। আর তুমি যা ভাবছ তা ঠিক নয়। এখানা যত্ন করে রেখে দিও। একদিন এ ছবি তোমার ভিজিটের শতগুণ তোমাকে ফেরত দেবে। কথাটা আজ তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, নয়?

বিশ্বাস সত্যিই হয়নি ডাক্তার ওয়াটকিন্স-এর। তাহিতির একটি নিসর্গচিত্র। পাহাড় আর গাছ, পিছন-ফেরা বাঁক-কাঁধে একটি মাত্র মেহনতি মানুষ। ছবির ফ্রেমটাও নিতান্ত বাজে কাঠের। বিশ্বাস হবার কথাও নয়। তবু একটি মৃত্যুপথযাত্রী চিত্রকরের শেষ অভিমানটাকে আঘাত করতে মন সরেনি। হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছিলেন ছবিটা। ও পাশে য়ামায়া তখন ফুলে ফুলে কাঁদছে। গগন তাকে ধমকের সুরে সান্ত্বনা দেয়,—আরে

বুদ্ধুর মত কাঁদছিস কেন রে পাগলি?

তাহিতি দ্বীপে কুষ্ঠরোগোক্রান্তদের পৃথকীকরণের কোন ব্যবস্থা নেই।

হঠাৎ অশ্রুআর্দ্র মুখ তুলে য়ামায়া বলে ওঠে, ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে না?

গগন বলে,—না। তার আগেই আমি জঙ্গলে চলে যাব।

ডাক্তার সাহেব বলেন,—জঙ্গলে মানে? এটাই তো জঙ্গল!

—না। আরও গভীর জঙ্গল আছে পাহাড়ের ওপাশে। সেখানে আদিবাসীরাও যায় না। সেখানে এই ন্যাকড়াখানাও মাজায় জড়াবার দরকার হবে না। মিশে যাব অরণ্যে!

ডাক্তার সাহেব মনের চোখ দিয়ে দেখতে পান দৃশ্যটা। সভ্য জগতের একটা মানুষ আদিম অরণ্যে সম্পূর্ণ অরণ্যচারী হয়ে গেছে! বেবুন-সিম্পাঞ্জি-গেরিলার স্বগোত্র সে। একমাথা চুল, একবুক দাড়ি নিয়ে এই বিংশ শতাব্দীতে তাহিতি দ্বীপের কোন অনাবিষ্কৃত পর্বতকন্দরে আবার একটা উলঙ্গ নিও-হোমোস্যাপিয়ান নূতন আলতামেরার সৃষ্টি করছে!

য়ামায়া উঠে আসে। কাঁকালে নিয়েছে উলঙ্গ বাচ্চাটাকে। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ। শুধু মাতৃত্বের অমৃতরসে নয়, উত্তেজনাতেই যেন ফুলে উঠেছে তার বুক। কটিদেশে একমাত্র লাজবস্ত্র। দু'চোখে আর তার জল নেই, আছে আগুন। বললে,—না! তোকে আমি একলা যেতে দেব না! আমরা সবাই যাব!

—কী পাগলি রে তুই!—ওকে ধমক দেয় গগ্যা। বলে,—তোর তো আর অসুখ করেনি। তুই পাপীতিতে ফিরে যা। তোর আবার বিয়ে হবে, নতুন মরদ পাবি, সংসার পাবি। ছেলেমেয়েরা রইল। তুই কেন মরতে যাবি আমার সঙ্গে? কী এমন বয়স তোর?

হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল য়ামায়া। বাঁ কাঁকালে শিশু—ডান হাত দিয়ে সে জড়িয়ে ধরল প্রকাণ্ড দৈত্যটার হাঁটু ; আর্ত চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল বনভূমি—

—না, না, না! তুই আমার মরদ! তোকে ছেড়ে আমি বাঁচব না!

পাথরে গড়া পল গগ্যার অক্ষি-কোটরেও তাহলে জল থাকে! অর্ধশতাব্দীকাল দুনিয়াদারি করে গগন পাল নিজেই কি সেটা জানতে পেরেছিল কোনদিন? ফোলা ফোলা কুষ্ঠগ্রস্ত লাল গাল বেয়ে দু ফোঁটা জল ঝরে পড়ল য়ামায়ার রুক্ষ চুলে। দু চোখে জল, তবু অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল পাগল শিল্পী। সভ্যজগতের একমাত্র সাক্ষীটাকে দেখে ইংরাজীতে বললে,—মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি নেমকহারাম! সমাজ আজও ওদের শেখাতে পারেনি সভ্যতার মূল মন্ত্রটা—'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!' স্রেফ জোঁকের মত! যাকে ধরে তাকে ছাড়ে না! জোঁকের তবু নুন আছে ; এরা নিমককেও ভয় পায় না, এমনই নেমকহারাম!

য়ামায়া বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারে না? সচকিত হয়ে মুখ তুলে বলে,—কী—কী বলছিস তুই ডাক্তার সা'বকে? আমাকে ছেড়ে চলে যাবি?

—না রে পাগলি! তাই কি পারি! আমি যে তোর মরদ!

ডাক্তার ওয়াটকিন্স প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলেন। এ-রোগে রোগীকে সান্ত্বনা দিতে যাওয়াটা প্রহসনের মত শোনাবে। তাই নীরবেই বিদায় নিলেন। পাকদণ্ডী পথে ফিরে চললেন ছবিটা নিয়ে। পাপীতিতে ফিরে এলেন পরদিন সন্ধ্যায়। ক্রমে ভুলে গেলেন দ্বীপান্তরের একটি জঙলি কুষ্ঠরোগীর কথা।

প্রায় দু বছর পরে আবার তার কথা মনে পড়ল তাঁর। কারণ বছর দুয়েক পরে আবার তিনি রুগী দেখতে এসেছিলেন টারাভাওতে—সেই মোড়লনীকে দেখতে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কুষ্ঠরোগীটার কথা। প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, পাহাড়ের মাথায় সেই

দাড়িওয়ালা জঙলি বিদেশীটা বেঁচে আছে?

—আছে বোধহয়।

বোধহয়। ওরা ঠিক জানে না। এ শুধু অনুমান। বছরখানেক আগেও তাকে দেখা গেছে। দৈত্যের মত প্রকাণ্ড একটা মানুষ নির্জন পাহাড়-পর্বতে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একমাথা রুক্ষ চুল, একবুক কাঁচাপাকা দাড়ি, মুখখানা কেশর-ফোলানো সিংহের মত থমথমে। খালি গা, খালি পা। ছবি আঁকত সে পাহাড়ের ধারে,—ঝরনার কিনারে—কখনও দূর সমুদ্রের বেলাভূমিতে। কখনও মধ্য রাত্রে ভেসে আসত একটা বাঁশের বাঁশীর সুর। গ্রামের দিকে ভুলেও আসত না। আসত য়ামায়া, গভীর রাত্রে চুপিচুপি। গ্রামের এক দোকানদারের কাছ থেকে সওদা করে নিয়ে যেত। বিনিময় প্রথা। নিয়ে আসত মুরগী, ডিম, নারকেল, কলার কাঁদি। নিয়ে যেত নুন, মোমবাতী, দেশলাই, কাপড়। দিনের বেলা আসত না। গ্রামের মানুষ সহ্য করত না তাকে। ও যে ছোঁয়াচে রুগীর রোগজীবাণু সর্বাঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওর ছেলেমেয়েরাও আসে না গ্রামে। তারপর আর বছরখানেক লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। তবু সে মরেনি বোধহয়। কারণ তাহলে য়ামায়া ফিরে আসত। য়ামায়া যে বেঁচে আছে এটুকু ওরা জানে, তাকে চোখে না দেখলেও। বাঁশীর শব্দটাও বন্ধ হয়েছে।

এবার কেউ ওঁকে যেতে বলেনি। তবু ডাক্তার ওয়াটকিন্স একটা মলম, কিছু বিস্কুট, গুঁড়ো দুধ, দেশলাই আর নুন নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলে স্থির করলেন। কেউ পথ দেখিয়ে সঙ্গে যেতে রাজী হল না। ও পাহাড়টা নিষিদ্ধ-অঞ্চল বলে মেনে নিয়েছে ওরা। অগত্যা একাই রওনা হলেন তিনি।

বনপথটা মুছে এসেছে। পায়ে-চলা পথে পায়ের দাগ আজকাল পড়ে না। দু পাশের আদিম অরণ্য তার সাবেক অধিকার ফিরে পাওয়ার উৎসাহে ঝুঁকে পড়েছে। পথে অসংখ্য ডাব পড়ে আছে ; কেউ কুড়িয়ে নিয়ে যায়নি। গতবার এত বন্য জন্তুও দেখেননি। এবার খরগোশ আর বন্য মোরগদের দেখলেন নির্ভয়ে পথের উপর চলাফেরা করতে। পায়ে-চলা পথটা ক্রমশঃ মিলিয়ে এসেছে—তবু ক্ষীণ একটা চিহ্ন আজও আছে। তাই শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলেন পাহাড়ের মাথায় সেই পাতায় ছাওয়া কুটিরের সামনে।

কাত হয়ে পড়েছে ঘরটা। সংস্কারের অভাবে। য়ামায়া কুটিরের সামনে একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে নারকেলের ছোবড়া ছাড়াচ্ছিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ সে। পদশব্দে ত্রস্তা হরিণীর মত ঘরের ভিতর ছুটে পালিয়ে যায়। ডাক্তার-সাহেব থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। একটু পরে ফিরে আসে য়ামায়া, তার মাজায় জড়ানো একখণ্ড কাপড়। কাঁকালে সেই শিশুটি। বছর দুই বড় হয়েছে ইতিমধ্যে।

—তোমার মরদকে দেখতে এসেছি. সে কোথায়?

—আচ্ছা, ওকে খবর দিই।

য়ামায়া ঢুকে গেল ঘরের ভিতর। ডাক্তার-সাহেবও ওর পিছন পিছন যাচ্ছিলেন, হাত নেড়ে বারণ করল মেয়েটি। দ্বারের বাইরেই দাঁড়িয়ে পড়েন উনি। খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে একটা দুর্গন্ধ। এ গন্ধ ডাক্তার-সাহেবের পরিচিত। গলিত কুষ্ঠের পুঁজের গন্ধ। ঘরের ভিতরে যে কথোপকথন হল তা সবই স্বকর্ণে শুনলেন উনি। গগনের কণ্ঠস্বর বিকৃত। ডাক্তার-সাহেব বুঝতে পারেন ওর গলার স্বরনালীও এতদিনে মহামারীর আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত। য়ামায়া বেরিয়ে আসে। বলে,—ও দেখা করবে না। তুই চলে যা।

একথা স্বকর্ণেই শুনেছিলেন ডাক্তার-সাহেব। তবু তিনি পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু প্রভুভক্ত কুক্কুরীর মতই য়ামায়া দরজা আড়াল করে দাঁড়াল। ভিতরে যেতে দিল না ওঁকে। ডাক্তার-সাহেব হতাশায় কাঁধ ঝাঁকালেন। উপহারের পুঁটলিটা দাওয়ায় রেখে পিছন ফিরলেন। অহেতুক এতটা পথ হেঁটে এসেছেন তিনি। তারপর য়ামায়াকে বলেন,-- তোমার মেয়েকে ডাক, আমাকে ফিরে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিক।

—সে নেই।

নির্বিকার মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দূরের আমগাছ তলাটা দেখিয়ে দিল। সদ্য কবর দেওয়া হয়েছে কাউকে, মাটিটা উঁচু হয়ে আছে। সহানুভূতিতে ডাক্তার সাহেবের মনটা ভারী হয়ে আসে। বলেন,—এখানে তুমি কেন পড়ে আছ? তুমি পাপীতিতে ফিরে যাও। ও বাঁচবে না। ওকে মরতে দাও।

আয়ত দুটি চোখ মেলে য়ামায়া একবার তাকায়। সে রীতিমত রোগা হয়ে গেছে। চোখ দুটি বসে গেছে। চোয়ালের হনু দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে। আজকাল সেও বোধকরি চুল আঁচড়ায় না, মাথায় জটা হয়ে গেছে তার। বললে,—ও যে আমার মরদ!

এত দুঃখেও হাসি পেল ডাক্তার-সাহেবের। ঠিকই বলেছিল সেদিন ঐ জঙলি মানুষটা! মেয়েমানুষ জাতটাই নিমকহারাম! যুগ-যুগান্তর ধরে তালিম দিয়েও সভ্য-সমাজ ওদের শেখাতে পারেনি মানব-জীবনের সেই মূল মন্ত্রটা—'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা!'

—আবার যদি কখনও এদিকে আসি, তোমাদের জন্য কি নিয়ে আসব?

—কিছু রঙ।

—রঙ? ও কি এখনও ছবি আঁকতে পারে?

—ও তো ছবিই আঁকছে বসে। দিন-রাত ছবি আঁকে।

—ও ক্যানভাস পায় কোথায়?

—না, দেওয়ালে ছবি আঁকছে এখন।

—কী রঙ চাই, ওকে জিজ্ঞাসা করে এস।

য়ামায়া মাথা ঝাঁকিয়ে বললে,—যে কোন রঙ। ও তো চোখে দেখে না। দুটি চোখই ওর নষ্ট হয়ে গেছে।

এ আবার কী কথা? যে চোখে দেখতে পায় না সে ছবি আঁকে? ডাক্তার সাহেব আর কথা বাড়াননি। য়ামায়া ওঁকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়ে গেল। লোকালয়ের কাছাকাছি এসে বললে,—এবার আমি যাই। ওরা দেখতে পেলে ইট মারবে!

আরও মাস দুয়েক পরের কথা। সেদিন বিলাতের ডাক এসেছে। ডাকে এক বাক্স স্যাম্পেল ওষুধ পেলেন ডাক্তার-সাহেব। সদ্য আবিষ্কার। কুষ্ঠ রোগের। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল টারাভাওয়ের সেই অন্তেবাসী শিল্পীর কথা। য়ামায়া কিছু রঙ চেয়েছিল, তাও তো দিয়ে আসা হয়নি। এবার কেউ তাঁকে ডাকেনি। তবু অন্তরে য়ামায়ার আহ্বান শুনতে পেলেন যেন। ওষুধের প্যাকেট, কিছু খাবার আর কয়েক টিউব রঙ নিয়ে উনি স্বতঃপ্রবত্ত হয়ে আবার এলেন টারাভাওয়ে।

টারাভাওয়ের লোকেরা বললে, য়ামায়া এখনও ফিরে আসেনি। এবারও একাই তাঁকে সেই পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠতে হল। এবার আদিম অরণ্য আরও নির্ভয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে পথ-চলতি পাকদণ্ডী সড়কের উপর। সেটার চিহ্নমাত্র নেই। তবু দুবার এ পথে এসেছেন। অনেকটা চেনা হয়ে গেছে। অবশেষে পাহাড়ের মাথায় সেই

পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরখানির সামনে এসে দাঁড়ালেন। এবার য়ামায়ার সাড়া পাওয়া গেল না। চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ। শুধু অজানা পাখির ডাক, আর বন-ঝিঁঝির একটানা একটা শব্দ। ডাক্তার ওয়াটকিন্স পোঁটলাটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে যান ঘরের দিকে। হাট করে খোলা আছে দরজাটা। ঘরটা আরও বেঁকে গেছে। বারান্দায় ভাঙা একটা মাটির কলসী। জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। য়ামায়ার নাম ধরে ডাকলেন বার দুয়েক। প্রতিধ্বনিই ফিরে এল শুধু। খোলা দরজা দিয়ে একটা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। নাকে রুমালটা চেপে ধরেন তিনি। তারপর ভিতরে ঢুকে পড়েন।

ভিতরটা রীতিমত অন্ধকার। দরজাটা অত্যন্ত ছোট—তা দিয়ে অল্প আলো আসছে, জানলাটা বন্ধ। প্রখর সূর্যালোক থেকে ও-ঘরে ঢুকে কিছুই দেখতে পেলেন না উনি। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকারে চোখটা সয়ে গেল। সান্ধ্য-আকাশের তারার মত এখানে ওখানে একটি একটি করে ফুটে উঠল কয়েকটি দৃশ্য। কেমন যেন গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল ওঁর। এ কী! উনি তো কোন ঘরের ভিতর নেই—তাঁর চারদিক ঘিরে শুধু গভীর অরণ্য! গাছ গাছ আর গাছ! পাহাড় ঝরনা—ঘন বেতের ট্রপিক্যাল জঙ্গল! দূরে দূরে কিছু নারকেল গাছ, আম গাছ—আর বাদবাকি সবই অচেনা গাছ। কিন্তু জঙ্গল তো নির্জন নয়। ঐ তো কতকগুলি সম্পূর্ণ উলঙ্গ মানুষ!

—প্রফেসর ম্যাক্‌গ্রেগরী, আমি ছবির কিছুই বুঝি না। ও ছবিরও কিছু বুঝতে পারলাম না। মেঝে থেকে সিলিঙ পর্যন্ত চারদিকের দেওয়ালে একতিল কোথাও ফাঁকা নেই, এটুকু দেখলাম শুধু। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। একটা অতিকায় আদিম জন্তু যেন তার আঁশওয়ালা লেজ দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরছে। আমি সিস্‌টিন চ্যাপেলে মিকেলাঞ্জেলোর লাস্ট-জাজমেন্টও দেখেছি। কিন্তু সেখানে মনকে তৈরী করেই নিয়ে গিয়েছিলাম—আমি জানতাম মিকেলাঞ্জেলো মহান শিল্পী, আমি জানতাম, সিস্‌টিন চ্যাপেল বিশ্বের এক বিস্ময়! কিন্তু এ কী! তাহিতি দ্বীপের এক দূরপ্রান্তে পর্ণকুটীরে এ জিনিস যে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। আমার কেমন মনে হল জানেন? একবার ইংল্যাণ্ডে ডার্টমুরে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। নীরন্ধ্র অন্ধকার রাত্রি। শুধু আকাশ ভরা তারা ছিল। আমি হাতড়ে হাতড়ে পথ চলছিলাম। মনে হচ্ছিল—এ পথ অসীমে গিয়ে মিশেছে, এ রাত্রিও বোধহয় নিষ্প্রভাত! বিশ্ব চরাচরে আমি একা, নিতান্ত একা! হঠাৎ আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। অন্ধকারে হাত বুলিয়ে দেখি যাতে হোঁচট খেয়েছি সেটা একটা কবর। আমার হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। তারার আলোয় হঠাৎ নজর হল, পথ ভুলে আমি একটা গোরস্থানে এসে পৌঁছেছি! আমার চারদিকে শুধু কবর, কবর আর কবর! সারি সারি ক্রুশচিহ্ন! তারা হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছিল! কারা যেন উইলো পাতার নিঃসরণের সঙ্গে তাল রেখে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে আমাক বলতে চাইছিল তাদের অতীত ইতিহাসের কথা—যখন তারা রক্ত-মাংসের জীব ছিল! অথচ কবরগুলো বোবা! ভয়ে আমি সেবার আর্তনাদ করে উঠেছিলাম!...এখানেও ঐ প্রাচীরচিত্রের উলঙ্গ নরনারীর দল যেন আমাকে কী কথা বলতে চায়, বলতে পারছে না—বলছে, অথচ আমি বুঝতে পারছি না ; এখানেও তেমনি কে যেন আমার কাঁধের উপর উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলল! কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে! আমি চিৎকার করতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটল না আমার কণ্ঠে! ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি—য়ামায়া!

ছুটে বেরিয়ে এসেছিলাম অন্ধকূপ থেকে। হ্যাঁ, য়ামায়াই। বারান্দার খুঁটি ধরে বিনিয়ে

বিনিয়ে কাঁদছে প্রেতাত্মার মত।

—য়ামায়া! য়ামায়া!

মেয়েটা মুখ তুলে তাকায়। মেয়ে নয়, তার কঙ্কাল! তার প্রেতাত্মা!

—তোমার মরদ কোথায়?

একই ভঙ্গিতে তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে এবারেও সে দেখিয়ে দিল দূরের আমগাছটা। আগের বার যে সমাধিস্তূপটা দেখেছিলাম তারই অদূরে পড়ে আছে গগন পালের মৃতদেহ। গলিত-কুষ্ঠের অন্তিম অবশেষ! দুর্গন্ধটা তারই। গাছের ডালে বসে আছে কটা শকুন। গাছের আড়ালে ওগুলো শেয়াল অথবা নেকড়ে!...

গগ্যা মারা গিয়েছিল দুদিন আগে। য়ামায়া তাকে টানতে টানতে ঐ গাছতলা পর্যন্ত নিয়ে গেছে। একটা গর্ত খুঁড়বার চেষ্টাও সে করেছে দুদিন ধরে। কিন্তু অনাহারে সে দুর্বল। একা হাতে অতবড় দানবটাকে সে মাটির বুকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। ঐ শকুন আর শেয়ালের হাত থেকে তার মরদকে রক্ষা করতেই বেচারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ডাক্তার ওয়াটকিন্স ওর হাত থেকে কোদালটা তুলে নিলেন। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সমাধিস্থ করলেন জঙলি মানুষটাকে। খাদ্যদ্রব্য কিছু ছিল না। ভাগ্যে উনি কিছু বিস্কুট আর পাঁউরুটি এনেছিলেন। কতদিনের অনাহার কে জানে? য়ামায়া দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত খেল। ডাবের জল খেল। একটু সুস্থ হয়ে বসল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

—ওর বাড়ির ঠিকানা জান?

য়ামায়া তার রুক্ষ চুলের মাথাটা ঝাঁকালো।

—তোমার ছোট ছেলেটাকে দেখছি না! সে কই?

এবারও একইভাবে মাথা ঝাঁকায়, অর্থাৎ সেটাও গেছে!

ডাক্তার সাহেব বলেন,—ভেবে আর কি হবে য়ামায়া! তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমাকে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে যাব।

আবার মাথাটা ঝাঁকায় বলে,—ঐ ঘরটা—

—ঘরটা?

তাই তো। ঘরখানার কথা মনে পড়ল এতক্ষণে। ওটার কথা মনেই ছিল না। ঘরটায় কি যেন অদ্ভুত সব ছবি আঁকা আছে না? কি ছবি? মনে পড়ছে না। অথচ ঘন্টাখানেক আগে ওটার ভিতর অদ্ভুতদর্শন কি যেন দেখেছিলেন মনে পড়ছে। ভয় পেয়েছিলেন। এবার য়ামায়াকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করেন সেই পাতায় ছাওয়া ঘরখানায়। দেওয়ালের ছবিগুলো ভাল করে দেখতে।

অধ্যাপক ম্যাক্‌গ্রেগরী আর কৌতূহল দমন করতে পারেন না। বলেন,—চিত্রের বিষয়বস্তুটা ঠিক কি ছিল বলুন তো? কী বলতে চেয়েছেন শিল্পী?

—তা আমি কি জানি? কিছুই বোধগম্য হয়নি আমার। একটা আদিম অরণ্যকে দেখেছিলাম, এটুকু মাত্র মনে আছে। সৃষ্টির আদিতে আদম আর ঈভ যে অরণ্যে বাস করত সেই হারিয়ে-যাওয়া বনভূমিই যেন এতদিনে প্রাণ পেয়ে উঠেছে। অদ্ভুত সুন্দর সে বনভূমি—বীভৎস আর ভয়াবহ। প্রকৃতির অন্তর্লীন আত্মাকেই উদ্ঘাটিত করেছেন শিল্পী। গাছপালা, পাহাড় আর নদী—সবই যেন জীবন্ত। সবই যেন প্রাণরসে ভরপুর। পাতাটি পার্চিং স্টোন! আর সেই আদিম অরণ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে কতকগুলো অসাধারণ অদ্ভুত জীব। তারা বিশ কোটি বছর আগেকার জুরাসিক যুগের অতিকায় টিরানোসরাসের স্বগোত্র হতে পারে, আবার অতি আধুনিক মানব মনের অবচেতন অরণ্যের বাসনা

কামনাও হতে পারে! আর ছিল মানুষ—হ্যাঁ!, পুরুষ-স্ত্রী-শিশু-বৃদ্ধ-পূর্ণযৌবনা নারী! সবাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাদের কেউ কেউ আবার টেরোডেক্‌টিলের মত আকাশে ভেসে চলেছে। তাদের সত্তা আছে, ওজন নেই। ওরা মানুষের মত দেখতে, অথচ ঠিক মানুষ নয়। যেন অস্থি-মজ্জা-মেদ-রক্ত-মাংস দিয়ে ওদের গড়েননি সৃষ্টিকর্তা—গড়েছেন ঈর্ষা-প্রেম-দ্বন্দ্ব-করুণা আর জিঘাংসা দিয়ে! তারা মানুষখেকো বাঘের মত নিষ্ঠুর অথচ দেহাতীত প্রেমের মত স্বর্গীয়! আমি আপনাকে বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পারছি না প্রফেসর। তবে এটুকু বলব, আপনি নিজেও সে ছবি দেখলে চমকে উঠতেন। কারণ আপনার মনে হত ওগুলো কোন অলৌকিক জীবের চিত্র নয়। মনে হত ওগুলো আদৌ কোন ছবি নয়—দেওয়াল-জোড়া ওটা একটা আয়না ; কারণ আপনার প্রতিবিম্বই দেখতে পাচ্ছেন আপনি! ও ছবি আপনারই!

অধ্যাপক ম্যাক্‌গ্রেগরী উৎসাহে উঠে দাঁড়ান। বলেন,—ডক্টর! আমাকে নিয়ে চলুন সেখানে। ও-ছবি নিয়ে আসা যাবে না ; কিন্তু আমার কাছে কালার্ড ফিল্ম আছে। প্রতিটি দেওয়ালের—

বাধা দিয়ে ডাক্তার সাহেব বলেন,—আমি দুঃখিত প্রফেসর। সে ছবি নেই।

—নেই! কেন? কি হল ঘরখানার?

ডাক্তার-সাহেব তাঁর শেষ দিনের অভিজ্ঞতা বলতে থাকেন। য়ামায়াকে তিনি সভ্য দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন সঙ্গে করে। মেয়েটি রাজী হয়নি। বলেছিল, সে পরে আসবে। তার বুঝি কী একটা কাজ ওখানে বাকি আছে। কী কাজ, জানতে চেয়েছিলেন ডাক্তার-সাহেব। জবাবে য়ামায়া বলেছিল—ঘরখানা জ্বালিয়ে দিতে হবে!

মৃত্যুর পূর্বে গগন নাকি য়ামায়াকে নির্দেশ দিয়ে যায়—তার জিনিস—কাপড়, রঙ, তুলি, ছবি সব কিছু ঐ ঘরখানায় ভরে যেন তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। কুষ্ঠব্যাধির বীজের যেন কোন অবশেষ না থাকে। ডাক্তার-সাহেব য়ামায়াকে বারণ করলেন। ছবির কিছু না বুঝলেও উনি এটুকু বুঝেছিলেন যে, এ এক অদ্ভুত সৃষ্টি। কিছু ফটো তুলে রাখার কথা তাঁর মনে হয়েছিল। সেকথা তিনি জানিয়েছিলেন জঙলি মেয়েটিকে। বলেছিলেন—আমি নিজে ডাক্তার, এ রোগের সংক্রামতার কথা আমার চেয়ে কেউ বেশি বোঝে না। আমি বারণ করছি। দু-চারদিন পরেই আমি ফিরে আসব, দু-দশখানা ফটো নেব। তারপর আমি নিজেই জ্বালিয়ে দিয়ে যাব।

য়ামায়া চুপ করে অবসন্নের মতো বসে রইল। হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। অগত্যা একাই ফিরে চললেন ডাক্তার সাহেব। আধখানা পথও আসেননি—হঠাৎ দেখতে পেলেন পাহাড়ের মাথায় আগুন লেগেছে। আবার চড়াই ভেঙে উপরে উঠে গেলেন। দেখেন, প্রভুভক্ত কুক্কুরীর মত য়ামায়া তার মরদের শেষ আদেশ পালন করেছে নিঃশব্দে। পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরখানা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত!

...একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে প্রফেসর ম্যাক্‌গ্রেগরীর।

ডাক্তার ওয়াটকিন্স তাঁর দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে একটা চুরুট ধরান। বলেন,—শিল্পীর ছবিখানা আমি আমার চেম্বারেই টাঙিয়ে রেখেছি। আচ্ছা, প্রফেসর! গগন পাল কি সত্যিই একজন প্রতিভাধর শিল্পী? এ ছবিখানি আমি যদি বিক্রি করতে চাই তার খদ্দের হবে?

প্রফেসর ম্যাক্‌গ্রেগরীও তাঁর পাইপ ধরাতে ব্যস্ত ছিলেন। বলেন,—হবে। খদ্দের আপনার সামনে উপস্থিত। ছবিখানা আমি কিনব। কত দাম নেবেন?

ডাক্তার সাহেব ইতস্ততঃ করে বলেন,—সত্যি কথা বলতে কি, ছবির কী রকম দাম হয় আমার কোন ধারণা নেই। আপনি যা ন্যায্য মনে করুন, দিন।

—বেশ। তাই দিচ্ছি আমি। একটু হিসাব কষি তাহলে। আগে বলুন, আপনি সারাদিনের জন্য দূর গ্রামে রুগী দেখতে গেলে কত ভিজিট নেন?

—একথা কেন?

—বলুনই না!

—দশ ডলার।

অধ্যাপক তাঁর বুক-পকেট থেকে ভারি ওয়ালেটটা বার করে বলেন,—আপনি তিনবার শিল্পী গগন পালকে দেখতে গিয়েছিলেন। সুতরাং ত্রিশ ডলার আপনার প্রাপ্য। আপনি নিজেই বলেছেন যে, শিল্পী আপনাকে বলেছিলেন—গরীবের যে আত্মসম্মান জ্ঞান থাকবে না এমন কোন কথা নেই—

—আপনি কি পুরো ত্রিশ ডলার দাম দিতে চান? ঐ সামান্য ছবিটার?

—না। তাহলে শিল্পী গগন পাল হবেন মিথ্যাবাদী, আর আমি জোচ্চোর।

—তার মানে?

—শিল্পী আপনাকে আরও বলেছিলেন—এ ছবি ভবিষ্যতে আপনার ভিজিটের শতগুণ আপনাকে দেবে। এই নিন—তিন হাজার ডলার!

ডক্টর ওয়াটকিন্স জবাবে কি বলেছিলেন তা আর বলেননি অধ্যাপক। দ্বৈপায়ন-দাদুকে শুধু বলেছিলেন,—ডক্টর লাহিড়ী! আপনি জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বাড়ি-গাড়ি-পশার-প্রতিপত্তি সবই হয়েছে। তবু কিছু মনে করবেন না—আজ থেকে একশো বছর পরে কেউ যদি আপনার নাম উচ্চারণ করে তবে তা করবে এজন্য যে, আপনি গগন পাল আর চন্দ্রভান গর্গের বন্ধু ছিলেন!

কথাটা জীবনে এই প্রথম শুনছেন না ডক্টর দ্বৈপায়ন লাহিড়ী। তফাত এই যে, প্রথমবার সেটা পাগলের প্রলাপ মনে হয়েছিল—এবার আর তা হল না!

দীর্ঘ কাহিনীর উপসংহারে দাদু বললেন, —গগনের বিরুদ্ধে আমার পর্বত-প্রমাণ অভিযোগ ছিল। তাকে আমি আজীবন ক্ষমা করিনি। শান্তি দেবীর প্রতি তার নিষ্ঠুরতা, বাবলু-মিণ্টির প্রতি তার নির্মম ঔদাসীন্য, বটুকের প্রতি নিক্ষিপ্ত তার পৈশাচিক বিদ্রূপ এবং সুলেখার প্রতি নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতায় আমি মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ ছিলাম। অর্ধশতাব্দীকাল ধরে আমার মনে যে হিমালয়ান্তিক অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার কৈফিয়ৎ গগন দিয়ে গেছে একটিমাত্র ছত্রে ঃ

—A man's work is the explanation of that man!

একটা মানুষের সৃষ্টিই তার অস্তিত্বের কৈফিয়ত!

আর চন্দ্রভান! ভিন্সেন্ট ভান গর্গ মরেনি, মরতে পারে না! সে বেঁচে আছে এই আমাদেরই আশেপাশেই,—সে নিশ্চয় ফিরে এসেছে এই পৃথিবীতে। শুধু আমরা তাকে ঠিকমত চিনতে পারছি না। তোমাকে কি বলব নরেন, এই বৃদ্ধ বয়সে গোলদীঘির ধারে, কফি-হাউসের কোণায়, মুক্তি-মেলার আসরে আজও তাকে খুঁজে বেড়াই আমি। নিদারুণ দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত কোন আর্টিস্টকে যখন কলকাতার ফুটপাতে স্কেচ করতে দেখি আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ি! মনে হয়?—ঐ তো ভিন্সেন্ট! সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি, সেই ময়লা পায়জামা আর ছেঁড়া পাঞ্জাবি! হাতে ভাঁড়ের চা, মুখে সবুজ-সুতোর বিড়ি! মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত-ঘরের সন্তান,—কোথায় লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করবি, বিয়ে-থা করবি, র‍্যাশন আনবি, সংসার করবি—তা নয়, ওরা ছবি আঁকতে বসেছে। বাড়িতে নিত্য গঞ্জনা, বন্ধুমহলে পাগলা বলে পাত্তা পায় না, বিয়ের বাজারে ওরা কানাকড়ি! কণ্ঠা-বার-করা ঘাড়-কুঁজো থুবড়িগুলো পর্যন্ত ওদের দিকে চোখ তুলে তাকায় না! ওরা যে পাগলামির আগুনে ওদের হাতের সব রেখা—সৌভাগ্য-রেখা, আয়ু-রেখা, যশঃ-রেখা—সব পুড়িয়ে ফেলেছে! ভাল কথা বললে শোনে না, গাল দিলে ভ্রূক্ষেপ করে না—বেহায়াগুলোর দু কান কাটা! আমি ওদের মধ্যে খুঁজে বেড়াই—ওর মধ্যে নতুন-করে-জন্ম-নেওয়া কোন্‌টা আমার সেই হারানো বন্ধু 'কানকাট্টা সেপাই' ভিন্সেন্ট ভান গর্গ?

পরিশিষ্ট

[Vincent Van Gogh]

১৮৫৩ ঃ ৩০শে মার্চ হল্যাণ্ডের পল্লীতে ভান গখ্-এর জন্ম। অনুজ তেও ভান গখ্ ছিলেন চার বছরের ছোট।

১৮৬৮ ঃ হেগ শহরে 'গোপিল আর্ট ডীলার্স' কোম্পানিতে শিক্ষানবিশ হিসাবে প্রথম চাকরিতে প্রবেশ। পাঁচ বছর পরে ভ্যাঁসঁ হেগ থেকে লণ্ডন অফিসে বদলি হয়ে যান এবং হেগ অফিসে তাঁর শূন্য পদে অনুজ তেও বহাল হন। তেও ঐ কোম্পানিতে সারা জীবন চাকরি করেন।

১৮৭৩-৭৪ ঃ লণ্ডনে যে-বাড়িতে ভ্যাঁসঁ থাকতেন সেই ল্যাণ্ড-লেডির চটুল-স্বভাবা কৌতুকময়ী কন্যা উরসুলা লায়রকে ভালবেসে ফেলেন। রহস্যময়ী উরসুলার হৃদয় জয় করেছেন বলে বিশ্বাসও করেন ; কিন্তু যেদিন মেয়েটির কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলেন সেদিন সে জানালো যে, সে বাকদত্তা। প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে ভ্যাঁসঁ ধর্ম-জগতের দিকে ঝুঁকলেন। কাজে মন নেই, ফলে চাকরি গেল।

১৮৭৬-৭৯ ঃ ভান গখ্ নানান জীবিকার সন্ধানে ফেরেন—স্কুলে শিক্ষকতা, বইয়ের দোকানে সেল্স্ম্যানের চাকরির চেষ্টা করেন, কিন্তু মন বসে না। মনে হয় তিনি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন ; সেটা কী তা বুঝতে পারেন না। ঐ সময় তিনি দিনে আঠারো ঘন্টা পড়াশুনা করতেন—বাইবেল ও সাহিত্য। আমস্টার্ডামে গিয়ে যাজক হবার চেষ্টা করেন এবং গ্রীক ও ল্যাটিন শিক্ষা করেন। ১৮৭৮ সালে শিক্ষানবিশী ঈভানজেলিস্ট হিসাবে ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত হন। বেলজিয়ামের "বরিনেজ' বা কয়লাখনি অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে প্রেরিত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়লাকুঠির কর্তৃপক্ষ এবং চার্চ-সম্প্রদায় উভয়পক্ষের কাছেই তিনি বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। অপরাধ—মালকাটাদের তিনি নিজ বিবেকের নির্দেশ অনুসারে সেবা করতে চেয়েছিলেন। কোলিয়ারির একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত মজদুরদের আত্মার সদ্গতি কামনায় যখন তিনি ফিউনারাল সার্ভিসে রত তখন নাটকীয়ভাবে চার্চ-সম্প্রদায়ের কর্মকর্তারা আসেন, তাঁকে পদচ্যুত ও চার্চ থেকে বিতাড়িত করেন।

১৮৮০ ঃ মালকাটাদের প্রতিকারহীন দুর্দশায় ঈশ্বরের ঔদাসীন্যে মর্মাহত হয়ে ভান গখ্ ঈশ্বরে বিশ্বাস হারান। হঠাৎ ছবি-আঁকা শুরু করেন। শিল্পগুরু রেভারেণ্ড পিটারসন ছিলেন ব্রাসেল্স-এ। আশি কিলোমিটার হেঁটে তাঁকে ছবি গুলি দেখাতে আসেন। পিটারসন তাঁর ছবিগুলি প্রথম দেখে হতাশ হন। পরে ঐ স্কেচগুলির ভিতরেই তাঁর প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাঁকে শেখাতে শুরু করেন। ভান গখ্ কিন্তু প্রাথমিক পাঠ শেষ করে পুনরায় কয়লাকুঠিতে ফিরে আসেন। নিদারুণ অর্থাভাবে অনশনে যখন তিনি মৃত্যুমুখে, সহসা তেও এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। এই বছরই তিনি তাঁর বিধবা ফার্স্ট-কাসিন বা ভগ্নী (মতান্তরে ভাগ্নি) 'কী' ভস্-এর প্রেমে পড়েন ; কিন্তু 'কী' তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। ভ্যাঁসঁ কী-এর পিতার সম্মুখে তাঁর প্রেমের একনিষ্ঠার প্রমাণ দিতে নিজ দক্ষিণ হস্ত প্রদীপ-শিখায় বাড়িয়ে ধরেন। এ দহন-চিহ্ন তাঁর বাকি জীবনের সঙ্গী হয়ে ছিল।

১৮৮১-৮৩ ঃ কী-এর কাছে পুনর্বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে শিল্পী সর্বতোভাবে চিত্রশিল্পে আত্মনিয়োগ করেন। তেও প্রতি মাসে তাঁকে মাসোহারা পাঠাতেন। তাতেই তাঁর

গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হত। এই সময়ে ক্রিস্টিন হুর্নিক নামে একটি গর্ভবতী বারাঙ্গনাকে একদিন তাঁর বাসায় নিয়ে আসেন। অভিশপ্ত জীবনের ফলশ্রুতি হিসাবে ক্রিস্টিনের একটি সন্তান হয়। শিল্পী ক্রিস্টিনকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু দু বছরের মাথায় ক্রিস্টিন তাঁকে ত্যাগ করে অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যায়। গার্হস্থ্য-জীবনের মাধুর্য, রমণীর স্নেহ-ভালবাসা এই দু বছরই পেয়েছিলেন শিল্পী।

১৮৮৩-৮৬ ঃ পুনরায় দেশে ফিরে আসেন। শিল্পদর্শনে নূতন চিন্তাধারা জাগে। সৌন্দর্যের প্রতি সভ্যজগৎ-স্বীকৃত তথাকথিত বুর্জোয়া মনোভাব তিনি অস্বীকার করেন-- দুঃখ, দারিদ্র্য, অবহেলিত মনুষ্য-সমাজের যন্ত্রণার চিত্র তাঁর শিল্পে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। কুৎসিত কদাকার বিষয়বস্তুও যে শিল্প-পদবাচ্য হতে পারে এই নূতন সত্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। ফলে তাঁর সৃষ্টি স্বীকৃতি পায় না। এমিল জোলার সাহিত্য এবং দেলাক্রোয়ের শিল্পদর্শন তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার শুরু করে। 'Potato Eaters' এই যুগে আঁকা।

১৮৮৬-৮৭ ঃ আন্টওয়ার্পে এসে রুবেন্স-এর শিল্প দেখে আকৃষ্ট হন। এই সময়ে অনেকগুলি জাপানী উডকাট্ দেখেন। সেগুলি প্রচণ্ড ভাল লাগে। তাঁর পরবর্তী জীবনে চিত্রের পশ্চাৎপটে প্রায়ই জাপানী ছবির নক্সা দেখা যায়। পারী আগমন। তুলোজ-লুত্রেক, গুইলমিন, বার্নার্ড, লাভাল, গোগ্যাঁ, রাসেল, পিসারো প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। উচ্চবিত্তের তথাকথিত বিশুদ্ধ-আর্টের বন্ধন থেকে চিত্রশিল্পকে মুক্ত করতে এই সময়ে ঐ শিল্পীবৃন্দ একটি 'কম্যুনিস্ট আর্ট-কলোনি' স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন, যা বাস্তবায়িত হয়নি।

১৮৮৮ ঃ পারী অসহ্য লাগে। ভান গখ্ আর্লেতে চলে যান। সেখানে প্রখর রৌদ্র। সূর্য হয়ে উঠল শিল্পীর মূল কেন্দ্রবিন্দু। রোলিন নামে একজন প্রতিবেশী ডাক-পিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। রোলিন ও তার পুত্রের পোর্ট্রেট আঁকেন। 'সূর্যমুখী' ও 'সাঁকো' এই যুগের সৃষ্টি। বন্ধু পল গোগ্যাঁর নিরতিশয় দারিদ্র্যের কথা জানতে পেরে ঐ সময় তাঁকে নিজের কাছে এনে রাখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। গোগ্যাঁর কাছে ট্রেনভাড়া ছিল না। তেও শেষ পর্যন্ত গোগ্যাঁকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দেন। গোগ্যাঁর আর্লে আগমন। দুই শিল্পীর মতান্তর থেকে মনান্তর। একদিন ক্ষুর দিয়ে উন্মাদ অবস্থায় ভান গখ্ বন্ধুকে আক্রমণ করেন। গোগ্যাঁ তৎক্ষণাৎ পারীতে পালিয়ে যান। সেই রাত্রেই ভান গখ্ ঐ ক্ষুর দিয়ে নিজের দক্ষিণ কর্ণ ছেদন করেন এবং সেটি একটি বার-মেড-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। মেয়েটি নাকি তাঁর কানের প্রশংসা করেছিল এবং ঠাট্টার ছলে কানটা উপহার চায়।

১৮৮৯ ঃ সেন্ট-রেমি উন্মাদাগারে আশ্রয় লাভ। এই সময় (১৭. ৪. ৮৯) তেও বিবাহ করেন। ভ্যাঁসঁ ভবিষ্যতের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েন। বিবাহিত অনুজের উপার্জনে ভাগ বসাতে স্বতঃই তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন। এর পর তাঁর চিত্রে সূর্যের বদলে চাঁদ ও তারার দল প্রাধান্য পেতে থাকে। 'বন্দীদলের চক্রাবর্তন' এবং 'শোকাহত বৃদ্ধ' এই যুগে আঁকা। প্রতি তিন মাস অন্তর পর্যায়ক্রমে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারাতে থাকেন।

১৮৯০ ঃ ২৭শে জুলাই একটি পিস্তল বুকে লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে তেও ছুটে আসেন। ২৯শে জুলাই সজ্ঞানে তাঁর মৃত্যু হয়। শেষ বারো ঘন্টা একমাত্র তেও ছিলেন তাঁর শয্যাপার্শ্বে। ভান গখ্-এর মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে তেও উন্মাদ হয়ে যান। উন্মাদ অবস্থায় তিনি স্ত্রীকে আক্রমণ করেন—কারণ, ঐ সময় তাঁর ধারণা হয়েছিল স্ত্রীর আগমনেই তাঁর দাদা আত্মহত্যা করেছেন! আরও তিন মাস পরে উন্মাদ অবস্থাতেই তেও প্রাণত্যাগ করেন।

তার তেইশ বছর পরে তেও-এর বিধবা পত্নী হল্যাণ্ড থেকে স্বামীর দেহাবশেষ সংগ্রহ করে আনেন। তাঁর দাদার সমাধির পাশে স্বামীর দেহাবশেষ সমাধিস্থ করেন। পারীর অনতিদূরে দুটি কবর পাশাপাশি আছে—শিল্পরসিকদের তীর্থ। একটি আইভিলতা দুটি সমাধিকে জড়াজড়ি করে আছে!

ভ্যাঁসঁ ভান গখ্-এর জীবদ্দশায় তাঁর একখানি মাত্র চিত্র স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হয়েছিল। মৃত্যুর অনতিকাল পর থেকেই তিনি বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম বলে স্বীকৃত!

য়োজেন অঁরি পল গোগ্যাঁ

[Paul Gauguin]

১৮৪৮ ঃ ৭ই জুন তারিখে পারীতে পল গোগ্যাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন একজন প্রগতিবাদী ফরাসী সাংবাদিক, মা স্পেন দেশের মেয়ে। স্পেনের লোক হলেও ওঁর দাদামশাই দীর্ঘদিন দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে ছিলেন।

১৮৫১ ঃ গোগ্যাঁর বয়স যখন তিন তখন তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী দেশের ক্ষমতা দখল করেন। ঐ সময়ে তাঁর বাবা সপরিবারে পেরুতে যাত্রা করেন—ইচ্ছা ছিল সেখানেই বাস করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জলযাত্রায় শিল্পীর পিতৃ-বিয়োগ হয়। সন্তানদের নিয়ে ওঁর মা চার বছর পেরুর রাজধানী লিমাতে ছিলেন।

১৮৬০ ঃ মায়ের সঙ্গে প্যারীতে ফিরে আসেন এবং ওর্লেতে স্কুলে ভর্তি হন।

১৮৬৫ ঃ সতের বছর বয়সে সদাগরী জাহাজে কাজ নিয়ে কয়েকবার ফ্রান্স ও দক্ষিণ আমেরিকার ভিতর যাতায়াত করেন। পরে ফরাসী নৌ-বাহিনীতে যোগ দিয়ে সেকেণ্ড লেফটেনান্ট-পদে উন্নীত হন।

১৮৭১-৮২ ঃ নৌ-বাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে শেয়ারের দালালীর কাজ ধরেন। স্টক ব্রোকার হিসাবে তাঁর যথেষ্ট রোজগার হয়। ঐ সময় তিনি মেটি সোফিয়া গ্যাড নামে একটি ওলন্দাজ মহিলাকে বিবাহ করেন। অবসর সময়ে ও ছুটির দিনে গোগ্যাঁ ছবি আঁকতেন। ১৮৭৬ সালে তাঁর একটি ছবি সাঁলোতে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়। গোগ্যাঁ এতে অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করেন এবং স্টক ব্রোকার-এর কাজের ক্ষতি করেও দিবারাত্র ছবি আঁকতে থাকেন। সংসারে এজন্য স্বতঃই অশান্তির সৃষ্টি হয়। কামীল পিসারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়।

১৮৮৩ ঃ এতদিনে গোগ্যাঁ তিনটি সন্তানের জনক। এই বছর তিনি সর্বক্ষণ ছবি আঁকার জন্য দালালী সম্পূর্ণ ছেড়ে দেন। পুত্রকন্যাসহ স্ত্রীকে তাঁর পিত্রালয়ে কোপেনহেগেন-এ পাঠিয়ে দিয়ে পারীতে স্টুডিও খুলে দিবারাত্র আঁকতে শুরু করেন। নিতান্ত দারিদ্র্যে মাঝে মাঝে তাঁকে রাস্তায় পোস্টার সাঁটার কাজ করতে হত। ঐ সময় তাঁর বড় ছেলে ক্লোভিস্ তাঁর সঙ্গে ছিল।

১৮৮৬ ঃ চালর্স লাভাল নামে একজন চিত্রকরের সঙ্গে পানামা যাত্রা করেন। সেখানে লাভালের একজন ধনী ভগ্নীপতি ছিলেন। তাঁর কাছে বিশেষ সাহায্য পাওয়া গেল না। গোগ্যাঁ পানামা খালে মাটি কেটেও গ্রাসাচ্ছাদন করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি য়ুরোপ ফিরে আসেন।

১৮৮৮ ঃ আর্লেতে ভ্যাঁসঁর সঙ্গে বাস ও ভ্যাঁসঁর কাছ থেকে পলায়ন। প্রায় এই সময়েই তেও ভান গখ্-এর আগ্রহে ও ব্যবস্থপনায় গোগ্যাঁর একটি চিত্র-প্রদর্শনী হয় ;

তাতে ছবি কিন্তু বিশেষ বিক্রী হয়নি। শিল্পী তখন ব্রিটানিতে বসবাস করেন।

১৮৯০ ঃ ভ্যাঁসঁর আত্মহত্যা ও তেওর মৃত্যুতে গোগ্যাঁ হতাশ হয়ে পড়েন। শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত মনে হয়।

১৮৯১ ঃ ৪ঠা এপ্রিল গোগ্যাঁ এক দুঃসাহসিক অভিযান করেন। পৃথিবীর অপর প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের একান্তে তাহিতি দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের ছবি আঁকবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করেন। প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি তাহিতির রাজধানী পাপীতিতে পৌঁছান। এই যুগে তিনি তাঁর জীবনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চিত্র আঁকেন, যার ভিতর 'Ta Mateti' অন্যতম। ঐ সময়ে শিল্পী য়ামায়া নামে একটি নিরক্ষর আদিবাসীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। য়ামায়া নিরলস নিষ্ঠায় তাঁর সেবা করেছে। সে জানত শিল্পী বিপত্নীক। অথচ তখন ঐ কুটির থেকেই গোগ্যাঁ কোপেনহেগেনে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করতেন। তাঁর য়ুরোপীয় স্ত্রী য়ামায়ার কথা কোনদিন জানতে পারেননি। বছর দুয়েকের মধ্যেই তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসেন। য়ামায়াকে ফেলে।

১৮৯৪ ঃ মার্সেলস্-এ আন্না নামে একটি জাভা-দেশীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে গোগ্যাঁ বাস করতে থাকেন। আন্নার অনেকগুলি ছবি তিনি এঁকেছেন। এডগার দেগার সঙ্গে এ-সময়ে বন্ধুত্ব গাঢ়তর হয়। গোগ্যাঁ এই বছরই শেষবারের মত স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ডেনমার্কে আসেন। কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় ফ্রান্সের ব্রিটানিতে ফিরে আসেন ও আন্নার সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। এই সময়ে আন্নাকে কেন্দ্র করে একবার তিনি কয়েকজন মদ্যপ নাবিকদের সঙ্গে রাস্তায় মারামারি করেন। ফলে তাঁর পা ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরে আন্না তাঁর স্টুডিও থেকে অনেক জিনিস নিয়ে পালায়। ভাঙা পা ও যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত গোগ্যাঁর অবস্থা চরমে ওঠে।

১৮৯৫ ঃ আন্নার কাছে শেষ মার খেয়ে গোগ্যাঁ পুনরায় তাহিতিতে ফিরে যাবেন বলে মনস্থির করেন। সত্যিই তিনি তাহিতিতে ফিরে আসেন। এবার তিনি গভীরতর অরণ্যে বসবাস শুরু করেন। য়ামায়ার সন্ধান পেয়েছিলেন কিনা জানা যায় না।

১৮৯৭ ঃ কন্যা এলিনের মৃত্যুসংবাদে শিল্পী মূর্ছাতুর হয়ে পড়েন। ঐ আঘাতে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রূপক চিত্র আঁকতে বসেন। তার বিষয়বস্তু—"আমরা কোথা থেকে আসছি—আমরা কি? ও কোথায় যাচ্ছি?" পুরো এক বছর দিবারাত্র পরিশ্রম করে ঐ মহান চিত্রটি শেষ করেন।

১৮৯৮ ঃ পূর্বকথিত ছবি আঁকা শেষ হলে আর্সেনিক সেবনে শিল্পী আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ; কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৮৯৯-০৩ ঃ ফরাসী সরকারের পাব্লিক ওয়ার্কসে কেরানীর চাকরি নেন। প্রচণ্ড ঝড়ে তাঁর বাড়িটি ভেঙে যায়। 'Le Sourire' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য তাঁর তিন মাস কারাদণ্ড হয়। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার পূর্বেই ১৯০৩ সালের ৮ই মে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর এক মাস আগে বন্ধু চার্লস মরিসকে লেখা চিঠির একটি পংক্তি তাঁর সমাধিক্ষেত্রে উৎকীর্ণ হবার যোগ্য ঃ

"A man's work is the explanation of that man."

পারীতে এক সাহিত্যিক বন্ধু তাঁর শিল্পে বর্বরতা দেখে আপত্তি জানানোতে শিল্পী বলেছিলেন, "তোমাদের সভ্যতা হচ্ছে একটা ব্যাধি। আমার বর্বরতা সেই রোগমুক্তির মহৌষধ।"

বর্তমানে গোগ্যাঁ পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদলের অন্যতম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

Lust for Life	Irving Stone
The Moon and Sixpence	W. Somerset Maugham
Lives of Famous French Painters	H. J. Wechsler
History of Modern Painting (3 vol.)	Various Authors, Skira, N. Y.
Gaugain, paul	J. Rewald
Van Gogh, Vincent (Dear Theo, letters)	Edited by I. Stone
Van Gogh (Plates)	Do, A. M. Hammacher
পাশ্চাত্ত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী	শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
ভারতের শিল্প ও আমার কথা	ও. সি. গাঙ্গুলী

আবার যদি ইচ্ছা কর

নারায়ণ সান্যাল